প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

ফাল্গুন, ১৩৭১

মুদ্রক : শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ পত্র

পরাধীনতার শৃংখল ভাঙ্গার
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে
যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন,
মৃত্যুঞ্জয়ী সেই শহীদকুলের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

সূচীপত্র

বিপ্লব-ঋষি ঃ

আমার কথা

"বোধ হয় এটা মানুষের সহজাত বৃত্তি, অনেকখানি এগিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে চাইতে ইচ্ছে করে।

কি থাকে পেছনে, যা এমনি করে টানে? হয়তো সাহারা মরুভূমি, দিগন্তপ্রসারী বালুকারাশি, এলোপাথাড়ি বাতাসে আগুনের হল্‌কা, বুকফাটা তৃষ্ণা, ব্যর্থতার আগুনে ঝলসানো স্বপ্নের পাশপ নগরী! কিংবা হয়তো নয়নাভিরাম শ্যামলিমার সমারোহ, পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পথ, পথের ধারে কাজলা দীঘির কাকচক্ষু জল, গাছে গাছে ফুলের হাসি, একটানা সাফল্যের নন্দনকানন।

কিন্তু সবই অতীত। অতীতের পানে ফিরে চেয়ে লাভ কি?

তবু মানুষ ফিরে ফিরে চায়। জীবনের সূর্য দীর্ঘ আকাশ পরিক্রমার শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমে নুইয়ে পড়েছে, অপরাহ্নের ছায়া হয়ে উঠেছে দীর্ঘতর, অকস্মাৎ তখন মনে পড়ে যায় অনেক পেছনে ফেলে-আসা পূর্বাচলে সূর্য ওঠার দিনটির কথা, মনের মুকুরে ভেসে ওঠে কৈশোর ও যৌবনের টুকরো টুকরো কত না কাহিনী!

মা বাবার কত না আশা ছিল, উত্তরকালে আমি হব দিগবিজয়ী ব্যারিস্টার; ভাই বোনদের কত না আকাঙ্ক্ষা, আমি হব উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার; শিক্ষকদের কত না ভরসা, আমি হব বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন; আত্মীয় পরিজনের কত না গর্ব, আমি বংশের গৌরব বৃদ্ধি করব।

সেদিন বোধ হয় অলক্ষ্যে বসে বিধাতাপুরুষ বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন।

তাই সবার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে দিয়ে সেই কবে ১৯২৫ সালে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে আমি এক সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছিলাম।

হেমচন্দ্র ঘোষ ঢাকা শহরে তখন যে শুধু বিপ্লবী দলই গঠন করেছেন তাই নয়, গুপ্ত সমিতির কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করছে। কিশোর ও যুবকদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা। সংগঠনের গোড়ার দিকে যাঁরা তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনিল রায়, ভবেশ নন্দী, প্রফুল্ল দত্ত, ভূপাল বসু, রসময় সুর, ভূপেন্দ্র রক্ষিত রায়, অরুণ নন্দী, মণীন্দ্র রায়, সুকুমার চক্রবর্তী এবং সত্য গুপ্ত। আমি তখন পড়ি হাঁসাড়া গ্রামের হাই স্কুলে। থাকি আমাদের কেয়টখালী গ্রামের বাড়ীতে।

১৯২৪ সালে আমি ক্লাশ নাই-এ উঠলাম। ওপরের ক্লাশে গোপাল সেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ঢাকা থেকে তার ভাগনে জিতেন সেন মাঝে মাঝে হাঁসাড়ায় গোপালদের বাড়ী বেড়াতে আসত। সেও বন্ধু হয়ে গেল। ঢাকায় জিতেনদের কায়েতটুলির বাড়ীতে মাঝে মাঝেই বেড়াতে যেতাম। কখনও গোপালের সঙ্গে, কখনও একাই। জিতেনদের বাড়ীর কাছেই কুস্তির আখড়া।

জিতেন ভাল কুস্তি জানত এবং অন্য ছেলেদের সঙ্গে আমাকেও কুস্তি শেখাত। আখড়াতেই ছিল ছোটখাটো একটা লাইব্রেরী। জিতেন আমাকে অনেক বই পড়তে দিত। পড়তে দিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, বিবেকানন্দ চরিত, কামাল পাশা, গ্যারিবল্ডি ও ডি ভ্যালেরার জীবনী। ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী বলত। গোপালও পড়তে দিত অনেক বই, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, ধর্ম ও জাতীয়তা, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল ও সত্যেনের জীবনী।

গোপাল বলত, বিপ্লবের পথেই আমরা দেশের স্বাধীনতা আনব। প্রতিদিন শতমুখে যারা আমাদের শোষণ করছে, আমাদের অর্থ লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়ে যারা বিলেতে তৈরী করছে অট্টালিকার পর অট্টালিকা, সমবেতভাবে আবেদন জানালেই কি কখনও তারা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে? তাদের বাধ্য করতে হবে যেতে। একমাত্র বিপ্লবের পথেই তা সম্ভব।

জিতেন বলত, কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের পথ আমাদের জন্য নয়। ক্ষুদিরাম কানাইলাল যে রক্তরাঙ্গা পথের নিশানা দিয়ে গেছেন, সেই পথেই আমাদের যাত্রা। আসবে না দ্বিজেন, তুমি আমাদের সঙ্গে?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই আসব।

তারপর একদিন এক ঝড়জলের গভীর রাত্রে ঢাকা শহরের রমনা অঞ্চলে একটি খালের ধারে এক পুরোনো ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত মসজিদে বসে জিতেন আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সত্যভূষণ গুপ্তের সঙ্গে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলাম।

দীক্ষাগুরু সত্যদা বললেন, জন্ম থেকেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। আমার দেশমাতা পরাধীনতার শৃংখলভারে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছেন, সেই শৃংখল খান খান করে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সাগর পার হয়ে বাণিজ্য করবার অছিলায় এসে যারা এদেশ গ্রাস করে বসেছে, সেই দস্যুদের শেষ মানুষটিকেও মহাসাগরে নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত আমাদের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। পরাধীন দেশের মানুষের সামনে একটিমাত্র কর্তব্য, স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগদান। সেই সংগ্রামের ফলে হয়তো আমি বেঁচে থাকবো না, তুমিও হয়তো বেঁচে থাকবে না। কিন্তু এও সত্য বলে জানি, যে আগুন আমরা জ্বালিয়ে রেখে যাব, আমাদের উত্তরপুরুষ সেই আগুনে বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে কৃতান্তের মতো বেরিয়ে আসবে, পুড়িয়ে মারবে শয়তান ইংরেজকে। আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। স্বাধীনতার সেই রক্তাক্ত সংগ্রামে পারবে না তুমি যোগদান করতে?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলাম, পারব, পারব। সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

পনেরো বছরের কিশোর, বিপ্লব কি, ভাল করে বুঝিনি সেদিন। কি করে গড়ে উঠবে বিপ্লব, কে করবেন পরিচালনা, বন্দুক কামানে সজ্জিত ইংরেজ

সেনার সম্মুখীন হব কোন্ অস্ত্র নিয়ে, কোথা থেকে আসবে সে সব অস্ত্র, কে আমাদের অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেবেন, কিছুই ধারণা করতে পারিনি। কিন্তু দিনের আলোর মত একটি নির্মম সত্য উপলব্ধি করেছিলাম যে, আমার আর ব্যারিস্টার অফিসার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন হবার আশা রইল না।

১৯২৬ সালে ভর্তি হলাম ঢাকার জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। থাকতাম ক্যাম্পাসের মধ্যেই কলেজ হোস্টেলে।

সন্ধ্যায় রোল-কলের পর বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে নিষেধ শুনছে কে? গভীর রাত্রে লুকিয়ে বেরিয়ে যেতাম, ফিরে আসতাম ভোর হবার আগেই। যেতাম কায়েতটুলিতে জিতেনদের বাড়ীতে, মালীটোলার মেসে সুপতি রায়ের ঘরে, পাটুয়াটুলীতে সত্যদার বাড়ীতে, তাঁতীবাজারে, গেন্ডারিয়ায়, উয়ারিতে।

আর যেতাম আর্মানীটোলার মেডিকেল ছাত্রদের মেসে। সেখানে থাকত গোপাল সেন আর বিনয়কৃষ্ণ বসু।

বিনয়কৃষ্ণ বসু, মানে সেই বিনয় বোস, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের অন্যতম মেজর বি. বোস, রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানে বিনয়-বাদল-দীনেশ ত্রয়ীর বিনয়।

শুধু বই পড়াই নয়, শুধু আলোচনাই নয়, কুস্তির আখড়ায় আমি তখন নিয়মিত যাই, ছোরা দেখেছি, নেপালী ভোজালী দেখেছি, রিভলভার দেখেছি, হাতে কলমেও কিছু কিছু কাজ সুরু করেছি।

বিপ্লব সমিতি কোন প্রকাশ্য সংস্থা নয়, এর লিখিত গঠনতন্ত্র কিছু নেই, এর নেই কোন নির্বাচিত সভাপতি বা সম্পাদক। এর কোন কার্যসূচি ভোটে পাশ করাতে হয় না। কাজই এই গুপ্ত সমিতির প্রথম কথা, কাজই শেষ কথা। কাজই কর্মীর পারদর্শিতা যাচাই করবার একমাত্র কষ্টিপাথর। হেমচন্দ্র ঘোষকে আমরা বড়দা বলে ডাকি কেন? শুধু কি বয়োজ্যেষ্ঠ বলে? সেটা গৌণ কারণ। প্রধান কারণ, তিনি আমাদের বিপ্লবী দল সংগঠনে, পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে বড়দারই মত কাজ করেছিলেন। সুরুটা ছিল মৃদু, শান্ত, কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই অনন্যসাধারণ দক্ষতা ও অপূর্ব নিষ্ঠাবলে কাজের মধ্য দিয়ে তিনি একেবারে প্রথম সারির প্রথমে এসে গেলেন, আমাদের শ্রদ্ধাবিগলিত কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হল, বড়দা, আমাদের বড়দা।

কেউ কাউকে শিখিয়ে দেয়নি।

ট্রেনিংএর সময় বা কাজের সময় এমন অনেক কর্মীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, সমবয়সী হলেও যারা ছিল নায়ক, যাদের নির্দেশ সানন্দে মাথা পেতে গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করিনি।

কখনও দেখেছি, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসে কারা জিতেনের ঘরের

দরজায় সাঙ্কেতিক শব্দ করল, আলো নিভিয়ে দিয়ে জিতেন আমায় পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিল, তারপর অনুচ্চকণ্ঠে সুরু হল ওদের কথা, চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তারপর একসময় নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে ওরা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ওরা কারা, কি জন্য এসেছিল, কি কথা হল, কোথায় চলে গেল, এ নিয়ে কোনদিন কোনও প্রশ্ন করিনি জিতেনকে। অথচ জিতেন ছিল প্রায় আমার সমবয়সী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু সে ছিল আমার শিক্ষক আর আমি শিক্ষানবিশ।

পারিবারিক কারণে ঢাকাতে পড়া হল না। ১৯২৭ সালে চলে এলাম কলকাতায়, উঠলাম দক্ষিণ কলকাতায় ভবানন্দ রোডে। আমার মেজদা সে বাড়ীর কর্তা। কোথাও আর ভর্তি হলাম না, মেজদাও বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। আমার চালচলন দেখে হতাশ হয়ে গেছেন।

সত্যদাও তখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এসেছেন, থাকেন ১-সি রসা রোডের দোতলায়।

সত্যদাকে কেন্দ্র করেই সংগঠনের কাজ সুরু হয়ে গেল। পরিচয়ের পরিধি বাড়তে লাগল। গোপালের মেজদির বাড়ী তখনকার রসা থিয়েটারের বিপরীত দিকে গলির মুখে। তাঁর বড় ছেলে অনিল সেনের সঙ্গে পরিচয় হল। অনিল ইতিমধ্যেই বিপ্লবী দলে যোগদান করেছে। তার বাবা গুণেশ সেন আলীপুর কোর্টের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর।

পরিচয় হল বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে।

পরিচয় হল হরিকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে।

পরিচয় হল ৭১ মির্জাপুর স্ট্রীটের দোতলার মেসের মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে। এঁরা সবাই বরিশালের শঙ্কর মঠ বিপ্লবী দলের কর্মী। মনাদা পরিচয় করিয়ে দিলেন রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের সরস্বতী লাইব্রেরীতে কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিরণদার বইয়ের দোকান থেকে বই নিয়ে আসতাম, ছেলেদের পড়তে দিতাম, পড়া হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে আসতাম।

সত্যদা একদিন বললেন, বরিশাল শঙ্কর মঠের বিপ্লবী দলের ওঁরা ক'জন আমাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

১৯২৭ সালে বিলেত থেকে এসেছিল সাইমন কমিশন।

কমিশনের সদস্যরা যেদিন জাহাজ থেকে নেমে বোম্বাই-এর মাটিতে পদার্পণ করল, সমগ্র ভারতব্যাপী সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে সেদিন থেকেই সুরু হয়ে গেল কমিশন বয়কট আন্দোলন। লাহোরে মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়। স্কট সাহেব বন্দুক ও লাঠিধারী পুলিশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র মিছিলের ওপর।

[এগার]

রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন লাজপৎ রায়। সেই আঘাতের ফলেই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সচকিত হয়ে উঠলেন বিপ্লবীরা। বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীরা, একটা কিছু করতেই হবে।

পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হল বিপ্লবী দলের সংগঠন, হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মি এবং নওজোয়ান ভারত সভা। নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন সর্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রসিং আজাদ এবং আরও ক'জন।

লালা লাজপৎ রায়ের ওপর মারাত্মক আক্রমণ চালিয়েছিল যে নরপশু স্কট, তাকে খতম করতে গিয়ে ভুলক্রমে নিহত হল স্যাণ্ডার্স সাহেব।

দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কক্ষে বোমা নিক্ষেপ করে ধরা দিলেন সর্দার ভগৎ সিং। নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, যে বিপ্লবের ঝড় প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠছে, শেষ বারের মতো বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্যই বোমা ফেলেছি।

১৯২৮ সালে ভর্তি হলাম যাদবপুরে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে। মনের আশা, গুড বয়ের মতো ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ব। ব্যারিষ্টার হওয়া হল না, না হতে পারলাম কোনো বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, দলের মধ্যে একজন হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবার পরিকল্পনা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, তথাপি অভিভাবকরা এই ভেবে কথঞ্চিৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন যে, যাকগে নষ্ট হয়ে একটি বছর, আমার বয়স মাত্র আঠারো, লেগে থাকলে এখনও ইঞ্জিনীয়ার হয়ে সংসারী হবার আশা আছে।

আমাদের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন ত্রিগুণাচরণ সেন।

হঠাৎ একদিন গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর সত্যদার বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভবানীপুর থানার পাশ দিয়ে যখন আসছি, দেখি, থানার সামনে দাঁড়িয়ে দুজন ভদ্রলোক কথা বলছেন আর আমায় লক্ষ্য করছেন। তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে আসব, এমন সময় একজন বলে উঠলেন, ওহে ছোকরা, শোন।

দাঁড়ালাম।

কি নাম তোমার ?

পাল্টা প্রশ্নই মুখে এসে যাচ্ছিল, তা জেনে আপনার কি দরকার, কিন্তু কোনরকমে চেপে গিয়ে বললাম, দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

কোথায় থাক ?

১৫-এ, ভবানন্দ রোড।

কি পড় ?

তা বলতেও আপত্তি করলাম না।

[বার]

গিয়েছিলে কোথায় ?

এবার আর ধৈর্য রইল না, পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, তা দিয়ে আপনার কিছু দরকার আছে কি ? আমি কোথায় যাই না-যাই, কি কি দিয়ে ভাত খাই—

শাট আপ। ধমক দিয়েই কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ভেবেছ আমরা কোন খবর রাখি না। গিয়েছিলে সত্য গুপ্তের বাড়ীতে। ঢাকা শহর জ্বালিয়ে সত্য গুপ্ত এসেছে কলকাতায়। কেন রোজ রোজ ওখানে যাও, তাও আমরা জানি।

কি জানেন ? ফস্ করে জিজ্ঞেস করলাম।

খপ করে আমার হাত ধরে ফেললেন, কি জানি ? এস ছোকরা আমার সঙ্গে, ভাল করে সমঝে দিচ্ছি তোমায়, কি আমি জানি।—বলেই থানার ভেতরে নিয়ে গেলেন। খাকি ইউনিফরম-পরা দারোগাবাবু টেবিলে বসে কি লিখছিলেন, সেই টেবিলের সামনে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, স্বদেশী গুণ্ডার দলে যোগ দিয়েছ তুমি, তোমায় এ্যারেস্ট করা হল। এবার একটা ষড়যন্ত্র মামলায় জুড়ে দিলেই তোমার অন্ততঃ দশ বছর জেল হয়ে যাবে। ছেড়ে দিতে পারি, যদি সব আমায় জানাও, সত্য গুপ্ত কি বলে, কি করবার মতলবে আছে, কে কে যায় তার বাড়ীতে—

সটান বলে দিলাম, কিছুই জানি না।

শুনেই দারোগাবাবু মুখ তুললেন, আপনি স্যার, যত সহজ মনে করছেন, ছোকরা তত সহজ পাত্র নয়। দিন আমার হাতে ছেড়ে, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দিই, দেখবেন, সব গল গল করে বেরিয়ে আসবে।

স্যার বললেন, রইল আপনার চার্জে, যথাসময়ে জানাবেন।

ভদ্রলোক চলে যেতেই দারোগাবাবু হাঁক দিলেন, দরওয়াজা।

বিশাল চেহারার এক পুলিশ এসে বুটের আওয়াজ তুলে স্যালুট করল।

সালা রেণ্ডিকা বাচ্চাকো হাজতমে ডালো।

খপ করে ধরল পুলিশ আমার চুলের মুঠি, টানতে টানতে নিয়ে গেল হাজতের কাছে, দরজা খুলে রেখে, চুল টেনে মাথাটা নুইয়ে মারল পিঠে কনুইয়ের গুঁতো, বাবা-মা তুলে অশ্লীল ভাষায় গাল দিতে দিতে এত জোরে ধাক্কা দিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে দিল যে, টাল সামলাতে না পেরে আমি পড়ে গেলাম।

দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে দরওয়াজা গট গট করে চলে গেল।

কিন্তু মামলা-টামলা হল না কিছু। থানা থেকে প্রায়ই নিয়ে যেত লর্ড সিংহ রোডে আই বি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং ওদের পছন্দ মত উত্তর না পেলে ধোলাই-এর ব্যবস্থা হত। স্বাস্থ্য আমার বেশ ভাল ছিল, ধোলাইকে কেয়ার করতাম না।

মামলা না হলেও এবং চোদ্দ দিন হাজতবাসের পর আমায় ছেড়ে দিলেও

বেশ বোঝা গেল, আই বি সত্যদার বাড়ীর ওপর নজর রেখেছে আর যারা সেখানে যায়, তাদের পেছনেও ফেউ লাগিয়েছে।

আমার অভিভাবকরা এবার একেবারেই আশা ছেড়ে দিলেন। বেশ বুঝতে পারলেন, স্বদেশীদের দলে ঢুকেছি বলেই পুলিশ ধরেছিল। ধরেছিল রাস্তা থেকে। একবার যখন ধরেছে, তখন কোথাও কিছু হলেই ধরবে, বার বার ধরবে, তারপর কোনও ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘ দিন জেল হয়ে যাবে। মেজদা সরকারী চাকুরে, ভয়টা তাঁরই হল বেশী। এবার না হয় বাড়ী তল্লাসী করেনি, কিন্তু এর পরের বার বাড়ীতেই পুলিশ হানা দেবে এবং কে জানে, হয়ত তাঁর চাকরি নিয়েও টান মারতে ছাড়বে না। তিনি প্রমাদ গুনলেন।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। জি ও সি।

সত্যদা বললেন, আমরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করব।

এতকাল কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে যে ধরনের স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হয়েছে, এবারই হবে তার ব্যতিক্রম। সেই যে দুধের মত সাদা খদ্দরের পোশাক, ধুতি, জামা ও গান্ধী টুপি আর স্যাণ্ডেল, চলাফেরায় শান্ত ও বিনয়ী, কথাবার্তায় আবেদনের ভাষা—না, তা নয়। এবার আর দল নয়—বাহিনী, স্বেচ্ছা-সৈন্যবাহিনী। এবার খাকি শার্ট, কোট, শর্ট বা ট্রাউজার্স, হাইল্যাণ্ডার্স ক্যাপ বা হেলমেট, বুট, পট্টি, চওড়া বেল্ট। অফিসারদের টাই ও স্টারস। কাঁধের ওপর ব্যাজ বি. ভি., টুপিতে মনোগ্রাম বি. ভি.। মানে, বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স।

ভলাণ্টিয়ার্স বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, মোটর সাইকেল, সাইকেল ও মেডিক্যাল। মেয়েদেরও দল আছে, তারা সভামণ্ডপে ও অন্যত্র মহিলাদের মধ্যে কাজ করবে।

বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক, জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, সুভাষচন্দ্র বসু। এ্যাডজুটেণ্ট পূর্ণ দাস, হেমন্ত বসু, রবি সেন, সন্তোষ দত্ত, প্রতুল ভট্টাচার্য এবং আরও ক'জন।

দক্ষিণ কলকাতায় তৈরী হল বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের 'বি' কম্পানী। অধিনায়ক মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত। আমি সেই কম্পানীর একটি প্লেটুনের প্লেটুন সার্জেণ্ট।

নিয়মিতভাবে কুচকাওয়াজ সুরু হয়ে গেল। কখনও হরিশ মুখার্জী রোডের ন্যাশনেল স্কুলপ্রাঙ্গণে, কখনও হরিশ পার্কে, কখনও চলত রুট মার্চ ভবানীপুর থেকে গড়ের মাঠ পর্যন্ত।

জানিনা, এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মধ্য দিয়েই মহাবিপ্লবী সুভাষ আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা।

আর সত্যদা সেই যে একবার 'মেজর গুপ্ত' নামে পরিচিত হয়ে গেলেন তারপর থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ছিলেন, মেজর গুপ্ত।

কংগ্রেসের অধিবেশনের পর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সকে স্থায়ী রূপ দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হল। শুধু বাংলা দেশেই নয়, বাইরেও গড়ে তোলা হবে এমনি বাহিনী, যথা, বিহার ভলান্টিয়ার্স, উড়িষ্যা ভলান্টিয়ার্স। কিশোর ও যুবকদের মধ্যে সামরিক নিয়মানুবর্তিতা, সামরিক শৌর্য ও সামরিক চেতনা জাগিয়ে তোলাই হবে এই বাহিনীর উদ্দেশ্য।

উদ্বোধন করা হল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ঢাকা রেঞ্জ। উদ্বোধন করলেন মেজর সত্য গুপ্ত। শুধু ঢাকা শহরেই নয়, সংগঠন বিস্তার লাভ করল নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমা শহরে। শুধু মহাকুমা শহরেই নয়, শহরকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল। আমিও কলকাতা ছেড়ে মাঝে মাঝেই বিক্রমপুরে আমাদের বাড়ীতে যেতাম। আমাদের গ্রামে এবং আশেপাশের গ্রামেও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ড্রিল, প্যারেড ও রুট মার্চ সুরু হয়ে গেল।

মা বাবার চিঠিতে খবর পেয়ে বিক্রমপুরে আমার তৎপরতায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এবং কলকাতায় নিজেই নজর রেখে আমার চালচলনে মহা উদ্বিগ্ন হয়ে মেজদা যাদবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট থেকে নাম কাটিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিলেন একেবারে সুদূর বেনারসে আমার সুন্দরদার কাছে।

১৯২৯ সালে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ ক্লাসে ভর্তি হলাম। তখন আমার বয়স উনিশ।

কিন্তু ততদিনে আমার ভাল ছেলে হবার আশা চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। কাশীতেও গুপ্ত সমিতির সঙ্গে পরিচিত হলাম। কাঁকোড়ী মামলার শহীদ রাজেন লাহিড়ীর দাদা ডাঃ জিতেন লাহিড়ীর ওষুধের দোকান 'স্টার কোম্পানী'-তে আমাদের ঘাঁটি স্থাপিত হল। স্থাপিত হল বিবেকানন্দ সেবা সমিতি নামে সমাজ-সেবা সংগঠন।

একবার ছুটিতে কলকাতা এসে সত্যদার ওখানে গেলাম। তখন তিনি থাকতেন কালীঘাট রোডে।

সেখানেই পরিচয় হল শচীন করগুপ্তের সঙ্গে। মাঝে মাঝে তাকে সত্যদার বাড়ীতে দেখতাম। বি. ভি-র ছেলে নয়, অথচ বার বার আসে কেন?

সত্যদা বললেন, শচীন এবং আরও কিছু ছেলে, তারা কেউ অনুশীলনের, কেউ যুগান্তরের, তারা এখনই এ্যাকশন করতে চায়। নেতারা বলছেন অপেক্ষা

করতে, কিন্তু এরা অপেক্ষা করতে রাজী নয়, ইয়োরোপীয় হত্যার কর্মসূচী এরা এখনই কার্যকরী করতে আগ্রহী। সবাই এদের নাম দিয়েছে, 'রিভোল্ট গ্রুপ।' কিন্তু নেতাদের বিরুদ্ধে রিভোল্ট ত করেনি এরা। উৎসাহে উদ্দীপনায় এরা খানিকটা অসহিষ্ণু বলা যায়। নইলে এরাও জীবন বলিদানে পরাঙ্মুখ নয়। শুধু এরা এ্যাকশন চাইছে এবং তা এখনই।

ওখানে অন্য দলের আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল।

সুতরাং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া পরিত্যাগ করে ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। পুরোদমে কাজ সুরু করলাম।

প্রথমে ঢাকা শহরে, তারপর বিক্রমপুরে, তারপর কলকাতায় এবং সর্বশেষে বেনারসে কত যে দেশের জন্য নিবেদিত-প্রাণ বিপ্লবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কত যে দুঃসাহসী বৈপ্লবিক অভিযানের বিবরণ জানতে পেরেছিলাম, এতকাল পরে আজ তাদের অনেকের কথা ও কাহিনী ভুলে গিয়েছি নিজের কথাও কি সব মনে আছে ?

আশ্চর্যতম সত্য যে, আমাদের দেশ স্বাধীন করবার জন্য কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক বিপ্লবী কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিলেন, সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। সূচনা থেকে সুরু করে এর বিস্তার, শক্তি অর্জন, এর তত্ত্ব ও দর্শন, কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি, এর সুইসাইড স্কোয়াড, এ্যাকশনগুলির নিখুঁত বিবরণ— না, এমনি কোনো গ্রন্থ নেই, যাতে এসব তথ্য ও কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আছে।

বিপ্লব আন্দোলনের টুকরো টুকরো কাহিনী হয়তো কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে তথ্যের সঙ্গে কল্পনা ও ভাবাবেগ মিশে একাকার হয়ে গেছে। সুখপাঠ্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে ইতিহাস বলে না।

আসল কথা, বিপ্লবী দলগুলি ছিল গুপ্ত সমিতি। প্রকাশ্য সংগঠনের মতো সে সব সমিতির কোন রেজিস্টার ছিল না। নিয়মানুবর্তিতা ছিল এত কঠোর যে, নিজের কর্মের কথা কেউ কাউকে বলতে পারত না। জানবার কৌতূহল ছিল সর্বতোভাবে পরিহার্য। ফলে, যারা এ্যাকশন করেছেন, শুধু তাঁরাই সেই এ্যাকশনের নিখুঁত বিবরণ দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের অনেকেই আজ লোকান্তরিত। যাঁরা আছেন, তাঁরাও নীরব ছিলেন, নীরবই আছেন। কিছুতেই নিজের কথা বলতে চান না। বিপ্লবীদের অনেকেই আজ বৃদ্ধ অথবা প্রৌঢ়, কেউ কেউ ব্যাধিগ্রস্ত, তাঁদের অনেকেরই পুরোনো ঘটনা ভাল করে মনেও পড়ে না। যা মনে পড়ছে না, বিপ্লবীরা কখনও সেখানে জোড়াতালি দেন না।

সুতরাং ইতিহাস প্রণয়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি যে টুকরো টুকরো কাহিনী লিখেছি, তার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অসংখ্য গ্রন্থের সাহায্য নেয়া ছাড়াও, যখনই শুনেছি সেই ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাক্ষী কেউ জীবিত আছেন, তখনই ছুটে গেছি তাঁর কাছে।

১৯২৫ সালে আমার বয়স ছিল পনেরো বৎসর। সুতরাং এখন আমার বয়স কত, সহজেই জানা যায়। বয়সের চাপ অগ্রাহ্য করেই তথ্য সংগ্রহে চেষ্টা করেছি। ইতিহাস রচনার আশা ত্যাগ করে বিপ্লব-বহ্নির কয়েকটি শিখার বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি। আমার সে প্রয়াস কতখানি সফল হয়েছে জানি না।

কাহিনীগুলি 'গল্প-ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তদানীন্তন সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় চেয়ে নিয়েছিলেন। প্রকাশন শেষ হবার আগেই তিনি লোকান্তরিত হলেন। প্রয়াত শৈলজাদার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছেন বর্তমান সম্পাদক সত্যেন রায়। তাঁকে জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

এই খণ্ড খণ্ড কাহিনীগুলি কিছুতেই গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারত না, যদি না জেনারেল প্রিণ্টার্স-এর কর্ণধার শ্রীমান সুরজিৎ আগ্রহ দেখাত।

পরিশেষে বলি, দেশ স্বাধীন করার সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু সেই অতীতের বিপ্লব কাহিনী শোনার আগ্রহ এখনও অপরিসীম। 'বিপ্লব-বহ্নি' যদি সেই আগ্রহ কথঞ্চিৎও মেটাতে পারে, তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

৩৭, বেলগাছিয়া রোড,
ফ্ল্যাট—এফ/৩, এম. আই. জি.
কলিকাতা-৭০০০৩৭

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

বোম্বাই দেখাল পথ, বাংলা করল অনুসরণ

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস।

বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ দেখা দিল। প্রথমে দুটি চারটি, বিচ্ছিন্নভাবে এখানে সেখানে, যারা স্বেচ্ছায় হাসপাতালে এলো, তাদের মধ্যে কিছু কিছু বেঁচে গেল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত বস্তিবাসীদের অনেকেই হাসপাতালে যাবার ভয়ে রোগের কথা চেপে যেতে লাগল। চেপে গেলে কি হবে, এ রোগ যে মারাত্মক, সময়মত ব্যবস্থা না নিলে দু চারদিনেই শেষ, প্লেগে মৃত্যুর খবর তো আর চেপে রাখা যায় না। আর প্লেগ ভীষণভাবে সংক্রামক, এক বাড়ীর রোগের কথা গোপন করে রাখলে কি হবে, দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে বাড়ীতে বাড়ীতে, ঘরে ঘরে, তখন?

প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল, মহামারী আকারে দেখা দিল।

শত চেষ্টা করেও গভর্ণমেণ্ট সাধারণ ব্যবস্থার দ্বারা এর বিস্তার রোধ করতে পারল না।

সুতরাং কালেক্টরকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়ে ১৮৯৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী নতুন আইন বিধিবন্ধ করা হল। মহামারী রোগ আইন। এ আইনে প্রথমেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, রোগাক্রান্তদের এক জায়গায় আটকাতে হবে সংক্রমণ রোধের জন্য।

আর এই আইন মোতাবেক কাজ করবার জন্য সিতারার সহকারী কালেক্টরকে পুণায় বদলি করা হল। তার নাম ডবলিউ. সি. র‍্যাণ্ড।

জবরদস্ত ইংরেজ অফিসার র‍্যাণ্ড। সিতারায় থাকতে শাসনের নামে সে যে অত্যাচার চালিয়েছিল, কেউ ভোলেনি তা।

এখানে এসেও প্লেগ দমনের নামে র‍্যাণ্ড যথেচ্ছাচার সুরু করল। গুজব শুনলেই সে যে-কোনো এলাকায় সদলবলে হানা দিতে লাগল, কেউ রোগাক্রান্ত হয়েছে কিনা, পরীক্ষা করবার জন্য কি পুরুষ, কি মেয়ে, সবাইকে উলঙ্গ ক'রে লাইন দিয়ে দাঁড় করাতে লাগল। তারপর গরু ছাগলকে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হয়, তেমনিভাবে রোগাক্রান্তদের দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে লাগল আটক শিবিরে।

লোকে আপত্তি জানাল, প্রতিবাদ করল, বিক্ষোভ প্রকাশ করল, প্রতিনিধি দল গিয়ে র‍্যাণ্ডকে অনুরোধ জানাল, রোগ প্রতিরোধের নামে আপনার এই

অসভ্য বর্বর ব্যবস্থা প্রত্যাহার করুন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মতো জননেতাও প্রতিবাদ জানালেন, এ ব্যবস্থা জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়।

তবুও কর্ণপাত করল না র্যান্ড, প্লেগ নির্মূল করার নামে জুলুম অবাধে চালিয়ে যেতে লাগল।

সুতরাং এবার নড়ে উঠল বিপ্লবী দল, হাত কামড়াতে লাগল চাপেকর ভাইরা—দামোদর হরি, বালকৃষ্ণ হরি আর বাসুদেব হরি—মানুষকে যে ইংরেজ নরাধম মানুষ বলে গণ্য করে না, মহিলাদের মর্যাদা রক্ষায় যে পরাঙ্মুখ, ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাকে সরিয়ে দেয়াই সমীচীন।

প্রস্তুত হল চাপেকর ভাইরা তরবারি ও পিস্তল নিয়ে।

১৮৯৭ সালের ২২ জুন। ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে পুণা শহরে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন হচ্ছে। স্বভাবতঃই সরকারী কর্মচারীরা, বিশেষ করে, ইংরেজ অফিসাররা উৎসব সফল করে তোলার জন্য ছুটোছুটি করছে। রাত দশটার সময় র্যান্ড গেছে গভর্ণরের কাছে আলোচনার জন্য।

ঠিক সেই সময় গভর্ণরের বাসভবনের ফটকের বাইরে ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে দামোদর, একটু দূরে বালকৃষ্ণ।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় র্যান্ডের ফিটন গাড়ী বেরিয়ে এসে সদর রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হল। দামোদর দৌড়ুতে দৌড়ুতে অনুসরণ করল।

জামসেদজী জীজীভাই-এর বাসভবনের বিপরীত দিকে আসতেই বালকৃষ্ণ চীৎকার করে সংকেত জানাল। দামোদর দৌড়ে গিয়ে ফিটনের পেছন দিক দিয়ে ওপরে উঠল, তারপর হুডটা খুলে নামিয়ে ফেলে র্যান্ডের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টানল। এ গুলী ব্যর্থ হতে পারে না।

মারাত্মকভাবে আহত হয়ে র্যান্ড গাড়ীর মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। রক্তের স্রোত বয়ে গেল। পরদিন প্রাণত্যাগ করল র্যান্ড রাত তিনটেতে।

দামোদর পালিয়ে গিয়েছিল, পালিয়েছিল বালকৃষ্ণও।

প্রায় দুমাস পর দামোদর ধরা পড়ে গেল।

তারপর যা হয়, যা হতো, ইংরেজের আদালতে বিচারের প্রহসন। দামোদরের চরম দণ্ড হল।

যারবেদা সেনট্রাল জেলে ফাঁসী হয়ে গেল তার ১৮৯৮ সালের ১৮ এপ্রিল।

ভারতের প্রথম শহীদ দামোদর হরি চাপেকর।

ছোট ভাই বাসুদেব খবর সংগ্রহ করল যে দামোদরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রধানতঃ সাহায্য করেছিল পুলিশের যে দুটি গুপ্তচর, দুটি ভাই, তাদের নাম গণেশশংকর দ্রাবিড় ও রামচন্দ্র দ্রাবিড়। এদের খতম করবার শপথ গ্রহণ করল বাসুদেব আর তার বন্ধু মহাবীর বিনায়ক রাণাডে।

১৮৯৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী যাত্রা করল দুজন, বাসুদেব আর রাণাডে। ওদের পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশ। রাত প্রায় দশটায় ওরা সোজা গেল দ্রাবিড়দের বাড়ীতে। গিয়ে বলল যে, সুপারিনটেনডেণ্ট অফ পুলিশ এসেছেন, দূরে অপেক্ষা করছেন, একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলবেন বলে ডেকেছেন তাদের।

গণেশ আর রাম হুজুর এসেছেন শুনে উঠিতো পড়ি পড়িতো উঠি করে ওদের সঙ্গে বাইরে চলে এলো।

কিছুদূর যাবার পর শোনা গেল রিভলভারের গর্জন।

গণেশ তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাল, রামচন্দ্র মরল পরদিন।

দুদিন পরেই গ্রেপ্তার হল বাসুদেব আর রাণাডে।

বাসুদেবের ফাঁসী হয়ে গেল ৮ মে। আর রাণাডের ১০ মে।

বালকৃষ্ণ ধরা পড়ে হায়দ্রাবাদে ১৮৯৭ সালে বড়দিনের সময়।

তার ফাঁসী হয়ে গেল ১৮৯৯ সালে ১২ মে।

তিন ভাই একই জেলের একই ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেল।

বোম্বাই-এর বিপ্লবীরা প্রমাণিত করল যে, তারা অত্যাচারীকে আর গুপ্তচরকে শুধু হুমকি দেয়া নয়, তাদের একেবারে খতম করে দিতে জানে। ঢিল খেলে তারা উত্তর দেবে পাটকেলের মধ্য দিয়ে, চোখ দেখালে দেখাবে চোখ, দাঁত দেখালে দাঁত।

তার ফলে যদি ফাঁসী যেতে হয়, তাতেও পশ্চাৎপদ নয় বোম্বাই-এর বিপ্লবীরা!

বোম্বাই-এর বিপ্লবীরা এই যে দেখাল রক্তরাঙ্গা পথ, কয়েক বছর পর এই পথেই যাত্রা করেছিল বাংলার বিপ্লবীরা।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন করবার অজুহাতে বঙ্গবিভাগ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা দেশ ক্রোধে ফেটে পড়ল।

সর্বত্র সভা হতে লাগল আর সেই সব সভায় নেতারা অগ্নিক্ষরা ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। পথে পথে বেরোল বিক্ষোভ মিছিল, তাদের কণ্ঠে মিলিত জয়ধ্বনি, বন্দে মাতরম। তাদের অনড় অটল দাবী, বঙ্গবিভাগ রদ কর। বন্দে মাতরম শব্দ দুটি সম্বন্ধে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষের ঘোর আপত্তি থাকায় সেখানে তৈরী করা হল 'বন্দেমাতরম সম্প্রদায়'।

বাংলায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির গোড়াপত্তন হয়েছিল কয়েক বছর আগেই। তখনকার পত্র-পত্রিকাগুলিও বিপ্লবীদের প্রেরণা জোগাচ্ছিল।

কলকাতায় তখন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিল কিংসফোর্ড।

স্বনামধন্য কিংসফোর্ড! র‍্যাণ্ডের উপযুক্ত উত্তরসূরী।

'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অভিযুক্ত হলেন তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে, যার শিরোনাম, 'ভয় ভাঙ্গো' এবং 'লাঠ্যৌষধি'।

কিংসফোর্ড ১৯০৭ সালের ২৪ জুলাই সম্পাদককে দণ্ডদান প্রসঙ্গে রায়ে মন্তব্য করল, 'ভয় ভাঙ্গো' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, দেশবাসী এখনও মূঢ় রয়েছে বলেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য এখনও টিঁকে আছে। 'লাঠ্যৌষধি' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, কাবুলী দাওয়াই-এর মতো আশ্চর্য ফলদায়ক ওষুধ আর নেই।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের দণ্ড সম্পর্কে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার ২৮ জুলাই-এর সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হল, সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ তাতে লিখলেন, ভূপেন্দ্রনাথ সত্যিই রাজদ্রোহমূলক কিছু লিখেছিলেন কিনা, সেটাই আসল প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত কি স্বাধীন? ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমার স্বাধীনতা আছে কি? স্বাধীন মানুষের মতো আমরা নির্যাতনের পরোয়া না করে যা ভাল বলে মনে করি, তাই ব্যক্ত করব।

অরবিন্দ ঘোষকে অভিযুক্ত করা হল আবার সেই কিংসফোর্ডের আদালতে।

সরকারপক্ষের সাক্ষী হিসেবে সমন জারি করে হাজির করা হল বিপিন চন্দ্র পালকে।

বিপিন পাল আদালতে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দোব না।

কিংসফোর্ড ভয় দেখাল, আপনাকে যে সব প্রশ্ন করব, তার ঠিক ঠিক জবাব না দিলে ফল কি হবে বুঝতে পারছেন?

পারছি, দৃঢ়স্বরে বললেন বিপিন পাল, তথাপি আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব না।

আদালত অবমাননার অভিযোগে কিংসফোর্ড বিপিন চন্দ্র পালকে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল।

আদালত বসেছিল লালবাজারে। বিপিন পালের বিচার দেখবার জন্য লালবাজারে দারুণ ভিড় হত। বিশেষ করে কিশোর ও যুবকেরা আসত দলে দলে। ১৯০৭ সালের ২৬ আগষ্ট এত ভিড় দেখে আর ওদের সমবেত কণ্ঠের বন্দে মাতরম ধ্বনি শুনে ইংরেজের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল, কিংসফোর্ড হুকুম দিল, লাঠি মেরে তাড়িয়ে দাও ওদের।

তৎক্ষণাৎ এলোপাথারি লাঠি চালাল পুলিশ। চালাল লাথি, চালাল ঘুসি।

ঘুসির বদলে ঘুসি চালাল মাত্র পনেরো বছরের একটি ছেলে, নাম সুশীলকুমার সেন।

সার্জেণ্ট তাকে গ্রেপ্তার করে হাজির করল কিংসফোর্ডের আদালতে।

নরপশু কিংসফোর্ড হুকুম দিল, লাগাও বেত পনেরো ঘা।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার ১৯০৭ সালের ১৩ আগষ্টের সংখ্যায় সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখলেন, এস, আমরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মা কালী চারটি বাহু বিস্তার করে আমাদের ডাকছেন। তোমাদের কামান বন্দুককে কি ডরাই আমরা ?

রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

এবং আবার সেই কুখ্যাত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে।

কিংসফোর্ডের অত্যাচারের প্রশংসা করলেন লর্ড মর্লে।

তার অপার রাজভক্তির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০৮ সালের ২৮ মার্চ তাকে প্রমোশন দিয়ে মজঃফরপুরের জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত করা হল।

কিন্তু বাংলার বিপ্লবীদের কালো খাতায় তত দিনে তার নাম উঠে গেছে। কিংসফোর্ডকে খতম করতে হবে।

এগারো বৎসর পূর্বে পুণাতে র‍্যাণ্ডকে হত্যা করে যে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিল চাপেকর ভাইরা, বাংলার বিপ্লবীরা এবার সেই পথে পা বাড়াবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলি হবার আগেই যখন কলকাতার গার্ডেনরীচে থাকত, তখনই সুশীল সেন তাকে দেবার জন্য চাপরাশীর হাতে

দিয়ে একটি মারাত্মক ধরনের 'বই-বোমা' পাঠিয়েছিল। বইখানা খুললেই বোমা বিদীর্ণ হবে।

কিন্তু বেঁচে গেল কিংসফোর্ড, বইখানা না খুলেই তা শেলফ-এ রেখে দিয়েছিল। ভেবেছিল তার কোন বই পড়বার পর বন্ধুরা কেউ ফেরৎ পাঠিয়েছে।

এবার মজঃফরপুর অভিমুখে যাত্রা করল দুই তরুণ বিপ্লবী, ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি (ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায়)। তাদের সঙ্গে একটি বোমা ও একাধিক পিস্তল। প্রথমে বোমা দিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা হবে, না হলে চালানো হবে রিভলভার।

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কিংসফোর্ড ও তার অন্যান্য বন্ধু বাসভবনের পাশেই ক্লাবে যখন মদ্যপান ও তাসের জুয়া খেলায় মত্ত, তখন জানতেও পারল না যে, রাত্রি প্রায় আটটায় ওরা দুজন চুপি চুপি এসে ওৎ পেতে রইল গেটের কাছাকাছি।

খেলার শেষে কিংসফোর্ড এবং মিসেস ও মিস কেনেডি দুখানা খোলা ঘোড়ার গাড়ীতে গৃহাভিমুখে রওনা হল। প্রথম গাড়ীতে মিসেস ও মিস কেনেডি।

রাস্তায় পর্যাপ্ত আলো না থাকায় চিনতে পারল না ওরা, প্রথম গাড়ীতেই কিংসফোর্ড আসছে মনে করে ক্ষুদিরাম ছুটে গিয়ে গাড়ীর মধ্যে বোমা ছুঁড়ল। বোমা বিদীর্ণ হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিস কেনেডি ও কিছুক্ষণ পরে মিসেস কেনেডি প্রাণত্যাগ করলেন।

কিংসফোর্ড দ্বিতীয়বার বেঁচে গেল।

বেঁচে গেলেও এমনই আতঙ্কিত হল যে, ঘটনার দিন তিনেক পরই সে সপরিবারে মজঃফরপুর ত্যাগ করে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো পলায়ন করল মুসৌরীতে।

১ মে সকাল প্রায় আটটায় ওয়েনি রেল ষ্টেশনে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে।

১১ আগষ্ট মজঃফরপুর জেলে তাঁর ফাঁসী হয়।

প্রফুল্ল এসে পেঁছিল সমস্তিপুর রেল ষ্টেশনে এবং মোকামা ঘাটের টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসল।

সিংভুম পুলিশের দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মজঃফরপুর থেকে ঐ ট্রেনেই যাচ্ছিল সিংভুম। প্রফুল্লর চালচলন দেখে তার সন্দেহ হল। সে যেমন ওপরওয়ালাকে সব জানিয়ে পরবর্তী নির্দেশ চাইল, তেমনি যাত্রী হিসেবে প্রফুল্লর সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল।

ট্রেন মোকামা ঘাট ষ্টেশনে আসতেই অপেক্ষমান পুলিশদের সাহায্যে নন্দলাল প্রফুল্লকে ধরে ফেলবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পুলিশের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল প্রফুল্ল এবং পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করল। গুলী চালাবার পূর্বক্ষণে বলে গেল, বেশ, বেশ! আপনি বাঙ্গালী, আমার দেশের লোক, আপনি আমায় গ্রেপ্তার করতে এসেছেন?

প্রফুল্লর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কলকাতা আনা হয় সনাক্তকরণের জন্য।

আত্মহত্যার পূর্বক্ষণে দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রফুল্লর উক্তি আর কেউ শুনুক, না শুনুক, বাংলার বিপ্লবীদের কানে পেঁছেছিল। তাদের কালো খাতায় নাম উঠল নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ঘটনার সাত মাস পরের ঘটনা। ১৯০৮ সালের ৯ নভেম্বর। স্থান কলকাতা।

নন্দলাল কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসেছে। থাকে ১০০/২ সারপেনটাইন লেনে।

কিংসফোর্ডকে আক্রমণের পর প্রায় সাত মাস কেটে গেছে। ক্ষুদিরামেরও ফাঁসী হয়ে গেছে মাস তিনেক আগে। মোকামাঘাট রেল ষ্টেশনের ঘটনার কথা এই কলকাতা শহরে কেই-বা মনে করে বসে আছে? নন্দলাল নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বিপ্লবীদের দুর্জয় সংকল্প ও সাহসের কতটুকু পরিচয় পেয়েছে সে?

৯ নভেম্বর সন্ধ্যার পর প্রায় সাড়ে সাতটায় নিশ্চিন্ত মনে নন্দলাল একখানা চিঠি পোষ্ট করবার জন্য রাস্তায় বেরিয়েছে, এমন সময় শোনা গেল রিভলভারের গর্জন।

নন্দলালের প্রাণহীন দেহ পথে লুটিয়ে পড়ল।

প্রফুল্ল চাকির সেই যে খেদোক্তি, বাঙ্গালী হয়েও আপনি বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন, নন্দলালের রক্তমোক্ষণে বাংলার বিপ্লবীরা সেই খেদোক্তির মর্যাদা রক্ষা করল।

ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করবার পর দিনই, ১৯০৮ সালের ২ মে, পুলিশ অকস্মাৎ হানা দিল নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে—(১) ৩২ মুরারীপুকুর রোড, মানিকতলা বাগান, (২) ৩৮/৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (৩) ১৫ গোপীমোহন দত্ত লেন, (৪) ১৩৪ হ্যারিসন রোড এবং (৫) দেওঘরের 'শীল লজ'। তন্ন তন্ন

করে তল্লাসীর ফলে পাওয়া গেল প্রচুর রাজদ্রোহমূলক প্রচার পত্র ও পুস্তিকা, বই ও হ্যান্ডবিল, প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্য,তাজা বোমা, বোমা তৈরীর মাল মসলা, বোমার খোল, অনেকগুলো পিস্তল, রিভলভার, ছোরা ও আরও সব আপত্তিকর দ্রব্য।

গ্রেপ্তার করা হল একচল্লিশ জনকে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ, বারীন, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কানাইলাল দত্ত ও আরও আরও অনেকে।

আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হল আটত্রিশ জনকে আসামী করে এবং তাদের দু দলে ভাগ করে।

প্রথম দলের মামলা ১৯০৮ সালের ৪ মে সুরু হয়, আসামীদের দায়রায় সোপর্দ করা হয় ১৯ আগষ্ট।

দ্বিতীয় দলের মামলা সুরু হয় ১৯০৮ সালের ১৪ অক্টোবর এবং আসামীদের দায়রায় সোপর্দ করা হয় ১৯০৯ সালের ৪ মার্চ।

দায়রা জজ রায় দেন ১৯০৯ সালের ৬ মে।

এই ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী হল নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

রাজসাক্ষী যা, ১৮৯৭ সালে বোম্বাই প্রদেশে র‍্যান্ড হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সাহায্য করেছিল যে দুজন পুলিশের গুপ্তচর, গণেশ দ্রাবিড় ও রামচন্দ্র দ্রাবিড়, তারাও তা। ওরা দুজন ফেরারীকে খুঁজে বার করেছিল আর দলের সদস্য নরেন নিজে জেল থেকে বাঁচবার জন্য সহকর্মিদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হতে রাজী হয়েছে। সুতরাং বোম্বাই-এ পুলিশের গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্হা নেয়া হয়েছিল, বাংলায় রাজসাক্ষীর বেলাতেও সেই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

অস্ত্র আইনে কারাদণ্ডিত বিপ্লবী সত্যেন বোসের সঙ্গে পরামর্শ করল কানাইলাল দত্ত। তারপর ১৯০৮ সালের ৩১ আগষ্ট সত্যেন ও কানাই জেলের মধ্যেই রিভলভার দিয়ে হত্যা করল নরেন গোস্বামীকে।

কানাই-এর ফাঁসী হল ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর আর সত্যেনের ফাঁসী হল ২১ নভেম্বর।

আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় আরও যে দুই ব্যক্তি সরকারের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছিল মামলা সাজানো ও পরিচালনার ব্যাপারে, তাদের নাম (১) আশুতোষ বিশ্বাস, আলীপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর আর (২) সামসুল আলম, পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট।

তাদের দুজনের নাম বিপ্লবীদের কালো খাতায় লেখা হয়ে গেল। ওদের খতম করতে হবে।

আশু বিশ্বাসের ভার নিল বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসু।

তার ডান হাতের পাতা নেই। তাহলে কি করে ধরবে রিভলভার? কি করে টানবে ট্রিগার? কি করে নিশানা ঠিক করবে? বাঁ হাতে?

চারু বলল, না, না, বাঁ হাতে রিভলভার কেন? ওটা হাতের কব্জির সঙ্গে এঁটে বেঁধে দিন। ঐ হাত তুলেই নিশানা ঠিক করে রাখব আর বাঁ হাতে টানব ট্রিগার। চাদর গায়ে জড়ানো থাকলেই কেউ বুঝতে পারবে না ডান হাতে আমার কি বাঁধা আছে।

এই অসম্ভব কাজকেই সম্ভব করে তুলল বিপ্লবী।

১৯০৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী। দায়রা আদালতে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী তখনো চলছে। কোর্টের কাজ সেরে সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ পুলকিত চিত্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস বিকেল চারটের সময় নথিপত্র গুছিয়ে নিয়ে যেই বেরিয়ে এসে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছিল, অমনি গর্জে উঠল চারুর হাতে বাঁধা রিভলভার।

আশু বিশ্বাস প্রাণ হারাল।

১৯০৯ সালের ১৯ মার্চ চারুর ফাঁসী হয়ে গেল।

এর পরের পালা সামসুল আলমের।

১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারী।

আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা তখন শেষ হয়ে গেছে। ফাঁসীর আদেশ হয়েছে, হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আর দীর্ঘ কারবাসের।

আপীল চলছে হাইকোর্টে।

আপীল করলেও কি আর ওরা ছাড়া পাবে? পুলিশ নিপুণভাবে সাজিয়েছে মামলা, খাড়া করেছে বাছাই-করা সাক্ষী, পরিচালনা করেছে সুষ্ঠুভাবে। আর এই কৃতিত্বের প্রায় সবখানিই সামসুলের। জবরদস্ত ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ।

২৪ জানুয়ারী হাইকোর্টে এসেছিল আর একটি রাজনৈতিক মামলার ব্যাপারে। কাজ শেষ করে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পেছনে সশস্ত্র দেহরক্ষী।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে যেই নামতে যাবে, অমনি এগিয়ে এল বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত। চালাল রিভলভার।

সামসুল আলমের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল।

১৯১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বীরেনের ফাঁসী হয়ে গেল।

সেই যে সুশীল সেন, ১৯০৭ সালের ২৬ আগষ্ট কিংসফোর্ডের আদালতে বিপিন চন্দ্র পালের মামলা চলবার সময় যে বাইরে এক সার্জেণ্টের নাকে প্রচণ্ড ঘুসি মেরেছিল, যে অপরাধের জন্য কিংসফোর্ড ওকে পনেরো ঘা বেত মারবার হুকুম দেয়, কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্য যে তার গার্ডেনরীচের বাসভবনে 'বই বোমা' পাঠিয়েছিল, আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় তাকেও গ্রেপ্তার করা হয় সিলেটে তার বানিয়াচং গ্রামের বাড়ী থেকে ১৯০৮ সালের ১৫ মে। কিন্তু তাকে বেকসুর মুক্তি দেয়া হয় ১৯১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী।

১৯১৫ সালে সুশীল মাত্র বাইশ বছরের কিশোর।

বাংলার বিপ্লবী দলের অবিসংবাদিত নেতা তখন যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন।

আর উত্তর ভারতের নেতা রাসবিহারী বসু।

স্থির হয়ে গেছে ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ভারতের বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টের ভারতীয় সৈন্যরা একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, গোরা সৈন্যদের হত্যা করে দখল করে নেবে অস্ত্রাগার, গোলাবারুদের গুদাম, রেলওয়ে, টেলিফোন, জাহাজ জেটি। সৈন্যদের পরিচালনা করবেন রাসবিহারী ও তাঁর সহকর্মিরা।

বাংলার অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করবেন বাঘা যতীন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যায় কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায়।

বাঘা যতীন তখন ফেরারী।

২১ ফেব্রুয়ারী ছিলেন ৭৩ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে।

পুলিশের গুপ্তচর নীরদ হালদার কি করে খবর সংগ্রহ করে অকস্মাৎ সোজা সেই বাড়ীতে এসে হাজির। বাঘা যতীনের নির্দেশে ফেরারী চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরীর নিক্ষিপ্ত গুলী তৎক্ষণাৎ তার বক্ষভেদ করল।

বোঝা গেল, বাঘা যতীন ও তাঁর সহকর্মিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাদেরই একজন সুরেশ মুখোপাধ্যায়, পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ইনসপেক্টার।

১৬ ফেব্রুয়ারী শ্যামবাজার পাঁচ রাস্তার মোড়ে অকস্মাৎ সে নরেন ভট্টাচার্যকে (ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়) ধরে ফেলেছে।

বাঘা যতীন হুকুম দিলেন, খতম কর সুরেশ মুখার্জীকে।

১৯১৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী।

সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন। বড়লাট সেই সভায় ভাষণ দেবেন। সুতরাং চরম নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউনিফরমে ও সাদা পোশাকে সশস্ত্র পুলিশ গিজগিজ করছে।

ইনসপেক্টার সুরেশ হেদোর কাছে সকাল বেলাতেই সদলবলে উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে এত দূরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল এবং সশস্ত্র দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে সে তাই তত্ত্বাবধান করছে।

কয়েকজন যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তার সন্দেহ হল।

হঠাৎ দেখতে পেল ওদের একজন ফেরারী চিত্তপ্রিয়। চিত্তপ্রিয়কে সে চিনত।

চিত্তপ্রিয় এগিয়ে আসতে লাগল।

সুরেশ অর্ডারলিকে হুকুম করল, পাকড়ো উসকো।

তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠল চিত্তপ্রিয়ের রিভলভার। কিন্তু গুলী ছুটল না। জ্যাম হয়ে গেছে।

ছুটে এল বন্ধুরা খোলা রিভলভার নিয়ে। গুলীতে গুলীতে ঝাঁঝরা করে ফেলল সুরেশকে। মারাত্মকভাবে আহত অর্ডারলি মারা গেল তৃতীয় দিবসে।

এই দলে ছিল চিত্তপ্রিয় ছাড়া মনোরঞ্জন সেন, শচীন দত্ত এবং সেই সুশীল সেন ও আরও দুজন।

চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁতের যে নীতি প্রবর্তন করেছিল বোম্বাই ১৮৯৭ সালে, বিপ্লবী বাংলা সেই নীতি অনুসরণ করেই এগিয়ে চলল—

ফেরারী অরবিন্দ

প্রেসিডেন্সী জেলে সেই বিশেষ সেলটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অন্তর ভরে ওঠে, মাথা যেন আপনি নুয়ে আসে। লোহার দরজা আঁটা অপরিসর আধো অন্ধকার প্রকোষ্ঠটি দেখতে দেখতে যেন রূপান্তরিত হয়ে যায় একটি পবিত্র মন্দিরে। দেয়ালে প্রলম্বিত ছবি, ছবির গলায় বেল-ফুলের মালা, ফুলদানীতে রজনীগন্ধা, ধূপদানীতে সুগন্ধি ধূপ, মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ মন্দিরের ইতিহাস, 'এই কক্ষে শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৮-০৯ সালে বন্দী অবস্থায় দিব্য জীবনের তপস্যা করিয়া ভগবৎ দর্শন করেন।

১৯০৮-০৯ সালে এই প্রকোষ্ঠেই ছিলেন ঐতিহাসিক আলীপুর বোমার মামলার অন্যতম প্রধান আসামী, যাঁর নাম অরবিন্দ ঘোষ।

মাত্র নয় বৎসর বয়সে বিলেতে যান অরবিন্দ, সেখানেই লেখাপড়া, সেখানেই মানুষ। বাবা ডাঃ কে. ডি. ঘোষের সঙ্গে এ্যাক্রয়েড পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা হয় বলে অরবিন্দ নাম লিখতেন, অরবিন্দ এ্যাক্রয়েড ঘোষ। মারাঠি ও গুজরাটি ভাষা জানতেন, বাংলা জানতেন না। দীনেন্দ্রকুমার রায় গৃহশিক্ষকরূপে তাঁকে বাংলা ভাষা শেখান।

এ ইতিহাস সর্বজনবিদিত যে গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শনের সূত্রপাত করেন, তাঁর নাম চিরস্মরণীয় বাল গঙ্গাধর তিলক। তারপর ১৮৯৭ সালে পুণা শহরে প্লেগ নির্মূল করবার অজুহাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাণ্ড অবমাননাকর ব্যবস্থা প্রয়োগ করবার ফলে ভারতের যে প্রথম বিপ্লবী ২২ জুন পিস্তলের গুলীতে র‍্যাণ্ডকে হত্যা করেন, তাঁর নাম দামোদর হরি চাপেকর।

কিন্তু এ সবই মহারাষ্ট্রে। বাংলা দেশে বিপ্লববাদ স্রষ্টার নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে সন্ন্যাসী হয়ে নতুন নাম গ্রহণ করেন, নিরালম্ব স্বামী। আর বাংলা দেশে বিপ্লববাদের আদিগুরু হচ্ছেন অরবিন্দ ঘোষ।

১৯৩২ সালের বিপ্লব-বহ্নির কাহিনী বলতে গিয়ে মনে পড়ল, সেই বহ্নি প্রথম যে প্রজ্বালিত করেন, সেই আদিগুরুকে স্মরণ করা হয়নি। শুধু তিনি কেন, সূচনায় সেই বহ্নিতে ঘৃত প্রয়োগে যে অগ্নি ঋষিরা তাকে দেখতে দেখতে রূপান্তরিত করেছিলেন এক লক লক শিখা বৈপ্লবিক হব্যবাহনে, তাঁদের কারুর কথাই কিছু বলা হয়নি।

তাই তাঁদের কয়েকজনকে স্মরণ করছি।

প্রথমেই আদিগুরু অরবিন্দ।

বৈপ্লবিক রণাঙ্গনে তাঁর স্থিতি হয়ত দশ বৎসরের বেশী নয়, কিন্তু তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি বাংলা দেশে বিপ্লববাদের গোড়া পত্তনের ব্যবস্থা করেন এবং বিপ্লববাদের সেই প্যালিওলিথিক যুগে যাঁর অনুপ্রেরণায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথম বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যাদের আদর্শ ছিল দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ভারতে এলেন বরোদার মহারাজার খাস সচিবের চাকরি নিয়ে। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আবেদন-নিবেদনভিত্তিক আন্দোলন প্রথম থেকেই তাঁর অপছন্দ ছিল। ভারতে এসেই এই আন্দোলন সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে বললেন, ফ্রান্সের উদাহরণ গ্রহণ করতে হবে, যে দেশ তেরো শত বৎসরের অত্যাচারকে রক্তক্ষরা পাঁচ বছরেই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

অরবিন্দ প্রথমে উদয়পুর রাজ্যের ঠাকুর সাহেবের সংস্পর্শে আসেন। তিনিই তাঁকে টানেন গুপ্ত সমিতি সংগঠনের দিকে। তারপর কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে পরিচয় ও আলাপ হয় বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে। বরোদার সেনাদলে ভর্তি হবার জন্য বাংলা দেশ থেকে যান যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালীকে যদি সেনাদলে না নেয়া হয়, তাই অরবিন্দ তাঁর নতুন নামকরণ করেন 'যতীন্দর উপাধ্যায়' এবং তিনি ভর্তি হয়ে যান। অরবিন্দ যতীন্দ্রকে ডাকতেন 'দাদা' বলে। ইনিই অরবিন্দকে বিপ্লবী দল সংগঠনের জন্য বাংলা দেশে আসবার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৯০১ সালে মহারাজার আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় গিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা নিবেদিতা। স্বামীজী, যিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্মভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন, তোমরা বীর হও। আমি নিশ্চিত জানি, ভারতমাতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের জীবন বলি চান', যিনি বলেছিলেন, 'চাই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক, যারা যমের মুখে যেতে পারে,' সেই স্বামীজীর শিষ্যা নিবেদিতাও অরবিন্দকে বাংলা দেশে আমন্ত্রণ জানান।

১৯০৬ সালে বরোদার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অরবিন্দ স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এলেন। এর আগে ১৯০১ সালেই বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে 'দাদা' যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান, তারপর ১৯০২ সালে পাঠান ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। তারপর এলেন তিনি নিজেই।

কলকাতা আসবার পরই বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তখন থেকে সুরু করে ১৯১০ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত এই

সামান্য ক'টি বৎসরে তাঁর যে অসামান্য কর্মকাণ্ড ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, সেই কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু তাঁর ফেরারী হবার ঘটনার উল্লেখ করছি আর সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিছু বিবরণ।

১৯০৬ সালেই প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'যুগান্তর'। সম্পাদক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অরবিন্দ জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করলেন। ঐ সালেই প্রকাশিত হল অগ্নিক্ষরা পত্রিকা, 'বন্দেমাতরম'। প্রথম সম্পাদক বিপিন চন্দ্র পাল, তারপর অরবিন্দ ঘোষ। সম্পাদকের মসী অসিরূপে ঝলসে উঠল। ঘুমিয়ে পড়া জাতির কানে সমুদ্র গর্জনের মত ধ্বনিত হতে লাগল জাগরণের আহ্বান।

প্রমাদ গুণল ইংরেজ সরকার। গ্রেপ্তার করা হল অরবিন্দকে। রাজদ্রোহের মামলা আনা হল।

বিপিন চন্দ্র পাল সরকার পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়ায় তাঁর প্রতি ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হল। কিন্তু মামলাও টিঁকল না, বেকসুর খালাস পেলেন অরবিন্দ। কবি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানালেন—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।...
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।...

হ্যাঁ, কারাগার আবার তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ঐতিহাসিক আলীপুর বোমার মামলায়। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে অরবিন্দ ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার হন। তাঁদের সবাইকে রাখা হয় প্রেসিডেন্সী জেলে।

৬ কলেজ স্কোয়ারে দৈনিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার অফিস। সম্পাদক স্বনামধন্য কৃষ্ণকুমার মিত্র। অরবিন্দের আপন মেসো। সুকুমার কৃষ্ণকুমারের পুত্র। অরবিন্দ শুধু তাঁর 'অরোদা' নন, বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষাগুরু।

জনৈক জেল ওয়ার্ডারের হাত দিয়ে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে একদিন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সুকুমারের কাছে একখানা চিঠি পাঠালেন, তাতে লিখেছেন যে, অরবিন্দসহ তাঁরা জেলের প্রাচীর টপকে পালাবেন, যেন তার ব্যবস্থা করা

হয় এবং ওপারে যাওয়ামাত্র সবার আগে অরবিন্দকে যেন দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়।

সুকুমার সংগঠনে নামলেন।

জেলের বাইরে রাস্তা কোন্ দিকে, কোথায় থানা ও ফাঁড়ি, আদি গঙ্গার দিকে কোন্ পথে সোজা যাওয়া যায়, কোন্ পথে গেলে সহজেই নিরাপদে সরে পড়া যায়, সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থানের ম্যাপ প্রস্তুত করে দিলেন সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও বঙ্কিম বিশ্বাস। সুকুমার ম্যাপখানা ওয়ার্ডার মারফৎ বারীন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অরবিন্দকে সরানো হবে মোটরে। মোটর সংগ্রহ করা কঠিন নয়, কিন্তু চালক বিশ্বাসী হওয়া চাই। সুকুমার স্থির করলেন তিনি নিজেই ড্রাইভার হবেন। বন্ধু নাগেশ্বর প্রসাদ সিংকে ধরলেন, নাগেশ্বর প্রসাদ নাড়াজোলের দেবেন্দ্রলাল খানের অনুমতি নিয়ে তাঁর গাড়ী নিয়ে এলেন। ড্রাইভার সুকুমারকে মোটর চালানো শিখিয়ে দিল।

সমস্ত আয়োজন হয়ে গেছে, এখন শুধু তারিখ সময়ের অপেক্ষা, এমন সময় সবিস্ময়ে দেখা গেল, অকস্মাৎ জেলের পশ্চিম প্রাচীরে অতি উজ্জ্বল ফ্লাড ব্যবস্থা করা হয়েছে, অতিরিক্ত পাহারা বসানো হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ আলীপুর বোমার মামলার আসামীদের ওপর আরও কড়া নজর রাখছে।

অরবিন্দও তাঁর সহকর্মীদের জেল থেকে পালানো সম্ভব হল না।

মুক্তির পর অরবিন্দ বলেছিলেন, আমাদেরই ভেতর কেউ বলে দিয়েছে।

মামলায় বেকসুর খালাস পেলেন অরবিন্দ।

বাইরে বেরিয়ে এলেন দিব্য জ্ঞান লাভ করে। উত্তরপাড়ায় ১৯০৯ সালে সেই অবিস্মরণীয় ভাষণ। মামলায় আদৌ বিচলিত হইনি আমি। কারণ সবই আমি দেখেছি বাসুদেবময়। সরকার পক্ষের উকিল, আমাদের পক্ষের ব্যারিস্টার, সাক্ষী, কর্মচারী, পিওন, দর্শক, এমন কি, বিচারকের মধ্যেও আমি দেখেছি বাসুদেবকে। বাসুদেবই আমায় মুক্ত করে এনেছে তাঁরই কাজ করবার জন্য।

কি তাঁর কাজ?

কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হল ইংরেজী সাপ্তাহিক, 'কর্মযোগিন।'

তারপর বাংলা পত্রিকা, 'ধর্ম'।

কার্যালয় ৪ শ্যামপুকুর লেন। অরবিন্দ থাকেন ৬ কলেজ স্কোয়ারে মাসীর বাড়ীতে। রোজ বিকেলে যান কাগজের অফিসে, ফিরে আসেন রাত নটায়। অত্যন্ত স্বল্পভাষী। আত্মসমাহিত। অসংখ্য মুখরতার মাঝে যেন প্রস্তরায়িত মৌন সন্ন্যাসী। অধরের ভাষা দ্বিধাগ্রস্ত হলে কি হবে, লেখনীতে তাঁর আগুনের হলকা। কর্মযোগিন-এ লিখলেন, মিন্টো-মর্লি শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নয়।

গুজব শোনা যাচ্ছিল, পুলিশ আবার তাঁকে গ্রেফতার করবে। তাই লিখলেন, 'An open letter to my countrymen', বললেন, 'আমায় যদি নির্বাসিত করা হয়, আমি যদি আর ফিরিয়া না আসিতে পারি, তাই এই খোলা চিঠিতেই আমার দেশবাসীকে জানাইলাম আমার চরম রাজনৈতিক লক্ষ্য।'

১৯০৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর কর্মযোগিন-এ তাঁর স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুতে পারে বলে সহকর্মীরা যখন খবর আনলেন, তখনও অরবিন্দ নির্বিকার।

১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারী বিপ্লবী বীরেন দত্তগুপ্তের রিভলভারের গুলীতে হাইকোর্ট ভবনে প্রাণ হারালেন আলীপুর বোমার মামলার সংগঠক ও পরিচালক ডেপুটি পুলিশ সুপার সামসুল আলম। অরবিন্দ ৫ ফেব্রুয়ারী কর্মযোগিন-এ স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন, 'This is the result of the repressive policy of the Government'.

এই ফেব্রুয়ারী মাসেরই শেষ দিকে একদিন ৬ কলেজ স্কোয়ারে সুকুমারদের বাড়ীতে বসে কর্মযোগিনের প্রুফ দেখছিলেন সুকুমার আর অরবিন্দ এমন সময় এলেন সহকর্মি রামচন্দ্র মজুমদার। গুরুতর সংবাদ এনেছেন তিনি। অরবিন্দের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রেডি করা হচ্ছে, পুলিশ যে কোন সময় এসে পড়তে পারে, সুতরাং কালবিলম্ব না করে—

অরবিন্দ শুধু একবার মুখ তুলে চাইলেন। সে মুখমণ্ডলে অনাহত প্রশান্তি। দুশ্চিন্তার একটিও রেখা নেই। আবার প্রুফ দেখায় মনোনিবেশ করলেন।

তারপর রোজ বিকেলে যেমন যান, তেমনিভাবে গেলেন ৪ শ্যামপুকুর লেনে কাগজের অফিসে।

অফিসে আবার সহকর্মীরা সমবেতভাবে ওঁকে চেপে ধরলেন। নিজের সম্বন্ধে আপনি উদাসীন হলেও আমরা আপনাকে সুবোধ বালকের মত পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি না। দেশ আপনাকে চায়, জাতি আপনাকে চায়। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার যে সংগ্রাম সুরু হয়ে গেছে, তার মাঝখানে

আপনি যদি নির্বাসিত হয়ে যান, তাহলে কে আমাদের পরিচালনা করবে? সুতরাং আমাদের দাবী, এই মুহূর্তেই আপনাকে গা ঢাকা দিতে হবে, সরে পড়তে হবে চন্দননগরে। কাছাকাছি সব চাইতে নিরাপদ এই ফরাসী উপনিবেশটি।

অরবিন্দ এবার আর নীরব থাকতে পারলেন না। প্রস্তরায়িত মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন, নিবেদিতাকে জিজ্ঞেস কর সে কি বলে।

তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্র নিবেদিতার কাছে ছুটলেন। সব শুনে নিবেদিতা বললেন, Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things.

খুশী মনে ফিরে এলেন রামচন্দ্র, বললেন অরবিন্দকে, অরবিন্দ বলে উঠলেন, Allright, arrange.

কিন্তু কি করে বেরোনো যাবে? পুলিশের গুপ্তচরেরা প্রায় প্রকাশ্যেই নজর রাখে কর্মযোগিন অফিসের ওপর, অরবিন্দ যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ তাঁর ওপরেও। অরবিন্দ রাত নটায় বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ারের দিকে রওনা হলে ওরা পেছনে যায় ফেউয়ের মত। বিপ্লবী সহকর্মিরাও আবার গোয়েন্দাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করে। ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখে।

একদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল চরের দল অনুপস্থিত। বিপ্লবী চরেরা খবর নিয়ে এল ওরা দূরে কোন দোকানে জলযোগ সেরে আসতে গেছে। হয়ত ভেবেছে, নটার আগে ত অরবিন্দ অফিস থেকে বাইরে আসেন না, সুতরাং নটা পর্যন্ত একটু ঢিলেঢালা দিলে ক্ষতি নেই।

সুতরাং, রামচন্দ্র, বলে উঠলেন, এই সুযোগ। এমনি সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

একেবারে সদর দরজা দিয়েই বেরিয়ে এলেন চারজন—রামচন্দ্র মজুমদার, বীরেন ঘোষ, সুরেশ চক্রবর্তী আর তাঁদের মাঝখানে অরবিন্দ। গুপ্তচরেরা কেউ নেই। যদি এসে পড়ত, ওঁদের দেখে ফেলত, তাহলে এখনই সরে পড়ার প্ল্যান বাতিল করে ওঁরা এসে উঠতেন ৬ কলেজ স্কোয়ারে। কিন্তু চরেরা যখন দেখতে পেল না, তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্র আলোকোজ্জ্বল রাজপথ ছেড়ে প্রায়ান্ধকার গলিতে প্রবেশ করলেন এবং একটু পরই নিরাপদে গঙ্গার ঘাটে এসে পোঁছলেন। নৌকো আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, অরবিন্দ নৌকোয় উঠলেন। সঙ্গে বীরেন ঘোষ আর সুরেশ চক্রবর্তী।

আকাশে রুপালী থালার মত চাঁদ ঝক ঝক করছে। দিগদিগন্ত জোৎস্নায়

উদ্ভাসিত। নদীর জলে অসংখ্য মরকতমণি ঝিকমিক করছে। হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ। নৌকো চলল চন্দননগরের দিকে। আরও কত নৌকো যাচ্ছে, কত নৌকো আসছে। কিন্তু ওরা কেউ জানতেও পারল না ওরই একখানায় চলেছেন ফেরারী অরবিন্দ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। শ্যামপুকুর লেনের গুপ্তচরেরাও টের পেল না যে, চিড়িয়া ভাগ্ গিয়া।

ভোর হবার একটু আগে চন্দননগর ঘাটে নৌকো ভিড়ল।

বিপ্লবী মতিলাল রায়কে খবর দেয়া হল।

তিনি অরবিন্দকে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাঠের গোলার পেছন দিকে একটি ঘরে লুকিয়ে রাখলেন।

পরদিন হৈ চৈ পড়ে গেল। কাগজে কাগজে শিরোনাম, অকস্মাৎ অরবিন্দের অন্তর্ধান। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, 'যোগাভ্যাসের জন্য অরবিন্দ আত্মগোপন করিয়াছেন।' পুলিশ হন্যে হয়ে নানা স্থানে হানা দিতে লাগল। নানা জায়গায় তল্লাসী, নানা জনকে জিজ্ঞাসাবাদ, গ্রেপ্তার, নির্বাসনের হুমকি।

কিন্তু সবই ব্যর্থ। ফেরারীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

ওদিকে চন্দননগরের গুপ্ত আশ্রয় থেকেই বার্তাবহ মারফৎ কলকাতার সহকর্মিদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলতে লাগলেন মহাবিপ্লবী।

কিন্তু ইংরেজের শাসনকেন্দ্র কলকাতা থেকে চন্দননগর আর কতদূরে? ফরাসীদের উপনিবেশ হলেও ওখানে যেতে পাসপোর্ট লাগে না। কলকাতা পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি ওদিকে আকৃষ্ট ও প্রসারিত হতে কতদিন আর লাগতে পারে? তারপর ওখানেই থাকেন বিপ্লবী নেতা মতিলাল রায়।

তাঁরই সঙ্গে পরামর্শ করে আশ্রয়স্থল দু তিন বার পরিবর্তন করলেন অরবিন্দ। কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যেখানেই থাকেন, সেখানেই সবাই চিনে ফেলে। সুতরাং স্থির হল আরও দূরে যাবেন তিনি।

১৯১০ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সুকুমার মিত্রকে গোপনে লিখে পাঠালেন যে, চন্দননগর আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না, আরও অনেক দূরে ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরিতে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ওখানে কেউ তাঁকে সহজে চিনতে পারবে না। সুতরাং তার ব্যবস্থা করা হোক।

তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থাপনায় নামলেন সুকুমার। প্রধান সহকারী হিসেবে সঙ্গে নিলেন নোয়াখালির বিপ্লবী নগেন্দ্র কুমার গুহ রায়কে।

পণ্ডিচেরিতে ট্রেনে যাওয়াই সহজ, সবাই ট্রেনেই যাতায়াত করে। কিন্তু

অত্যন্ত পরিচিত অরবিন্দকে ঠিক পুলিশ ধরে ফেলবে। তাই ওঁকে পাঠাতে হবে জাহাজে! তাও ফরাসী কোম্পানীর জাহাজে, কারণ অন্য কোম্পানীর জাহাজ পণ্ডিচেরিতে ভেড়ে না। জাহাজে গেলে আরও একটা সুবিধা আছে। বৃটিশ ভারতের সমুদ্রতট থেকে কোনো ফরাসী জাহাজ মাত্র তিন মাইল পথ গেলেই যাত্রীরা সবাই ফরাসী আইনের আওতায় এসে যায়, তখন বৃটিশ পুলিশের ওয়ারেণ্টে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না, ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অনুমতি চাই আর ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সেই অনুমতি দিতে বাধ্য নন। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণে কেউ কোন বিদেশী রাজ্যে আশ্রয় নিলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

কিন্তু তিন মাইল দূরে যাবার আগেই জাহাজের মধ্যে যদি চিনে ফেলে কেউ? সুতরাং স্থির করা হল, কেনা হবে সেকেণ্ড ক্লাশ কেবিনের টিকিট আর ক্যাপ্টেনকে বলে দিতে হবে যে, যাত্রীটি ম্যালেরিয়া রোগী, তাই সে কেবিনের দরজা সব সময় বন্ধ করে থাকবে। শুধু তাই নয়। মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি যাতে যাত্রীদের মধ্যে সংক্রামিত হতে না পারে, সেজন্য রোগীকে সদর পথে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে জাহাজে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, জাহাজের পেছন দিকের ঝুলানো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তোলা হবে ওঁকে।

এমনি চমৎকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন সানন্দে সম্মতি দেবেন।

এর পরেও লোকের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, স্থলপথে এত সহজে ও নিশ্চিত নিরাপদে পণ্ডিচেরি যাবার সুবিধা থাকতে এই ভদ্রলোক সমুদ্র-যাত্রার ঝুঁকি নিয়ে ঘুর পথে যাচ্ছেন কেন? এবং লোকের এই প্রশ্নটাই শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে! সুতরাং স্থির করলেন সুকুমার, টিকিট কেনা হবে কলম্বোর, কলম্বো জাহাজে ব্যতীত যাওয়া যায় না, ফলে কারুরই মনে কোন প্রশ্ন জাগবে না, অথচ অরবিন্দ আগের স্টেশন পণ্ডিচেরিতে নেমে পড়বেন।

সঙ্গী চাই অন্ততঃ একজন। ওঁকে একা ছেড়ে দেয়া যাবে না। স্থির হল, সঙ্গে যাবেন আলীপুর বোমার মামলার মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বিজয় নাগ। দুজনের ছদ্মনামও স্থির করে ফেলা হল। বিজয় নাগ হবেন B. C. Bhowmik of Nilphamari in Rangpur District আর অরবিন্দ হবেন J. N. Mitter of Uluberia in Howrah District.

ফরাসী জাহাজখানার নাম, ডুপ্লে আর জাহাজ কোম্পানীর নাম, মেসেগারিস ম্যারিটাইমস। নগেন গুহ রায় গেলেন টমাস কুক কোম্পানীর

অফিসে। দুই বার্থের একটি সেকেণ্ড ক্লাশ কেবিন রিজার্ভ করে দুখানা কলম্বোর টিকিট কিনে আনলেন। ওঁদের দুটো ট্রাঙ্ক আর বিছানাপত্র কেবিনে রেখে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে এলেন।

১ এপ্রিল প্রত্যুষে কলকাতার ফোর্ট ঘাট ছেড়ে যাত্রা করবে ডুপ্লে জাহাজ।

৩১ মার্চ রাত এগারোটার মধ্যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে যাত্রীদের উঠতে হবে জাহাজে। তারপর আর কাউকে উঠতে দেওয়া হবে না।

৩১ মার্চ, ১৯১০ সাল।

ভোর হবার একটু আগে চন্দননগর ঘাট থেকে একখানা নৌকো কলকাতার দিকে রওনা হল। নৌকোয় আরোহী তিনজন, বিজয় নাগ, বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ। প্রকাশ্য দিবালোকে এক নৌকোয় কলকাতা যাওয়া নিরাপদ নয়, বিশেষ করে যে নৌকোয় আছেন বাংলা দেশে বিপ্লববাদের আদি গুরু অরবিন্দ, যাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশের দল। তাই মাঝপথে আরেকখানা নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছেন সুরেন চক্রবর্তী। চন্দননগরের নৌকোয় যেমন ছোট্ট একখানি পতাকা উড়ছে, অপেক্ষমান নৌকোতেও ঠিক তেমনি পতাকা থাকবে। তাহলে আর অসুবিধা হবে না চিনে নিতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দু নৌকোয় দেখা হল না। সুরেন ফিরে এলেন। সুকুমারকে সব জানালেন। চিন্তিত হলেন সুকুমার। রওনা হতে পারেননি নাকি অরোদা? না কি রাস্তায় কোন বিপদ আপদ দেখা দিয়েছে? সুকুমার নগেনকে জাহাজে পাঠালেন, কেবিন থেকে ট্রাঙ্ক দুটো ফেরত আনালেন।

ওদিকে সুরেনের নৌকো হদিস করতে না পেরে অমরেন্দ্র নৌকো ভেড়ালেন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে, মন্মথ বিশ্বাসকে পাঠালেন সুকুমারের কাছে। তখন দুপুর গড়িয়ে শুধু বিকেল হয়নি, বিকেলও গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। সুকুমার বলে দিলেন, আর নৌকো বদলাবার দরকার নেই, তোমরা ঐ নৌকাতেই সোজা চলে যাও ফোর্টের ঘাটে। নগেনকে বললেন আবার ট্রাঙ্ক দুটো ও বিছানাপত্র জাহাজ ঘাটে নিয়ে যেতে। ওখানে ওরা অপেক্ষা করছে।

নগেন চলে গেলেন।

রাত যখন সাতটা, নগেন ফোর্টের ঘাটে মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছেন, ৬ কলেজ স্কোয়ারে সমবেত বিপ্লবীদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা নেই, এমন সময় সহসা অমরেন্দ্র এসে হাজির।

সুকুমার বলে উঠলেন, সে কি ! তুমি !

অমরেন্দ্র অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, নীচে ঘোড়ার গাড়ীতে অরবিন্দ বসে আছেন—

অরোদা ! বল কি ? ছুটে নেমে গেলেন সুকুমার, বললেন, করেছ কি অরোদা, গোলদীঘিতে গিজ গিজ করছে পুলিশের টিকটিকি, তাদের বুঝতে বাকি নেই যে, এই বাড়ীটা বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি, ফেরারীদের আশ্রয়স্থল আর তুমি সেই বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছ ?

অরবিন্দ নির্বিকার, যেমন সর্বদাই তাঁকে দেখা গেছে। ইংরেজ সরকারের মাথা ব্যথা হলে কি হবে, তিনি একেবারেই উদাসীন, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। মায়ের শৃঙ্খল ভাঙ্গার ব্রত উদ্‌যাপনে নিয়োজিত প্রাণ, তাই বুঝি ভয়ডরহীন !

অমরেন্দ্রকে সুকুমার বললেন, সোজা তোমরা ঘাটে চলে যাও। জিনিষপত্র নিয়ে নগেন সেখানে অপেক্ষা করছে। মনে রেখো, ওঁদের দুজনের ডাক্তারী পরীক্ষা শেষ করে রাত এগারোটার মধ্যে জাহাজে উঠতে হবে। উঠবে পেছন দিক দিয়ে, ঝোলানো সিঁড়ি নামানো থাকবে। ক্যাপ্টেনকে বলা হয়েছে। যাও, জলদি যাও।

গাড়ী ছুটল ঘাটের পথে।

ওখানে গিয়ে আর এক বিভ্রাট !

ডাক্তার সাহেব যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শেষ করে বাড়ী চলে গেছেন। বাড়ী থিয়েটার রোডে। ওঁর সার্টিফিকেট ছাড়া জাহাজে উঠতে দেবে না। এখন উপায় ?

আর কিছু ভাববার অবকাশ নেই। যা আছে বরাতে তাই হবে, ফেরারী অরবিন্দকে নিয়ে ওঁরা গাড়ী ছোটালেন থিয়েটার রোডের দিকে।

রাত তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে। রাত্রির আহারের শেষে ডাক্তার বিশ্রাম করছেন। বেয়ারা বলল, আজ আর দেখা হবে না।

হবে না শুনে কি ফিরে যাবেন ওঁরা ? ব্যর্থতাকে বিপ্লবীরা কোনদিনই স্বীকার করেন না। বেয়ারাকে মিষ্টি কথায় পটিয়ে ফেললেন নগেন, তারপর আরও মিষ্টি নগদ কিছু বখশিস ওর হাতে গুঁজে দিলেন। সে ডাক্তারকে ডেকে তুলল।

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন বি. সি. ভৌমিক আর ম্যালেরিয়া রোগী জে. এন. মীটারকে। সার্টিফিকেট দিলেন দুখানা। তখন দশটা বেজে গেছে। আর মাত্র একটি ঘণ্টা সময় হাতে আছে। এরই মধ্যে ওঁদের জাহাজে তুলে

দিতে না পারলে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। নগেন বিদ্যুদ্বেগে গাড়ী চালাতে বললেন।

জাহাজের পেছন দিকে ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা চারজন যখন ডেকে উঠলেন, এগারোটা বাজতে তখন মাত্র পনেরো মিনিট বাকী আছে।

কেবিনে ঢুকেই বিজয় ট্রাংক গুছিয়ে রাখলেন, বিছানা পেতে ফেললেন।

আর কোন কথা হল না, কথা বলবার সময়ও নেই। নগেন অরবিন্দের পদধূলি গ্রহণ করলেন, অমরেন্দ্র জানালেন নমস্কার। অরবিন্দ দুজনকেই আলিঙ্গন করলেন।

দ্রুতপদে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন অমরেন্দ্র ও নগেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে একবারটি পেছন ফিরে চাইলেন।

কেবিনের দরজায় অরবিন্দ।

সেই প্রস্তরায়িত মুখমণ্ডল, সেই পলকহীন দুটি চোখ! চোখের পাষাণ ফেটে একবিন্দু বাষ্প টলমল করে উঠেছিল কি?

১৯১০ সালের ১ এপ্রিল অতি প্রত্যূষে ডুপ্লে জাহাজ কলকাতা বন্দর ত্যাগ করল।

৪ এপ্রিল বাংলার বিপ্লববাদের আদিগুরু ফেরারী অরবিন্দ বিজয় নাগ সহ নিরাপদে অবতরণ করলেন পণ্ডিচেরীতে।

সাভারকরের কর্মকাণ্ড

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ এই বাংলাদেশেরই বারাকপুরে বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ৩৪শ রেজিমেন্টের ৫ম বাহিনীর ১৪৪৬ নম্বর সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম বন্দুক ছোঁড়ার পরই সুরু হয়ে গিয়েছিল চিরস্মরণীয় সিপাই বিদ্রোহ। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। বিদ্রোহের ইতিহাসে যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাজগীরের হায়দর আলী খাঁ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, বক্তিয়ার খাঁ, সাহাবাদের কুনওয়ার সিং, মেদিনীপুরের বৃন্দাবন তেওয়ারী, বাঁকুড়ার নীলমণি সিং, আসামের ননীরাম দত্ত, লখনৌ-এর মহম্মদ আবদুল্লা এবং আরও আরও অনেক নাম। ইংরেজ শক্তির পদানত ভারতের স্বাধীনতা অর্জনই এই ব্যাপক বিদ্রোহের লক্ষ্য না হলেও স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহই ভারতের সশস্ত্র বিক্ষোভের প্রথম অগ্নিক্ষরা অভিব্যক্তি!

সিপাই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হল বটে, কিন্তু আগুন একেবারে নিভিয়ে ফেলা গেল না। পাঞ্জাবে জ্বলে উঠল রাম সিং, মহারাষ্ট্রে বাসুদেও বলবন্ত পাডকে, দৌলতরাও রামেশী আর গোবিন্দরাও দাভারে এবং মণিপুরে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ।

বাংলাদেশে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখনী আগুন ছড়াতে সুরু করলেও এ ইতিহাস সর্বজনবিদিত যে, ইংরেজের সর্বপ্রকার কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল মহারাষ্ট্র এবং যে মানুষটি সর্বপ্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন করবার পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করবার উদ্দেশ্যে বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে কাজে নেমেছিলেন তাঁর নাম বালগঙ্গাধর তিলক। মহারাষ্ট্রকেশরী তিলক। গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তার সূচনা। তারপর স্থাপিত হয় 'মিত্র মেলা', পরে রূপান্তরিত হয়ে নামকরণ হয়, 'অভিনব ভারত সোসাইটি'।

চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, প্রকাশ্য জনসভায় ও কর্মিদের গুপ্ত বৈঠকে এই সংকল্পই ঘোষণা করা হত। গান গাওয়া হত:

হায়, পরাধীন জীবন যাপনে তোমার লজ্জা নাই!
যদি না থাকে, তাহলে আত্মহত্যা কর।

জহ্লাদের মত ধূর্ত শয়তান গরু ছাগলকে হত্যা করে,
উল্লাসে নৃত্য করে, বলে, ওদের কণ্ঠ থেকে মুক্তি দিলাম।
তুমিও মরবার আগে ইংরেজ হত্যা কর।

শুধু গান কেন, মহারাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকাতেও জন-মানসের বিক্ষোভ ফেটে পড়ত। ১৮৯৬ সালের ১১ এপ্রিল 'সুধাকর' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে শিবাজী উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্তব্য করা হয়েছিল, এই মুহূর্তে আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন একটি দ্বিতীয় শিবাজীর। কিন্তু তাঁর আদর্শ হবে কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। আমাদের জাতীয় বিশ্বাসের ওপর যে হামলা চলছে, আমাদের নালিশ তার বিরুদ্ধে নয়। আমাদের বিক্ষোভ রাণী ভিক্টোরিয়ার সেই সব অত্যাচারী অফিসারের বিরুদ্ধে যাদের অত্যাচার বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন।

এই সব সাগ্নিক অভিব্যক্তির মূলে ছিলেন সেই মানুষটি যাঁর নাম বালগঙ্গাধর তিলক। লোকমান্য তিলক। মহারাষ্ট্রকেশরী তিলক।

তাঁর অসমসাহসিক সর্বকার্যে প্রধান সহযোগী ও বন্ধু ছিলেন শিবরাম মাধব পরাঞ্জপে।

বাংলাদেশে বিপ্লববাদের স্রষ্টার নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিপ্লববাদের আদিগুরু অরবিন্দ ঘোষ। কিন্তু মহারাষ্ট্রেই সুরু হয়েছিল প্রথম বিস্ফোরণ। বরোদা থেকে বাংলাদেশে আগমনের পূর্বে কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে অরবিন্দ তিলকের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিপ্লবের প্রেরণা লাভ করেন।

মহারাষ্ট্রের অবিস্মরণীয় অবদান সেই তিনটি ভ্রাতা, দামোদর হরি চাপেকর, বালকৃষ্ণ হরি চাপেকর আর বাসুদেও হরি চাপেকর। নিহত হল সাতারার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ র‍্যাণ্ড এবং লেফটেন্যাণ্ট আয়ার্স্ট। তারপর নিহত হল পুলিশের গুপ্তচর গণপৎরাও দ্রাবিড় এবং রামচন্দ্র দ্রাবিড়।

ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে দামোদর গান গেয়েছিলেন, 'নারায়ণ জয়, গোপালহরি জয়।'

গুপ্তচরদ্বয়ের হত্যাপরাধে বাসুদেব ও তার বন্ধু মাধব বিনায়ক রাণাডের প্রতি দায়রা জজ যখন ফাঁসীর আদেশ দিলেন, পরিহাসচ্ছলে বাসুদেব সহাস্যে প্রশ্ন করেছিলেন জজকে, দুজনের হত্যার জন্য যখন দুবার ফাঁসীতে ঝোলানো হবে, তখন জিজ্ঞেস করতে পারি কি, গণপৎরাও আর রামচন্দ্র কার জন্য আগে ফাঁসী হবে ?

ফাঁসীর হুকুম শুনে বালকৃষ্ণ বলে উঠেছিলেন, ধন্যবাদ!

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম বোম্বাই শহরে হলেও মারাঠি যুবকদের একটা বড় অংশ অনুরোধ উপরোধ আবেদন নিবেদনের দ্বারা কখনও বলদর্পী ইংরেজের অত্যাচার লাঘব করা যাবে, তা বিশ্বাস করত না। তাদের আস্থা ছিল কব্জির জোরে, বোমা-রিভলভারে, পর পর হত্যাকাণ্ডের দ্বারা শাসকগোষ্ঠীর মনে ত্রাস সৃষ্টিতে। ভারতে ওদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলাই ছিল এদের ব্রত। তারা বিশ্বাস করত, এই পথেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা।

মারাঠি লৌহ যুবকদের তালিকায় আর একটি নাম, বিনায়করাও দামোদর সাভারকর। ১৯০৫ সালে বাইশ বৎসর বয়সে বি-এ পাশ করে পরের বৎসর আইন পড়বার জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন। পূর্বেই তিনি অভিনব ভারত সোসাইটিতে যোগদান করেছিলেন। লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে সোসাইটির এক গোপন বৈঠকে সাভারকর বলেন, আইন পড়তে যাবার কথা প্রকাশ করেছি বটে, কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য ভারতের বিপ্লবের বাণী সাগরপারের দেশগুলোতে পৌঁছে দেয়া আর লণ্ডনে থেকেই বিপ্লবের কাজ করা।

র‍্যাণ্ড, আয়ার্স্ট এবং গণপৎরাও ও রামচন্দ্র নিহত হবার পরই পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠল। সন্দেহবশে অনেককে গ্রেপ্তার করতে লাগল, তল্লাসীর নামে অত্যাচার চালাতে লাগল। বুঝতে দেরী হল না যে, পুলিশ কাথিয়াবাড়ের অধিবাসী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ১৮৯৭ সালে কৃষ্ণবর্মা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য একদিন চুপিসারে লণ্ডন পাড়ি দিলেন।

কিন্তু পরাধীনতার বেদনাবোধ যার অন্তরে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা সৃষ্টি করেছে, হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও যে বিন্দুমাত্র কম্পিত নয়, পৃথিবীর প্রান্তে গেলেও সে কি কখনও দেশকে ভুলে থাকতে পারে?

১৯০৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণবর্মা লন্ডনে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি' স্থাপন করলেন। পরাধীনতার জ্বালা যে কি দুর্বিষহ, এই সঙ্কটকালে জাতীয় ঐক্য যে কতখানি প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে লণ্ডনের ও ইয়োরোপের ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার এবং তাদের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ছিল এই সোসাইটির উদ্দেশ্য। কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি আবাসও গড়ে তোলেন ১৯০৫ সালের ১ জুলাই।

১৯০৬ সালে লণ্ডনে এসে সাভারকর এই হাউসেই অবস্থান করেন এবং পুরোদমে সোসাইটির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালে কৃষ্ণবর্মা

'পলিটিক্যাল মিশনারীজ ইন ইণ্ডিয়া' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন এবং যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিটি এই নতুন সংগঠনের সর্বভার গ্রহণ করেন, তাঁর নাম হরদয়াল।

ক্রমে ইণ্ডিয়া হাউসের ভার এসে যায় সাভারকরের হাতে। অভিনব ভারত সোসাইটির লণ্ডন শাখা স্থাপিত হয়। জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রেরা ইণ্ডিয়া হাউসের একাধিক গোপন সভায় ভারত স্বাধীন করবার জন্য সর্বস্ব নিয়োগের কঠোর শপথ গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়া হাউসের বৈঠকে ভারত থেকে এসে ভাষণ দেন লালা লাজপৎ রায়, বিপিন চন্দ্র পাল ও আরও অনেকে। এই সব সভায় যোগদান করত যারা, তাদের মধ্যে একটি নাম মদনলাল ধিংড়া।

অভিনব ভারত সোসাইটির কয়েকজন বোমা তৈরী সুরু করলেন। উদ্দেশ্য, গোপনে ওগুলো ভারতে পাঠিয়ে বিপ্লবীদের হাতে পেঁছে দেয়া, যাতে তারা ওগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারেন। সাভারকর ভারতে ইংরেজের অত্যাচার এবং ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে বহু পুস্তিকা রচনা করেন এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সেগুলো ইয়োরোপের সর্বত্র বিতরণ করা হয়।

এবার পুলিশের টনক নড়ল। অভিনব ভারত সোসাইটির লণ্ডন শাখা থেকে সাভারকরই যে এই সব বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা সোসাইটির বোম্বাই অফিসে পাঠাচ্ছেন এবং অফিসের প্রধান কর্ম সাভারকরের দাদা গণেশপন্থ দামোদর সাভারকরই যে সেই পুস্তিকাগুলি বিতরণের ব্যবস্থা করছেন, পুলিশ তা বুঝতে পারল।

১৯০৯ সালের ২ মার্চ তারা গণেশপন্থের বাড়ী তল্লাসী করে অনেকগুলি পুস্তিকা পেল, গ্রেপ্তার করল তাঁকে।

ঐ মার্চ মাসেই ইণ্ডিয়া হাউসের অন্যতম পাচক চতুর্ভুজ আমিনকে সাভারকর ভারতে পাঠালেন। সবাই জানল, অনেকদিন দেশে যায়নি সে, তাই ছুটি নিয়েছে কিছুদিনের জন্য। কিন্তু সাভারকরের ব্যবস্থাপনায় চতুর্ভুজের বাক্সের নীচে তৈরী করা হল একটি গুপ্ত খোপ, সেই খোপের মধ্যে তিনি কুড়িটি ব্রাউনিং পিস্তল ভরে দিলেন। তখনকার দিনে কাস্টমস বিভাগের এত কড়াকড়ি ছিল না। চতুর্ভুজ জাহাজে নিরাপদে এসে বোম্বাইতে নামল এবং সাভারকরের নির্দেশমত অভিনব ভারত সোসাইটির নাসিক শাখার কর্মি ও বিপ্লবী পাতনাকরের কাছে সেই পিস্তলগুলি পেঁছে দিল। নির্দেশ পাঠালেন সাভারকর, পিস্তলগুলি যেন কাজে লাগানো হয়।

ওদিকে লণ্ডনে মদনলাল ধিংড়া অধীর হয়ে উঠেছেন, একটা কিছু করতেই হবে। ওঁর আশেপাশের বন্ধুরা কিছুই আঁচ করতে না পারলেও খবর পেঁৗছে গেল ওঁর বাবার কাছে। তাঁরই নির্দেশে মদনলালের দাদা চিঠি লিখলেন লণ্ডনে ভারত সচিবের এ ডি সি কার্জন উইলীকে, তিনি যেন ছোট ভাইকে সংশোধনের চেষ্টা করেন। উইলী ওঁকে ডেকে ধমকে দিলেন। মদনলাল স্থির করলেন, এই উইলীকেই খতম করতে হবে।

১৯০৯ সালের ১ জুলাই লণ্ডনের ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউটের জাহাঙ্গীর হলে ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঘরোয়া সভায় মদলাল ধিংড়া পিস্তলের গুলীতে উইলীকে হত্যা করে।

নভেম্বর মাসে আহমদাবাদে প্রকাশ্য রাজপথে ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোর গাড়ীর ওপর বোমা ফেলা হয়। সৌভাগ্যক্রমে বোমা বিস্ফোরিত হল না। কিন্তু গ্রেপ্তার করা হল সাভারকরের সতেরো বৎসর বয়স্ক ছোট ভাই নারায়ণ সাভারকরকে।

সাভারকর প্রেরিত ব্রাউনিং পিস্তল দিয়ে বোম্বাইতেও কাজ সুরু হয়ে গেল।

২১ ডিসেম্বর নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে বিজয়ানন্দ থিয়েটার হল-এ যখন বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল, অভিনব ভারত সোসাইটির আওরঙ্গাবাদ শাখার কর্মি অনন্তলক্ষ্মণ কানাড়ে ব্রাউনিং পিস্তল দিয়ে তাকে হত্যা করেন।

সুরু হয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলার সঙ্গে সাভারকরের দাদা গণেশপন্থকেও জুড়ে দেওয়া হয়। অনন্তলক্ষ্মণ কানাড়ে, কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও বিনায়ক নারায়ণ দেশপান্ডের প্রতি ফাঁসীর আদেশ দেয়া হয় এবং অন্যান্যের সঙ্গে গণেশপন্থের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ড।

পুলিশ এবার নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, এ সবেরই মূলে আছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের বেঁটেখাটো ক্ষীণদেহ সেই লোকটি, যার নাম বিনায়করাও দামোদর সাভারকর।

তাঁর ওপর হুকুম জারী করা হল, ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ব্যারিষ্টারী পাশ করলেন তিনি, কিন্তু হুকুম জারী করা হল, বার-এ যোগদান করতে পারবে না।

উইলীর মত একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের হত্যার ফলে সারা ইংলন্ডে হৈ হৈ পড়ে গেল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ধুরন্ধর গোয়েন্দাদের বুঝতে দেরী

হল না যে, মদনলাল ধিংড়া গুলী চালালেও এই ষড়যন্ত্রের নায়ক হচ্ছে সেই ভারতীয় ব্যারিস্টারটি, যার নাম বিনায়করাও দামোদর সাভারকর। তারা যেমন প্রকাশ্যেই সাধারণভাবে ইণ্ডিয়া হাউসের বাসিন্দাদের, বিশেষ করে সাভারকরের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল, সাভারকরও তেমনি প্রকাশ্যেই এই হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। মদনলালের কাজের নিন্দা করে কোন সভায় বক্তৃতা হলেই সাভারকর তার প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের ছাত্রদের ওপর গোয়েন্দাদের নজর পড়ায় সাভারকর হাউস বন্ধ করে দিলেন, সারা লন্ডন শহরে ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ল। লন্ডনের ভারতীয়দের মধ্যে তারা বিপ্লবের বীজ ছড়াতে লাগল।

১৯০৯ সাল, ৫ জুলাই। লণ্ডনের রাজভক্ত ভারতীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সভা। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন মাননীয় আগা খাঁ। বক্তার পর বক্তা উইলী হত্যার নিন্দা করতে লাগলেন, কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিতে লাগলেন মদনলাল ধিংড়াকে। কাপুরুষ, জহ্লাদ, সমাজের কলঙ্ক— এমনি সব মন্তব্য করতে লাগলেন। শ্রোতৃবর্গ নীরবে সেই ধিক্কার ধ্বনি সমর্থন করতে লাগলেন।

অবশেষে এল প্রস্তাব, 'এই সভা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কার্জন উইলীকে নৃশংসভাবে হত্যার নিন্দা করিতেছে এবং গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছে যে, হত্যাকারীকে যোগ্য শাস্তি দেয়া হউক।'

সভাপতি আগা খাঁ উঠে দাঁড়ালেন, ঘোষণা করলেন, সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল।

অকস্মাৎ শ্রোতাদের মধ্য থেকে উচ্চৈঃস্বরে একটি কণ্ঠ ভেসে এল, না, না, সর্বসম্মতিক্রমে নয়।

কে? কে আপত্তি জানাচ্ছেন? আগা খাঁ বললেন, সামনে এগিয়ে আসুন।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বেঁটে-খাটো একজন ভারতীয়. আমি আপত্তি জানাচ্ছি।

কে আপনি?

আমার নাম বিনায়করাও দামোদর সাভারকর। আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করি না। সাভারকর দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, লিখে নিন, অন্ততঃ একজন প্রস্তাবের বিরোধীতা করছে, তার নাম ভি ডি সাভারকর, বোম্বাই-এর অধিবাসী ভারতীয়।

মার মার করে উঠল সবাই। চীৎকার, হল্লা, সাভারকরকে উদ্দেশ্য করে

অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ চলল। ধেয়ে এল একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বসল সাভারকরের মুখে। চশমা ভেঙ্গে গেল, মুখ কেটে গেল।

সহকর্মি কজন সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের একজনের পকেটে ছিল রিভলভার। টেনে বার করছিলেন আততায়ীকে শেষ করে ফেলবার জন্য। সাভারকর ইসারায় বারণ করলেন।

আরেকজন আততায়ীর মাথায় লাঠি মেরে বসলেন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভূতলশায়ী হল।

পুলিশ গ্রেপ্তার করল সাভারকরকে।

কিন্তু ছেড়ে দিল কিছু পরেই।

বড় ভাই দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত, মিণ্টোর ওপর বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে সন্দেহবশে ছোট ভাই গ্রেপ্তার, নিজের ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ, ব্যারিষ্টারী পাশ করেও ব্যারিষ্টারী করবার অনুমতি পাওয়া গেল না—মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে সাভারকর অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

চলে এলেন ফ্রান্সে ১৯০৯ সালের শেষ দিকে।

ফ্রান্সে ছিলেন সেই বিখ্যাত ফরাসী মহিলা ম্যাডাম কামা, ইংরেজের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে জর্জরিত ভারতের বেদনা ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যিনি নানারকম পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করছিলেন এবং সেই মহৎ প্রচেষ্টায় ইয়োরোপের ভারতীয়দের সুসংহত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বাস্থ্যোদ্ধার ও বিশ্রামের আশায় সাভারকর তাঁর ওখানে উঠলেন। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার দৈনন্দিন বিবরণ ডাকযোগে পেতে লাগলেন।

এই প্রথম নাসিক ষড়যন্ত্র মামলাতেই দাদার সঙ্গে সাভারকরকেও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডে সহায়তা করার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে সাভারকরের অনুপস্থিতেই সুরু হল দ্বিতীয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা। তাঁর ছোট ভাই নারায়ণকেও অভিযুক্ত করা হল তাঁর সঙ্গে। সাভারকরের প্রেরিত ব্রাউনিং পিস্তল দিয়ে জ্যাকসনকে হত্যা করা হয়েছে, সুতরাং সাভারকর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছেন, এই অভিযোগে তাঁর প্রতি দ্বিতীয় বার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

দু-দুবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড! সাভারকর আর দ্বিধা করলেন না সোজা চলে এলেন লণ্ডনে। ষ্টেশনেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

পরদিন পাঠানো হল ব্রিকস্টন জেলে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সাভারকরকে ভারতে পাঠানো হবে।

সে সময় ইংলণ্ড থেকে ভারতে যেতে হলে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সের মার্সেলিস বন্দরে এসে জাহাজে চড়তে হত। কিন্তু দুর্ধর্ষ ভারতীয় বিপ্লবীকে নিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ পথে যেতে সাহস করলেন না। তাঁরা স্থির করলেন সোজা সাগর পথেই সাভারকরকে পাঠানো হবে।

১৯১০ সালের ১৩ই মার্চ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একদল সুদক্ষ গোয়েন্দাসহ সাভারকরকে বিস্কো উপসাগরে জাহাজে তোলা হল।

জাহাজ রওনা হল।

গভীর রাত্রি। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সমুদ্র। সেই পুরু আবরণ ভেদ করে কালো জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

জাহাজ প্রকোষ্ঠে বন্দী সাভারকর।

দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বিনায়করাও দামোদর সাভারকর।

লোকে শ্রদ্ধাভরে নামকরণ করছে, বীর সাভারকর।

সাভারকর গভীর চিন্তামগ্ন।

এই শীতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

চার বৎসর পর দেশে ফিরছি। অভ্যর্থনা জানাতে দাদা গণেশপন্থ আসবেন না, জেলে আছেন, ভাই নারায়ণ আসবে না, জেলে আছে। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে সশস্ত্র পুলিশ আর কালো রং-এর বন্দী গাড়ী। আমাকেও জেলে যেতে হবে। লৌহ কপাট মুখব্যাদান করে রয়েছে। মাথার ওপর ঝুলছে দু-দুটো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। অর্থাৎ আঠাশ বৎসর।

জাহাজ নোঙ্গর করল।

কোথায় ?

গবাক্ষের শিকের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করেই চিনলেন সাভারকর, মার্সেলিস বন্দর। ফ্রান্সের সেই মার্সেলিস বন্দর। যে বন্দরে এসে তাঁকে নিয়ে জাহাজে উঠতে সাহস করেনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। জাহাজ, দেখা যাচ্ছে, সেই বন্দরেই রাত কাটাতে এসেছে। আবার যাত্রা করবে প্রত্যুষে।

হঠাৎ সাভারকরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

দরজায় নক করলেন।

বাইরে থেকে প্রহরী জিজ্ঞেস করল, ইয়েস ?

শৌচাগারে যাওয়া দরকার।

দরজা খুলে বাইরে এনে বন্দীকে শৌচাগারে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রহরী বলল, তাড়াতাড়ি করো। তারপর দরজা তালা বন্ধ করে দিল।

চতুর্দিকে চাইলেন সাভারকর। কোনো ফাঁক নেই। শুধু মাথার ওপরে সিলিং-এ একটি ছিদ্র, খুব ছোট নয়। ভেতর দিয়ে দেখা যায় কালো আকাশের টুকরো ঐ রন্ধ্র পথেই ঝির ঝির করে সমুদ্রের হাওয়া আসছে। একমাত্র ভেণ্টিলেশন। ওর পাশে একটা হুকও দেখা যাচ্ছে।

ব্যস, আর দেরী নয়। ড্রেসিং গাউনটা খুলে ছুঁড়ে মারলেন হুক লক্ষ্য করে। গাউনটা আটকে গেল হুকে। বেঁটে খাটো হালকা শরীর সাভারকর গাউন বেয়ে উঠলেন ওপরে, ছোট্ট শরীর ফুটো দিয়ে গলিয়ে বেরিয়ে এলেন শৌচাগারের ছাদে। সেখান থেকে অনেক নীচে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ কিসের শব্দ? বাইরের প্রহরী সচকিত হয়ে উঠল।

হ্যালো, হ্যালো, দরজা খোল, দরজা খোল।

কোনো সাড়া নেই।

খোল শীগগির। নইলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব।

কোনো শব্দ নেই।

স্যাঙাৎদের ডাকল প্রহরী। দরজা ভেঙ্গে ফেলল। ড্রেসিং গাউন ঝুলছে। প্রিজনার পলাতক।

বাইরে এল ছুটে। ভোর হয়ে আসছে। তবু টর্চ ফেলে দেখা গেল সাভারকর প্রাণপণে পারের দিকে চলেছেন।

এ্যালার্ম বাজিয়ে দিল। ছুটে বেরিয়ে এল প্রহরীর দল। ছুটে গিয়ে নামল তীরে।

ব্যারিস্টার সাভারকরের জানা ছিল যে, ফ্রান্সের মাটিতে পা ঠেকাতে পারলেই আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বৃটিশ পুলিশ আর তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। তীরে উঠে প্রাণপণে ছুটলেন তিনি কোন ফরাসী পুলিশের সন্ধানে। ওর হাতে পড়লে আর এরা কিছু করতে পারবে না।

ছুটছেন তিনি তীর বেগে। বৃটিশ পুলিশও ছুটছে আন্তর্জাতিক আইন না মেনেই।

ভোর হয়ে গেছে। মার্সেলিস বন্দর জেগে উঠেছে। চলছে যানবাহন, লোকজনের চলাচল সুরু হয়েছে। তাদের মধ্য দিয়েই ছুটছেন সাভারকর, ছুটছে জাহাজের বৃটিশ পুলিশ।

দেখা গেল একজন ফরাসী পুলিশের জমাদারকে।

ছুটে গেলেন তাঁর কাছে, বললেন, আমি একজন ভারতীয় বিপ্লবী, তোমাদের দেশ থেকে বৃটিশ পুলিশ আমায় এমনিভাবে ধরে নিয়ে যেতে পারে না।

শুনল না জমাদার। মানল না আইন। বৃটিশ পুলিশের হাতে তুলে দিল।

বৃটিশ পুলিশ সাভারকরকে বন্দী করে আবার জাহাজে নিয়ে এল।

জাহাজ যাত্রা করল ভারত অভিমুখে।

বোম্বাই পেঁাছেই সাভারকরকে সোজা জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

ফরাসী গভর্ণমেন্ট পরে সাভারকরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে দাবী জানিয়েছিল, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সে দাবী প্রত্যাখ্যান করল।

বীর সাভারকরের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ওপর যবনিকা নেমে এল।

পাঠানো হল তাঁকে আন্দামানে সেলুলার জেলে।

দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর কাটালেন আন্দামানে।

তারপর তাঁকে ভারতে এনে অন্তরীণ করে রাখা হল বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি নামক ক্ষুদ্র শহরে নানা বিধি নিষেধের নাগপাশে জড়িয়ে।

মুক্তিলাভ করলেন ১৯৩৭ সালের ১০ মে সুদীর্ঘ আঠাশ বৎসর পরে।

জেলে প্রবেশ করেছিল ছাব্বিশ বছরের তরুণ যুবক, বেরিয়ে এলেন চোয়ান্ন বছরের ভগ্নস্বাস্থ্য প্রবীণ।

দেশের স্বাধীনতার জন্য একটানা এত দীর্ঘ কাল জেলে ও অন্তরীণে আর কেউ কাটিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

জনগণের সশ্রদ্ধ নামকরণ সার্থক, বীর সাভারকর।

চতুরচূড়ামণি রাসবিহারী

বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন ১৯০৫ সালের ১৬ অকটোবর। অজুহাত, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে এত বড় একটা প্রদেশ বঙ্গদেশ, একে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব হে বঙ্গবাসী, তোমাদেরই কল্যাণের জন্য—

আসল কারণ, বাঙ্গালীকে ভয়। এরা এক সঙ্গে চলে, এক সুরে কথা কয়, একের কণ্ঠ সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তোলে, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এদের ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্র। সেই ঐক্য ভাঙ্গতে হবে। সুতরাং কার্জন বাংলা দেশকে ভেঙ্গে পূব দিকের আধখানা অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগকে জুড়ে দিলেন আসামের সঙ্গে।

জুড়ে দিলে কি হবে? বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ মানছে কে?

ফলে ঐক্য আরও দৃঢ়বদ্ধ হল, সুরু হল ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, সভা, শোভাযাত্রা, অগ্নিগর্ভ ভাষণ, সমগ্র বাংলায় নব জাগরণের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠল।

১৬ অকটোবর, বাংলার ৩০ আশ্বিন, ১৩১২ সাল, রবীন্দ্রনাথ রাখী বন্ধন উৎসব পালনের আহ্বান জানালেন। কবির লেখনীতে ঐক্যের সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান ॥

মদমত্ত ইংরেজ সরকার নির্মমভাবে শাসন মুদ্গর চালাতে লাগলেন। ফলে, প্রকাশ্য আন্দোলন ধাবিত হল গুপ্ত পথে। স্থাপিত হল গুপ্ত সমিতি, সুরু হল বোমা তৈরী, রিভলভার সংগ্রহ, রাজনৈতিক ডাকাতি, সরকারী কর্মচারী নিধন।

অবশেষে, ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বাতিলের নির্দেশ এল। কার্জন সাহেবের সেটল্‌ড্ ফ্যাক্ট আনসেটেল্‌ড্ হয়ে গেল।

কিন্তু কলকাতা আর নয়। কলকাতা নিরাপদ নয়। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজধানীতে প্রবেশ করবেন সরকারীভাবে।

শোভাযাত্রায় মোগল আমলের বর্ণাঢ্য জাঁকজমক। সারা ভারতের মহারাজা, রাজা, নবাব ও জমিদারেরা স্বর্ণখচিত পোষাকে সজ্জিত হয়ে শত শত রক্ষিসহ এসেছেন হুজুরের প্রতি আনুগত্য জানাতে। রেল ষ্টেশন থেকে লালকেল্লা পর্যন্ত দীর্ঘ সড়কে সংখ্যাতীত সশস্ত্র অফিসার, পুলিশ এবং সেনা বাহিনীর একটি দল সতর্ক পাহারাদার। হাতীর পিঠে মাহুত, মাহুতের পেছনে হাওদায় উপবিষ্ট সহাস্যবদন লর্ড ও লেডী, তাঁদের পেছন থেকে ছাতা ধরেছে বলরামপুর রাজ্যের জমাদার মহাবীর সিং।

হাজার হাজার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি যখন চাঁদনী চকের ক্লক টাওয়ার ছাড়িয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে অগ্রসর হচ্ছে, তখন ঠিক, এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে অকস্মাৎ প্রচন্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ !

বোমাটি পড়েছে হাওদার ঠিক পেছনে। মহাবীর সিং তৎক্ষণাৎ নিহত। হাওদার পেছন দিকটা উড়ে গেছে, স্পিলন্টারের আঘাতে হার্ডিঞ্জের ঘাড়ে গভীর ক্ষত, শরীরেরও নানা স্থানে স্পিলন্টারের আঘাত। দর দর করে রক্ত ঝরছে। হার্ডিঞ্জ দ্রুত সংজ্ঞা হারালেন।

হৈ চৈ পড়ে গেল। মুহূর্তে সব যেন লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম ! চারিদিক থেকে ছুটে এল সবাই। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু আততায়ীর হদিস পাওয়া গেল না।

চিকিৎসার জন্য তৎক্ষণাৎ হার্ডিঞ্জকে দেরাদুনে স্থানান্তরিত করা হল।

পরদিনই দেরাদুন শহরে বিশাল জনসভা। সভার সংগঠক, সভাপতি ও প্রধান বক্তা দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কর্মচারী রাসবিহারী বসু। এই সভা আমাদের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের জীবন নাশের চেষ্টার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং পরম করুণাময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছে, বড়লাট দীর্ঘজীবি হউন।

এমনি আরও সভা হল। আরও সভা; ঘন ঘন সভা। সব সভারই একই সংগঠক, একই সভাপতি ও একই প্রধানবক্তা, সেই সরকারী কর্মচারী রাসবিহারী বসু এবং সব সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একই বয়ানের প্রস্তাব, নিন্দা করিতেছে, ধিক্কার দিতেছে, মহামহিম বড়লাটের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে।

কিন্তু বোমা ছুঁড়েছিল কে? ১৯১৩ সালের ২৪ জানুয়ারী তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন নগদ এক লক্ষ টাকা।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর 'মাই ইন্ডিয়ান ইয়ার্স, ১৯১০-১৬' নামীয় গ্রন্থে লিখেছেন, 'দেরাদুন ষ্টেশন থেকে মোটরে যখন আমার বাংলোয় যাচ্ছিলাম, একজন ভারতীয়কে দেখলাম আরও কজনের সঙ্গে তার বাড়ীর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা সবাই আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বার বার সেলাম জানাতে লাগল। ওরা কারা জিজ্ঞেস করলে আমায় জানানো হল যে, ওদের মধ্যে যে প্রধান, দুদিন আগে দেরাদুনের একটি জনসভায় সে সভাপতিত্ব করেছিল এবং আমার জীবনের ওপর আক্রমণে সান্ত্বনা জানিয়ে সে নিজেই ঐ প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করে পাশ করিয়েছে। পরে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সেই ভারতীয়, যে আমাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল।'

চতুরচূড়ামণি রাসবিহারী!

বুদ্ধিতে, কৌশলে, অভিনয়ে, ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম ধারণে গোটা ভারতের গোয়েন্দা ও পুলিশের দলকে বার বার তাঁর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হয়েছে।

কত নামই ছিল তাঁর! মাণিক, সতিন্দর চন্দর, মোটা বাঙ্গালী, সতীশ চন্দর, চারুচন্দ্র দত্ত এবং ভারত ত্যাগের সময় পি. এন. টাগোর এবং আরও অনেক নাম। তাঁর আসল নামটি খুব কম লোকেরই জানা ছিল। জাপানে ফেরারী থাকাকালেও নতুন নতুন জাপানী নাম নিতেন।

কখনো সুটবুট পরিহিত পুরোদস্তুর সাহেব, কখনও পাগড়ী মাথায় মাড়োয়ারী, কখনও শ্মশ্রুশোভিত পাঞ্জাবী, কখনও ধুতিচাদরে বাঙ্গালী, কখনও বা পৈতে ও টিকিধারী ভুঁড়ি-ভাসানো ভট্টাচার্য বামন, কখনও শেরওয়ানী ও ফেজধারী মুসলমান ভদ্রলোক, এমন কি, কখনও ব্রীড়াবনতা অবগুণ্ঠনবতী মহিলার ছদ্মবেশেও তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিপ্লব সংগঠনের কাজে ঘুরে বেড়াতেন!

তাঁর অভিনয় ছিল এমনি নিখুঁত যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা দূরে থাক, পুলিশ তাঁকে একজন অতীব প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী বলেই জানত। এতখানি বিশ্বাস করত যে হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় রাসবিহারী যাতে বড়লাটের কাছাকাছি থাকতে পারেন, সেজন্য পুলিশ তাঁকে একটি স্পেশ্যাল পাস দিয়েছিল। যে চন্দননগরে রাসবিহারীর বাড়ী, যেখানে সে যুগে গড়ে

উঠেছিল বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান মিলন কেন্দ্র, সেই চন্দননগরের বিপ্লবীদের গতিবিধি সম্বন্ধে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধান ডেনহ্যাম একবার অনুরোধ জানিয়েছিল এই রাসবিহারীকেই। এমনি সাধারণ ভাবে চলাফেরা করতেন তিনি, বাইরে সাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে অজ্ঞ, নিরীহ ভাল মানুষটির অভিনয় এমনি নিখুঁতভাবে করে চলতেন যে, ধুরন্দর গোয়েন্দারাও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, সমগ্র ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বৃটিশ শাসনের বনিয়াদ খান খান করে ভেঙ্গে ফেলার পরিকল্পনা, সংগঠন ও প্রয়াসের মূলে লোকচক্ষুর অন্তরালে মুখ্য ভূমিকা যাঁর তাঁরই নাম রাসবিহারী বসু।

পরে অবশ্য ওদের এই মহাভ্রম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু কবে?

হার্ডিঞ্জের ওপর আক্রমণের বৎসরাধিক কাল পর ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে দিল্লী পুলিশ হানা দেয় আমীর চাঁদ ও আবাদবিহারীর বাড়ীতে। তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালাতে গিয়ে হঠাৎ পেয়ে যায় রাসবিহারীর ব্যবহারের কিছু জিনিস ও কাগজপত্র। সেই মুহূর্তেই ভুল ভাঙ্গল পুলিশের, বুঝতে পারল অনুগত সরকারী কর্মচারিটি একজন দুধর্ষ বিপ্লবী।

রাসবিহারী তখন লাহোরে ছিলেন, খবর পেয়েই দিল্লীতে এলেন। তল্লাসীর বিবরণ পেয়েই ফেরারী হলেন। শ্রীশ ঘোষকে সঙ্গে করে চন্দননগর চলে এলেন।

ওদিকে গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়ে ৮ মার্চ ভোর হবার আগেই কলকাতা থেকে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী গিয়ে হানা দিল তাঁর চন্দননগরের বাড়ীতে, তাদের দলপতি স্বয়ং গোয়েন্দা প্রধান ডেনহ্যাম এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট। কিন্তু চতুর চূড়ামণি রাসবিহারী। ঠিক সময়মত খবরটি পেয়েছেন, আগেই সরে পড়েছেন টুক করে, তবে বেশী দূরে যাননি, কাছেই লুকিয়ে থেকে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন।

পরদিনই 'হুলিয়া' বার করল পাঞ্জাব পুলিশ। শহরে শহরে, রেল স্টেশনে, পোষ্ট অফিসে, সরকারী বে-সরকারী অফিসগুলির দেয়ালে দেয়ালে তাঁর ছবি সেঁটে দেয়া হল, পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করলেন 'ধরাইয়া দিতে পারিলে পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার।'

কিন্তু কোনো পাত্তা নেই।

পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল, বারো হাজার।

তথাপি কোন খবর নেই।

দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়েছিল রাসবিহারীকে পুরোপুরি ফেরারী অবস্থায়। সেই কর্মকাণ্ডের আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু আভাস দিয়ে যাচ্ছি।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন অনেক আগে ১৯০২ সালে, মাত্র ষোল বৎসর বয়সে। অরবিন্দের মত রাসবিহারীকেও বিপ্লবী দলে টেনে আনেন বিপ্লববাদের 'ব্রহ্মা' যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সুহৃদ সম্মিলনী' স্থাপন করেন চন্দননগরে, রাসবিহারীকে তার সভ্য করে নেন। উনিশ বৎসর বয়সে দেরাদুনে সরকারী চাকরিতে যোগদান করেন। সেখানে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন, বোমা তৈরী করেন। ১৯০৮ সালে লালা হরদয়াল ইয়োরোপে চলে গেলে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলির ভার গ্রহণ করেন বিপ্লবী জিতেন চট্টোপাধ্যায়। জিতেন রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯১০ সালে তিনিও যখন ইয়োরোপে চলে যান, তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে রাসবিহারীকেই সমস্ত ভার দিয়ে যান। রাসবিহারী কলকাতায় আসেন। হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বর্তমান ওয়াই. এম. সি. এ বিল্ডিংস-এ ১৯০৮ সালে বিপ্লবী অমরেন্দ্র চাটার্জী ও ক্ষীরোদ গাঙ্গুলীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় "শ্রমজীবি সমবায়" নামে একটি পণ্য বিপণী খোলা হয়। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের দোকান হলেও কালক্রমে কলকাতা শহরে ওটাই হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান মিলনকেন্দ্র। এই মিলনকেন্দ্র মারফৎ বাংলায় বিপ্লবীদের সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। পরিচিত হন তিনি বাঘা যতীন, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন ভট্টাচার্য (উত্তর কালের মানবেন্দ্র নাথ রায়), বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্তী ও আরও অনেকের সঙ্গে। পরিচিত হন শ্রীশ ঘোষ, মতিলাল রায়, প্রতুল গাঙ্গুলী, নলিনী কিশোর গুহের সঙ্গে। ১৯১৩ সনের শেষ দিকে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে তিন বন্ধুর সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক— অমরেন্দ্র, বাঘা যতীন ও রাসবিহারী। ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হলে বাংলাদেশের নেতৃত্বের ভার থাকবে বাঘা যতীনের ওপর।

কিন্তু এ সবই ফেরারী হবার আগে।

ফেরারী হবার পর তাঁর কর্মতৎপরতা যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

তিনিই প্রথম বিপ্লবী, বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে যিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, সংগঠন করেছিলেন এবং কার্যে রূপায়নের তারিখ ও সময় পর্যন্ত নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন। যাঁর মাথার মূল্য বারো

হাজার টাকা, তখন ফেরারী অবস্থায় প্রচণ্ডতম ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। দিল্লী, লাহোর, অমৃতসর, সাহারাণপুর, বেনারস, কলকাতা এবং আরও অনেক জায়গায় বারবার যাতায়াত করতে হয়েছে। এক বেনারসেই যে কতবার বাড়ী বদলেছেন, তার ঠিক নেই। বাঙ্গালীটোলায়, মিশিরপোখরায়, কখনও মদনপুরায়, আবার কখনো দেবনাথপুরায়, খলিলপুরায় কখনও হরিশ্চন্দ্র ঘাট রোডে। এই হরিশ্চন্দ্র ঘাট রোডের গুপ্ত আশ্রয়স্থলেই কলকাতা থেকে এসে মিলিত হলেন বাঘা যতীন, নরেন ভট্টাচার্য এবং অতুল ঘোষ ১৯১৫ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি। ইংরেজ তখন ইয়োরোপীয় রণাঙ্গনে ব্যতিব্যস্ত, ভারতের দিকে আর তেমন নজর রাখতে পারছে না, রাসবিহারী বললেন, এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ, এই ফেব্রুয়ারীতেই আমরা সুরু করব সশস্ত্র বিপ্লব।

তারপর বেরিয়ে পড়লেন উত্তর ভারত সফরে। শচীন সান্যাল তখন তাঁর দক্ষিণ হস্ত। জলন্ধর, বান্নু, কোহাট, রাওয়ালপিণ্ডি, ঝিলাম, কপূরতলা, ফিরোজপুর, মীরাট, আম্বালা ও দক্ষিণ ভারতেরও অনেকগুলি ক্যান্টনমেন্টের খবর নিলেন।

সর্বত্রই সুখবর। সব সেনাব্যারাক থেকেই এল বার্তা, আমরা রেডি, হুকুম দিজিয়ে।

তারিখ স্থির করে দিলেন রাসবিহারী, ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী।

স্থির করা হল, মীয়ান মীরের ভারতীয় সেনাদল প্রথম রাইফেল ছুঁড়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যেরা বন্দুক ঘুরিয়ে দাঁড়াবে, দখল করা হবে অস্ত্রাগার, বারুদখানা, সামরিক যানবাহন, রেলওয়ে, বন্দী করা হবে গোরা সৈন্যদের আর নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে তাদের, যারা বাধা দেবে ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক রুপাল সিং পূর্বাহ্নেই পুলিশকে খবর পাঠিয়েদিল।

রাসবিহারীও খবর পেয়ে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ তারিখ বদলে দিলেন, ২১ নয়, ১৯ ফেব্রুয়ারী।

কিন্তু হায়! বিশ্বাসঘাতক সেই সংবাদটিও পুলিশকে জানিয়ে দিল।

অকস্মাৎ পুলিশ হানা দিল শুধু লাহোরে নয়, সর্বত্র, উত্তর ভারতের নানা শহরে।

রাসবিহারীর বিশ্বস্ত সহকর্মীরা অনেকেই ধরা পড়ে গেলেন।

কিন্তু আশ্চর্যতম সত্য. পুলিশ শত চেষ্টা করেও রাসবিহারীর সন্ধান পেল না।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না তাঁকে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ওয়ারেন্ট বার করা হল, পাওয়া গেল না। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলাতেও প্রধান আসামীর নাম ছিল রাসবিহারী বসু, কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা গেল না। এই একটি লোককে গ্রেপ্তার করবার জন্য সমগ্র ভারতের গোয়েন্দা ও পুলিশ বাহিনী সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

নলিনী মুখার্জীকে সঙ্গে করে রাসবিহারী বেনারস থেকে কলকাতায় এলেন।

আগের বছরই যখন তাঁর নামে হুলিয়া বেরোয়, তখনই শ্রীশ ঘোষ ও বন্ধুরা তাঁকে ভারতের বাইরে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, এমন কি, টিকিটও কেনা হয়। কিন্তু কিছুতেই রাজী হননি রাসবিহারী। বলেছিলেন ভারতে আমার কাজ এখনও শেষ হয় নি।

বন্ধুরা আবার চেপে ধরলেন তাঁকে। চন্দননগরে গেলে মতিলাল রায়ও সেই পরামর্শ দিলেন। তিনি নিজেও উপলব্ধি করলেন যে, শুধু ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ করিয়ে এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ও সেই স্বাধীনতা অটুট রাখা সম্ভব হয়। অনিবার্যভাবে প্রয়োজন অপরিমিত অর্থ এবং প্রচুর পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র আর ইংরেজের শত্রু কোনো শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা। এই সহযোগিতা সংগ্রহ করতে হলে যেতে হবে ভারতের বাইরে। সেখান থেকে নিরাপদে কাজ করা যাবে।

কবি রবীন্দ্রনাথের তখন জাপান যাত্রার আয়োজন চলছে।

ক্ষুরধারবুদ্ধি চতুরচূড়ামণি রাসবিহারী সেই সুযোগ গ্রহণে তৎপর হলেন। নাম গ্রহণ করলেন পি. এন. টাগোর। টিকিট কেনা হল সেই নামে। সানুকি মারু জাহাজের টিকিট। যেন ঠাকুর পরিবারেরই কোন ব্যক্তি জাপানে কবির সুষ্ঠু সফরের ব্যবস্থা করে রাখবার জন্য আগেই সেখানে যাচ্ছেন; এমনি যুক্তি দেখিয়েই পাসপোর্ট চাওয়া হল।

রাসবিহারী তখন চন্দননগরে নিজের বাড়ীতে থাকতেন না, থাকতেন সাগরকালী ঘোষের বাড়ীতে। গলায় ধবধবে পৈতে আর মাথায় লম্বা টিকি, যেন ভটচার্য বামুনটি।

জাপান যাবার টিকিট সহজেই কেনা হয়েছে, কিন্তু নিয়ম অনুসারে

আইডেনটিটি কার্ডখানা আনতে হবে তাকেই, যার নামে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছে এবং আনতে হবে স্বয়ং পুলিশ কমিশনার টেগার্টের অফিস থেকে !

কিন্তু ঘাবড়াবার মানুষ নন রাসবিহারী। ছদ্মবেশ ধারণের চরম পরীক্ষায় নামলেন। চন্দননগরের ভটচার্য বামুনের খোলস ছেড়ে একদিন বেরিয়ে এল একটি পুরোদস্তুর সাহেব—সুট, বুট, কোট, টাই ও হ্যাট এবং ফিরিঙ্গিসুলভ সেই কেয়ারব্রিফ চলন। মিষ্টার পি. এন. টাগোর। পুলিশ কমিশনারের অফিসের বাইরে এসে মোটর থামল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মি. টাগোর। ঢুকলেন অফিসে সেই কেয়ারব্রিফ ষ্টাইলে। আইডেনটিটি কার্ডখানা নিয়ে বেরিয়ে এলেন আবার সেই কেয়ারব্রিফ ষ্টাইলে। গাড়ী হুস্ করে চলে গেল।

ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে টেগার্ট সাহেবকে টেগোর সাহেবের এটাই হচ্ছে চরমতম পার্টিং কিক !

১৯১৫ সালের ১২ মে খিদিরপুর থেকে সানুকি মারু জাহাজ জাপান অভিমুখে যাত্রা করল। তাঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিলেন শচীন সান্ন্যাল ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত (ওরফে গিরিজাবাবু)।

৫ জুন রাসবিহারী নিরাপদে জাপানে পেঁছিলেন।

কিন্তু জাপানে গিয়েও কি নিস্তার আছে ফেরারী মহানায়কের ?

এখানেও জাপ গোয়েন্দারা তাঁর ওপর নজর রাখতে লাগল। একদিন নিজের ঘরে পোষাক পরিবর্তনের সময় হঠাৎ মনে হল দুজন লোক জানালা দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছে। সন্দেহ হল। পরীক্ষা করবার জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি রাস্তায় বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনের মত এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলেন। দেখা গেল, ফেউ দুটি ঠিক পেছনে লেগে আছে। হঠাৎ বিপরীত দিকে ঘুরে সোজা ওদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা স্বীকার করল যে, গভর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে ওরা বিদেশীদের ওপর নজর রাখছে।

সান ইয়াৎ সেন তখন জাপানে। রাসবিহারী তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব বললেন। সান ইয়াৎ সেন তাঁকে মিয়াজাকির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিয়াজাকি তাঁকে নিয়ে গেলেন মিৎসু তয়ামার কাছে।

১৯১৫ সালের নভেম্বরে লালা লাজপৎ রায় জাপানে এলে ওখানকার ভারতীয়েরা একটি অভিজাত হোটেলে তাঁর সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। মিৎসু তয়ামা, ডঃ ওখাওয়া ও বহু জাপানী সে সভায় যোগদান করেন। এবং অন্যান্য ভারতীয়ের সঙ্গে যোগদান করেন হেরম্ব গুপ্ত ও রাসবিহারী।

সেই সভায় পি. এন. টাগোর ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিক্ষরা ভাষায় একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণের ফলেই জানাজানি হয়ে গেল যে, টাগোর আর কেউ নন, স্বয়ং ফেরারী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। অনেকগুলো রাজদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ও হত্যা মামলা সম্পর্কে ইংরেজ সরকার যাঁকে সারা দুনিয়াময় খুঁজে বেড়াচ্ছে, যাঁর মাথার দাম ধার্য হয়েছে বারো হাজার টাকা।

ক্রোধে ফেটে পড়লেন বৃটিশ গভর্ণমেন্ট। মিত্র শক্তি জাপ গভর্ণমেন্টকে জানিয়ে দেয়া হল, আনডিজায়ারেবল তিনজন ভারতীয়কে এখনই জাপান থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হোক। লালা লাজপৎ রায়, হেরম্ব গুপ্ত ও রাসবিহারী বসু।

বহিষ্কারের আদেশ পেয়ে লালাজী আমেরিকা চলে গেলেন আর বাকি দুজনের ওপর আদেশ জারী করা গেল না, কারণ দুজনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

আবার সুরু হল জাপ গোয়েন্দা ও পুলিশের সঙ্গে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রতিযোগিতা।

মিৎসু তয়ামার অনুরোধে 'নাকামুরায়া' নামীয় রুটির দোকানের মালিক সোমা ওঁদের দুজনকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছেন বলে যখন সংবাদ এল, ওরা তখন তয়ামার বাড়ীতে। এবং পুলিশ গুপ্তচর মুখে সে খবরটি পেয়ে তয়ামার বাড়ীর সামনে এসে হাজির লরী ভর্তি হয়ে এবং অস্ত্র নিয়ে। ওরা অপেক্ষা করছে, সন্ধ্যার পর ওরা বাড়ীতে ঢুকবে, তল্লাসী সুরু করবে এবং এবার হাতেনাতে ধরে ফেলবে দুজন আনডিজায়ারেবলকে।

তয়ামা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ যাত্রায় বুঝি আর বাঁচাতে পারলেন না ওঁদের। পুলিশের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে যাবার কোনো পথই দেখতে পেলেন না। রাসবিহারী বাড়ীর ভেতর থেকে সবই দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, পাশের বাড়ীটা কার ?

তয়ামা বললেন, আমারই বন্ধু অধ্যাপক তেরাও-এর।

বাইরে যে গাড়ীখানা নিয়ে ড্রাইভার অপেক্ষা করছে, ওখানা কার গাড়ী ?

তেরাও-এর।

ব্যস, ভেতরের ঘরে গেলেন হেরম্বকে নিয়ে। হেরম্বকে পরালেন তুকুদার বড় ওভারকোট আর নিজে পরলেন জাপানী কিমোনো। জাপানী ছদ্মবেশে দুজন জাপানী ভদ্রলোক বনে গেলেন। তারপর তয়ামাকে নয়, তয়ামাকে সহজেই পুলিশ চিনে ফেলতে পারে, তাঁর বন্ধু মিয়াগাওয়া তখন তয়ামার বাড়ীতে এসেছিলেন, তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে

অধ্যাপক তেরাও-এর বাড়ীর বাগানে এলেন। তার একটু পরই বাড়ীর সদর দিয়েই বেরিয়ে এলেন দুটি জাপানী ভদ্রলোক, সঙ্গে অধ্যাপক তেরাও এবং মিয়াগাওয়া। অভিবাদন প্রত্যভিবাদনের পালা শেষ করে বিদায় নিয়ে স্মিতহাস্যে ভদ্রলোক দুজন মোটরে উঠলেন, অধ্যাপকের ইঙ্গিতে মোটরখানা গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তার ওপর অপেক্ষমান সশস্ত্র পুলিশ ও পুলিশী যানবাহনের পাশ কাটিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। গিয়ে থামল 'নাকামুরায়া'-র মালিক সোমার বাড়ীতে।

এদিকে সন্ধ্যা নামবার পরই পুলিশ সদলবলে হানা দিল তয়ামার বাড়ীতে।

তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না হেরম্ব আর রাসবিহারীকে।

কিছুদিন পর হেরম্ব গুপ্ত আমেরিকা চলে গেলেন।

রাসবিহারীকে লুকিয়ে রাখবার জন্য বার বার বাড়ী বদলানো হল। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল। আর বুঝি তাঁকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করা যায় না।

তয়ামা তখন সোমাকে পরামর্শ দিলেন তাঁর বড় মেয়ে তোসিকোর সঙ্গে রাসবিহারীর বিয়ে দিয়ে দেবার জন্য।

সোমা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়ে রাজী হল, ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে ওঁদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময়ও কিন্তু রাসবিহারী ফেরারী। গোপনে অনুষ্ঠান সমাধা করতে হল।

ঠিক পাঁচ বৎসর পর ১৯২৩ সালের ২ জুলাই জাপ গভর্ণমেন্ট রাসবিহারীকে জাপানের পূর্ণ নাগরিক বলে ঘোষণা করলেন।

ভারতে ও জাপানে তাঁর মোট নয় বৎসরের ফেরারী জীবনের অবসান হল।

কিন্তু সুদূরে জাপানে থেকেও কি মহাবিপ্লবী ভুলতে পেরেছিলেন জননী জন্মভূমির কথা?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র যখন বৃটিশ গভর্ণমেন্টের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে ভারত ত্যাগ করে বার্লিনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর পর, ১৯৪২ সালে আবার সুরু হল তাঁর কর্মকাণ্ড। গঠন করলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ, গঠন করলেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, আজাদ হিন্দ ফৌজ।

রেডিও-টেলিফোন যোগে সাদর আহ্বান জানালেন সুভাষকে।

সুভাষ চলে এলেন সাবমেরিন যোগে।

তারপর ১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা ময়দানে সেই অবিস্মরণীয় লক্ষ লোকের জনসভা। সুভাষকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে আবেগকম্পিত স্বরে মহানায়ক রাসবিহারী বললেন, Friends and Comrades-in-Arms ! You might now ask me what did I do in Tokyo for your cause ; what present I have brought for you. Well, I have brought for you this present—Srijut Subhas Chandra Bose needs no introduction to you, India or to the world. He symbolises all that is best, noblest the most daring and the most dynamic in the youth of India.

Indians' best is represented in him.

Friends and Comrades-in-Arms ! In your presence to-day I resign my office and appoint Subhas Chandra Bose as the President of the Indian Independence League in East Asia.

ইনিই আমাদের 'নেতাজী।'

রণগুরু বাঘা যতীন

নদীয়া জেলার গড়াই নদীর তীরে একটি গ্রামের নাম কয়া।

অকস্মাৎ সেই কয়া গ্রামের প্রান্তে জঙ্গলে এক বাঘের প্রাদুর্ভাব ঘটল। যে সে বাঘ নয়, যাকে বলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রায়ই আসে কয়ায়। হাস, মুরগী সাফ করে ফেলল দেখতে দেখতে, তারপর সুরু করল ছাগল, মাঝে মাঝে গরু কখনো কখনো মানুষের ওপরেও হামলা সুরু করল। ভয়ে তটস্থ গাঁয়ের মানুষ। শুধু রাতের অন্ধকারেই চোরের মত নয়, রয়েল বেঙ্গলকে রাশভারী রাজার মতই দিনের বেলাতেও দেখা যেতে লাগল এখানে ওখানে সেখানে। সুযোগ বুঝলেই ঝাঁপিয়ে পড়বার মতলব! বৌ-ঝিরা আর নদীতে যায় না, পুরুষেরা যায় না ক্ষেত-খামারে, হাটে বাজারে। সারা কয়া গ্রামের নিরুপদ্রব শান্তিময় জীবন ভয় ও আতঙ্কে যেন স্তব্ধ হতে চলল।

কিন্তু এমনিভাবে থাকলেই কি চলবে? একটা বিহিত কিছু করতে হবে না?

মাতব্বরদের বৈঠক বসল, অনেক আলোচনা হল, বিতর্ক হ'ল, কিন্তু বিহিত কেউ বাতলাতে পারল না। অবশেষে গ্রামের লোক মরিয়া হয়ে একদিন দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল লাঠি, সড়কি, হাত দা আর একটা বন্দুক নিয়ে! কেনেস্তারা পিটিয়ে হল্লা করতে করতে জঙ্গল পেটাতে লাগল যদি ওটাকে নদীতে নামানো যায়। ওপারে উঠে যেখানে ইচ্ছে যাকগে, আমাদের কয়া গ্রাম ত রক্ষা পাবে।

গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার চাটুজ্জেদের ভাগনে যতীন এসব খবর কিছুই জানত না। চাকরি করে কলকাতায়, গভর্ণমেণ্টের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারীর ষ্টেনোগ্রাফার। ছুটিতে মামার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গায়ের রং, গাঁয়ের মানুষ হাঁ করে চেয়ে দেখে। পথে বেড়াচ্ছিল যতীন; হঠাৎ হল্লা শুনে থমকে দাঁড়াল, ওদিক থেকেই ছুটে আসছিল একটা লোক, তাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি হে? ওদিকে হল্লা কিসের? তুমিও বা ছুটছ কেন?

হাঁফাতে হাঁফতে বলল সে, গাঁয়ের লোক বাঘ মারতে বেরিয়েছে বাবু। তাড়া খেয়ে ওটা এদিকেই আসছে, ওদিকে যেওনাকো, পালাও, পালাও—

বলতে বলতে সে আবার লম্বা দৌড় দিল। আর যতীন দ্রুত পায়ে সেই 'ওদিকেই' গেল। একেবারে খালি হাত নয়, একখানা ছোট সাইজের ছোরা আছে সঙ্গে, কোমরে।

সত্যিই তাড়া খাওয়া ক্রুদ্ধ বাঘটা এদিকেই আসছিল। রাস্তা অতিক্রম করবার সময় অকস্মাৎ যতীনকে দেখতে পেয়ে তারই ওপর লাফিয়ে পড়ল।

ব্যস, সুরু হয়ে গেল বাঘে-মানুষে লড়াই। একদিকে কালান্তকের মত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আরেক দিকে সামান্য ছোরা হাতে ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবান চাটুজ্জেদের ভাগনে যতীন মুখোপাধ্যায়।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল যতীন। বাঘের ধারালো নখের আঘাতে দর দর করে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নিল সে, বার করল ছোরা, অবিরাম চালাতে লাগল। গর্জন করতে করতে খাড়া হয়ে উঠছে বাঘ, নখের আঘাতে আঘাতে খোবলাচ্ছে যতীনের গায়ের মাংস, পুরো মাথাটাই মুখে পুরে ফেলবার জন্য বার বার চেষ্টা করছে আর যতীন বাঁ হাতে ওকে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলে রেখে ডান হাতে চালাচ্ছে ছোরা ওর চোখে, মুখে গলায়, বুকে। ফিনকি দিয়ে ছুটছে রক্ত বাঘের মানুষের। গুলী করা যাচ্ছে না, যদি যতীনের গায়ে লেগে যায়। লাঠি চালানো যাচ্ছে না, যদি যতীনেরই মাথায় পড়ে! অসহায় গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলো সেই জীবন-মরণ সংগ্রাম।

কিছুক্ষণ পর দুজনেই নিষ্পন্দ হয়ে রক্ত স্রোতের মধ্যে সটান লুটিয়ে পড়ল।

ছুটে এল সবাই, সবিস্ময়ে দেখলে, মারাত্মকভাবে আহত হলেও যতীন ঐ একখানা ছোরা দিয়েই খতম করে দিয়েছে বাঘটাকে, যার নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

১৯০৬ সালের সেই দিনটি থেকেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পেলেন নতুন নাম, বাঘা যতীন!

বাঘা যতীন।

বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীর রণগুরু শহীদ বাঘা যতীনের নাম রক্তাক্ষরে লেখা আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পাদস্পর্শে ধন্য বীরেশ্বর বিবেকানন্দের সস্নেহ আশীর্বাদে কৃতার্থ শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরির মন্ত্রশিষ্য যতীন্দ্রনাথ। ১৯০৩ সালে তেইশ বৎসর বয়সে কলকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রীটে যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণের গৃহে জীবনে প্রথম

আলাপ হয় অরবিন্দ ও যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানে যাঁকে বলা হয় বাংলায় বিপ্লববাদের ব্রহ্মা, পরে যিনি সন্ন্যাসী হয়ে নতুন নাম গ্রহণ করেন, নিরালম্ব স্বামী। তাঁরাই যতীনকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দেন। যাতায়াত সুরু করেন ভগ্নী নিবেদিতার ৭নং, বোসপাড়া লেনের গৃহে।

হ্যাঁ, সে যুগে বিপ্লবী দলে যোগদান করতে হলে রীতিমত দীক্ষা গ্রহণ করতে হত আর সেই দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত পবিত্র কর্ম। যে হাতে একদিন বোমা ছুঁড়তে হবে, যে হাত দিয়ে টানতে হবে রিভলভারে ট্রিগার, যে হাতে একদিন ঝলসে উঠবে তীক্ষ্মধার ছুরিকা, স্বাধীনতার শত্রুনিধনে নিয়োজিত সেই হাতের মালিককে সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে নিজেকে দীক্ষা গ্রহণের যোগ্য করে তুলতে হত! অন্ততঃ কিছু অনুকূল মৌলিক উপাদানের সন্ধান পেলেই দীক্ষাগুরুর অনুগামীরা নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা সেই উপাদানগুলিকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলার দুরূহ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতেন। পড়তে দেয়া হত শ্রীমৎ ভগবদগীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, বিবেকানন্দ-বাণী। ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে করতে হত প্রার্থনা, ধ্যান, প্রাণায়াম ও ব্যায়াম। বাবা মা ভাই বোন পরিবৃত সংসারে বাস করেও ব্রহ্মচারীর মত গ্রহণ করতে হত সাত্ত্বিক আহার, শয়ন করতে হত ভূমি-শয্যায়, সর্বদা কৌপিন এঁটে যেন সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে হত।

যোগ্যতা অর্জনের পর তাকে নিয়ে যাওয়া হত দীক্ষাগুরুর সমীপে। এ যেন মন্দিরে দেবতা দর্শনে যাবার আহ্বান। অনাঘ্রাত ফুলের মত পবিত্র মন শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিগলিত অন্তর, সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার আকুতিতে উদ্বেলিত হৃদয় যেন কোন পূজারী চলেছে আত্মনিবেদনের নৈবেদ্য সাজিয়ে। দীক্ষাগুরুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ এসে গেছে। না, কোনো দিনের আলোয় নয়, ড্রয়িং রুমে ঘূর্ণ্যমান পাখার নীচে গদি-আঁটা সোফায় বসে টাকা-আনা-পাই দেয়া-নেয়ার দর কষাকষি নয়। নিয়ে যাওয়া হত হয়ত কোন গভীর রাত্রে লোকালয় থেকে দূরে কোন গহন অরণ্যে। হয়ত সেদিন কালীপূজার রাত, বিশ্ব চরাচর অন্ধকারে নিমগ্ন, আকাশের তারাগুলি ভয়ার্ত চোখে পিট পিট করছে, শনশন করে বইছে হিমেল বাতাস, টপ টপ করে ঝরে পড়ছে গাছের পাতা। হয়ত এমনি কোনো এক ঘোর অমাবস্যা রজনীতে মহা শক্তিস্বরূপিনী কালীমাতার মন্দির চত্বরে দেবীর করধৃত খড়্গনিঃসৃত রক্তের তিলক ললাটে এঁকে দিয়ে বিপ্লব-গুরু উচ্চারণ করতেন আত্মবিলোপনের সেই অমৃত মন্ত্র, ভুলিও না জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন বলি প্রদত্ত।

বিপ্লববাদের আদি যুগে ঠিক এমনি ধরণের ভাবগম্ভীর পরিবেশেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেয়া হত।

১৯০৮ সালে চাঞ্চল্যকর আলীপুর বোমার মামলা সম্পর্কে পুলিশ কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করে নি। গ্রেপ্তার করেছিল ১৯১০ সালের ২৭ জানুয়ারী। আলীপুর বোমার মামলার প্রধান তদন্তকারী অফিসার ছিল পুলিশের ডেপুটি সুপার সামসুল আলম। তাতেই সে বিপ্লবীদের চোখে পড়ে যায় এবং তাদের কালো খাতায় আলমের নাম ওঠে। আলমকে খতম করবার পরিকল্পনা করেন বাঘা যতীন এবং ভার দেন উনিশ বৎসরের কিশোর বিপ্লবী বীরেন দত্ত গুপ্তের ওপর। ১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারী হাইকোর্টের কাজ সেরে আলম বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটায় যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে যাচ্ছিল, সেই সময় বীরেন তাকে গুলি করে। এক গুলিতেই তৎক্ষণাৎ আলমের মৃত্যু হয়। বীরেন অবশ্য ঐখানেই ধরা পড়ে যায়। তার কাছে পাওয়া যায় রিভলভার ও ছোরা। বিচারে তার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারী তার ফাঁসী হয়।

২৭ জানুয়ারী সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেই পুলিশ প্রথম গ্রেপ্তার করল বাঘা যতীনকে। কিন্তু গ্রেপ্তারের পরেই বুঝতে পারল, এ মামলা টিকবে না। তাই তিন দিন রেখেই তাঁকে ছেড়ে দেয়া হল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার গ্রেপ্তার করা হল হাওড়া গ্যাং কেসে। রাখা হল আলীপুর জেলে। ওখানে এই গ্যাং কেসের অনেক আসামী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। উত্তর কালের মানবেন্দ্রনাথ রায়। সংক্ষেপে এম. এন. রায়। নরেনের সঙ্গে পরিচয় হল বাঘা যতীনের, নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

এই গ্যাং কেসও টিকল না। মুক্তি পেলেন বাঘা যতীন। তবে এবার সরকারী চাকরীটি গেল।

ধীরে ধীরে পরিচয় হতে লাগল বিপ্লবীদের সঙ্গে। পরিচয় হল হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের ওয়াই. এম. সি. এ. বিল্ডিং-এ তখন ছিল একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শ্রমজীবি সমবায়। স্বদেশী দ্রব্যের দোকান হলেও এই শ্রমজীবি সমবায় ছিল সে যুগের 'স্বদেশী' যুবকদের অন্যতম প্রধান মিলন কেন্দ্র। বাঘা যতীন সেখানে যাতায়াত সুরু

করলেন। পরিচিত হলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এবং আরও একজনের সঙ্গে, তাঁর নাম রাসবিহারী বসু।

১৯১৩ সালের শেষ দিকে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে তিন বন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। অমরেন্দ্র, বাঘা যতীন ও রাসবিহারী। রাসবিহারী সমগ্র ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্ল্যান ও ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টের ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছেন, হাতিয়ার নিয়ে তারা এখন শুধু সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে। বাঘা যতীনের ওপর রাসবিহারী বাংলা দেশের নেতৃত্বের ভার দিলেন।

১৯১৪ সালের আগস্টে সুরু হয়ে গেল বিশ্বযুদ্ধ।

এই সুবর্ণ সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল বিপ্লবীরা। জীবন-মরণ সংগ্রামে ইংলণ্ড যখন ইয়োরোপে ব্যতিব্যস্ত থাকবে, ভারতের গোরা সেনাদের টেনে নিয়ে যাবে বাইরের রণাঙ্গনে, ঠিক সেই সময় ভারতের ব্যারাকে ব্যারাকে জ্বলে উঠবে বিদ্রোহের আগুন, ভারতীয় সেনা দখল করে বসবে অস্ত্রাগার, গোলাবারুদখানা, রেলওয়ে। দিল্লীর লালকেল্লা শীর্ষে উড়বে ভারতের বিজয় বৈজয়ন্তী। দিনও স্থির হয়ে গেল, ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী।

কিন্তু হায়, কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল।

১৯০৮ সালের ২৯ নভেম্বর নদীয়া জেলার রায়তা গ্রামে বিপ্লবীরা ডাকাতি করে সংগ্রহ করে ১৯১৫ টাকা। এই ডাকাতিতে যোগদান করেন বাঘা যতীন, মন্মথ ভৌমিক, যতীন রায়, বিনয় রায় ও আরও কজন। ১৯১৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী বাঘা যতীনেব সংগঠনের নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গার্ডেনরীচে ডাকাতি করে বার্ড কোম্পানীর আঠারো হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়। নরেনের সঙ্গে ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নরেন দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, অতুল ঘোষ ও আরো কয়েকজন। পরদিন শ্যামবাজারে পাঁচ রাস্তার মোড়ে অকস্মাৎ পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ইনসপেক্টর সুরেশ মুখার্জী নরেন ভট্টাচার্যকে দেখতে পেয়ে ঝপ করে গ্রেপ্তার করে ফেলে।

কিন্তু তারপরেও বাঘা যতীনের সংগঠনে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ চলতে লাগল। ২২ ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটার একটি চালের আড়তে হানা দেন আবার সেই চিত্তপ্রিয়, নরেন, মনোরঞ্জন, ফণী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

২৪ ফেব্রুয়ারী যে ঘটনাটি ঘটে, তার ফল হয় সুদূর প্রসারী।

পর পর স্বদেশী ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশের ঘোরতর সন্দেহ হয় যে, এ সবগুলোর মূলে আছে একই ব্যক্তি, যার নাম যতীন মুখোপাধ্যায়, তাকে

গ্রেপ্তার করলেই স্বদেশী দলটা অনেকটা থিতিয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ ছুটল বাঘা যতীনের সন্ধানে। কিন্তু পাওয়া গেল না। খানে ওখানে, সম্ভব-অসম্ভব, সমস্ত জায়গায় পুলিশ হানা দিতে লাগল, গুপ্তচরে গুপ্তচরে সারা কলকাতা শহর ছেয়ে ফেলা হল। কিন্তু বৃথা, বাঘা যতীনের হদিস পাওয়া গেল না।

গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য বাঘা যতীনও বার বার আস্তানা বদলাচ্ছেন। ছায়ার মত যে কটি ছেলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তাদেরই একজন সেই চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। ১৯১৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ৭৩ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের বাড়ীখানা ভাড়া করা হল ফণিভূষণ রায়ের নামে। ফণিভূষণ কাল্পনিক নাম। ওখানে এসে উঠলেন বাঘা যতীন ও তাঁর কজন সহকর্মি।

পুলিশের ঝানু গুপ্তচর নীরদ হালদার কি করে যেন বাড়ীটার খবর পেয়ে গেল। যেন পরিচিত বন্ধু কেউ ও-বাড়ীতে এসেছে এবং তারই কাছে সে এসেছে, এমনি ভাব দেখিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারী নীরদ হালদার সোজা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল এবং সোজা দোতলায় গিয়ে দেখে, একটা ঘরে মাদুর পেতে বসে আছেন বাঘা যতীন ও আরও ক'জন যুবক।

মৃদু হেসে বলে উঠল নীরদ হালদার, আরেঃ, যতীনবাবু দেখছি যে—

তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এল চিত্তপ্রিয়, সেই চিত্তপ্রিয়, চকিতে বার করল রিভলবার।

দেখেই পেছন ফিরে সিঁড়ির দিকে দৌড়তে গেল নীরদ হালদার, পারল না, চিত্তপ্রিয়ের রিভলবার গর্জে উঠল, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে কিন্তু ঝানু গুপ্তচর বলে গেল, আমায় গুলী করেছে যতীন মুখোপাধ্যায়।

নির্দিষ্ট অভিযোগ। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে গেল যতীন মুখোপাধ্যায়ের নামে। চিত্তপ্রিয়ের নামে। পুরস্কার ঘোষণা করা হল, 'ধরাইয়া দিতে পারিলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

সুরু হল বাঘা যতীনের রীতিমত ফেরারী জীবন।

কিন্তু ফেরারী হয়ে থাকা ও চলাফেরা করা তাঁর পক্ষে এক বিষম কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। যেমন স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল দেহ, তেমনি তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ। সাধারণের মধ্যে মিশিয়ে দিলেও কখনও কি লুকিয়ে রাখা সম্ভব এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষসিংহকে? লক্ষ লোকের সমাবেশে যেমন সবার আগে চোখে পড়বেন, তেমনি সে চোখ আর ফেরানো যাবে না। যেখানেই যাবেন তিনি, সেখানেই যেন চুম্বকের টানে এগিয়ে আসবে সবাই, কৌতূহল জাগবে, কে এই গৌরবর্ণ শক্তিমান ব্যক্তিটি? তারপর ভোলা গিরি মহারাজের

শিষ্য তিনি, কণ্ঠে সর্বক্ষণ দোদুল্যমান রুদ্রাক্ষের মালা। চিনে ফেলবার পক্ষে সেটিও একটি সহজ নিশানা।

আত্মগোপনে ভীষণ আপত্তি রণগুরুর। তিনি চান কাজ, কাজ, শুধু এ্যাকশন, লুকিয়ে লুকিয়ে চোরাগোপ্তা আক্রমণ নয়, চান প্রকাশ্য দিবালোকে মুখোমুখি সংঘর্ষ। একদা সামান্য একখানা ছোরা হাতে যিনি তীক্ষ্নদংষ্ট্রা ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হয়েছিলেন দিনের আলোয়, আজ রিভলবার হাতে বৃটিশ লায়নের সম্মুখীন হতে তাঁর অণুমাত্র দ্বিধা নেই।

বন্ধু বিপ্লবীরা অনেক কষ্টে তাঁকে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন।

ওদিকে, ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে চতুরকুলচূড়ামণি রাসবিহারীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা যখন বানচাল হয়ে গেল, তিনি উপলব্ধি করলেন যে, বিশ্বযুদ্ধ চলতে থাকাকালেই ইংরেজের শত্রুপক্ষীয় কোন শক্তির অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য না নিয়ে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। এ দিকে মার্চ মাসের শেষে কলকাতার শংকর ঘোষ লেনের একটি মেসের ছাদে বিপ্লবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসল। যোগদান করলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, নরেন ঘোষ চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও নরেন ভট্টাচার্য। এই বৈঠকেই জার্মান গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ভারতে দ্বিতীয়বার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন নরেন ভট্টাচার্য। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টাতেও বাংলার নেতৃত্ব দেওয়া হয় বাঘা যতীনকে।

বিপ্লবী বন্ধুরা অনেক কষ্টে তাঁকে রাজী করালেন কলকাতার বাইরে যেতে। তিনি সর্ত দিলেন, বিপিন গাঙ্গুলী ও অন্যদের নিরাপদ স্থান স্থির না হওয়া পর্যন্ত এক পা-ও নড়বেন না তিনি কলকাতা থেকে।

তাই করা হল। বিপিন গাঙ্গুলী, চিত্তপ্রিয় এবং আরও ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে এসে উঠলেন হাওড়া জেলার বাগনান হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতুল প্রসাদ সেনের বাড়ীতে।

কিছুদিন পরেই সেখানে আর নিরাপদ মনে হল না। অতুল আবার একজন জনপ্রিয় কেরিকেচারিষ্ট। তাই তাঁর বাড়ীতে বহু বাইরের লোক আসে। কে কখন এঁদের দেখে ফেলবে, বলা যায় না। সুতরাং তাঁদের সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল মেদিনীপুর জেলার গণ্ডগ্রাম মহিষাদলে। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, সেখানকার অধিবাসীরাও কৌতুহলী হয়ে উঠেছে। এরা কারা, কোথা থেকে এল, কেন এল, থাকবে ক'দিন, তারপর যাবে কোথায়, এমনি সব প্রশ্ন লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বন্ধুরা, অন্ততঃপক্ষে যতীনকে একেবারে বাংলা দেশের বাইরে সরিয়ে ফেলতে হবে, নইলে, কিছুতেই পুলিশের শ্যেন-দৃষ্টি এড়ানো যাবে না। কিন্তু মুশকিল বাঘা যতীনকে রাজী করানো। খাপখোলা তলোয়ারের মতই যিনি শাণিত ও স্পষ্ট, এ্যাম্বুশের কলাকৌশল তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে না।

তাঁকে বোঝাবার ভার নিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নরেন ভট্টাচার্য। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে তাঁকে বললে যে, কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। বার্লিনে গঠিত বার্লিন-ভারত কমিটি জার্মান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কথা বলেছেন। জার্মান গভর্ণমেন্ট অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র পাঠিয়ে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন। সমস্ত ব্যবস্থা করবেন বাটাভিয়ার জার্মান কনসাল। তাঁরা কোন বিশ্বস্ত লোককে বাটাভিয়ায় পাঠাতে বলেছেন। জার্মাণী থেকে বিপ্লবী জিতেন লাহিড়ী এই সুখবর নিয়ে এসেছেন। নরেন বললেন তিনি নিজেই যাবেন বাটাভিয়ায়। হরিকুমার চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে বাটাভিয়া থেকে যাতে জার্মানীর টাকা আসে আর আসে জাহাজ বোঝাই জার্মান অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ, যাতে সেই সব অস্ত্র বাংলা দেশের কোনো নিরাপদ গুপ্ত অঞ্চলে নামিয়ে দেয়া যায়, তিনি তার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে আসবেন।

সুতরাং নরেন ভট্টাচার্য অনুরোধ জানালেন, আর মাত্র দু-এক মাস আপনাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। কিন্তু বাংলা দেশে আর নয়। আমাদের বন্ধু ঠিকাদার মণীন্দ্র চক্রবর্তী উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের অন্তর্গত কাপ্তিপদা গ্রামে আপনার থাকবার জায়গা স্থির করেছেন, ষ্টেটের দেওয়ান রাজী হয়েছেন। নলিনী কর ইতিমধ্যে আপনাদের জন্য সেখানে চালাঘর তৈরী করেছে মণীন্দ্রের সাহায্যে।

বন্ধু ও সহকর্মিদের একান্ত অনুরোধে অবশেষে রাজী হলেন ফেরারী নায়ক।

নরেন ভট্টাচার্য আর নলিনী কর ওঁকে আর চিত্তপ্রিয়কে কাপ্তিপদায় রেখে এলেন।

বাংলার বাইরে গেলেও বাংলার সঙ্গে, কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ না থাকলে চলবে কেন? হরিকুমার চক্রবর্তী এর চমৎকার ব্যবস্থা করলেন। কাপ্তিপদা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে বালাশোর শহর। সেই শহরে একটি দোকান খোলা হল, ইউনিভারিস্যাল এম্পোরিয়াম। দোকানের ভার দিলেন হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স-এর শ্যামসুন্দর বসুর ভাই শৈলেশ্বরের ওপর। প্রধানতঃ

সাইকেলের দোকান তারপর কলকাতার শ্রমজীবি সমবায়ের স্বদেশী মালপত্রও ওখানে বিক্রীর জন্য মজুত থাকবে।

এই এম্পোরিয়ামের মাধ্যমে বাঘা যতীন কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন।

ফেরারী মনোরঞ্জন সেন আর নীরেন দাশগুপ্ত কাপ্তিপদায় এলেন এপ্রিলে; তারপর এলেন জ্যোতিষ পাল আগষ্ট মাসে।

এদিকে সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে নরেন ভট্টাচার্য বাঘা যতীনের অনুমতি নিয়ে সি. এ. মার্টিন ছদ্মনামে মাদ্রাজ থেকে জাহাজে বাটাভিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

১২ মে রাসবিহারী পি. এন. টাগোর ছদ্মনামে সানুকি মারু জাহাজে জাপান যাত্রা করলেন এবং নিরাপদে জাপানে পৌঁছিলেন ৫ জুন।

ব্যাংকক ও বাটাভিয়ায় গিয়ে নরেন ভট্টাচার্য জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করে কথা কয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন। তারপর সুসংবাদ নিয়ে ১৫ জুন মাদ্রাজে এসে নামলেন। ঐ দিন কলকাতায় ৬২ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীটে যাদুগোপালের কাছে টেলিগ্রাম করলেন; 'এখানে এসে পৌঁছেছি। বালাশোর যাচ্ছি। সেখানে একজনের সঙ্গে দেখা হবে।—হোয়াইট।' তারপর কাপ্তিপদায় গেলেন বাঘা যতীনকে জানালেন যে, বাটাভিয়া থেকে জার্মান অর্থ আসছে হ্যারী এ্যান্ড সন্স-এর নামে আর সাভেরিক জাহাজ বোঝাই হয়ে আসছে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি। ওরা জাহাজ ভেড়াবে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে রায়মঙ্গল গ্রামে।

বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে সাজো সাজো রব পড়ে গেল।

অর্থ আসছে, অস্ত্র আসছে। ভারতে আছে মাত্র বারো হাজার ইংরেজ সৈন্য, আর সবই চলে গেছে ইয়োরোপীয় রণাঙ্গণে ঘর সামলাতে। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে আগেই বারুদখানা তৈরী করে গেছেন রাসবিহারী, এবার সেই বারুদখানায় আগুন লাগাবার শুভ মুহূর্ত আসন্ন। একই দিনে একই সময়ে সমগ্র ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। জার্মান অস্ত্রে সজ্জিত বিপ্লবীরা বেরিয়ে পড়বে শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে। পরাধীনতার শৃংখল চূর্ণবিচূর্ণ করে না ফেলা পর্যন্ত আমাদের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

কিন্তু হায়, জুলাই মাসে মারাত্মক দুঃসংবাদ পাওয়া গেল।

প্ল্যানমত ঠিকই জার্মান ফরেন সার্ভিসের নির্দেশে জার্মান এজেন্টরা আমেরিকা থেকে এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ কিনেছিল এবং ঘোষণা করেছিল জাহাজখানা যাবে মেক্সিকোর কোন বন্দরে। আসল উদ্দেশ্য,

জাহাজের মাল ভারতে পাঠানো। প্ল্যানমত ঠিকই এই অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই এ্যানি লার্সেন জাহাজখানা মেক্সিকোর সোকোরো দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

প্ল্যান ছিল, সাভেরিক নামে আর একখানি জাহাজ আগে থেকেই ঐ দ্বীপে অপেক্ষা করবে। এ্যানি লার্সেন ওখানে পৌঁছিলে তার মালপত্র স্থানান্তরিত করা হবে সাভেরিকে। সাভেরিক বাটাভিয়া অভিমুখে যাত্রা করবে আনজের হয়ে। ঐ আনজেরেই আসবে একটি ছোট পাইলট জাহাজ, সেই জাহাজটি পথ দেখিয়ে সাভেরিককে নিয়ে আসবে ভারতের উপকূলে পূর্বনির্দিষ্ট সেই জঙ্গলাকীর্ণ গুপ্ত স্থানে, রায়মঙ্গলে। সেখানে মালগুলি নামিয়ে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা থাকবে।

এ্যানি লার্সেন সোকোরো দ্বীপে পৌঁছে দেখল, সাভেরিক তখনও আসেনি। হয়ত দু-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে, এই আশায় এ্যানি লার্সেন সোকোরোতে অপেক্ষা করাই স্থির করল।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। সাভেরিকের দেখা নেই।

গেল আর এক সপ্তাহ। সাভেরিক এল না।

চরম ঝুঁকি নিয়ে আরও এক সপ্তাহ দেখল এ্যানি লার্সেন, তবু সাভেরিক এল না।

এদিকে নাবিকদের খাবার ফুরিয়ে এসেছে ফুরিয়ে এসেছে পানীয় মিঠে জল। এ অবস্থায় কি করা যাবে স্থির করতে না পেরে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করতে লাগল এ্যানি লার্সেন, যদিই বা দিগন্তে ফুটে ওঠে সাভেরিকের মাস্তুল-শীর্ষটি।

এ্যানি উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে দেখে সন্দেহ হল মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের। আটক করা হল এ্যানি লার্সেনকে।

ওদিকে সাভেরিক জাহাজ লস এ্যাঞ্জেলেসের কাছে স্যান পেড্রো থেকে যাত্রা করল ২৩ এপ্রিল আর এ্যানি লার্সেন যাত্রা করেছিল ৬ মার্চ। সোকোরো দ্বীপে পৌঁছে খবর পেল যে, তেরো দিন আগে এ্যানি লার্সেন কোন দিকে চলে গেছে।

তবু মাসখানেক অপেক্ষা করল সাভেরিক এ্যানি লার্সেনের আসার আশায়। তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে যাত্রা করল জাভা অভিমুখে। ২০ জুলাই জাভা এসে পৌঁছতেই ওলন্দাজ যুদ্ধ জাহাজ সাভেরিককে আটক করল।

অর্থাৎ যে জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আসছিল, সেখানা আটক করল মার্কিন গভর্ণমেণ্ট এবং যে জাহাজ গিয়েছিল সেই অস্ত্রশস্ত্র ভারতে নিয়ে আসতে,

সেখানা আটক করল ওলন্দাজ গভর্ণমেন্ট। একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ না হওয়ায় নরেন ভট্টাচার্যের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল।

ব্যর্থ হয়ে গেল ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বিতীয় বার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা।

পুলিশ টের পেয়ে গেল।

পুলিশ তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে উঠল।

অকস্মাৎ হানা দিল হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স নামীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ৪১ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অফিসে ৭ আগষ্ট। গ্রেপ্তার করল হরিকুমার চক্রবর্তীকে, তার ভাই মাখনলাল চক্রবর্তীকে আর আফিস কর্মি শ্যামসুন্দর বসুকে। বাটাভিয়া থেকে ফিরে এসে ১৫ জুন মাদ্রাজ থেকে নরেন যাদুগোপালকে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন, সেখানা ওখানে পেয়ে গেল পুলিশ। বুঝতে দেরী হল না যে, বালাশোরের ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়ামের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে হ্যারী এ্যাণ্ড সন্সের।

৫ সেপ্টেম্বর হানা দিল পুলিশ বালাশোরের ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়ামে। গ্রেপ্তার করল শৈলেশ্বর বসুকে। তল্লাসী করে সন্দেহজনক একখানা চিঠি পাওয়া গেল গোপালবাবু নামে একজনের লেখা। শৈলেশ্বরকে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন ও চিঠি আমার নয়, কার জানি না।

স্থানীয় অধিবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করল পুলিশ। জানতে পারল যে, গোপাল বাবু ঐ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। তাঁর স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত গৌরবর্ণ চেহারা দেখবার মত। সবাই জানে উনি শৈলেশ্বরের বন্ধু। মাঝে মাঝে আসেন, শৈলেশ্বর বাবুর ওখানেই দু একদিন থাকেন, তারপর চলে যান।

কোথায় থাকেন গোপাল বাবু?

ওরা জবাব দিল, মাইল পঁয়ত্রিশেক দূরে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পাহাড়ী অঞ্চলে কাপ্তিপদা গ্রামে।

পরদিন পুলিশ ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে গেল। দেওয়ানকে জিজ্ঞেস করল। দেওয়ান স্বীকার করলেন যে, গত মার্চ মাস থেকে গোপালবাবু নামে এক ভদ্রলোক কাপ্তিপদায় আছেন, সঙ্গে বোধ হয় আরও কজন।

কোন্ বাড়ীটা?

দেওয়ান প্রায় মাইলখানেক দূরে কয়েকটি চালা ঘর দেখিয়ে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ পুলিশের হেড কোয়ার্টার্সে খবর গেল। বাংলা পুলিশ ও উড়িষ্যা পুলিশের হেড কোয়ার্টার্সে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বাঘা বাঘা

অফিসাররা যুগ্মভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনা করবার জন্য রণসাজে সজ্জিত হয়ে এল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের ডি. আই. জি. ডেনহ্যাম, বিহার ও উড়িষ্যা পুলিশের ডি. আই. জি. রাইনল্যাণ্ড, বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি, সহকারী পুলিশ সুপার বার্ড, সার্জেণ্ট রাদারফোর্ড আর কলকাতার স্বনামধন্য পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। সঙ্গে শতাধিক অস্ত্রধারী সৈন্য।

ইয়োরোপে চলছে তখন বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব, ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের একটি গণ্ডগ্রামেও প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠল একটি মুখোমুখি সংগ্রাম! ইংরেজ বাহিনী এগিয়ে চলল।

তারপর?

তারপর অবিস্মরণীয় সেই ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।

একদিকে আধুনিক নানাবিধ মারণাস্ত্রে সজ্জিত একটি রেগুলার সেনাবাহিনী ও তাদের সেনাপতির দল, আর অন্য দিকে রিভলভার হাতে চারটি কিশোর বিপ্লবী আর তাদের কমান্ডার। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, জ্যোতিষ পাল আর তাদের দাদা, বাংলার বিপ্লবীদের রণগুরু বাঘা যতীন। ১৯০৬ সালে কয়া গ্রামের পথে হয়েছিল একটি বাঘ ও একটি মানুষের লড়াই। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বুড়ী বালামের তীরে সুরু হল শত শত বৃটিশ লায়ন আর মাত্র পাঁচটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দুর্ধর্ষ সংগ্রাম!

সিংহ ও ব্যাঘ্রের আমৃত্যু লড়াই!

সে লড়াইয়ের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন, সেই অমর কাহিনী রক্তের অক্ষরে লেখা আছে প্রতিটি দেশহিতৈষীর অন্তরের অন্তস্থলে।

ফলাফল?

ইংরেজ স্থলদৃষ্টিতে সেই যুদ্ধে ফলাফল দেখেছিল, চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলে নিহত, সাংঘাতিক আহত যতীন পরদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ফাঁসী হয় মনোরঞ্জন ও নীরেনের আর জ্যোতিষের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু আমরা জানি, সেই ১৯১৫ সালে বাংলার বিপ্লবীদের রণগুরু বাঘা যতীন যে মুখোমুখি সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, সেই সংগ্রামই চলেছিল চট্টগ্রামে, জালালাবাদে, কালারপোলে, চন্দননগরে, ধলঘাটে, পাহাড়তলীতে, ঢাকায়, মেদিনীপুরে, রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এবং—

এবং কোহিমায়, যখন সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ ১৯৪৪ সালের ৪ জুলাই জলদগম্ভীর স্বরে আহ্বান জানিয়েছিলেন, Friends! My

Comrades in the war of Liberation ! To day I demand of you one thing, above all. I demand of you blood. It is blood alone that can avange the blood that the enemy has split. It is blood alone that can pay the price of freedom. Give me blood and I promise you freedom.

ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন মানবেন্দ্রনাথ

প্রথম নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার ক্ষুদ্র গ্রাম আড়বেড়িয়া, জন্ম তারিখ ১৮৮৭ সালের ২২ মার্চ।

দ্বিতীয় নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়, জন্মস্থান আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, জন্ম তারিখ ১৯১৬ সালের জুন মাস।

প্রথম নাম রেখেছিলেন বাবা মা, দ্বিতীয় নাম রাখলেন নিজেই ২৯ বৎসর বয়সে।

প্রথম নামটি যখন রাখা হয়, তখন তিনি গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের আদরের শিশু, তারপর বালক, তারপর কিশোর, ১৯০৬ সালে ১৯ বৎসর বয়সে এনট্রান্স পাশ করে যাদবপুরের বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হলেন। দ্বিতীয় নামটি যখন গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী, ফেরারী, তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বাহিনী। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন মানবেন্দ্রনাথ রায়, সংক্ষেপে এম. এন. রায়, আরও সংক্ষেপে শুধু রায়।

আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক রাজনীতি ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় নাম এম. এন. রায়।

দীর্ঘ ফেরারী জীবনে কত ছদ্মনাম ছিল তাঁর। কখনো সি. এ. মার্টিন কখনো উইলিয়াম আর্থার পাইন, কখনো হোয়াইট, কখনো ইতালীয় নাম রবার্টো এ্যালেনী ভিল্লা গ্রাসিয়া, কখনো কণ্ঠে ক্রশ-দোলানো পাদ্রী ফাদার মার্টিন, কখনো পাঞ্জাবী নাম হরি সিং, কখনো আবার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ডঃ ব্যানার্জী। ১৯৩১ সালের ২৭ জুন বোম্বাই শহরের একটি অভিজাত হোটেল থেকে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে, তখন হোটেলের রেজিষ্টারে তাঁর নাম পাওয়া যায় ডঃ মামুদ।

ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ এই অন্যতম প্রথম সারির বিপ্লবী কি করে ও কিভাবে ফেরারী অবস্থায় নানা ছদ্মনামে দুনিয়ার তাবৎ ধুরন্ধর গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে ভারত থেকে বাটাভিয়া, তারপর ব্যাংকক, সাংহাই, জাপান, কোরিয়া ও চীন হয়ে মেক্সিকো, আমেরিকার নানা শহরে এবং জার্মানী ও রাশিয়ায় কর্মব্যস্ততায় বিদ্যুৎ-সফর করে বেরিয়েছেন, সেই দীর্ঘ কাহিনী পাঠ করলে হতবাক হয়ে যেতে হয়। ১৯৩০ সালে ফেরারী মানবেন্দ্রনাথ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে

গিয়ে নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এলেন, অথচ পুলিশ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

ফেরারী হয়ে শুধু গ্রেপ্তার এড়াতেই ব্যস্ত থাকতেন না, কাজ করেছেন। কাজ করেছেন সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গে, লেনিনের সঙ্গে, ট্রটস্কির সঙ্গে, স্ট্যালিনের সঙ্গে, কাজ করেছেন প্রচণ্ডভাবে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, কাজ করেছেন ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন।

এই জন্ম-বিপ্লবীর প্রয়াস যদি সফল হত, তাহলে শুধু যে ভারত থেকে অনেক, অনেক আগেই ইংরেজকে পাততাড়ি গুটিয়ে সাত সমুদ্র সাঁতরে পালাতে হত, তাই নয়, সারা দুনিয়ার অত্যাচারী ধনিক গোষ্ঠীর রক্তাক্ত শাসনের মূল ভিত্তিটাই টলটলায়মান হয়ে উঠত!

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চব্বিশ পরগণার চিংড়িপোতা রেল ষ্টেশনে প্রথম স্বদেশী ডাকাতি। রেল কোম্পানীর টাকা লুণ্ঠন। ডাকাত দলের নেতা বিশ বৎসর বয়স্ক কিশোর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

১৯০৯ সালে ডায়মণ্ড হারবারের কাছে নেত্রী গ্রামে এক ধনীগৃহে ডাকাতি। যাবার সময় ডাকাতরা বলে গেল, এই টাকা ভারত থেকে ইংরেজ তাড়ানোর কাজে ব্যয় করা হবে। ডাকাত দলের নেতা নরেন ভট্টাচার্য।

আলীপুর বোমার মামলায় বেকসুর মুক্তিলাভ করলেন অরবিন্দ ১৯০৯ সালের মে মাসে। ১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারী আলিপুর বোমার মামলার সংগঠক ও পরিচালক ডেপুটি পুলিশ সুপার সামসুল আলমকে হত্যা করল বীরেন দত্ত গুপ্ত। তারপরই সুরু হল হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা অন্যান্যের সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন নরেন ও বাঘা যতীন। দুজনেই ছিলেন আলীপুর সেনট্রাল জেলে। সেখানেই তাঁদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

মামলা টিকল না, সবাই ছাড়া পেলেন।

১৯১৪ সালের ২৪ আগষ্ট। কলকাতার ছাতাওয়ালা গলির একটি পার্ক। রাত্রে সেখানে বিপ্লবীদের গোপন সভা। আলোচ্য বিষয় রডা কোম্পানীর পিস্তল চুরি। সভায় অন্যান্যের সঙ্গে নরেনের যোগদান।

ঐ বছরই অকটোবর মাসে আমেরিকা থেকে কলকাতায় এলেন কেদারেশ্বর গুহ। তখন পুরোদমে চলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতে সামান্য সংখ্যক গোরা সৈন্য রেখে বাকি সব সৈন্যকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইয়োরোপ ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে। এই তো সুবর্ণ সুযোগ। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র ছড়িয়ে দিলেন রাসবিহারী বসু ও তাঁর সহকর্মিরা।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ওরা অকস্মাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুষ্টিমেয় গোরা সৈন্যদের দিকে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরবে, দখল করবে অস্ত্রাগার, গোলা-বারুদের গুদাম, রেলওয়ে, জাহাজ জেটি, দখল করে নেবে ফোর্ট উইলিয়ম, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ঠিক পথে পরিচালনা করবার জন্য ভারতের বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পথে বেরিয়ে আসবে, এক সশস্ত্র রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হবে। কেদারেশ্বর সংবাদ দিলেন, ইংরেজের শত্রু জার্মানীতে বার্লিন কমিটি গঠিত হয়েছে, জার্মানী গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে।

কিন্তু রাসবিহারীর নির্দিষ্ট দিনে অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভব হল না এক সহকর্মির বিশ্বাসঘাতকতায়।

এর আগে কাশীতে তাঁর গোপন আশ্রয়স্থলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে নরেনও যোগদান করেছিলেন, তাঁর মারফৎ তিনি ফেরারী বাঘা যতীনকে খবর পাঠান যে, বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে।

রাসবিহারীর পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় তিনি এ ব্যাপারে বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সহযোগিতার ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে ১৯১৫ সালের ১২ মে জাহাজে জাপান চলে যান।

১৯১৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী। গার্ডেনরীচে ডাকাতি। সাউথ ইণ্ডিয়া জুট মিলের আঠারো হাজার টাকা লুণ্ঠন। ডাকাত দলের নেতা নরেন।

১৬ ফেব্রুয়ারী শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে দারোগা সুরেশ মুখার্জি কর্তৃক অকস্মাৎ নরেন গ্রেপ্তার। ১৫ মার্চ জামিনে খালাস। খালাস হয়েই ফেরারী হলেন।

২২ ফেব্রুয়ারী জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর গদিতে আবার ডাকাতি। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ বত্রিশ হাজার টাকা। ডাকাত দলে বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতির সঙ্গে আবার নরেন।

বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ সবাই তখন ফেরারী। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের কাপ্তিপদা গ্রামে তাঁদের জন্য আশ্রয়স্থল ঠিক করেন নলিনী কর ও নরেন। নরেনই ওঁদের সবাইকে গোপনে কাপ্তিপদায় রেখে আসেন মার্চ মাসে।

এই মার্চ মাসেই ইয়োরোপ থেকে এলেন জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। খবর দিলেন, জার্মান গভর্ণমেন্ট বাটাভিয়ায় জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করবার জন্য একজনকে পাঠাতে বলে দিয়েছেন, তিনিই টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার

ব্যবস্থা করবেন। অমনি কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে একটি মেসের ছাদে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসল বিপ্লবীদের। কে যাবে বাটাভিয়ায়? স্থির হল, যাবে নরেন।

এপ্রিল মাসেই রওনা হলেন নরেন সি. এ. মার্টিন ছদ্মনামে।

বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ৪১ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীটে। ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়াম নামে একটি সাইকেলের দোকান স্থাপন করেন বালাশোরে কাপ্তিপদায় ফেরারী বাঘা যতীনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার উদ্দেশ্যে। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০১।১ ক্লাইভ স্ট্রীটে স্থাপন করেন সোনুয়া স্টোন এণ্ড লাইম কোম্পানী নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। বাটাভিয়া ও ব্যাংককে নরেনের সংগঠনের ফলেই সেখানকার জার্মান কনসাল উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের নামে টাকা পাঠাতেন। লাইম কোম্পানী বাটাভিয়ায় চরিতমলের কাছে টেলিগ্রাম করত, দশ হাজার ব্যাগ চিনি পাঠাও, তার উত্তরে আসত টাকা হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স-এর নামে।

বাটাভিয়ার জার্মান কনসালের সঙ্গে আলোচনা করে নরেন ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থাও করে ফেললেন।

স্থির হল, জার্মানী আমেরিকা থেকে এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কিনে এ্যানি লার্সেন জাহাজে বোঝাই করবে। মেক্সিকো যাচ্ছে বলে রওনা হয়ে এ্যানি লার্সেন আসবে সোকোরো দ্বীপে। মেভারিক নামে আর একখানা জাহাজ আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করবে। লার্সেনের অস্ত্রশস্ত্র স্থানান্তরিত করা হবে মেভারিকে। মেভারিক যাত্রা করবে বাটাভিয়ার উদ্দেশে, পথের মাঝখানে আনজেরে একখানি পাইলট জাহাজ এসে মেভারিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ভারতের উপকূলে কোনো গোপন স্থানে। মোভারিক করাচীতে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু নরেন পরামর্শ দিলেন, ওখানে নয়, মাল খালাস করতে হবে সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিবৃত রায়মঙ্গলে।

নরেন সমস্ত ব্যবস্থা করে ১৯১৫ সালের জুন মাসে ভারতে ফিরে এলেন। কিন্তু জুলাই মাসে বিপ্লবীরা খবর পেল যে, দুটো জাহাজই ধরা পড়ে গেছে!

তাতে আদো দমলেন না ক্লান্তিহীন বিপ্লবী।

ফণী চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে ১৫ আগস্ট আবার ছুটলেন নরেন বাটাভিয়ায়, এবার তাঁর ছদ্মনাম উইলিয়াম আর্থার পাইন। বাটাভিয়ার জার্মান কনসাল

জেনারেল তাঁকে পাত্তা না দেয়ায় ফণীকে পাঠালেন সাংহাইতে। পরিকল্পনা ছিল, সেখানকার জার্মান কনসালকে দিয়ে আবার দু-জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবেন বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ ও হাতিয়া দ্বীপে।

কিন্তু ফণী গ্রেপ্তার হবার ফলে সে পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

তাতেও হতাশ হলেন না নরেন। হোয়াইট ছদ্মনামে ছুটলেন জাপানের নাগাসাকি শহরে। সান ইয়াৎ সেন তখন চীন থেকে পালিয়ে ওখানে আত্মগোপন করেছিলেন, নরেন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সান তাঁকে পরামর্শ দিলেন চীনে গিয়ে জার্মান এ্যাম্বাসাডারের সঙ্গে দেখা করতে।

ছুটলেন নরেন নাগাসাকি থেকে টোকিও, সেখান থেকে কোরিয়াগামী জাহাজে গেলেন সিউল, সেখান থেকে আর একখানি জাহাজে এসে নামলেন চীনের দরহেন বন্দরে, সেখান থেকে ট্রেনে পেঁছিলেন পিকিং।

সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে পিকিং পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল বটে, কিন্তু শান্তি ও সুনীতির বক্তৃতা নরেন এমনি জোরালো আবেগপূর্ণ ভাষায় করলেন যে, পিকিং পুলিশ আপাততঃ ওঁকে জামিনে মুক্তি দিল। মুক্তি পেয়েই উনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হাজির হলেন গিয়ে নিরাপদ জার্মান এলাকায়। দেখা করলেন জার্মান এ্যাম্বাসাডারের সঙ্গে।

জার্মান এ্যাম্বাসাডার নিজে দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না, বললেন, বার্লিনের হুকুম আনতে হবে।

কি করে বার্লিনে যাবেন? প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে তখন ইয়োরোপে প্রধানতঃ ইংরেজ ও জার্মানদের মধ্যে। এ্যাম্বাসাডার একখানা ইঙ্গ-ফরাসী পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিলেন, তাতে নরেনের নাম দেওয়া হল ফাদার সি. মার্টিন, অর্থাৎ পণ্ডিচেরীর জনৈক মার্টিন নামীয় পাদ্রী আমেরিকার প্যারিসে যাচ্ছেন বাইবেল অধ্যয়ন করতে।

নরেন পিকিং থেকে রওনা হয়ে গেলেন হ্যাংকাও, তারপর ষ্টীমারে ইয়াংসি নদীপথে যাবার সময় নানকিং ও পুকাও-এর মাঝপথে একটি জার্মান গানবোট পেয়ে তাতেই উঠে পড়লেন।

১৯১৬ সালের জুন মাসে নিপ্পন মারু জাহাজে স্যানফ্র্যান্সিসকো বন্দরে অন্য বহু যাত্রীর সঙ্গে নামলেন গলায় সোনার ক্রুশ দোলানো, সাদা আলখাল্লা জাতীয় লম্বা গাউনে ঢাকা দেহ, ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ এক গম্ভীরমুখ পাদ্রী নাম তাঁর ফাদার সি. মার্টিন।

এক অভিজাত হোটেলে উঠলেন তিনি।

বন্দরের পুলিশ টের না পেলেও পরক্ষণেই আমেরিকান গোয়েন্দাদের

চমক ভাঙ্গে। পরদিনই খবরের কাগজে ছাপা হল বড় বড় হরফে, 'Mysterious alien reaches America—Famous Brahmin revolutionary—A dangerous German spy…'.

কাগজে পড়েই বেরিয়ে পড়লেন নরেন, কাছেই পালো আলটো শহরে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। সেখানে থাকতেন বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাই ধনগোপাল। ধনগোপালকে আত্মপরিচয় দিলেন, তাঁর পরামর্শ চাইলেন। ধনগোপাল বুদ্ধি দিলেন, নাম বদলে নতুন মানুষ সাজ, তাহলে দৃষ্টি এড়াতে পারবে।

সেদিন সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ঊনত্রিশ বৎসরের পুরাতন খোলস থেকে বেরিয়ে এল এক নতুন মানুষ এক নতুন নাম, মানবেন্দ্রনাথ রায়।

এইখানেই তিনি মার্কসবাদীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। মার্কসবাদীয় নানা পত্রপুস্তিকা ও গ্রন্থ সংগ্রহ করে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন সুরু করেন।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একদা যিনি বিদেশী রাষ্ট্র থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আনিয়ে রক্তাক্ত বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াসে মেতে উঠেছিলেন, আজ তিনি সারা বিশ্বের ধনিক ও বুর্জোয়াতন্ত্রের নাগপাশ থেকে নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সামিল হলেন। যাঁর কর্মপরিধি ছিল শুধু ভারত, আজ তা বিস্তার লাভ করে তাঁকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক রণাঙ্গনে টেনে নিয়ে এল।

জাতীয়তাবাদী নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হল আন্তর্জাতীয়তাবাদী মানবেন্দ্রনাথে। বহতা নদী এসে গড়িয়ে পড়ল দিগন্তবিস্তারী সাগরে।

একদিন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অকস্মাৎ পুলিশ মানবেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করল। পরে অবশ্য জামিনে ছেড়ে দিতে আপত্তি জানাল না।

মুক্তি পেয়েই আত্মগোপন করলেন।

পালিয়ে চলে গেলেন মেক্সিকোতে।

স্থানীয় স্প্যানিশ অভিজাতদের অবিচারমূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ডিকটেটররূপী ক্যাথলিক চার্চের অবমাননাকর অনুশাসনের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর জনগণ তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, চলছে গৃহযুদ্ধ, চলছে বিশৃংখলা। মানবেন্দ্রনাথ সেখানকার রাজনীতিতে যোগদান করলেন, গণবিপ্লবে মদৎ জোগালেন।

এবং অচিরেই মেক্সিকোর জনগণ তাঁর মধ্যে এক দরদী নেতার সন্ধান পেল।

১৯১৮ স্যালের ডিসেম্বর মাসে সোস্যালিষ্ট পার্টি অব মেক্সিকো রিজিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন মানবেন্দ্রনাথ।

১৯১৯ সালের মাঝামাঝি তাঁরই প্রস্তাবে, ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই সোস্যালিষ্ট পার্টির নাম বদলে নতুন নাম রাখা হল কমিউনিষ্ট পার্টি অব মেক্সিকো।

রাশিয়ার বাইরে এই প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তুললেন মানবেন্দ্রনাথ।

কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই।

আবার মেক্সিকো ত্যাগ করলেন, চললেন রাশিয়ায়। লেনিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাসপোর্টে নাম লিখলেন রবার্টো এ্যালেনী ভিল্লা গ্র্যাসিয়া।

স্পেনে নামলেন, সেখান থেকে আবার জাহাজে বার্সিলোনা, তারপর জেনোয়া, মিলান ও জুরিখ হয়ে বার্লিনে পেঁছিলেন ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে, সেখান থেকে প্রথমে লেনিনগ্রাড, লেনিনগ্রাড থেকে মস্কো।

রাশিয়ায় তখন বিপ্লবোত্তর চরম বিশৃঙ্খলা। মারামারি, কাটাকাটি, দারিদ্র্য, বিক্ষোভ, হানাহানি। তার মধ্যেই বিপ্লবীদের বৈদেশিক দপ্তরের ভাইস-কমিশনার কারাখানা বোরোদিন ও রায়কে সঙ্গে করে গেলেন বৈদেশিক দপ্তরে।

লেনিন আসন ছেড়ে উঠে এসে রায়কে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, you are so young ! I expected a grey bearded wiseman from the East.'

মানবেন্দ্রনাথের বয়স তখন বত্রিশ বৎসর।

লেনিনের সঙ্গে কাজ সুরু করলেন রায়।

দেশে দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হতে লাগল।

কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে রায়কে কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হল।

রায়ের মেধা, ধীশক্তি, মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে নিখুঁত বিচার বিশ্লেষণ, তাঁর ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন কর্মক্ষমতা, তাঁর অমায়িক ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কমিউনিষ্ট নেতৃবর্গ ও কর্মিদের অবিসংবাদিত প্রশংসা লাভ করল।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশনের রায় কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

১৯২৪ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার অন্যতম সেক্রেটারি পদে

নিযুক্ত হন। অর্থাৎ ট্রটস্কি লেনিনের পাশাপাশি তিনিও কমিউনিজমের অন্যতম পুরোধারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

এর পরই কমিউনিজম-এর দর্শন বিশ্লেষণ করে তিনি এর ত্রুটি দেখতে পেলেন। জন্ম বিপ্লবী কোদালকে কখনও চামচে বলে না, কোদালই বলে। কমিউনিষ্ট দর্শন নিয়ে ট্রটস্কির সঙ্গে তাঁর মতভেদ আর চাপা রইল না। লেনিনের সঙ্গেও মত মিলল না।

কমিউনিজমের দর্শনের মধ্যে ঈপ্সিতকে খুঁজে না পেয়ে মানবেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসাই স্থির করলেন। এখানে তাঁর বিরুদ্ধে ঝুলছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। তাই চোদ্দ বৎসর পর ১৯৩০ সালে ভারতে এলেন গোপনে এবং ডঃ ব্যানার্জী ছদ্মনাম নিয়ে সফর করতে লাগলেন।

গ্রেপ্তার হলেন ১৯৩২ সালের ২৭ জুন বোম্বাই শহরে।

১৯৩২ সালে ৯ জানুয়ারী বারো বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। আপীলে মেয়াদ হ্রাস হয়ে হল ছয় বৎসর। জেল থেকে মুক্তিলাভ করলেন ১৯৩৫ সালের ২০ নভেম্বর। যোগদান করলেন কংগ্রেসে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় ১৯৪০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে নিজেই একটি দল গড়ে তুললেন, র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্র্যাটিক পিপলস পার্টি।

১৯৫৪ সালের ২৫ জানুয়ারী সকালবেলা অকস্মাৎ করোনারি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সাতষট্টি বৎসর বয়সে মানবেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ড, দেশ ও বিদেশে তাঁর রচিত অসংখ্য পত্র পুস্তিকা, তাঁর সম্পাদিত নানা পত্রিকা এবং তাঁর নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ পর্যালোচনা করে তাঁর সম্বন্ধে একটি অভিমত নিঃসন্দেহে প্রকাশ করা যায় যে, মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন বিপ্লবী।

টেগার্ট বেঁচে রইল

কলকাতা হাইকোর্টের দায়রা বিচারক রায় দিলেন মৃত্যুদণ্ড।

কিশোর আসামীর মুখমণ্ডলে সেই স্বাভাবিক অনির্বাণ কমনীয়তা! খুশীর ছোঁয়ায় উজ্জ্বল দুটি চোখ। আদালতের রায় যেন পৃথিবী থেকে বিতাড়নের নির্মম আদেশ নয়, যেন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের সাদর সস্নেহ আহ্বান! বলল সে, আজ আমার পক্ষে অতি পবিত্র দিন। মা ডাকছেন আমায়, যাতে ফিরে গিয়ে তাঁর বুকের কোটরে চিরবিশ্রাম নিতে পারি।

পাবলিক প্রসিকিউটর যখন কোর্ট রুম প্রতিধ্বনিত করে ওজস্বিনী ভাষায় এই বিপথগামী আসামীর অপরাধের সাড়ম্বর বিবরণ পেশ করে বাহবা কুড়োচ্ছিলেন. এই জঘন্য হত্যার নেপথ্যে আরও কয়েকজনের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন, আসামী তখন বাধা দিয়ে বলে উঠল, মিথ্যে কথা। লালবাজারে আমি কোনদিন ঘোরাঘুরি করিনি আর কারুকে সঙ্গে নিয়েও আমি কোনদিন বৌবাজারে কোন বাড়ীতে যাইনি। সব সময় আমি একাই ঘুরেছি, একাই চেষ্টা করেছি টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করবার জন্য। আমি খুবই দুঃখিত যে, ঠিক চিনতে না পেরে হুবহু টেগার্টেরই মতো দেখতে অন্য এক সাহেবের ওপর গুলী চালিয়েছি। আমি ভরসা রাখি, আমার অসমাপ্ত কাজ অন্য কেউ সমাপ্ত করবে। গত বছর থেকেই আমি খবর সংগ্রহ করছি যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে যেসব ইংরেজ কর্মচারী কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব তাদের অগ্রগণ্য। আমি দেশমায়ের আদেশ পেলাম, সরিয়ে দাও ওকে ধরাধাম থেকে···

১৯২৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী। হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য। কোর্টরুমের অভ্যন্তরে আইনজীবিদের ভিড়। রুমের দ্বারদেশে প্রহরারত রিভলভারধারী সার্জেণ্ট। কোর্টরুমে জনসাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ না হলেও গুটিকতক যাদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়েছে, তন্ন তন্ন করে করা হয়েছে তাদের দেহতল্লাসী। কে জানে হয়তো ঐ মতিচ্ছন্ন (?) খুনী আসামীর কোনো দোসর বা কোনো সহযোগী জামার নীচে লুকিয়ে রিভলভার নিয়ে নির্দোষ নিরীহ দর্শক সেজে প্রবেশ করে গুলী চালিয়ে বসবে হয়তো স্বয়ং পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ওপর! কারণ আজ আদালত কক্ষে তিনিও উপস্থিত।

কিন্তু অলিন্দে ঠাসা জনসাধারণ। প্রকাশ্য বিচারালয়ে আসা নিষিদ্ধ করতে না পারলেও নিশ্চয়ই ওদেরই মধ্যে মিশে রয়েছে সাদা পোষাকের আই. বি. পুলিশ, কান খাড়া করে শুনছে লোকেদের মন্তব্য, ওদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করছে, তির্যক দৃষ্টি রাখছে ওদেরই মধ্যে যারা উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ, তাদের ওপর।

মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করে বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন আবেদন আছে?

সরাসরি সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে অচঞ্চল কণ্ঠে বলে উঠল সেই কিশোর আসামী, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতের প্রতিটি গৃহে যেন বিদ্রোহের বীজ বপন করে।...

১৯২৪ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্সী জেলে এই অগ্নি কিশোরের ফাঁসী হয়ে গেল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের তালিকার পর আরেকটি শহীদের নাম সংযোজিত হল গোপীনাথ (গোপীমোহন) সাহা।

সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম এর অনেক আগেই সুরু হয়ে গেছে। মহারাষ্ট্রে গণপতি ও শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে তাঁর নাম লেখা হয়ে গেছে, বাল গঙ্গাধর তিলক। ১৮৯৭ সালের ২২ জুন পুণায় কালেক্টর ডবলিউ. সি. র‍্যাণ্ডকে খতম করে দিয়ে ১৮৯৮ সালের ১৮ এপ্রিল ভারতের প্রথম শহীদ দামোদর হরি চাপেকর ফাঁসীর মঞ্চ রাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছেন। মহারাষ্ট্রে প্রজ্বলিত এই আগুন দেখতে দেখতে বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র-শিষ্য বীরেশ্বর বিবেকানন্দ উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, তোমাদের জন্মভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন, তোমরা বীর হও। আমি নিশ্চিত জানি, ভারতমাতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবন বলি চান।

সেই রুদ্র আহ্বান-বাণী ১৯০১ সালে বরোদায় বহন করে নিয়ে গেলেন ভগিনী নিবেদিতা।

১৯০৬ সালে বিপ্লবের আদিগুরু অরবিন্দ চলে এলেন কলকাতায়।

প্রকাশিত হল 'যুগান্তর', প্রকাশিত হল 'বন্দে মাতরম্', প্রকাশিত হল 'সন্ধ্যা'। ঘুমিয়ে পড়া জাতির বধির কর্ণকুহরে বিপ্লবের সঞ্জীবনী মন্ত্র পৌঁছে দিতে লাগল 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা। সম্পাদকের লেখনী অসিরূপে দেখা

দিল। সম্পাদকীয় মসি রক্তবিন্দু ছড়াতে লাগল বাংলার শহরে শহরে, গ্রামে ও বন্দরে।

তারপর ১৯০৬ সালের এপ্রিলে বরিশালের সেই অবিস্মরণীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, যার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, মূল সভাপতি আবদুল রসুল আর অন্যান্যর সঙ্গে যোগদান করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

কুখ্যাত কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুর অভিমুখে যাত্রা করল দুটি কিশোর বিপ্লবী, ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী (ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায়)।

ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেল ১৯০৮ সালের ১১ আগষ্ট মজঃফরপুর জেলে। আর মোকামাঘাট রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করল প্রফুল্ল চাকী।

তারপর সুরু হল আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা।

তারপর কানাইলাল দত্তের ফাঁসী হয়ে গেল ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু শহীদ হল ২১ নভেম্বর।

আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করে শহীদ হল চারুচন্দ্র বসু।

সামসুল আলমকে হত্যা করে শহীদ হল বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।

১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করছিলেন, তখন তাঁর ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হল।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে পুরোভাগে রেখে ভারতের বিপ্লবীরা বোমা রিভলভার চালিয়ে দেশ স্বাধীন করবার যে ব্যাপক পরিকল্পনা করেছিল, রাসবিহারী বসু ছিলেন সেই পরিকল্পনার প্রণেতা ও মহানায়ক। ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ সেই মহানায়ককে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে বিরাট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে যে দুজন পুলিশপুঙ্গব তাঁর চন্দননগরের বাড়ীতে হানা দিয়েছিল, তাদের একজন গোয়েন্দাপ্রধান ডেনহ্যাম, অপর জন কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট।

রাসবিহারীর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলবার সময় ইংরেজের শত্রু জার্মানীর অস্ত্র ও অর্থ-সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনের একটি মেসের ছাদে ১৯১৫ সালে মার্চের শেষে বিপ্লবী নায়কদের যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসে, তাতে যোগদান করেন

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, নরেন ঘোষ চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং নরেন ভট্টাচার্য (উত্তর কালের এম. এন. রায়)।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আয়োজনও ব্যর্থ হয়ে গেল, কারণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই জার্মান জাহাজ এ্যানি লার্সেন জাহাজের সঙ্গে মাভেরিক জাহাজের দেখা হল না। এ্যানি লার্সেনকে আটক করল মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ আর মাভেরিককে বন্দী করল ওলন্দাজ যুদ্ধ জাহাজ।

পুলিশ টের পেয়ে গেল।

হানা দিল হ্যারী অ্যান্ড সন্স-এর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অফিসে।

হানা দিল উড়িষ্যা প্রদেশের বালাশোরে ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়ামে।

তারপর অবিস্মরণীয় ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের সেই মুখোমুখি যুদ্ধ। একদিকে রিভলবার হাতে বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, জ্যোতিষ পাল আর তাদের অধিনায়ক বাঘা যতীন, অপর দিকে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত শতাধিক সামরিক সেনা, তাদের পরিচালক ডেনহ্যাম, রাইনল্যান্ড, কিলবি, বার্ড, রাদারফোর্ড আর কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট।

টেগার্ট ! টেগার্ট ! টেগার্ট !

বাংলার বিপ্লবীদের মুখে মুখে ফিরছিল একটি দুর্ধর্ষ শত্রুর নাম, চার্লস টেগার্ট !

গোপীনাথ সংকল্প গ্রহণ করল, এই টেগার্টকেই খতম করতে হবে।

বরিশালের 'শঙ্কর মঠ' বিপ্লবী দলের প্রভাবে এসেছিল সে। বহুদিন ছিল শঙ্কর মঠে, কলকাতায় এসেও ঘন ঘন যাওয়া আসা করত শ্রীসরস্বতী প্রেস এবং সরস্বতী লাইব্রেরীতে। পরিচয় হয়েছিল মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ ও কিরণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

কিন্তু টেগার্টকে হত্যার সিদ্ধান্ত সে নিজেই গ্রহণ করল।

টেগার্টকে নাগালের মধ্যে পাওয়া সহজ কথা নয়।

লালবাজারে তার অফিস বটে, কিন্তু সেখানে প্রবেশ করবে কি করে? তার অফিস কক্ষের গেটে অস্ত্রধারী পাহারা, পাহারা বাইরের টানা বারান্দায়, দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতে, লালবাজার ক্যাম্পাসের গেটে, এ ছাড়াও অস্ত্রধারী সাদা পোষাকের পুলিশ সামনের রাজপথে বিপরীত দিকের দোকানপাটের কোথায় ঘাঁটি আগলে রয়েছে এবং গেটের বাইরে চলমান জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে ঘোরাফেরা করছে, কে জানে।

গোপীনাথ মরতে ভয় পায়না বিন্দুমাত্রও, কিন্তু তা শত্রুনিপাতের পর।

লালবাজারে ঢুকে শত্রুনিপাত সম্ভব নয়।

টেগার্টের বাসস্থান কিড ষ্ট্রীটে।

সুতরাং জামার নীচে রিভলবার নিয়ে সে কিড ষ্ট্রীটের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে লাগল দিনের পর দিন, বিশেষ করে সকালের দিকে অফিস সুরু হবার অনেক আগে, কারণ ওর কি রকম কী ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সারাদিন খাটাখাটি সুরু করবার আগে অন্য সাহেবদের মতো টেগার্টও নিশ্চয়ই চৌরঙ্গীর সম্মুখস্থ ময়দানে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরোয় আর নিশ্চয়ই সে সময় ওর কোন দেহরক্ষী থাকে না। সেটাই সুবর্ণ সুযোগ!

১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারী।

প্রচণ্ড শীতের সকাল। তবু স্বাস্থ্যান্বেষীরা গরম পোষাক পরে ময়দানে বেরিয়েছে পায়চারী করতে। বেরিয়েছে গোপীনাথও। ধুতি, খাঁকি সার্ট, কালো জুতো। সার্টের নীচে ও ডানদিকের পকেটে একটি ম্যাগাজিন পিস্তল ও একটি রিভলবার আর গোটা চল্লিশেক বুলেট। স্বাস্থ্যের অন্বেষণে বেরোয়নি সে, বেরিয়েছে টেগার্টের অন্বেষণে।

কিড ষ্ট্রীট থেকেও বেরিয়ে আসছে কেউ কেউ পায়ে হেঁটে। কেউ যুগলে, কেউ একাই। এদের মধ্যে টেগার্ট নেই।

গোপীনাথ দক্ষিণের দীঘির দিকে পায়ে পায়ে এগোল।

হঠাৎ নজরে পড়ল পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে একজন সাহেব এগিয়ে আসছে। বুক টান করে গট গট করে পা ফেলে।

টেগার্ট কি? হ্যাঁ, টেগার্টই তো!

গোপীনাথ ভাল করে দেখল। সে পূব দিকের ফুটপাথের দিকে এগিয়ে যেতেই সেও তাকে অনুসরণ করল। তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। স্বাস্থ্যান্বেষীরা ফিরে আসছে। লোকজন চলাচল সুরু হয়ে গেছে।

সাহেবটি ফুটপাথে উঠে হল এ্যাণ্ড এণ্ডারসনের শো কেসে সাজানো জিনিসগুলি যখন নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করছে, ঠিক সেই সময় আট দশ হাত দূর থেকে গোপীনাথের পিস্তল গর্জে উঠল।

কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সাহেবটি, সম্মুখে পিস্তলধারীকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল।

তৎক্ষণাৎ গুলী করল গোপীনাথ।

সাহেবটি ঢলে পড়ল ফুটপাথে। অমনি এগিয়ে এল গোপীনাথ। ওর ছটফট করা দেহ লক্ষ্য করে আরও ক'বার গুলী চালাল।

জনসাধারণ ভীত, স্তম্ভিত, বিভ্রান্ত। দেখা গেল, আততায়ী বেশ শান্তভাবে আগ্নেয়াস্ত্রটি পকেটে রেখে ধীর পাদক্ষেপে পার্ক ষ্ট্রীট ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছে।

যেন কোথাও কিছু হয়নি, দিন যেমনি চলছিল, তেমনই চলেছে।

সংবিৎ ফিরে এল দর্শক ও পথচারীদের মধ্যে।

কে একজন বলে উঠল, ধর ওকে। সবাই চীৎকার করে উঠল, পাকড়ো, পাকড়ো।

ছুটল ওরা।

একজন ট্যাক্সি চালাল।

দেখতে পেয়েই গোপীনাথ ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে গুলী চালাল। লাগল না।

দ্রুত পায়ে রাসেল ষ্ট্রীটে ঢুকে পড়ল সে। ছুটতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা ঘুরে গিয়ে আবার পড়ল পার্ক ষ্ট্রীটে। পশ্চাতে জনতার চীৎকার, খুনী ভাগতা হ্যায়। পাকড়ো খুনীকো। চীৎকার শুনে আরও লোক তাড়া করছে।

একটা প্রাইভেট মোটর গাড়ী থেমে আছে দেখতে পেয়ে গোপীনাথ ছুটে গেল। সাদা কোট প্যাণ্ট পরা ড্রাইভার। গোপীনাথ বলল, ভাই, আমার একটা লিফট দাওনা—

ড্রাইভার বলল, পারব না।

অমনি গুলী চালাল গোপীনাথ; গুলী ড্রাইভারের বেল্টে লাগল। বেঁচে গেল সে।

ওদিকে পেছনে বাড়ছে জনতার সংখ্যা, বাড়ছে হল্লা, বাড়ছে চীৎকার। পাকড়ো, পাকড়ো। খুনী ভাগতা হ্যায়।

গোপীনাথ প্রাণপণে দৌড়ুতে লাগল। পেছনে ছুটছে ক্রমবর্ধমান জনতা।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে এসে হাঁপাতে লাগল সে। এই প্রচণ্ড শীতেও তার শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। দম ফুরিয়ে গেছে। সুযোগ বুঝে একটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়তেই গুলী চালাল গোপীনাথ। গুলী হাতে বিঁধেছে। হাত চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা।

আবার ছুটল সে।

ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট দিয়ে রয়েড ষ্ট্রীটে পড়ল সে। ককবার্ণ লেনে ঢুকে পড়ল।

জনতাও ছুটছে।

রিপন ষ্ট্রীটে পড়ল সে।

জনতা এসে পড়েছে।

ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে এসে পড়ল সে।

ট্রাম লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একখানা ঘোড়ার গাড়ি।

ছুটে গেল গাড়োয়ানের কাছে। বলল, ভাই আমায় নিয়ে চল। ভাই—

গাড়োয়ান রাজী নয়।

হঠাৎ একটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দূরে ছিল কর্তব্যরত একজন পুলিশ। সেও ছুটে এল।

গোপীনাথ ধরা পড়ে গেল।

১৪ জানুয়ারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তাকে হাজির করা হল।

জানা গেল, যাকে সে হত্যা করেছে, সে টেগার্ট নয়, তার নাম মিস্টার ই. ডে। এক সওদাগরী অফিসের কর্মচারী।

টেগার্ট বেঁচে রয়েছে।

তারপর সুরু হল বিচার। পাবলিক প্রসিকিউটরের জ্বালাময়ী বক্তৃতা। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের আনুপূর্বিক বিবরণ। আসামীকে নির্ভুল সনাক্তকরণ। অবশেষে রায়, মৃত্যুদণ্ড।

ফাঁসীর সেল থেকে গোপীনাথ শেষ পত্রে মাকে লিখেছিল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাও, যেন ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে বিপ্লবী জন্মলাভ করে······

চিনতে ভুল করায় ১৯২৪ সালে বিপ্লবীর বুলেট থেকে বেঁচে গেল টেগার্ট। তাই ১৯৩০ সালে বিপ্লবীরা সতর্ক হল, যাতে আর ভুল না হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে বিপ্লবের ভাবধারা সারা বাংলায় ছড়িয়ে গেছে দাবানলের মতো।

ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন বসু, চারু বসু, বীরেন দত্তগুপ্ত প্রভৃতি ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের যে জয়গান গেয়ে গিয়েছিলেন, সেই গানেই উদ্বুদ্ধ হয়ে গোপীনাথের আত্মোৎসর্গের পর বাংলায় বপন-করা বিপ্লবের বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম সুরু হয়ে গেছে।

সি আই ডি, আই বি-র স্পেশ্যাল সুপার ভূপেন্দ্রনাথ চাটার্জী আলীপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে এলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামী প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্র তাকে শেষ করে দেয় ১৯২৬ সালের ২৫ আগষ্ট। তাদের ফাঁসী হয়ে গেছে ২৮ সেপ্টেম্বর।

তারপর কংগ্রেসের ১৯২৮ সালের স্মরণীয় কলকাতা অধিবেশন।

সামরিক বাহিনীর ধাঁচে গঠিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দল। সামরিক পোষাক, সামরিক নিয়মানুবর্তিতা। সামরিক কুচকাওয়াজ। দলের সামরিক নামকরণ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। দলের সর্বাধিনায়ক, জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, মূর্তিমান তারুণ্য সুভাষচন্দ্র বসু। কংগ্রেসের সমক্ষে সুভাষের সেই বৈপ্লবিক প্রস্তাব: না, আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা পূর্ণ স্বরাজ নয়, আমাদের দাবী তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ইংরেজের লেশমাত্র সম্পর্কহীন পূর্ণ স্বাধীনতা। বিপ্লবীদলের মুখপাত্ররূপে সুভাষের সেই চ্যালেঞ্জ, আলটিমেটাম, আন্দোলন, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লীতে ভারতীয় পরিষদের যখন অধিবেশন চলছে, তখন পরিষদ কক্ষে বোমা নিক্ষেপ করে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন বিপ্লবী ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। ১৪ জুন অকস্মাৎ পুলিশ যতীন্দ্র নাথ দাসের কলকাতার বাসভবনে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করল হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মি নামীয় বিপ্লবী দলের নেতা সন্দেহে।

তেষট্টি দিন অনশনের পর যতীন্দ্রনাথ আত্মবিলোপনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর।

বাংলার শহরে শহরে, বিশেষ করে কোলকাতায় বিপ্লবীদের বহু গোপন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এমনি একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সরস্বতী লাইব্রেরী ও সরস্বতী প্রেসকে কেন্দ্র করে। যারা সেই কেন্দ্রের নেতা, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাস করেন ৭১ মির্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি মেসে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বরিশালের 'শংকর মঠ' নামীয় বিপ্লবী দলভুক্ত, তাঁদের নাম মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ এবং আরও কজন।

কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে গড়ে তোলা 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স' একটি বিপ্লবী দলের শিরোনাম হয়ে উঠেছে। ঢাকা শহরে এর উৎপত্তি, তারপর ঈশান কোণের এক ফালি কালো মেঘ যেমন অনুকূল বাতাসে ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তারপর ক্রমে ক্রমে ভয়াল বাহু বিস্তার করে ছেয়ে ফেলে বিশ্ব চরাচর, ঠিক তেমনি করে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স সংগঠন-বাহু বিস্তার করেছে বিক্রমপুরে, ময়মনসিংহে, মাণিকগঞ্জে, মেদিনীপুরে, আরও অনেক জায়গায় এবং কলকাতায়। বি ভি-র সর্বাধিনায়ক সত্যভূষণ গুপ্ত, সহ-নায়ক ভূপেন্দ্র রক্ষিত রায়, ভবেশ নন্দী, রসময় সুর, প্রফুল্ল দত্ত, মনীন্দ্র রায় এবং আরও ক'জন। এঁদের অনুপ্রেরণার উৎস বাংলার বিপ্লবী দলের অন্যতম পুরোধা হেমচন্দ্র ঘোষ।

তারপর অকস্মাৎ ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল 'মাষ্টারদা' সূর্য সেনের সংগঠনে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে নেমে পড়ল। বিপ্লবীরা লুণ্ঠন করল সামরিক অস্ত্রাগার, পুড়িয়ে ছাই করে দিল টেলিফোন একসচেঞ্জ, কেটে ফেলে দিল টেলিগ্রাফের তার, উপড়ে ফেলল রেলওয়ে লাইন, বহির্জগতের সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরের সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ভেঙ্গে পড়ল প্রশাসন আর প্রাণভয়ে ভীত ইয়োরোপীয়ান অধিবাসীরা ফেরুপালের মতো পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজে।

মাত্র বারো দিন আগে মহাত্মা গান্ধী ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান সুরু করেছিলেন।

পাশাপাশি দুইদলের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কংগ্রেসী দল আর বিপ্লবী দল। শয়তান ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যেন সাঁড়াশী অভিযান!

১৮ এপ্রিলের পর ২১ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের সেই অবিস্মরণীয় বিজয়-সংগ্রাম।

ঠিক এই সময় কলকাতার উত্তরাঞ্চলে একটি বাড়ীতে বিপ্লবীদের একটি গোপন বৈঠক বসল। বৈঠকের পুরোধা শংকর মঠের মনোরঞ্জন গুপ্ত।

স্থির হল, এবার টার্গেট টেগার্ট, কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট।

আর আড়ালে থেকে নয় এ্যাকশনের শেষে সরে পড়বার পথ খোলা রেখে নয়,

গোপীনাথের মতো একক প্রচেষ্টা নয়, তার মতো যাতে চিনতে ভুল না হয়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রমণ চালাবে চারজন।

কারা সেই চারজন ?

যুগান্তর বিপ্লবী দলের বিভিন্ন গ্রুপের কিছু ছেলে তখন এ্যাকশনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। টগবগ করে ফুটছে তারা। গুনগন করে জ্বলছে। কাজ চাই, এখনই চাই। তীরে বিষ মাখানো হয়ে গেছে, হয়ে গেছে ধনুকে জ্যা রোপন, এখন হুকুম চাই তীর ছোঁড়বার। নেতারা বলছিলেন, আর একটু ধৈর্য ধর, আরও একটু অপেক্ষা কর, সংগঠনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল, শেষ হলেই একযোগে একই দিনে একই সময়ে বাংলার প্রতিটি শহরে—কিন্তু ওরা বলে, আমরা রেডি, এ্যাকশনের জন্য রেডি, জীবনদানের জন্য রেডি। বিউগল বাজিয়ে দিন, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি, ঝাঁপিয়ে পড়ি শত্রুর বুকে।

তখন বিপ্লবী দলের এক নম্বর শত্রু, কমিশনার টেগার্ট।

সেই শত্রুকে নিপাত করবার আয়োজনের ভার নিলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত।

রসিক দাসকে বললেন ঐ এ্যাকশন-পাগল ছেলেদের মধ্য থেকেই চারজনকে বাছাই করতে। বোমা ছুঁড়বে তারা টেগার্টের ওপর। কেউ বাধা দিতে এলে চালাবে রিভলভার। যদি তবু রুখতে না পারে, সরে পড়তে না পারে, তাহলে মুখে ঢেলে দেবে পটাসিয়াম সাইওনাইড। ধরা দেবে না।

শৈলেন নিয়োগীর এক আত্মীয় লালবাজারে চাকরি করেন।

সে ভাল মানুষটির মতো সেখানে যাতায়াত সুরু করল।

স্বভাবতঃই সেই আত্মীয়ের সহকর্মীদের সঙ্গেও তার পরিচয় হতে লাগল।

সবার সঙ্গে খোসগল্পের ফাঁকে ফাঁকে শৈলেন টেগার্টের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে লাগল।

শৈলেন সংবাদ নিয়ে এল, টেগার্টকে বিপ্লবীদের সন্ধান কার্যে মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরেও যেতে হয়, শহরেও মাঝে মাঝেই এমনি ধরনের ডিউটিতে সে এমনি ব্যস্ত থাকে যে, ক'দিন হয়তো হেডকোয়ার্টার লালবাজারে আসতেই পারে না, এলেও যখন-তখন আসে, আবার যখন খুশী চলে যায় কিড ষ্ট্রীটে তার সরকারী কোয়ার্টারে। বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড দমনে ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে যেন সেই একমাত্র ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। অনেকগুলি সাফল্যই তার কারণ।

তবে প্রতিদিনই যে তাকে এমনি ধরনের ডিউটিতে ছুটাছুটি করতে হয়, তা নয়। সেই স্বাভাবিক দিনগুলিতে একেবারে ঘড়ি ধরে টেগার্ট লালবাজারে আসে। কীড ষ্ট্রীটের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায়। তার মোটরের সিডান বডি নয়, হুডওয়ালা। তবে প্রায়ই সে হুড খুলেই আসে। তার ড্রাইভারের নাম সুব্বাখান। সুব্বাখানের কাছেও গুলীভরা রিভলভার থাকে। একাই আসে টেগার্ট। সঙ্গে থাকে একটি এ্যালসেশিয়ান কুকুর, গাড়ী চলবার

সময় মুখ বাড়িয়ে থাকে। চৌরঙ্গী রোডে বেরিয়ে গাড়ী উত্তর দিকে এসে কার্জন পার্ক বাঁয়ে রেখে চলে আসে লাটভবনের দিকে তারপর ডান দিকে মোড় নেয়। ডালহাউসি স্কোয়ার ইস্ট দিয়ে উত্তর দিকে গীর্জা পর্যন্ত এসে ডান দিকে ঘুরে লালবাজার গেটে গিয়ে পৌঁছায়।

টেগার্টের মোটরের সামনে বা পেছনে মোটর সাইকেলে কোন অস্ত্রধারী সার্জেণ্ট পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় না। টেগার্ট খানিকটা বেপরোয়া, সাহসী তো বটেই।

মনোরঞ্জন গুপ্ত স্থির করলেন, এই বেপরোয়া সাহসীর দাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। দিতে হবে ঐ প্রকাশ্য রাজপথে জনাকীর্ণ ডালহাউসি স্কোয়ারে। ভিড়ের মধ্যে আক্রমণ চালাবার সুবিধে অনেক। অত লোকের মধ্যে ঠিক কোন্ লোকটি বোমা ছুঁড়ছে বা রিভলভার চালিয়েছে যেমন নির্ণয় করা কঠিন, তেমন এ্যাকশনের শেষে ভিড়ের মধ্যে আততায়ী যে কোথায় সরে পড়ল, কোথায় মিলিয়ে গেল, খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

স্থির হল, সঙ্গে রিভলভার থাকলেও বোমা দিয়ে আক্রমণ চালানো হবে। সে সময় বিপ্লবীদের হাতে এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় দিয়ে তৈরী প্রচুর পরিমাণ বোমা ছিল। তবে সেগুলো শুধু ছুঁড়ে মারলেই ফাটত না। একটা ছোট্ট সলতেয় অগ্নি সংযোগ করে ছেড়ে দিতে হত। স্থির হল, ধাবমান মোটরের সামনে থেকে দুজন বোমা ছুঁড়বে, দুজন ছুঁড়বে পেছন থেকে। একটু আগে থেকেই ওরা সিগারেট ধরাবে, সময়কালে জ্বলন্ত সিগারেটটাই চেপে ধরে সলতে জ্বালিয়ে দেবে। সময়ের হিসেবে গোলমাল হতে পারে না, কারণ জানাই গেছে যে টেগার্ট ঠিক সাড়ে দশটায় বাড়ী থেকে রওনা হয়।

রসিক দাস তিনটি ছেলেকে দিলেন—অনুজা সেন, দীনেশ মজুমদার আর অতুল সেন। চতুর্থকেও দিয়েছিলেন রসিক দাস, কিন্তু শৈলেন নিয়োগী ধরে পড়ল, টেগার্টের গতিবিধির খবর আমি এনে দিয়েছি, সুতরাং ওকে খতম করার এ্যাকশনে আমাকেও নিতে হবে।

মনোরঞ্জন গুপ্ত রাজী হলেন।

প্রস্তুত হল চারজন—অনুজা, দীনেশ, অতুল আর শৈলেন। ওরা কেউ সিগারেট খায়না। কিন্তু যেহেতু বোমার সলতেয় জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে অগ্নি সংযোগ করতে হবে, সেই হেতু ওরা সিগারেট খাওয়া সুরু করল। অনভ্যস্ত হাতে ওটা ধরাতে গেলে পাছে পথচারীদের সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাই ওরা মহলা দিতে লাগল। কিভাবে সিগারেটটি দুটি ঠোঁটের মাঝখানে নরমভাবে চেপে ধরতে হয়, তারপর কি বিচিত্র উপায়ে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটি দুই জড়ো করা হাতের মধ্যে ধরে সিগারেটে চেপে ধরতে হয়। ধোঁয়া টেনে কাশলে চলবে না, তাহলেই অনভ্যস্ততা ধরা পড়ে যাবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ওরা পাকা সিগারেটখোরের মতো সিগারেট খাওয়া শিখে ফেলল।

কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল ওরা। অফিস টাইমে ডালহাউসি স্কোয়ারের রাস্তা দিয়ে অসংখ্য মোটর যাতায়াত করে দ্রুতবেগে। তার অনেকগুলিরই হুড খোলা থাকে। টেগার্টের হুডখোলা গাড়ী চেনবার একমাত্র নিশানা, ওর সঙ্গে থাকে একটি এ্যালসেশিয়ান কুকুর আর সেটা গলা বাড়িয়ে থাকে। ধাবমান অত মোটরের মধ্যে টেগার্টের গাড়ীখানা যে কখন্ হুস করে বেরিয়ে গেছে, ঠিক ঠাহর করতে পারেনি ওরা।

ক্ষুব্ধ হলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত। ওদের চারজনকেই বদলে দিতে চাইলেন, রসিক দাসকে বললেন চারটি নতুন ছেলে দিতে।

কিন্তু ওরা ভীষণভাবে ধরে পড়ল, এবার আর ভুল হবে না মনাদা।

মনাদা রাজী হলেন ওদের আবার সুযোগ দিতে। তবে সতর্ক করে দিলেন গোপীনাথের মতো চিনতে ভুল করে নিরীহ কাউকে মেরে বসেনা যেন।

১৯৩০ সাল। ২৫ আগষ্ট। বেলা ন'টা। স্থান ডালহাউসি স্কোয়ারে কারেন্সি অফিসের সামান্য উত্তরে হ্যারল্ড এ্যান্ড কোম্পানী নামে একটি দোকান ছিল, ঠিক তার সামনের রাস্তা। পশ্চিমে ট্রাম লাইন ঘেঁসে ফুটপাথ, ফুটপাথ ঘেঁসে ডালহাউসি স্কোয়ারের লোহার রেলিং। হ্যারল্ড কোম্পানীর বিপরীত ফুটপাথে অপেক্ষমান শৈলেন নিয়োগী আর অতুল সেন, স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ট্রাম লাইনের বাঁকের কাছে ঘোরাফেরা করছে অনুজা সেন আর দীনেশ মজুমদার। ওদের সঙ্গে আছে বোমা, রিভলভার, বিষের প্যাকেট আর সিগারেট ও দেশলাই।

সবারই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাস্তার দক্ষিণ দিকে, কখন আসবে টেগার্টের হুডখোলা গাড়ী।

দশটা বাজল জেনারেল পোষ্ট অফিসের ঘড়িতে।

ওরা চোখে চোখে ও সামান্য হস্ত সঞ্চালনে একে অপরকে এ্যালার্ট করে দিল।

ওদের মুখে সিগারেট। একটা থেকে আরেকটা ধরাচ্ছে। যেন চেইন স্মোকার।

সাড়ে দশটা হতেই ট্রাফিক পুলিশদের মধ্যে সামান্য চাঞ্চল্য দেখা গেল। ওরাও ঘন ঘন তাকাচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

অর্থাৎ আসছে, ওদের হুজুর আসছে। বিপ্লবীদের এক নম্বর শত্রু টেগার্ট আসছে।

পুলিশরা রেডি হচ্ছে সেলাম জানাতে আব বিপ্লবীরা রেডি হল বোমা ছুঁড়তে।

কয়েক মিনিট পরই লাটভবনের গেটের কাছে দেখা গেল সেই হুডখোলা মোটর, এ্যালসেশিয়ান গলা বাড়িয়ে রয়েছে।

মনাদার নির্দেশ ছিল, টেগার্টের গাড়ী হ্যারল্ড কোম্পানীর সামনে আসতেই সামনে এগিয়ে বোমা ছুঁড়বে শৈলেন আর অতুল। স্বভাবতঃই গাড়ীখানা অচল

হয়ে যাবে অথবা টেগার্টের গায়ে বোমা পড়তেই সুব্বাখান ব্রেক কসবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে গিয়ে আরও দুটি বোমা ছুঁড়ে ফিনিশিং টাচ দেবে অনুজা ও দীনেশ।

কিন্তু কেমন যেন হকচকিয়ে গেল শৈলেন আর অতুল, পেছনের এরা দেখল ওরা দেরী করছে আর টেগার্টের গাড়ি গাড়ীর ভিড়ের মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

তড়িৎ বেগে পেছন দিকে এগিয়ে এল অনুজা, ছুঁড়ল বোমা। গাড়ীর ওপর না পড়ে পড়ল গাড়ী থেকে দক্ষিণে। প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হল, গাড়ীর টায়ার গেল ফেটে, দরজার পাট ভেঙ্গে পড়ল, স্প্লিণ্টার ছিটকে গিয়ে লাগল সুব্বা খানের হাতে, হাত রক্তে ভেসে গেল।

গাড়ী অচল হয়ে গেল।

রিভলভার হাতে টেগার্ট উঠে দাঁড়াতেই সলতে জ্বালিয়ে দিয়ে বোমা ছুঁড়ল দীনেশ।

সে বোমাও ওর গায়ে পড়ল না। উলটে মারাত্মক বিপদ ঘটল। একটা স্প্লিণ্টার ছিটকে এগিয়ে যাওয়া অনুজার পেটে গিয়ে বিদ্ধ হল। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে জামাকাপড় লাল করে দিল।

ছুটল সে। ছুটল সে প্রাণপণে স্কোয়ারের দক্ষিণ ফুটপাথ ধরে পশ্চিম দিকে।

সারা এলাকায় তখন দারুন হৈ চৈ। টেগার্টের গাড়ীর আশেপাশে ও পেছনে অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে। ট্রাম থেমে গেছে। রাস্তায় নেমে পড়েছে অসংখ্য মানুষ। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গেছে সবাই। দোকানগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেকে। হৈ চৈ করছে, চীৎকার করছে। সেই জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে সরে পড়েছে শৈলেন আর অতুল।

প্রথম বোমার শব্দে হকচকিয়ে উঠল টেগার্ট, বোধকরি গড-এর নাম স্মরণ করে ভয়ে কাঁপতে লাগল, আহত সুব্বাখানের রক্ত দেখে ভাবল এবার সেও সাবাড়—কিন্তু না, তার গায়ে কোন স্প্লিণ্টার লাগেনি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বোমা, গাড়ীর কাছেই প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হল, বোধ করি সে ভয়ে চোখ বুঁজল—কিন্তু না, এবারও বেঁচে গেছে সে।

কৈ, আর পড়ছে না তো বোমা। এবার সংবিৎ ফিরে এল, রিভলভার হাতে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ নজরে পড়ল স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকের ফুটপাত ধরে একটি ছেলে দৌড়ুচ্ছে। দেখেই গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ল সে, তাড়া করল তাকে। পেছনে ছুটল সেই বাঘা কুকুর।

ডালহাউসি ইনষ্টিটিউটের কাছাকাছি এসে পড়েছিল অনুজা, কিন্তু আর পারল না। স্প্লিণ্টার পেটে বিঁধে রয়েছে, অনর্গল রক্তক্ষরণে অবসন্ন শরীর। কোটটা রেলিং-এর উপর রেখে রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে পড়ল সে। মাথাটা

ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখ বুজে এল। ঐ রেলিং-এ হেলান দিয়েই চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ল অনুজা সেন।

টেগার্ট কুকুর নিয়ে এসে দেখে অনুজার দেহে প্রাণ নেই।

ওদিকে পথচারীদের কেউ কেউ দীনেশকে বোমা ছুঁড়তে দেখেছে।

কে একজন বলে উঠল, ঐ যে, ঐ লোকটাই বোমা ছুঁড়েছে। বলতেই একদল বলে উঠল, ধর, ধর্—

রেলিং টপকে দীঘির দক্ষিণ পার দিয়ে ছুটল দীনেশ পশ্চিম দিকে।

জনতা তাড়া করছে, পুলিশের দলও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে, সবাই চীৎকার করছে, পাকড়ো, পাকড়ো, খুনী ভাগতা হ্যায়—

জনতা ঘিরে ফেলল দীনেশকে।

কিন্তু মনাদার নির্দেশ, কেউ ধরতে এলে গুলী চালাবে, সহজে ধরতে দেবে না।

গুলী চালাল দীনেশ। কিন্তু বুলেট ছুটল না। হয় রিভলভার, নয়তো বুলেট খারাপ।

সেই মুহূর্তে পুলিশ ও জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

পটাসিয়াম সাইওনাইডের প্যাকেটটাও সে বার করতে পারল না পকেট থেকে।

দীনেশ ধরা পড়ে গেল।

বাকি তিন জনের দুজন উধাও, তৃতীয় জন মৃত।

তাই মামলা সুরু হল একা দীনেশের নামে। স্টেট ভার্সাস দীনেশ মজুমদার।

বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল।

১৯২৪ সালে টেগার্টকে চিনতে না পেরে গোপীনাথ অপরকে হত্যা করেছিল।

১৯৩০ সালে টেগার্টকে ঠিক ঠিক চিনেও বিপ্লবীরা তাকে শেষ করতে পারল না।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট বেঁচে রইল।

জেল পলাতক বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার

১৯৩০ সালের ২৫ আগষ্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের ওপর যে বোমাগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার খোল ছিল এ্যালুমিনিয়াম-এ্যালয় দিয়ে তৈরি, ভেতরে বিষ্ফোরক পদার্থ ঠাসা। তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকলেও সে বোমা ছুঁড়ে মারলেই ফাটত না। বোমার সঙ্গে লাগানো একটি ছোট্ট সলতে, সেই সলতেয় অগ্নি-সংযোগ করে ছুঁড়ে মারতে হত। অগ্নিসংযোগ কি করে করা যাবে? এক হাতে বোমা ধরে অন্য হাতে দেশলাইয়ের কাঠি? দেশলাই এক হাতে জ্বালানো যায় না। কাঠি জ্বালিয়ে বাক্সটা পকেটে রেখে আরেক হাতে বোমা বার করে তার সলতেয় আগুন লাগাতে গেলে কাঠিটা হাওয়ায় নিভে যেতে পারে। তাহলে বোমা ঢিলের মতো গিয়ে পড়বে, ফাটবে না।

তাই টেগার্টের ওপর যারা বোমা নিক্ষেপ করেছিল, তাদের সঙ্গে ছিল চুরুট। টেগার্টের গাড়ী ডালহাউসি স্কোয়ারে পৌঁছবার কিছু আগেই তারা চুরুট খাওয়া সুরু করেছিল। চুরুটের আগুন অনেকক্ষণ থাকে এবং দুই অধরের ফাঁকে চেপে ধরা চুরুটের আগুনে বোমার সলতে জ্বালিয়ে নেওয়া খুব সহজ।

টেগার্টের ওপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তাব করেছিলেন বরিশাল শংকর মঠ নামীয় বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত, তিনিই প্ল্যান করেছিলেন কোথায় এবং কিভাবে আক্রমণ চালানো হবে, সংগঠনের সর্বকর্তৃত্ব তাঁরই ওপর দেয়া হয়েছিল।

যে চারটি তরুণ টেগার্টের ওপর আক্রমণ চালায়, তাদের নাম শৈলেন নিয়োগী, অনুজা সেন, অতুল সেন এবং দীনেশ মজুমদার।

অনুজা নিজেদের বোমার আঘাতে ডালহাউসি স্কোয়ারেই মারা গেল।

পালিয়ে গেল শৈলেন আর অতুল।

ধরা পড়ে গেল দীনেশ মজুমদার।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য আই বি পুলিশ দিনের পর দিন অমানুষিক অত্যাচার চালাল। কে পাঠিয়েছিল তোমাদের? কোথায় পেয়েছ বোমা আর রিভলভার? সঙ্গে আর কে কে ছিল?

কোন জবাব দিল না দীনেশ।

তাই পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও 'ডালহাউসি বোমার মামলা' করা গেল না। মামলার নাম দিতে হল, 'স্টেট ভার্সাস দীনেশ মজুমদার।'

একজন, মাত্র একজন আসামী, দীনেশ মজুমদার।

দীনেশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ইংরাজ সরকার, যাক, কুইন্স পার্ডন-এ ছয় বৎসর

মাপ হয়ে গেলেও অন্ততঃ চোদ্দ বৎসরের জন্য একটা খুনে স্বদেশীকে শ্রীঘরে পাঠানো গেছে !

বোধ হয় সে আমলের আই বি পুলিশের উর্বর মস্তিষ্কেই কূট বুদ্ধি এল যে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে যে খতম করতে গিয়েছিল, তাকে কলকাতার কোনো জেলে না রেখে বাইরে সরিয়ে দেয়াই নিরাপদ হবে। সুতরাং ১৯৩০ সালের ১৭ অকটোবর দীনেশকে স্থানান্তরিত করা হল মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে। রাখা হল বিশ ডিগ্রিতে। বিশ ডিগ্রি মানে পাশাপাশি সিঙ্গল সিটেড বিশটি সেল। সম্মুখের প্রাঙ্গণ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দিনের বেলা সেই প্রাঙ্গণে বন্দীরা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করে।

একটি সেলে ছিল মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত শচীন করগুপ্ত।

আরেকটি সেলে ছিল পুটিয়া মেল ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত সুশীল দাশগুপ্ত।

তারপর এল দীনেশ মজুমদার।

তিনজনে খুব ভাব। ওরা এক সঙ্গে বেড়ায়, স্নান করে, এক সঙ্গে বসে খায়, গল্প করে। দিনের বেলা সব সময় এক সঙ্গে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তিন বন্ধু, আমরা জেল থেকে পালাব, পালাব জেলের প্রাচীর টপকে রাতের অন্ধকারে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক, আমরা জেলে পচতে রাজী নই।

কিন্তু পৃথক পৃথক সেলে থাকলে কি করে সম্ভব হবে? এ্যাসোসিয়েশন ওয়ার্ড, যেখানে একটা হল-এর মতো একটা ঘরে অনেক বন্দী এক সঙ্গে থাকে, সেখানে যাওয়া দরকার।

১৯৩১ সালে মে-জুন মাসে মেদিনীপুরের প্রচণ্ড গরমের সময় ওরা জেলের সুপারিণ্টেনডেণ্ট কর্ণেল এম দাসকে নালিশ জানাল যে, সেলে বাতাস চলাচলের পথ নেই, অসহ্য গরম, ওদের এ্যাসোসিয়েশন ওয়ার্ডে বদলি করা হোক। দাস ওদের হিসস্ট্রি টিকেট দেখলেন, ওজনে কমে যাচ্ছে বলে ডাক্তার ওদের জন্য স্পেশাল ডায়েট হিসেবে রোজ মাংস ও দুধের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। জেলার রিপোর্ট দিলেন, আসামীরা নম্র ও ভদ্র।

কর্ণেল দাস রাজী হলেন।

ওরা সেল ছেড়ে এ্যাসোসিয়েশন ওয়ার্ডে এল।

আবার সুরু হল ওদের গোপন সলা-পরামর্শ, কি করে দেয়াল টপকানো যায়।

জেলের প্রাচীরের বাইরের দিকে মাঝে সেনট্রি বকস আছে। দিনের বেলা সশস্ত্র ওয়ার্ডার এখানে দাঁড়িয়ে নজর রাখে জেলের অভ্যন্তরে। রাত্রে সমস্ত বন্দীকে আটকে রাখা হয় বলেই আর প্রাচীর গার্ড থাকে না।

ওরা স্থির করল, রাত্রে প্রাচীর টপকাতে হবে। ধোপাচালিতে কাপড়-চোপড় ভাটিতে দেবার জন্য বিরাট সিমেণ্টের চুল্লী আছে, তা বেশ উঁচু এবং প্রাচীর থেকে মাত্র দশ বারো ফুট দূরে। সেখানে কতকগুলো গাছ থাকায় ফ্লাড লাইটের আলোর মাঝে মাঝে ছায়া। প্রাচীরের বাইরে জেলের বিরাট সবজি বাগান, সেখানে ঝোপঝাপ প্রচুর। টপকাবার পক্ষে ওটাই নিরাপদ স্থান।

ওরা লক্ষ্য করল, প্রতিদিন লক আপ করতে আসে ডেপুটি জেলার, সঙ্গে চীফ হেড ওয়ার্ডার, হেড ওয়ার্ডার আর যার তখন থেকে ডিউটি সুরু হবে সেই ওয়ার্ডার। বন্দীরা তখন সার বেঁধে বসে আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরা তাদের খাটে বসে থাকে। সেই সময় যদি কোন বন্দী পায়খানায় গেছে বলে বন্দী মেট বা বন্দী পাহারা জানায়, তাহলে গণনাকারীরা আর পায়খানার দরজা খুলে উঁকি মারতে যায় না অথবা সে বেরিয়ে আসা পর্যন্তও অপেক্ষা করে না। ওরা গুনতি ঠিক আছে ধরে নিয়ে ওয়ার্ডে তালা বন্ধ করে চলে যায়। শুধু তাই নয়, যদি শোনে বিকেলেই একজনের শরীর খারাপ হয়েছে, তাই সে আপাদমস্তক কম্বল দিয়ে ঢেকে শুয়ে রয়েছে, তাহলে আর ওরা কম্বল টেনে তুলে অসুস্থ 'স্বদেশীকে' বিরক্ত করে না, তাকে গুনতিতে ধরে নেয়।

মজা হচ্ছে, লক আপের দায়িত্ব ডেপুটি জেলারের ওপর অর্পিত থাকলেও ওয়ার্ডেই ঢোকেন না তিনি, দূরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চীফ হেড ওয়ার্ডারের সঙ্গে গল্প-গুজব করেন, হেড ওয়ার্ডার ও ওয়ার্ডার ঘরে ঢোকে ও গুনতি করে।

ঐ ওয়ার্ডে বেশীর ভাগ রাজনৈতিক বন্দীই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর। বন্দীদের মধ্যে চট্টগ্রাম ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বন্দী প্রভাতকে ওদের খুব পছন্দ হল এবং তাকে বলল প্ল্যানটা। প্রভাত ঐ ওয়ার্ডের বন্দীদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছিল।

ওরা স্থির করল, একদিন প্ল্যানটার মহলা দেওয়া হোক।

সেদিন লক আপ করার দল আসবার পূর্বক্ষণে সুশীল আর দীনেশ পাশাপাশি পায়খানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করল, প্রভাত লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে সামনে রাখল। আর শচীন আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

যথারীতি এল লক আপ করার দল। যথারীতি ডেপুটি জেলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চীফ হেড ওয়ার্ডারের সঙ্গে খোসগল্প সুরু করলেন এবং যথারীতি ওয়ার্ডের মধ্যে এসে ঢুকল হেড ওয়ার্ডার আর ওয়ার্ডার।

বন্দীরা আগে থেকেই সার বেঁধে বসে রয়েছে। যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর, তারা বসে রয়েছে নিজের নিজের খাটে।

প্রভাত এগিয়ে গিয়ে বলল, জমাদার সাহেব, আজ তিন জন কম পাবেন। দুজন গেছে পায়খানায় আর ঐ দেখুন আর একজন অসুস্থ বোধ করায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

হেড ওয়ার্ডার বত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করে বলল, ঠিক আছে পরভাতবাবু। টাট্টিমে যব আছে, থাকতে দেন। আর ঐ তো, একজন সুইয়ে আছে।

গুনতি শেষ করে চলে গেল ওরা দরজায় তালা এঁটে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর মেন গেটে ঢং করে একবার ঘণ্টা বাজল।

অর্থাৎ সারা জেলের বন্দীদের সংখ্যা মিলে গেছে।

অর্থাৎ কেউ পালায়নি।

আবার এমনিভাবে গুনতি হবে রাত্রিশেষে ভোরে লক আপ খোলার সময়। তখন না মিললে যতই হুলস্থুল হোক, ওদের কিছু যাবে আসবে না, কারণ, রাত্রের ট্রেনে ওরা ততক্ষণে নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁছে যাবে।

একজন ওয়ার্ডারকে হাত করে ওরা শহরে এক বন্ধুর কাছে চিঠি দিয়ে পাঠাল। বন্ধু কয়েক শো টাকা পাঠাল এবং ওয়ার্ডারটিকেও কিছু 'বখশিস' দিল।

বড় চৌকায় কাজ করে এমন একজন সাধারণ বন্দীকে টাকা দিয়ে হাত করা হল। সে চৌকা থেকে একটা বেশ মোটা হ্যাণ্ডেলওয়ালা খন্তি দিয়ে গেল লুকিয়ে। হ্যাণ্ডেলটা আড়াই হাত লম্বা হবে। গোপনে সেই হ্যাণ্ডেলটা বেঁকিয়ে অনেকটা ইংরেজী 'এস' অক্ষরের মতো করা হল।

সর্ব আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন, এখন দিন ধার্য করতে হবে।

১৯৩২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী।

বিকেলে কাজ শেষ হবার ঘণ্টা বাজতেই বন্দীরা ওয়ার্কশেড ছেড়ে চলে এল হাতমুখ ধুয়ে খেতে।

ওদের গার্ডও চলে গেল, কারণ তাদেরও ডিউটি শেষ।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে গিয়ে ওরা ভাটি দেবার উনুনের নীচে লুকিয়ে রেখে এল সেই বাঁকানো খন্তিখানা আর তিনচারখানা ধুতি।

সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টার মধ্যেই সাধারণ বন্দীদের লক আপ হয়ে যায়। স্বদেশী বন্দীদের হয় প্রায় সাতটায়। তার আগেই ভাটি দেবার উনুনের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে রইল সুশীল দাসগুপ্ত, শচীন করগুপ্ত আর দীনেশ মজুমদার।

সাড়ে পাঁচটায় হয়েছে সূর্যাস্ত।

সাড়ে ছটায় অন্ধকার হয়ে এল।

সাতটায় লক আপ করার দল যখন এল, তখন রাত হয়ে গেছে।

আগে থেকেই প্রস্রাব পায়খানা দুটোর দরজা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে সামনে রেখেছে একটি লণ্ঠন আর শচীনের বিছানায় কাপড়চোপড় এবং এটা-ওটা-সেটা সাজিয়ে রেখে তা এমনি নিখুঁতভাবে ঢেকে দিয়েছে যে দেখলে মনে হবে শচীনই মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে।

হেড ওয়ার্ডার ঢুকতেই এগিয়ে গেল প্রভাত—জমাদার সাহেব, দীনেশ আর সুশীল গেছে পায়খানায় আর ঐ যে, শচীন মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে সেই বিকেল থেকে। ওর কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে।

আবার সেই বত্রিশ পাটি বিকশিত করল হেড ওয়ার্ডার, মেদিনীপুরকা বাত বলবেন না পরভাতবাবু। খালি মেলেরিয়া, খালি মেলেরিয়া। হামলোককো গারদমে তো হরদম দশঠো বারোঠো পড়িয়েই থাকে।

প্রভাত বলল, আপনি না হয় একটু দেরী করুন, দীনেশ আর সুশীল বেরোক।

—আরে রাখিয়ে দেন, বাধা দিল হেড ওয়ার্ডার, এতনা দেখিয়ে দেখিয়ে লক আপ করতে গেলে রাত দশটা বাজিয়ে যাবে—হা হা হা হা—

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল হেড ওয়ার্ডার আর ওয়ার্ডার।

দরজায় তালা পড়ল।

ওদিকে—

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কাজ সারতে হবে।

দীনেশ ধোবি চালির ছাপড়া থেকে একখানা বাঁশের পাতলা চটা খুলে নিয়ে এল। বাঁধা হল 'এস'-এর সঙ্গে। ধুতিগুলোও জোড়া দিয়ে বাঁধা হল এস-এর সঙ্গে। তারপর সার্কাসের সেই সুপরিচিত কসরৎ। সবার চাইতে স্বাস্থ্যবান দীনেশ। দাঁড়াল সে প্রাচীর ধরে, এস-বাঁধা চটা নিয়ে শচীন উঠে দাঁড়াল তার কাঁধের ওপর, ঠিক এমনিভাবে শচীনের কাঁধে সুশীল চটা উঁচু করে এস-এর অপর প্রান্ত প্রাচীরের মাথায় আটকে দিল।

ব্যস, চমৎকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

স্থির হল, ওপারে নেমেই তিনজন বিচ্ছিন্ন হয়ে সবজি বাগানে লুকিয়ে থাকবে। অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না বন্দীদের গুনতি মিলে-যাওয়া নির্দেশক সেই ঢং করে একটা ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়। ওতেই জানা যাবে প্রভাত গুনতির ব্যাপারটা কৌশলে ম্যানেজ করতে পেরেছে কিনা। তারপর বিচ্ছিন্নভাবেই ওরা যাবে রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের নির্দিষ্ট স্থানে। শচীন তিনখানা কলকাতার টিকিট কিনে রখবে।

তারপর ট্রেনে কলকাতা।

অর্থাৎ কেল্লা ফতে।

ধুতির দড়ি বেয়ে প্রথমে লাফিয়ে পড়ল সুশীল দাশগুপ্ত, সবজি বাগানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর শচীন করগুপ্ত। সেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর দীনেশ মজুমদার।

একটা ভুল করল দীনেশ। সবার শেষে যখন সে, তখন প্রাচীরের মাথায় উঠে ধুতির দড়িটা বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে অনায়াসে সে দড়ি বেয়েই নামতে

পারত। কিন্তু তা না করে দুই বন্ধুর মতো লাফ দিল। বেকায়দায় পড়ে পায়ে দারুণ আঘাত লাগল। বসে পড়ল সে।

ওরা দুজন দূরে সরে পড়েছে, এসব কিছুই জানতে পারল না।

ঢং করে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল।

অর্থাৎ গুনতি মিলে গেছে।

অর্থাৎ সারা রাত্রির জন্য নিশ্চিন্ত।

ওরা বিচ্ছিন্নভাবে জনবহুল রাস্তা এড়িয়ে ঘুরপথে ষ্টেশনের দিকে চলল।

এবং নিরাপদে প্ল্যাটফরমের নির্দিষ্ট স্থানে প্রথমে পোঁছে গেল সুশীল, একটু পরে শচীন।

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পরও দীনেশ এসে পোঁছোচ্ছে না দেখে ওরা চিন্তিত হল। তবে কি শহরের পথে কেউ ওকে চিনে ফেলেছে? ও ধরা পড়ে গেছে? তাহলে তো এতক্ষণে জেলের এ্যালার্ম সাইরেন বেজে উঠত, হুলস্থুল পড়ে যেত পুলিশ মহলে, জেনে যেত যে, আরও দুজন জেল থেকে পলাতক, পেয়ে যেত ধুতির তৈরী দড়ি আর খন্তি দিয়ে তৈরী 'এস' এবং শহর থেকে পলায়নের পথ বন্ধ করবার জন্য সবার আগে পুলিশ ছুটে আসত ষ্টেশনে। না, ধরা পড়েনি নিশ্চয়ই।

কিন্তু তাহলে আসছে না কেন?

ওদের উদ্বেগ যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ছটফট করছে ওরা, এমন সময় দেখা গেল দীনেশকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ধীরে ধীরে সে আসছে।

কি ব্যাপার, খোঁড়াচ্ছ কেন?

এসেই বসে পড়ল দীনেশ, বলল, তোমরা লাফিয়ে পড়বার পর আমি তাড়াতাড়িতে একটা মস্ত ভুল করে বসলাম। দড়িটা বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে অনায়াসে দড়ি বেয়ে নেমে আসতে পারতাম, তা না করে প্রাচীরের মাথা থেকে আমিও তোমাদের মতো লাফিয়ে পড়লাম। এক টুকরো ইটের ওপর ডান পা-টা এমনি বে-কায়দায় পড়ল যে, উঠতেই পারলাম না প্রথমটা। এত জোরে লেগেছে যে, মনে হচ্ছে এ্যাঙ্কেলের হাড় ভেঙ্গে গেছে। রিকসা করতে পারি না, সে তো আসবে বড় রাস্তা দিয়ে। তাই এত দেরী।

সুশীল শচীন পা দেখল, ফুলে গেছে। হয়তো সত্যিই হাড় ভেঙ্গে গেছে।

সুশীল বলল, কি করা যায় তাহলে? এখনই ডাক্তার দেখানো দরকার। দেখালেও দু একদিনে ভাল হয়ে যাবে বলে মনে হয় না—

শচীন বলল, রাত্রে যদি আমরা এখানে থাকি, তাহলে তারপর কলকাতা যাওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে। কারণ ভোরে লক আপ খোলার সময় গুনতিতেই ওরা জেনে যাবে যে, আমরা তিনজন পালিয়েছি। তারপর থেকে ষ্টেশনে নিশ্চয়ই নজর রাখবে—

সুশীল চিন্তিতমুখে বলল, তাই তো, কি করা যেতে পারে তাহলে?

দীনেশ বলল, এক কাজ কর না ভাই। আমাকে রেখেই চলে যাও তোমরা, আমি ওয়েটিং রুমে শুয়ে থাকি। কাল পুলিশ যখন আমায় খুঁজে পাবে, ততক্ষণে তোমরা কলকাতায় নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাবে—

মানে? শচীন বাধা দিল, মানে তোমাকে ফেলে রেখেই চলে যাব? তা কখনো হয়?—দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

বলেই সে দীনেশের ধুতি ছিঁড়ে লম্বা একটা ব্যাণ্ডেজের কাপড় তৈরী করে ওর এ্যাঙ্কেলে ভাল করে বেঁধে দিল। ওর জামা-গেঞ্জি খুলে আরেক টুকরো ধুতি পাকিয়ে দড়ার মতো করে ওর গলায় পরিয়ে দিল। ধুতির বাকি অংশটা হেঁটো ধুতির মতো করে পরল দীনেশ।

শচীন হেসে বলল, তোমার বাবা মা মারা গেছেন, তোমার গুরুদশা চলছে। তুমি দারুণ শোকাচ্ছন্ন। ট্রেনে বাঙ্কের ওপর তুলে দোব, তুমি কাপড়ের টুকরো মুড়ি দিয়ে সারাক্ষণ শুয়ে থাকবে। শোকাচ্ছন্ন অসুস্থ লোককে, পায়ে কি হয়েছে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। আমরা বেঞ্চিতে নির্লিপ্তভাবে বসে থাকব।

শচীন তিনখানা হাওড়ার টিকিট কিনে আনল। ট্রেন সোজা যাবে হাওড়ায়, খড়্গপুরে আর বদলাতে হবে না।

যথা সময়ে ট্রেন এসে গেল।

কারাদণ্ডে দণ্ডিত তিনজন বিপ্লবী যুবক, সুশীল দাশগুপ্ত, শচীন করগুপ্ত আর দীনেশ মজুমদার মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল থেকে পালিয়ে নিরাপদে ট্রেনে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

সেদিন ১৯৩২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী।

ভোরবেলা হাওড়া ষ্টেশন।

যাত্রীদের ভিড়।

আবার ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাত্রীদের সঙ্গে মিশে এগিয়ে যেতে লাগল। দীনেশ খোঁড়াচ্ছে।

ট্যাক্সি নয়, ট্রাম নয়, বাস নয়, ওরা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠল। জানালা দরজার পাট তুলে দিল। সোজা গিয়ে নামল শচীনের এক বন্ধুর বাড়ীতে।

সবিস্ময় অভ্যর্থনা জানাল সে, আরে শচীন, তুই? এই সকালে! ছাড়া পেয়ে গেছিস তাহলে? এঁরা?

শচীন নিম্নস্বরে বলল, শোন্, ছাড়া পাইনি। আমরা তিনজন জেল থেকে পালিয়ে এসেছি। এই বন্ধুর পায়ে দারুণ চোট লেগেছে, ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তার দেখিয়ে আমরা সন্ধ্যার পর অন্যত্র—

ওরে ব্বাবা! দুই চোখ কপালে তুলল বন্ধুটি, বলিস কি রে! জেল থেকে পালিয়ে এসেছিস তোরা? পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজছে তোদের। যদি টের পেয়ে যায়—ওরে ব্বাবা!

বোঝা গেল, এখানে হবে না। বন্ধুটি সুদিনের বন্ধু, দুর্দিনে কেউ নয়। কিংবা কে জানে, হয়তো শত্রুতাই করে বসতে পারে। অর্থের লালসায় পুলিশেরই বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।

সুতরাং ওরা একটা ট্যাক্সিতে চাপল।

দীনেশ তার এক আত্মীয়ের কথা বলল। সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাড়ী। বিপ্লবী না হলেও দীনেশকে ভালভাবেই জানে ও ভালবাসে। অন্ততঃ এমনিভাবে ফিরিয়ে দেবে না। তবে মেদিনীপুরের পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে, নিশ্চয়ই টেলিফোনে খবর এসে গেছে কলকাতায় আই বি-র কাছে। জানা কথা যে, গুপ্তচরেরা প্রথমেই নজর দেবে এদের তিনজনের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীর ওপর। কিন্তু কোথাও না উঠে বেশীক্ষণ রাস্তায় থাকা যে আরও বিপজ্জনক!

আত্মীয়টি সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

খবর পাঠানো হল বিপ্লবী ডঃ বীরেশ গুহকে। গুহ বললেন, ডাক্তার দেখানো জরুরী সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও জরুরী অবিলম্বে তোমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আমি সুশীলকে সরিয়ে ফেলছি।

সুশীলকে নিয়ে চলে গেলেন গুহ।

খবর পাঠানো হল বিপ্লবী বন্ধু শ্রীশ দাশগুপ্তকে।

শ্রীশ এসেই বলল, আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকা ভীষণ রিস্কি।

তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেল শচীন আর দীনেশকে নিজের বাড়ীতে, পরদিনই কাছের বস্তিতে একখানা ছোট্ট ঘর ভাড়া করা হল, সেখানে উঠল ওরা দুজন।

চেনা ও আস্থাভাজন ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার দীনেশের পা পরীক্ষা করে বললেন, না, হাড়-টাড় ভাঙ্গেনি, মচকে গেছে।

তিনি প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেলেন। ওষুধ আনা হল।

বিপ্লবী বন্ধু বিজয় মোদক খবর পেয়ে চলে এল। ওদের দুজনকে নিয়ে চলে গেল নিবেদিতা গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী ইন্দুর বাড়ীতে।

সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করায় দীনেশের পা ভাল হয়ে গেল।

কিন্তু সেখানে বেশীদিন থাকা নিরাপদ নয়। কলকাতা পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে, হানা দিচ্ছে এখানে ওখানে জেল পলাতক তিন বিপ্লবীর সন্ধানে।

সুতরাং বিজয় এবার ওদের নিয়ে গেল কলকাতার বাইরে, অথচ বেশী দূরে নয়। কারণ ওরা পালিয়ে এসেছে কাজ করবার জন্য। শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার জন্য নয় কিংবা কোনো নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবার জন্য নয়। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লবীর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়ে দিতে হবে যে, এদেশে ইয়োরোপীয়দের জীবন নিরাপদ নয়।

বিজয় ওদের নিয়ে গেল রামরাজাতলায়। কলকাতা শহরই বিপ্লবীদের হেড কোয়ার্টার্স। হেড কোয়ার্টার্স থেকে দূরে থাকলে চলবে কি করে?

রামরাজাতলায় বিজয়ের বন্ধুর বাড়ীর চিলেকোঠায় উঠল ওরা। বন্ধু কয়লা ব্যবসায়ী। চিলেকোঠা সারাদিন তালা বন্ধ থাকে। উনি থাকেন দোকানে। শুধু দুপুরে একবার তালা খোলেন ওদের খাবার দিয়ে আসবার জন্য।

আর রাত্রে ?

রাত্রে কাজ সুরু হয়ে গেল ওদের।

প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের কর্মী দীনেশ* মজুমদার।

সেই দলের কর্মীদের খবর পাঠানো হল। বিশেষ করে দলের প্রধান সংগঠক সুনীল চ্যাটার্জীকে। বছরখানেক আগে সুনীলেরই পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিচালনায় কানাইলাল ভট্টাচার্য আলীপুর সেসন্স কোর্টের জজ গার্লিককে খতম করে দিয়েছে ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই।

আবার এ বছর এই ১৯৩২ সালের মে মাসে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসন তার কাগজে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে মেয়ে-বিপ্লবী সম্বন্ধে অত্যন্ত অবমাননাকর ভাষায় লিখেছে সম্পাদকীয় নিবন্ধে। তাদের আখ্যা দিয়েছে street girls !

সুতরাং সুনীলরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, খতম করতে হবে ওয়াটসনকে।

সুরু হয়ে গেছে গোপন বৈঠক।

কোথায় ?

এখনকার যতীন দাস পার্কের বিপরীত দিকে হাজরা রোডের ওপর 'হোটেল এলিট' নামে লাল রংয়ের যে বাড়ীটি দাঁড়িয়ে আছে, তখন সেটি ছিল একটি সাধারণ মেস, সেই মেসের তিন তলায় সুনীল একটি ঘর ভাড়া করে রেখেছিল। কেউ থাকত না সেখানে। ঘর তালাবন্ধ থাকত। সুনীল থাকে তার বাড়ীতে জয়নগরের কাছে গঙ্গাঘাটা গ্রামে। মাঝে মাঝে কাজে আসে কলকাতায়। কলকাতায় এলে ঐ তেতলার ঘরে থাকত।

সুনীল চলে এসেছে এবং তেতলার ঘরে প্রায়ই বসছে বিপ্লবীদের গোপন বৈঠক।

সেই বৈঠকে অন্যদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য রামরাজাতলা থেকে যাতায়াত সুরু করল শচীন করগুপ্ত আর দীনেশ মজুমদার।

সুনীলও আসতে লাগল রামরাজাতলায় ওদের গোপন আস্তানায়।

সুনীল একদিন বলল যে, জেল পলাতকদের আশ্রয়স্থল পরিবর্তন করা দরকার।

আপত্তি জানাল না ওরা। কারণ দীনেশের প্রস্তাবেই স্থির হয়ে গেছে যে, ওয়াটসনকে আক্রমণের সংগঠক হবে সুনীল আর আক্রমণ চালাবে অতুল সেন, টেগার্টকে আক্রমণে যে দীনেশের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং পালাতে পেরেছিল !

ট্যাক্সিতে রওনা হল ওরা, সঙ্গে বিজয় মোদক আর সুনীল চ্যাটার্জী। রাণীগঞ্জে অপেক্ষা করছিল দুর্গাদাস হালদার। তার কাছে পৌঁছে দিয়েই ফিরে এল বিজয় এবং সুনীল। দুর্গাদাস ফেরারী দুজনকে নিয়ে গেল বাংলার বাইরে পুরুলিয়ায়। বিভূতি দাশগুপ্তের ব্যবস্থাপনায় ওরা আশ্রয় পেল।

মাসখানেক পর হঠাৎ শচীন দেখতে পেল, কলকাতা আই বি-র একজন পরিচিত গুপ্তচর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে কি বাংলার বাইরে এই পুরুলিয়াতেও ওরা দৃষ্টি প্রসারিত করেছে?

তৎক্ষণাৎ খবর পাঠানো হল বিজয় মোদককে।

বিজয় ছুটে এল।

এবার কোথায় সরানো যায় এদের?

ঝরিয়া কয়লা খনির চাকুরে প্রমথ ঘোষ বিপ্লবীদের বন্ধু। প্রফুল্ল ও জ্যোতির্ময় নামে দুজন ফেরারী বিপ্লবীকে কুলি সাজিয়ে খনির চাকরিতে ভর্তি করে নিয়েছিল সে। শচীন ও দীনেশকে বিজয় প্রমথ ঘোষের কাছে নিয়ে গেল।

দুটি বিহারী নাম নিয়ে পরদিন থেকেই খনির কাজে ভর্তি হয়ে গেল শচীন আর দীনেশ। কারণ খনি-শ্রমিকদের মধ্যে সে যুগে কোনো বাঙ্গালী ছিল না বলা চলে।

খালি গা, খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত খাটো ময়লা ধুতি, সারা শরীরে কয়লার কালি আর বাসস্থান কুলিদের ব্যারাকে, কুলিদের সাথে।

কুলিজীবনের আরও একটি রীতি পালন না করলে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা। প্রতি শনিবার সপ্তাহের মজুরী পেলেই কুলিকামিনের দল চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ব্যারাকে বসে যায় তাড়ি ও গাঁজার আসর। গাঁজার আসরে ওদেরও যোগ দিতে হল। তবে ধোঁয়াটা মুখের মধ্যে রেখেই ছেড়ে দিত, নেশাখোররা নেশায় মশগুল হয়ে অতটা লক্ষ্যই করত না।

হাজিরাবাবু প্রমথ ঘোষের বন্ধু, বিপ্লবীদের প্রতি তিনিও সহানুভূতিশীল। তিনি ওদের খবর জানতেন যে, ওরা দুজন জেল-পলাতক ফেরারী বিপ্লবী, ওরাও পরিচিত হয়ে উঠল ওঁর সঙ্গে। হপ্তা নিতে এসে ওরা ওঁর সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষাতে কথা বলত।

একদিন ওদের কথোপকথন হাজিরাবাবুর দাদার কানে গেল। তিনি কি কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ফিরে এলেন, কুলিদের মধ্যে দুজন বাঙ্গালী থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বলে গেলেন আগামী শনিবার হপ্তা নিতে এলে ওদের যেন বসিয়ে রাখা হয়, উনি কথা কইবেন।

হাজিরাবাবুর কাছে একথা শুনে আর ওখানে থাকা নিরাপদ মনে হল না।

পরদিনই ট্রেনে চেপে বসল শচীন আর দীনেশ।

কোথায় যাবে ওরা?

মনে পড়ল বিপ্লবীনেতা ভূপতি মজুমদারের কথা। একথা বিপ্লবীরা সবাই

জানত যে, ভূপতিবাবু জেলের বাইরে থাকাকালীন তো নিশ্চয়ই, উনি জেলে গেলেও ওঁর বাড়ীর দরজা দলনির্বিশেষে বিপ্লবীদের জন্য সর্বদাই ছিল অবারিত। ওঁর নির্দেশমত ওঁর অনুপস্থিতিকালেও হুগলীর বাড়ীতে যে কোনো বিপ্লবী সাদর অভ্যর্থনা পেত এবং যতদিন খুশী থাকতে পারত।

শচীন ও দীনেশ প্রথমটা ভেবেছিল ওখানেই যাবে ওরা।

বিজয় মোদক ও সুনীল চ্যাটার্জী রাজী হল না। ভূপতিবাবু তখন জেলে। পুলিশ নিশ্চয়ই নজর রেখেছে ওঁর বাড়ীর ওপর। আর জেল-পলাতকদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় রাজবন্দীর গৃহ নিরাপদ হবে না।

তাই ওদের দুজনকে এবার নিয়ে যাওয়া হল ফরাসী চন্দননগরে। ওখানে আরও ফেরারী বিপ্লবী ছিল, তাদের মধ্যে একজন নলিনী দাস। নলিনী ১৯৩১ সালের ৬ই নভেম্বর হিজলী রাজবন্দী শিবির থেকে পালিয়ে এসেছে।

চন্দননগরে থাকাকালে খবর এল যে, পুরুলিয়া থেকে কজন বিপ্লবী ভূপতি বাবুর বাড়ীতে এসেছে শচীনদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

চন্দননগর থেকে সাইকেলে রওনা হল শচীন ও প্রকাশ।

দুর্ভাগ্যক্রমে ওরা হুগলীতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল।

মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল থেকে ১৯৩২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী পালিয়েছিল শচীন করগুপ্ত, দীনেশ মজুমদার আর সুশীল দাশগুপ্ত। সুশীলকে নিয়ে গেছেন ডঃ বীরেশ গুহ। শচীন ও দীনেশ সর্বদাই ছিল একসঙ্গে। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে রিভলভারসহ ধরা পড়ে গেল শচীন।

বাকি রইল দীনেশ মজুমদার। সে তখন নিরাপদে চন্দননগরে।

সে কি করল ?

ডেয়ার ডেভিল দীনেশ মজুমদার

সে যুগের বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দেবার সময় দীক্ষাগুরু স্পষ্ট করেই বলতেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থেকো।

প্রস্তুত হয়েই যারা বিপ্লবী দলে যোগদান করেছিল, সংগ্রামী সেই আত্মত্যাগী বীরবৃন্দের সবাই কি নিহত হয়েছে ফাঁসীতে অথবা ইংরেজ সরকারের গুলীতে?

না, তা হয়নি। কারণ প্রতিটি কর্মীকেই এমন কাজে নিয়োগ করা হয়নি, যার ফলে ধরা পড়লে তার ফাঁসী হতে পারে—অথবা প্রত্যেককেই ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি হাতাহাতি সংগ্রামে পাঠানো হয়নি, যার ফলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত হয়ে উঠতে পারে। একটি সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের সুযোগ করে দেবার জন্য যারা শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি সংগ্রহ করে, যারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যারা হাতিয়ার সরবরাহ করে, যারা সংগঠন করে, তাদের অবদানও কম নয়। এরা ধরা পড়লে যে সবাইকেই ফাঁসী যেতে হয়, তা নয়।

কিন্তু সে-যুগে এমন বেশ কিছুসংখ্যক ছেলে বিপ্লবী দলে যোগদান করেছিল, যারা ট্রিগার টানা, বোমা ছোঁড়া ও ছুরি চালানো ব্যতীত অভিযান-সংশ্লিষ্ট অন্য ধরনের কাজে তেমন উৎসাহ পেত না। এ্যাকশনের আয়োজন হচ্ছে জানতে পারলেই তারা সামনে এসে দাঁড়াত, বুক টান টান করে নির্ভীক কণ্ঠে বলে উঠত, আমায় নিন সুইসাইড স্কোয়াডে।

শহীদ হবার জন্যই যেন এদের জন্ম!

এদের কাছে 'মরণ রে, তুঁহু-মম শ্যামসমান!'

যতদূরেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক না কেন, মৃত্যু এদের টানবেই অপ্রতিরোধ্যভাবে।

১৯৩০ সালের ২৯ আগষ্ট ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ লোম্যান ও সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিশ হডসনের ওপর আক্রমণান্তে বি. ভি. বিপ্লবী দলের কর্মী বিনয় বোস যখন ঢাকা থেকে ফেরারী হয়ে কলকাতায় এল, সহকর্মীদের পক্ষে তাকে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে লুকিয়ে রাখা যখন দিনের পর দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল, সুভাষচন্দ্র তখন ওকে গোপনে ভারতের বাইরে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু বিনয় বলেছিল, গ্রেপ্তারের ভয়ে বিদেশে সরে পড়া ইংরেজের ভয়ে পালিয়ে যাওয়ারই সমতুল্য।

তাই ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর, প্রায় সাড়ে তিন মাস পরই সে দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযান করে এবং শহীদ হয়।

১৯৩০ সালের ২৫ আগষ্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ওপর আরও তিনজনের সঙ্গে আক্রমণান্তে অতুল সেন পথচারীদের ভিড়ের মধ্যে সরে পড়ে।

কিন্তু টেগার্টকে খতম করতে না পেরে তার স্বস্তি ছিল না। বারবার তাগাদা দিতে লাগ. বিপ্লবী নায়ক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের প্রধান সংগঠক সুনীল চ্যাটার্জীকে—কাজ দাও, কাজ দাও।

তাই দু বছর পর ১৯৩২ সালের ৫ আগষ্ট ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সে শহীদ হয়।

এই বিপ্লবীরা মৃত্যু-পাগল, ইংরেজীতে যাকে বলে ডেয়ার ডেভিল!

তেমনি ডেয়ার ডেভিল ছিল দীনেশ মজুমদার।

১৯৩২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই শচীন করগুপ্ত ও সুশীল দাসগুপ্তের সঙ্গে মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল থেকে প্রাচীর টপকে পলায়ন করেছিল দীনেশ মজুমদার।

কলকাতা এসে পৌঁছবার কদিন পরেই নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই ওদের দলটিকে ছোট করবার জন্য বিপ্লবী ডঃ বীরেশ গুহ সুশীলকে নিয়ে যান!

শচীন ও দীনেশ বহুস্থানে ঘোরবার পর আশ্রয় পায় ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে। ব্যবস্থা করে বিজয় মোদক আর সুনীল চ্যাটার্জী। চন্দননগরে ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রাখবার ভার নেয় বিপ্লবী বন্ধু শ্রীশ সরকার, তিনকড়ি মুখার্জী এবং তুষার চ্যাটার্জী।

আগে চন্দননগর শহর ছিল বাংলার বিপ্লবীদের অনেকটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কিন্তু ১৯৩০ সালের ২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের ফেরারী বিপ্লবীদের সন্ধানে চন্দননগরে শশধর আচার্যের গৃহে বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষের পর থেকে কলকাতার আই বি পুলিশের অতন্দ্র নজর পড়েছে চন্দননগরের ওপর। তাই শচীন ও দীনেশকে বার বার বাড়ী বদলাতে হয়।

হিজলী রাজবন্দী শিবির থেকে ১৯৩১ সালের ৬ নভেম্বর পালিয়েছিল দুজন রাজবন্দী, নলিনী দাশ ও ফণী দাশগুপ্ত। ওদের মধ্যে নলিনীও তখন দীনেশদের সঙ্গে চন্দননগর আশ্রয়ে ছিল।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে আক্রমণ করেছিল দীনেশ ও আরো তিনজন। কিন্তু আক্রমণ পরিচালনায় সামান্য হেরফেরের ফলে এবং নিক্ষিপ্ত সবগুলো বোমা ঠিক সময়মত না ফাটায় টেগার্ট রক্ষা পেয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যখন সে দেখল, বোমার আঘাতে তার গাড়ীর যন্ত্র বিকল ও দরজা ভেঙ্গে পড়লেও এবং ড্রাইভার সুব্বা খান আহত হলেও তার নিজের কিছুই হয়নি, তখন সে গাড়ী

থেকে রিভলভার নিয়ে লাফিয়ে পড়ল এবং এ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে ধাওয়া করল অনুজার পশ্চাতে।

কিন্তু ধরতে পারল না তাকে।

নিজেদেরই নিক্ষিপ্ত বোমার টুকরোর আঘাতে প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে অনুজা তখন ডালহাউসি স্কোয়ারের রেলিং ঠেস দিয়ে বসে সকল ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে!

চন্দননগরে সহবিপ্লবীদের কাছে দীনেশ মাঝে মাঝেই এই কাহিনী বলত আর দুঃখ করত, আমরা অনুজাকে হারিয়েছি, অথচ আমাদের চিরশত্রু টেগার্ট এখনও বেঁচে আছে।

কোর্টে যখন মামলা চলছিল স্টেট ভার্সাস দীনেশ মজুমদার, তখনকার একটি দৃশ্যের কথাও বার বার বলত সে।

স্থান—আদালতকক্ষ। সময়—বেলা এগারোটা। আদালতকক্ষের দরজায় দরজায় সশস্ত্র সার্জেণ্ট। আদালতপ্রাঙ্গণেও সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় রত। প্রকাশ্য বিচারালয়, তাই আইনজীবি ও জনসাধারণের প্রাঙ্গণে ও কক্ষে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়া যায় না। কিন্তু ওদেরই মধ্যে আইনজীবি ও দর্শকের ছদ্মবেশে মিশে রয়েছে কতজন আই বি পুলিশের গুপ্তচর, কে জানে।

এমনি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও নিরাপদ দুর্গে প্রবেশ করল সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। তারও কোমরের বেল্টে আঁটা একটি গুলীভরা আর্মি রিভলভার।

এমনি নিশ্ছিদ্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কার ভয়ে!

কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান একমাত্র আসামী দীনেশ মজুমদার। জেল থেকে আনা হয়েছে তাকে দেহতল্লাসী করে, সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। কাঠগড়ার নীচেও খোলা রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সার্জেণ্ট তার ওপর কড়া নজর রেখে।

তাহলে? তাহলে আর কাকে ভয়?

ভয় দীনেশকে নয়, ভয় দীনেশের কোনো অপরিচিত সহকর্মীকে, কোনো অকুতোভয় অনুগামীকে, ভয় বাংলার বিপ্লবী দলের সুইসাইড স্কোয়াডকে, আত্মবিলোপনের অগ্নিমন্ত্রে যারা দীক্ষিত। কে জানে এদেরই কেউ পুলিশ গুপ্তচরদের ছদ্মবেশের অনুকরণে নিরীহ ও উৎসুক দর্শকের মুখোস পরে এসেছে কিনা, এসেছে কিনা আইনজীবির শামলা পরে।

মরতে ভয় পায় না যে, মারতে তার হাত কাঁপবে কেন?

তাই এই ব্যাপক সুতর্কতা ব্যবস্থা সত্ত্বেও টেগার্ট আতঙ্কগ্রস্ত।

মনে আতঙ্ক থাকলে কি হবে, দীনেশ বন্ধুদের বলতে লাগল, ব্যাটা সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠল দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো। তারপর নিজের সাহস ও কেরামতি প্রমাণের জন্য নির্জলা মিথ্যা গল্প বলতে লাগল—

বোমার আওয়াজ পেয়েই আমি হুডখোলা গাড়ীতে রিভলভার নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

আরও বোমার আওয়াজ !

কেয়ার করলাম না।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখি লোকজনের হৈ চৈ ও ছুটোছুটির মধ্যে ডালহাউসি স্কোয়ারের পূব দিক দিয়ে একটা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে আর রেলিং টপকে স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, এই ছেলেটি, কাঠগড়ার এই আসামী। আমি এর পেছনে ধাওয়া না করে আমার কুকুর নিয়ে ছুটলাম দ্বিতীয় লোকটার পেছনে।

ছুটতে ছুটতেই গুলী চালাতে পারতাম এবং জানি আমার নিশানা এমনি নিখুঁত যে, সহজেই আমি এদের ফেলে দিতে পারতাম।

কিন্তু রিভলভার চালালাম না অত পাবলিকের মধ্যে। আর ওদের জ্যান্ত গ্রেপ্তার করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। ভেবেছিলাম, এই আসামীকে জেরা করলেই জানা যাবে যে কোথায় পেল সে বোমা আর রিভলভার, এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টার পেছনে কোন্ কোন্ টেরোরিস্ট ইন্ধন জুগিয়েছে।

কিন্তু আসামী কোন জবাব দেয়নি।

ধর্মাবতার, হিজ ম্যাজেষ্টিজ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম অনুগত কর্মচারী হিসেবে প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও আমি কুণ্ঠিত নই, কিন্তু এই মতিচ্ছন্ন টেরোরিস্টদের সাধ্য নেই যে, আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

দীনেশ মজুমদার বন্ধুদের এইসব কাহিনী বলত আর নিজের হাত কামড়াত।

টেগার্ট বেঁচে আছে !

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বেঁচে থাকল বটে এবং বিপ্লবীদের বেপরোয়া ক্রিয়াকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে দেখে জীবন বাঁচাবার জন্য একদিন সরকারী চাকরিকে সেলাম ঠুকে তলপিতলপা বেঁধে ইংলণ্ডে পলায়ন করল বটে, কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান যে, টেগার্টের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ আর একটি পুলিশ কমিশনারকে দুঃসাহসী করে তুলল।

তিনি চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে কুঁই।

তিনি ভাবলেন, টেগার্ট কলকাতায় যা করেছে, আমি চন্দননগরে তা করতে পারব না কেন ? আমার সাহস বা ক্ষমতা কি কিছু কম ?

কলকাতার তথা বাংলার বিপ্লবীরা অনেক সময় পালিয়ে চন্দননগর চলে আসে। চন্দননগর থেকে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য এখানে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে আরও ইংরেজ হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির পরিকল্পনা করা, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা তৈরী করা। আমি ওদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দোব।

১৯৩৩ সালের ৯ মার্চ। সকালবেলা।

চন্দননগরের আশ্রয়স্থলে নিরাপদেই রয়েছে দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস এবং আরও কয়েকজন। বাড়ীর দরজায় একটি ছেলে পায়চারি করছে আর চারিদিকে নজর রাখছে।

অকস্মাৎ সেখানে সাইকেলে এসে নামল পুলিশ কমিশনার কুঁই। বেল্টে রিভলভার। কিন্তু একা। খবর পেয়েছে কুঁই, ঐ বাড়ীতে কজন ছেলে থাকে, যারা দিনের বেলা বাইরে আসে না, রাত্রে তাদের কাছে অন্য ছেলেরা আসে, আবার চলে যায়।

ওদের মতিগতি সন্দেহজনক।

তাই স্বয়ং কুঁই এসে হাজির।

টেগার্ট এমনি করে হানা দিত গুণ্ডা আর জুয়াড়ীদের গোপন আড্ডায়। আমি কেন পারব না ?

জিজ্ঞেস করল ছেলেটিকে, কে আছে বাড়ীতে ডেকে দাও।

কুঁইকে চেনে সে। সুতরাং বুঝতে দেরী হল না যে, বিপদ আসন্ন।

কোন জবাব না দিয়ে সে দ্রুত বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

এবং পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে সে প্রাণপণে ছুট দিল।

কুঁই মনে করল, এই ছেলেটা নিশ্চয়ই টেরোরিষ্ট।

সে সাইকেলে তার পশ্চাতে ছুটল।

পর মুহূর্তেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল দীনেশ মজুমদার আর নলিনী দাস।

তারা ছুটল বিপরীত দিকে।

দোকানপাট সব খুলে গেছে তখন, রাস্তায় লোক চলাচল সুরু হয়ে গেছে, চলছে নানারকম যানবাহন—মোটর, লরী, সাইকেল, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী—এরই মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে ছেলেটি।

পুলিশ কমিশনারকে সবাই চেনে, চেনে না ঐ ছেলেটিকে।

কুঁই চীৎকার করছে, পাকড়ো, পাকড়ো।

একজন পথচারী বাধা দিতে এল। তাকে ঠেলে দিয়ে ছুটল সে।

আর একজন বাধা দিল।

আর একজন ছুটে এল।

ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ছেলেটিকে।

ছেলেটি ধরা পড়ে গেল।

কুঁই সাইকেল থেকে নামল। ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এল। কুঁই ছেলেটিকে পুলিশের হাতে দিয়ে বিজয় গর্বে অফিসে ফিরে যাবে, এমন সময় একজন পথচারী বলল যে, আরও দুজনকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দিকে ছুটে যেতে দেখেছে।

আরও দুটো ? কুঁই-এর ফরাসী রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল।

ঝপ করে লাফিয়ে উঠল সাইকেলে, ছুটল জি টি রোডের দিকে।

দীনেশ আর নলিনী তখন হেঁটেই চলেছে কলকাতার দিকে।

কৌশল সফল হয়েছে। কুঁই তাড়া করেছে ছেলেটিকে। পরমুহূর্তেই ওরা দুজন বেরিয়ে যে বিপরীত দিকে ছুটেছিল, কুঁই পেছন ফিরে আর তা দেখেনি। পেছনে তাকাবে কেন? সে ভেবেছে ঐ ছেলেটিই একমাত্র টেরোরিস্ট।

খানিকটা পথ দৌড়ে এসে জি টি রোড ধরে ওরা এখন নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছে। হয়তো ভাবছে পরের ষ্টেশন মানকুণ্ডুতে ট্রেন ধরে ওরা কলকাতা চলে যাবে। সুনীলরা একটা শেলটারের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

এমন সময়—

এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে তীরবেগে সাইকেল চালিয়ে কে একজন সাহেব ওদের অতিক্রম করে চলে গেল এবং কিছুদূর গিয়েই সাইকেল থেকে নেমে ফিরে দাঁড়াল।

দেখেই চিনল ওরা, পুলিশ কমিশনার কুঁই।

তখন দৌড়নো ঠিক হবে না। আর দীনেশ নলিনীকে কুঁই চিনবে কি করে? তাই ধীরভাবেই এগিয়ে চলল দুজন নিরীহ পথিকের মতো। কুঁইও সাইকেল ঠেলে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, দুজন ছেলেকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ তোমরা?

পায়ে হেঁটে? পাল্টা জিজ্ঞেস করল নলিনী।

পায়ে হেঁটে কিংবা দৌড়ে।

দীনেশ বলল, না তো।

তোমরা দুজন কোথায় যাচ্ছ?

মানকুণ্ডু।

কোথা থেকে এলে?

চন্দননগর।

চন্দননগরের কোথায় ছিলে? কি তোমাদের নাম? কুঁই দৃঢ়স্বরে বলল, চল আমার সঙ্গে থানায়—

বলতে না বলতেই দীনেশ তড়িৎগতিতে রিভলভার বার করে আরও এক পা এগিয়ে ট্রিগার টানল।

সাইকেল শুদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কুঁই।

এক গুলিতেই সাবাড়।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বেঁচে গেলেও চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার দীনেশের হাত থেকে রেহাই পেল না।

খানিকটা দৌড়ে একটা বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়ল দীনেশ মজুমদার আর নলিনী দাস।

কেউ তাদের পাত্তা পেল না।

কিন্তু শহীদ হবার জন্যই যাদের জন্ম, তারা যে বার বার জীবনের ঝুঁকি নিতে থাকবে, যত দিন না তাদের অভীষ্টলাভ হয়, যত দিন না তারা মৃত্যুসখাকে প্রীতির আলিঙ্গনে বাঁধতে পারে !

অন্তরালে থেকে বিধাতা যেন ভগীরথের মতো সেই পথে তাদের নিয়ে যান !

চন্দননগর হত্যাকান্ডের মাত্র মাস দেড়েক পর ১৯৩৩ সালের ২২ মে ভোর হবার আগেই কলকাতা পুলিশ মহলে সাজো সাজো রব পড়ে গেল।

এক লরীবোঝাই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী রওনা হল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধরে।

কিছু দূরে নেমে ওরা নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঘিরে ফেলল লাগালাগি তিন খানা বাড়ী, ১৩৬/৩-এ, ১৩৬/৩-বি এবং ১৩৬/৪-বি নম্বরের বাড়ী। সদর রাস্তায় পুলিশ, বাড়ীগুলির পেছনে পুলিশ, দুপাশের গলিতে পুলিশ। কেউ বন্দুক উঁচিয়ে, কেউ উঁচিয়ে রিভলভার। ওদের লীডার ইনসপেক্টার মুকুন্দ ভট্টাচার্য।

মই লাগিয়ে ১৩৬/৩-এ বাড়ীর ছাদে উঠে গেল মুকুন্দ ভট্টাচার্য এবং আরও কজন পুলিশ। পাশের ১৩৬/৩-বি দোতলা বাড়ীর চিলেকোঠা বন্ধ থাকলেও দরজার ফাঁকে আলোরেখা দেখা যাচ্ছে আর ভেতরে অস্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে।

দুই বাড়ীর মাঝখানে সামান্য ব্যবধান। একখানা তক্তা ফেলে পার হল ওরা।

বন্ধ দরজায় করাঘাত করতেই ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়া হল।

তৎক্ষণাৎ পুলিশ কাঠের দরজা ভেদ করে বন্দুকের গুলী চালাতে লাগল।

এমনিভাবে গুলী চালালে কারুর গায়ে লাগার সম্ভাবনা কম। পুলিশ ভাবল এমনি করেই টেরোরিস্টদের টেরোরাইজ করা যাবে।

স্বভাবতঃই এক পাশে সরে গেছে ওরা। সাঁই সাঁই করে দরজা ভেদ করে গুলী এসে ওপাশের দেয়ালে লাগছে।

ফিসফিস করে বলল দীনেশ, নলিনী, তুই পেছনের জানালা দিয়ে পালিয়ে যা আমরা এদের এনগেজ রাখছি।

দরজায় একটা ফুটো ছিল, সেখানে রিভলভারের নল চেপে ধরে ট্রিগার টানল দীনেশ। গুলী লাগল মুকুন্দ ভট্টাচার্যের কাঁধে ! গলগল করে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। ভেসে গেল খাকি ইউনিফরম।

এইবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল পুলিশের দল।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী চালিয়ে দরজা ঝাঁঝরা করে ফেলতে লাগল।

গুলী দিয়েই গুলীর জবাব দিতে লাগল দীনেশ মজুমদার, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় আর নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিকে একদল পুলিশ, তাদের হাতে মাস্কেট, আর একদিকে তিনটি বিপ্লবী তরুণ, তাদের হাতে রিভলভার।

যুদ্ধ চলতে লাগল।

ওদিকে নলিনী দাস নিঃশব্দে পেছন দিকের গরাদহীন জানালা দিয়ে বেরিয়ে

পড়ল। ছাদের রেলিং ধরে ধরে এগিয়ে এল কোণের দিকে। বেড়ালের মতো লাফিয়ে পড়ল পাশের একতলা বাড়ীর ছাদে। না, কেউ দেখতে পায়নি। পাশেই সরু গলি। লাফ দেয়া বিপজ্জনক। কি করে নামা যাবে তাহলে? সহসা রেনওয়াটার পাইপের কথা মনে পড়ল।

খুব সাবধানে অথচ দ্রুত পাইপ বেয়ে গলির মধ্যে নেমে পড়ল নলিনী।

কিন্তু হায়, গলির ও মাথায় পাহারা দিচ্ছিল একজন সার্জেণ্ট।

দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসে পেছন থেকে জাপটে ধরল নলিনীকে।

ধস্তাধস্তি হতেই ছুটে এল আর একটা পুলিশ।

দেখাদেখি আর একটা।

আরও একটা।

আরও একটা।

নলিনী দাস ধরা পড়ে গেল।

ওদিকে—

তখনও চলছে গুলী বিনিময়।

মাস্কেট বনাম রিভলভার।

কিন্তু কতক্ষণ যুদ্ধ চালাবে বিপ্লবীরা? রিভলভারের কতগুলো বুলেট থাকতে পারে? অপর দিকে পুলিশের অতগুলো মাস্কেট, সবার সঙ্গেই কার্টিজের থলি। তারা ঝাঁঝরা করে ফেলল কাঠের দরজা।

বিপ্লবীদের বুলেট ফুরিয়ে গেল।

বুঝতে পেরেই পুলিশ সমবেতভাবে ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলল দরজা।

ধরা পড়ে গেল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর দীনেশ মজুমদার।

ইনসপেক্টার মুকুন্দ ভট্টাচার্যকে হাসপাতালে পাঠানো হল।

তারপর?

তারপর আর কি! ইংরেজ সরকারের আদালতে সেই চিরাচরিত কাজীর বিচার। সেই গম্ভীরমুখ বিচারক, সেই বশংবদ আমলার দল, পাবলিক প্রসিকিউটরের সেই জ্বালাময়ী ভাষণ, হিজ ম্যাজেষ্টিজ গভর্ণমেণ্টের অনুগত প্রজাবৃন্দের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এই মতিচ্ছন্ন টেরোরিস্টরা যে কী বিষম বিঘ্নস্বরূপ, এরা যে কতখানি জঘন্য হত্যাকারী, সবিস্তারে ও সালঙ্কারে তার বর্ণনা, তারপর সরকারী সাক্ষীদের মুখে তোতাপাখীর বুলির মতো সাক্ষ্যদান।

এবং অবশেষে রায় দান।

ন্যায় বিচারের সেই ভড়ং শেষ হতে দেরী হয় না। সুরু হয় ১৯৩৩ সালের ৫ অক্টোবর আর শেষ হয়ে যায় ১০ অক্টোবর।

ছ দিনেই শেষ।

রায়? অবশ্যই দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী।

নলিনী আর জগদানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

কুইকে কে হত্যা করেছিল জানে না পুলিশ। কিন্তু টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা এবং মুকুন্দ ভট্টাচার্যকে হত্যার চেষ্টা, দুই চেষ্টার যোগফল হল, নরহত্যা। নরহত্যার সাজা **"to be hanged by the neck until he be dead".**

কিন্তু শহীদ হবার জন্যই তো দীনেশ মজুমদারের জন্ম!

দেশমাতৃকার সেই অমোঘ আহ্বান কে রুখতে পারে?

তাই, ১৯৩৪ সালের ৯ জুন আলীপুর সেনট্রাল জেলের ফাঁসীর মঞ্চের ওপর বুক টান টান করে দাঁড়াল ডেয়ার ডেভিল দীনেশ মজুমদার।

ওরা তিনজন

ভগৎ সিং রাজগুরু আর শুকদেব

'স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচালেই হয় না। স্বাধীনতা ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, তোমরা চাইলে আর আমরা দিয়ে দিলাম। ত্রিশ কোটি ভারতীয় প্রজার নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত, তোমাদের কল্যাণকামনায় আমরা উদ্বুদ্ধ, তোমাদের দেশের শাসনভার তোমাদেরই হাতে তুলে দিয়ে চলে আসতে আমরা প্রতিশ্রুত। কিন্তু ঐ যে বলেছি, স্বাধীনতা ছেলের হাতের মোয়া নয়, তোমাদের হাতে দিয়ে দিলে তোমরা তা রক্ষা করতে পারবে কি না, সেটা ত আগে আমাদের দেখতে হবে, ভাল করে যাচাই করতে হবে তোমাদের যোগ্যতা। তাই—'

তাই ১৯২৮ সালে লর্ড সাইমনের নেতৃত্বে সেই সুদূর ইংলণ্ড থেকে বহুৎ মেহনৎ করে এলেন কয়েকজন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ভাল করে যাচাই করতে ভারতীয়েরা স্বাধীনতা পাবার মত এবং স্বাধীন দেশের প্রশাসন চালাবার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে কি না, করে থাকলেও তা কতখানি।

কিন্তু এ কি মনোবৃত্তি ভারতবাসীর? বোম্বাই-এ পদার্পণ করার দিন একেবারে 'ভারত বনধ্' করে বসলো? স্তব্ধ করে দিল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা? তারপর থেকেই যেখানেই যাচ্ছে কমিশন, সেখানেই হরতাল, কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল আর সমবেত কণ্ঠে শ্লোগান, গো ব্যাক সাইমন? এ কেমনতরো ব্যবহার তোমাদের?

কিন্তু গো ব্যাক বললেই ত আর চলে যাওয়া যায় না। আমরা কর্তব্যপরায়ণ, ভারতের জন্য আমাদের দরদ ও সহানুভূতি সীমাহীন, তাই কলসীর কানা মারলেও প্রেম বিতরণ আমরা করবই।

সাইমন কমিশন সারা ভারতবর্ষ সফর করতে লাগল কানে তুলো গুঁজে, চোখে ঠুলি লাগিয়ে আর পিঠে কুলো বেঁধে।

৩০ অক্টোবর শুভাগমন করল তারা লাহোরে।

লাহোর রেল স্টেশনে তাদের অভ্যর্থনা (?) জানাবার জন্য যাত্রা করল দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিল, সেই মিছিলের পুরোভাগে অন্যান্য নেতার সঙ্গে আর কেউ নন, স্বয়ং লালা লাজপৎ রায়! রেল স্টেশন ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া খাড়া করা হয়েছে, সেই সীমানা পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র পুলিশের দল, তাদের পুরোভাগে সিনিয়র পুলিশ সুপার মিঃ স্কট।

লালাজী সদলবলে কাঁটাতারের ধারে এলেন।

সদলবলে এগিয়ে এল স্কট।

তারপর সদলবলে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল অহিংস মিছিলের উপর। চলল নির্বিচারে লাঠি, বুট, বন্দুকের কুঁদো। আহত হয়ে গড়িয়ে পড়ল দলে দলে। স্কটের লাঠির ঘায়ে লালাজীর ছাতা ভেঙ্গে গেল, পরক্ষণেই স্কটের লাঠি পড়ল তাঁর বুকের পাঁজরে।

লালাজী আহত হলেন।

১৭ নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে উঠেছিল, হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক্যান পার্টি। গত আগস্ট মাসেই দিল্লীতে তার গুপ্ত সভা হয়ে গেছে, গঠিত হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, এক-একটি প্রদেশের সংগঠনের ভার এক-একজন কর্মীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পাঞ্জাবের ভার পেয়েছে ভগৎ সিং এবং শুকদেব।

১০ ডিসেম্বর লাহোর শাখার এক গুপ্ত বৈঠক বসল মোজাং হাউসের একটি নির্জন কক্ষে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, লালা লাজপৎ রায়ের হত্যার জন্য দায়ী সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ স্কটকে খতম করতে হবে। তিনজন বিপ্লবীকে মনোনয়ন করা হল, ভগৎ সিং, রাজগুরু ও চন্দ্রশেখর আজাদ।

পর পর তিন দিন ওরা স্কটের গতিবিধি লক্ষ্য করল।

তারপর তারিখ নির্দিষ্ট করা হল ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর।

ডি. এ. ভি. কলেজ ও আদালতসমূহের মাঝখানে বড় রাস্তার উপর স্কটের অফিস। ওরা তিনজন অপরাহ্নের দিকে কাছাকাছি এসে পেঁছিল। কলেজ-প্রাঙ্গণের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তিনটি সাইকেল। স্থির হল রাজগুরু এগিয়ে গিয়ে গুলি করবে। যদি তার গুলিতে স্কট খতম না হয়, তাহলে এগিয়ে যাবে ভগৎ সিং। ওরা ধরা দেবে না, কলেজপ্রাঙ্গণে ঢুকে সাইকেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। যদি ওদের কেউ অনুসরণ করে, তাহলে চন্দ্রশেখর তার সম্মুখীন হবে। যদি কেউ ধরাই পড়ে যায়, তাহলে আদালতে বিবৃতি দিয়ে সে দেশবাসীকে জানিয়ে দেবে যে, এটা সাধারণ হত্যা নয়, এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। যে ইংরেজ সরকার সারা দেশের উপর বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড থেকে সুরু করে লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে জহল্লাদ গভর্ণমেণ্ট, সেই গভর্ণমেণ্টের ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিদের একে একে খতম করে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যে, বিপ্লবীরা অত্যাচারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু পরম সৌভাগ্য স্কটের, অপরাহ্ন ঠিক চারটে সাঁইত্রিশ মিনিটে স্কটের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে যে মটর সাইকেলে চড়তে গেল, সে স্কট নয়, স্যাণ্ডার্স।

আর সাহেবদের লাল মুখ দেখতে প্রায় একই রকমের, তাই ওরা স্যাণ্ডার্সকেই মনে করল স্কট।

রাজগুরুর রিভলবার গর্জে উঠল।

মাথায় আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়ল স্যাণ্ডার্স।

ভগৎ সিং মনে করল, ব্যাটা যদি না মরে? তাই সেও এগিয়ে গেল, স্যাণ্ডার্সের লুটিয়ে পড়া দেহের ওপর পাঁচ ছয়বার গুলী করল।

তারপর দুই বিপ্লবী বন্ধু, যেন কিছুই হয়নি, যেন তারা রাস্তায় চলমান নাগরিকদের মতই নিরীহ নির্লিপ্ত, এমনি ভাব দেখিয়ে প্যাণ্টের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল কলেজের দিকে।

এমন সময় অকস্মাৎ স্কটের অফিস থেকে বেরিয়ে এল একজন ইউরোপীয় সার্জেণ্ট, স্যাণ্ডার্সের দেহরক্ষী চন্নন সিংকে সঙ্গে নিয়ে রিভলবার উঁচিয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করল।

ভগৎ সিং পেছনে ফিরে গুলী চালাল। গুলী ওদের গায়ে লাগল না বটে, কিন্তু সার্জেণ্টটা লাফিয়ে উঠতেই এমনভাবে পা হড়কে পড়ে গেল যে, তার হাত ভেঙ্গে গেল।

চন্নন সিং তখনও একাই ধাওয়া করছে।

কলেজ গেটের কাছে অপেক্ষা করছিল চন্দ্রশেখর আজাদ, এবার সে গুলী চালাল। পেটে গুলী লেগে লুটিয়ে পড়ল চন্নন সিং।

ওরা দ্রুতপদে ঢুকে পড়ল কলেজ ভবনের ভিতরে একটি হল-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে উঠল দোতালায় বোর্ডিং হাউসে, বিল্ডিং-এর পেছন দিকে গিয়ে রেন ওয়াটার পাইপ বেয়ে নীচে নেমে পড়ল, তারপর তিনজন সাইকেলে চেপে কলেজের পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে শহরের জনারণ্যে নিরাপদে মিলিয়ে গেল।

আততায়ীদের সন্ধানে পর মুহূর্ত থেকে সুরু হল সার্চ, সার্চ, সার্চ!

চতুর্দিকে যেখানে সেখানে সার্চ।

হানা দিল পুলিশ ডি. এ. ভি. কলেজ হোস্টেলে, সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির অফিসে, ডেইলি প্রতাপ পত্রিকার অফিসে, আরও অনেক জায়গায়। খবর পাওয়া গেল, ওরা নাকি নাভা হাউসের পেছনে এসে সাইকেলগুলো ফেলে রেখে অপেক্ষমান একখানা মোটরে গ্রামের দিকে পালিয়ে গেছে।

সাইকেল তিনখানা সেখানে পাওয়া গেল। কাদের সাইকেল? কারা এদের মালিক? সে খবর পাওয়া গেল না। কোত্থেকে পাওয়া যাবে? মোটরের মত সাইকেল রেজিস্ট্রেশনের কোন আইন নেই, সাইকেল চালাতে লাইসেন্স লাগে না।

গ্রামের দিকে পালিয়ে গেছে শুনে রবী নদীর তীরে গোটা বিরাট জঙ্গলটাই ঘিরে ফেলল বিরাট পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে, চালাল তন্ন তন্ন করে তল্লাসী।

কিন্তু কোনো হদিশ পাওয়া গেল না বিপ্লবীদের।

ব্যর্থ হল বৈদ্যুতিক অভিযান।

পক্ষান্তরে, ২১ ডিসেম্বর লাহোর গেট ও শালিমার গেটের দেয়ালে আঁটা হাতে লেখা পোস্টার দেখা গেল, আমি ভারতে বিপ্লবী সংগঠনের কমান্ডার ইন চিফ, আমি ঘোষণা করছি, যদি কেউ আমায় গ্রেপ্তার করতে পারে তাহলে গভর্ণমেন্ট যাই দিক না কেন, আমি নিজেই তাকে দেব নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে বিপ্লবীদের চ্যালেঞ্জ !

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছে তখন। ইংরেজ হোম মেম্বার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি নতুন বিল উত্থাপন করতে চাইলেন—পাবলিক সেফটি বিল, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় আন্দোলন দমন করা। পরিষদের প্রেসিডেন্ট বিঠলভাই প্যাটেল আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আগে ট্রেডস ডিসপিউটস্ বিল নিয়ে আলোচনা হোক। হোম মেম্বার রাজী হননি। বলেছেন, জনগণের স্বার্থের খাতিরে এটা অত্যন্ত জরুরী। শিল্পে যে সব বিরোধ দেখা দেয়, তা নিয়ে আমাদের ভাবনা থাকলেও হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেন্টের ত্রিশ কোটি প্রজার শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সবার আগে করা দরকার।

অথচ, যে জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেন্টের ঘুম হচ্ছে না, সেই জনগণের প্রতিনিধিরা প্রচণ্ড আপত্তির ঝড়ে বার বার পরিষদ কক্ষ প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন, তাদের নেতারা কক্ষের বাইরে মাঠে ময়দানের সভায় বার বার বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সেই আপত্তি ও বিক্ষোভের ঢেউ আজ ব্যবস্থা পরিষদ-কক্ষে দর্শকদের গ্যালারিতেও বুঝি এসে পেঁছেছে। সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। সকলেরই প্রচণ্ড ঔৎসুক্য, ঐ কুখ্যাত বিল আগে তোলবার জন্য হোমমেম্বার যে জেদ দেখিয়েছেন, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট প্যাটেল আজ রুলিং দেবেন, কি রুলিং দেন শুনতে হবে।

যেই প্যাটেল উঠে দাঁড়িয়েছেন, চতুর্দিকে নীরবতা, সকলেই উৎকর্ণ, প্যাটেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভারী তাপ-উত্তাপহীন কণ্ঠে বলতে সুরু করেছেন, অমনি কোথা থেকে কক্ষের মেঝের ওপর এসে পড়ল পর পর দুটি বোমা, প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল। পরক্ষণেই শোনা গেল পর পর দুবার রিভলভারের আওয়াজ! বোমার ঘায়ে মেঝেতে গর্ত হয়ে গেছে, টেবিল চেয়ার ভেঙ্গে ছিটকে পড়েছে।

মুহূর্তে হৈ চৈ পড়ে গেল, সদস্যরা দর্শকরা প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন, ভয়ার্ত চীৎকারে কক্ষ কেঁপে উঠল, হোম মেম্বার ও লালমুখ সদস্যরা তাড়া-খাওয়া ঘিয়ে ভাজা-কুকুরের মত চোঁ দৌড় মারলেন।

তারপর ছুটে এল মার্শালের দল, খোলা রিভলভার হাতে পুলিশের দল, টেলিফোন চলে গেল প্রধান ঘাঁটিতে, আরও পুলিশ পাঠাও, অস্ত্র পাঠাও, সৈন্য পাঠাও।

যে দুষ্কৃতকারীকে ধরবার জন্য এত তোড়জোড়, তারা দুজন কিন্তু দর্শকদের গ্যালারীতে অটল প্রশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে মুঠো মুঠো হ্যান্ডবিল ছুঁড়ে ফেলল নীচে মেঝের ওপর, হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান পার্টির ইস্তাহার, তারপর চীৎকার করে উঠল—দেশের প্রতি আমরা আমাদের কর্তব্য করলাম। হাতের আগ্নেয়াস্ত্র দুটিও সিটের ওপর ফেলে দিল।

পরক্ষণে পুলিশের দল উঠে আসতেই বিনা প্রতিরোধে, বিনা দ্বিধায় হ্যাণ্ডকাপ পরাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

কে তোমরা? নাম কী? কোথা থেকে এসেছ? কেন বোমা ফেললে? কেন ছুঁড়লে রিভলভার? কাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে?

পুলিশের হাজারো জেরার জবাবে অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিল ওরা—

আমি ভগৎ সিং, বয়স একুশ বৎসর, পাঞ্জাবের অধিবাসী।

আমি বটুকেশ্বর দত্ত, বয়স বাইশ বৎসর, বাংলায় দেশ হলেও আমিও পাঞ্জাবের অধিবাসী।

আমরা সোসালিষ্ট রিপাবলিক্যান পার্টি-নামীয় বিপ্লবী দলের সদস্য। তোমাদের পার্লামেন্ট যে ভুয়ো, বিনা প্রতিবাদে যে এই ভুয়ো সভার কাজ চলতে দেওয়া উচিত নয়, মর্মে মর্মে আমরা তা উপলব্ধি করি বলেই, কারুকে হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, তীব্র প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যেই বোমা ফেলেছি, রিভলভার ছুঁড়েছি। জনগণের কাছে তোমাদের মুখোস খুলে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

এদিকে পরদিনই, অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৯ এপ্রিল পুলিশ গোপন সূত্রে সংবাদ পেল যে, কাশ্মীর বিল্ডিং-এর ৬৯ নম্বর কক্ষে একটি লোহা ঢালাইয়ের ছোট কারখানা খোলা হয়েছে। কয়েকজন ভদ্রসন্তান লাহোর শহরের জনকতক লোহা ঢালাইকারী শ্রমিককে নিযুক্ত করেছে। কাজ হয় রাত্রিবেলা, দিনে নয়। তারা ঢালাই করে তৈরী করে দুদিক খোলা ডিম্বাকৃতি, অথচ আকারে ডিমের চাইতে বেশ বড় লোহার জিনিস। কি হবে ওগুলো দিয়ে, জিজ্ঞেস করেছিল শ্রমিকরা। ভদ্রসন্তানরা বলেছেন, ওগুলো একটা মেসিনের অংশ।

কি সে মেসিন? কি হয় তা দিয়ে? আর ঢালাই কাজটা দিনের বেলা হচ্ছে না কেন? নানা প্রশ্ন জাগল ওদের মনে। সন্দেহও হল বৈকি! ওরা চেনাজানা একজন পুলিশের কাছে ঘটনাটা বলল।

পুলিশেরও সন্দেহ হল।

সে জানিয়ে দিল ওপরওয়ালাকে।

ওপরওয়ালা গুপ্তচর পাঠালেন কাশ্মীর বিল্ডিং-এর ওপর নজর রাখবার জন্য।

জানা গেল ৬৯ নম্বর কক্ষটি যে ভাড়া নিয়েছে, তার নাম ভগবতীচরণ। সে নিজে কিন্তু কক্ষটি দখল নিতে আসেনি প্রায় দু সপ্তাহ। তারপর জনকয়েক

ছাত্র এসে থাকত ওখানে। তারা বেলা দশটায় ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যেত আর ফিরে আসত সেই অপরাহ্নে। মাঝে মাঝে একনাগাড়ে কদিন আসতও না তারা। গভীর রাত্রে শ্রমিকরা আসে, কাজ করে, আবার ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই চলে যায়। কে একটি ছেলে রোজই চুপিসারে এসে হাজির হয় সেখানে, কাজকর্মের তদ্বির করে, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যায়।

১৫ এপ্রিল গভীর রাত্রে অকস্মাৎ পুলিশ হানা দিল কাশ্মীর বিল্ডিং-এর সেই ৬৯ নম্বর ঘরে, পাওয়া গেল শুকদেবকে, গ্রেপ্তার করা হল তাকে। পাওয়া গেল দুটি পিস্তল, চব্বিশটি বুলেট ও এগারোটি বোমা।

পরিষদ কক্ষে বোমা ফেলার অভিযোগে ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্তের মামলা শুরু হল ১৯২৯ সালের ৭ মে দিল্লীতে।

১২ জুন দুজনের সাজা হয়ে গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সাজা হয়ে যাবার পর জেলের অভ্যন্তরে ওদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার সুরু হয়ে গেল। আবেদন নিবেদনে যখন কাজ হল না, ওদের কড়া প্রতিবাদে যখন কর্ণপাতও করলেন না জেল কর্তৃপক্ষ. তখন সাজা হওয়ার মাত্র তিনদিন পর, ১৫ জুন থেকে ওরা সুরু করল অনশন। ওদের দাবী, ওদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর ইয়োরোপীয় বন্দীদের যেমন দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি উন্নত ধরণের খাদ্য দিতে হবে। কোনো হার্ড লেবার দেওয়া চলবে না। সাধারণ কয়েদীদের থেকে পৃথক কোন ইয়ার্ডে রাখতে হবে, বই ও অন্যান্য সাহিত্যপাঠের সুবিধা দিতে হবে।

যথারীতি কর্তৃপক্ষ এসব দাবীতে কর্ণপাতও করলেন না।

কলকাতায় গ্রেপ্তার করে যতীন দাসকে ১৬ জুন লাহোরে নিয়ে আসা হল।

৯ জুলাই অনশনকারী ভগৎ সিংকেও লাহোরে নিয়ে যাওয়া হল।

কিছুদিন অপেক্ষা করার পর জেল কর্তৃপক্ষ অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীদের বলপ্রয়োগে খাওয়ানো সুরু করলেন। প্রক্রিয়াটি অভিনব। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে ডাক্তার আসেন, সঙ্গে কয়েকজন ওয়ার্ডার ও জোয়ান-গোছের সাধারণ কয়েদী। বন্দীকে চিৎ করে শুইয়ে হাত, পা ও মাথা চেপে ধরা হয়, যাতে একটুও না নড়তে পারে সে। দুধ ও নানারকম আহার্য তরলিত করে একটি পাত্রে রাখা হয় আর সেই পাত্রের সঙ্গে লাগানো একটি সরু রবারের নল, তার গোড়ায় স্টপকক লাগানো। ডাক্তার সেই সরু নলটি বন্দীর নাকের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে একেবারে পাকস্থলী পর্যন্ত চালান করে দেয়। তারপর স্টপকক ঢিলে করে দিলে সেই তরলিত খাদ্য ধীরে ধীরে বন্দীর পাকস্থলীতে যায়। এইভাবে শরীর মজবুত রাখবার মত পর্যাপ্ত খাদ্য খাওয়ানো যায় না বটে, তবে অনশনঘটিত মৃত্যুকে খানিকটা বিলম্বিত করা যেতে পারে।

তবে বিপ্লবী বন্দীদের ক্ষেত্রে সে কথা সত্য নয়। প্রথমতঃ, চিৎ হয়ে শোওয়াবার সময় সে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে থাকে, তারপর শোয়ালেও সে মাথা

নাড়ার চেষ্টা করে, যাতে নলটা নাকের মধ্যে ঢোকানো সম্ভব না হয়, পরিশেষে ওরা জবরদস্তি খাইয়ে চলে যাবার পর বন্দী গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করবার চেষ্টা করে।

এর ফলে বিপ্লবী বন্দীর শরীর বরং তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে।

ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব ও অন্যান্য অনশনকারী বন্দীকে এমনিভাবে বলপ্রয়োগে খাওয়াতে লাগলেন লাহোর জেল কর্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন নিয়ে।

যতীন দাস তখনো অনশন সুরু করেনি।

তবে জেলে এসেই সংবাদ পেয়ে গেছে সে।

সহকর্মীদের সঙ্গে গোপনে সংবাদ আদান-প্রদানও চলছে।

কতকগুলি বাস্তব সুখ-সুবিধা আদায়ের জন্য অনশনকে প্রথমটা সে ততটা সমর্থন করতে পারল না, বার্তাবহ মারফত তাদের বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভগৎ সিংদের অনশনের তখন আঠাশ দিন অতিক্রান্ত, অনশন এখন প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। একদিকে জেদী ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট, অন্যদিকে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' ভারতের বিপ্লবী দল, যারা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। এতদিন অটলভাবে অনশন চালিয়ে তাদের পক্ষে তা বিনা কারণে প্রত্যাহার করবার উপায় নেই।

সব শুনে যতীন দাস খবর পাঠাল—অল রাইট, আমি করছি হাঙ্গার স্ট্রাইক। আমাদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমি স্ট্রাইক এ্যাবানডন করব না, করব না।

তার হাঙ্গার স্টাইক সুরু করবার তারিখটিও উল্লেখযোগ্য।

সে যুগে একটি 'স্বদেশী' ষড়যন্ত্র মামলা সুরু করতে পারলেই পুলিশ খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠত।

কোনো 'স্বদেশীকে' ধরে ফেলতে পারলেই চলত তার ওপর দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার। ঘুট-ঘুটে অন্ধকার কক্ষে বন্ধ করে রাখা, স্নানাহার করতে না দেয়া, বাবা মা চৌদ্দপুরুষ তুলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ, মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়া, গায়ে ময়লা-মেশানো জল ঢেলে দেয়া, বরফের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা, নখের নীচে আলপিন ফুটিয়ে দেয়া, উলঙ্গ করে গোপনাঙ্গে আঘাত করা এবং চড় চাপড় কিল ঘুসি লাথি মারা ও হাণ্টার চালনা—এ ত চলতই, তাছাড়া চলত প্রচুর পরিমাণ টাকার লোভ দেখানো। যদি কোন বন্দী দুর্বলতা দেখিয়ে কিছু বলে ফেলত অমনি সুরু হত পুলিশের ষড়যন্ত্র মামলা সাজাবার কূট কলা-কৌশল। যা সে জানে না, অতএব বলেনি, সে সব কথা প্রয়োজনমত তার মুখে গুঁজে দেয়া হত! কতকগুলি বিক্ষিপ্ত বৈপ্লবিক ঘটনার সঙ্গে আসামীদের যুক্ত করবার উদ্দেশ্যে ওর মুখ দিয়ে চমৎকার একটি আষাঢ়ে গল্প বলানো হত। তারপর সে গল্পটি যে গল্প নয়, তথ্যনির্ভর সত্য, তা আদালতে নিখুঁতভাবে

প্রমাণ করবার জন্য অগণিত সাক্ষী সৃষ্টি করা হত। তারপর ঢাকঢোল পিটিয়ে সুরু করা হত বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। একটি ষড়যন্ত্র মামলার সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারলেই যেমন কর্তাদের দেখানো যেত রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা, তেমনি প্রমোশন ও পুরস্কারের পথ সুগম হয়ে উঠত।

এমনিভাবেই সুরু হল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ১৯২৯ সালের ১০ জুলাই! প্রধান প্রধান আসামীদের নাম :

(১) ভগৎ সিং, বাবার নাম কিষেণ সিং, ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদকক্ষে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পরিষদে বোমা নিক্ষেপ মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

(২) রঘুনাথ, ওরফে 'এম', ওরফে শিবরাম রাজগুরু, বাবার নাম হরি রাজগুরু, ১৯২৮ সালের ১৮ অক্টোবরের কয়েকদিন পূর্বে পুনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(৩) শুকদেব, ওরফে দয়াল, ওরফে স্বামী, বাবার নাম রামলাল, ১৯২৯ সালের ১৫ এপ্রিল লাহোরে একটি বোমার কারখানায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(৪) যতীন্দ্রনাথ দাস, বাবার নাম বঙ্কিমচন্দ্র দাস, ১৯২৯ সালের ১৪ জুন কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(৫) চন্দ্রশেখর আজাদ, ওরফে পণ্ডিতজী, এখনও পলাতক।

(৬) ভগবতীচরণ, ওরফে বি সি ভোহরী, এখনও পলাতক।

এদের অপরাধ? অপরাধ গুরুতর!

১৯২৮ সালের ১৩ জানুয়ারী বেনারসে তোমরা সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টরকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে,

২৬ জুন গোপালপুর জেলার বরহালগঞ্জের একটি পোষ্ট অফিসের টাকা সরিয়ে ফেলেছ,

৪ ডিসেম্বর তোমরা সদলবলে অর্থ লুট করবার উদ্দেশ্যে লাহোরের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে হানা দিয়েছিলে,

১৭ ডিসেম্বর লাহোরে তোমরা পুলিশ সুপার স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেছ,

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল তোমরা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ কক্ষে বোমা ফেলেছ, রিভলবার ছুঁড়েছ,

৭ জুন মাউলনিয়ায় ডাকাতি করেছ, লাহোর, সাহারাণপুর, আগ্রা ও কলকাতায় রাশি রাশি বোমা তৈরি করেছ,

তোমরা কাকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের জেল ভেঙ্গে ছিনিয়ে নেবার ফন্দী এঁটেছিলে,

আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রজাদের কল্যাণকর্মে প্রতিশ্রুত ও নিয়োজিত হিজ ম্যাজেষ্টিটস গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করেছ।

অর্থাৎ যেন তারস্বরে আদালতকে বলা হল, 'এই লাহোর থেকে সুরু করে সেই সুদূর কলকাতা পর্যন্ত খুনী ও ডাকাতদের এই সংগঠন, এরা জনগণের ত্রাস, এরা সমাজের কলঙ্ক, এদের বাঁচবার অধিকার নেই।'

সাক্ষী সংগ্রহ করা পুলিশের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। সাধারণতঃ ঠেলাওয়ালা, পানবিড়িওয়ালা, ফলওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা, মুচি, মেথর, মুন্দফরাস, পুলিশের নাম শুনলেই যাদের বুকে কাঁপুনি সুরু হয়ে যায়, কিছু বখশিশ পেলেই যারা দিনকে রাত রাতকে দিন বলতে রাজী, পুলিশের প্রয়োজনমত তাদের মুখে কথা গুঁজে দেয়া হয়, মামলা সুরু হবার পূর্বে-তারিখ মত আসামীদের আদালতে হাজির করা হলে আড়াল থেকে ওদেরকে ভাল করে চিনিয়ে দেয়া হয়, সনাক্তকরণ প্যারেডে যাতে ওরা ভুল না করে বসে।

মামলা সুরু হবার ঠিক দুদিন পরেই যতীন দাস পুলিশের এই ঘটনাকে চরম আঘাত দিল। ১৩ জুলাই সুরু করল সে অনশন। ঘোষণা করল, আমার এই অনশন আমরণ। আমাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চলবে, এ অনশন চলবে।

চললও তাই।

প্রথমতঃ—উপেক্ষা, অবজ্ঞা, হুমকি ; তারপর বলপ্রয়োগ, হাজারো নির্যাতন, ভীতিপ্রদর্শন। তাতেও কুলোল না, অনশন চলতে লাগল।

তারপর ওদের ব্রজকণ্ঠ খাদে নেমে এল, রক্তবর্ণ চক্ষু হয়ে এল ম্লানায়মান। সুরু হল উদাত্ত প্রতিশ্রুতি। অনশন প্রত্যাহার কর, অনেক কিছু করব কথা দিচ্ছি।

শুনল না যতীন দাস, শুনল না ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব এবং সহবন্দীরা। অনশন অব্যাহতভাবে চলতে লাগল।

ওদের সুর আরও নরম হয়ে এল, চলল অনুরোধ, উপরোধ, আবেদন। বন্দীরা তথাপি কর্ণপাত করল না। অনশন চলতে লাগল। আত্মবিলোপনে বিপ্লবী কি কখনও ভয় পায়?

অবশেষে বলদপী ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের দম্ভ ও কূট কৌশল চূর্ণ করে দিয়ে এল সেই চরম দিন—ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা একটি দিন, ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর—তেষট্টি দিন অনশনের পর যতীন দাস চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ল।

যতীন দাসের তিরোধানের পরই আবার দ্রংষ্ট্রা বার করল বৃটিশ সিংহ, আবার শোনা গেল তার গর্জন। তোড় জোড় করে সুরু হল আবার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

যতীন দাস যখন চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল আর তার আত্মবলিদানের ফলে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত সমগ্র ভারত চঞ্চল হয়ে উঠল, তখন বেশ বোঝা গেল যে, তাদের অনশনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে, মহাত্মা গান্ধীর

নেতৃত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেসও সচকিত হয়ে ওঠে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, কংগ্রেস বিপ্লবী বন্দীদের দাবীদাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।

তাই, একশো বারো দিন চালাবার পর ভগৎ সিং ও সহবন্দীরা অনশন ত্যাগ করল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনুরোধে।

দীর্ঘ একবছর পর ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হল। ১৯৩০ সালের ৭ অকটোবর রায় দেয়া হল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল তিনজন—ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেব।

রায় শুনে ভগৎ সিং বলে উঠল, দীর্ঘকাল জেলে পচার চাইতে ফাঁসীতে যাওয়া অনেক আনন্দের।

আলোড়িত হয়ে উঠল সমগ্র ভারত। চলতে লাগল সভা সমিতি, প্রতিবাদ বিক্ষোভ, আবেদন নিবেদন।

অবশেষে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী প্রাণরক্ষার আবেদন জানাতে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

বড়লাট সে আবেদনও প্রত্যাখান করতে দ্বিধা করলেন না।

ফাঁসীর দিন ধার্য হয়ে গেল, ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ।

ঐ দিন সন্ধ্যা ছ'টা প'য়তাল্লিশ মিনিটে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেল ওরা তিনজন, ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেব।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার নেমে এল বিশ্ব চরাচরে।

দেশমাতৃকা অবাধ্য অশ্রু মার্জনা করলেন!

মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাস

প্রভাতে পূর্বাচল আলোকিত করে যে সূর্যের উন্মেষ, মধ্যাহ্নে যার প্রখর কিরণ বিশ্ব চরাচর উদ্ভাসিত করে তোলে, আহ্নিক পরিক্রমার পর সেই সূর্যই আবার অস্তাচলে নেমে আসে, ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বীজ থেকে অঙ্কুরের উদ্গম, অঙ্কুর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে স্বর্ণলতা, ফুলে ফুলে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে, দিগদিগন্তে বিকীরণ করে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও সুবাস। তারপর একদিন শেষ হয়ে আসে তার দিন, ঝরে পড়ে ফুল, নুয়ে পড়ে শাখা, আকাশ-ছোঁয়া মঞ্জরী ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। জন্ম যদিও-বা আকস্মিক, মৃত্যু অবধারিত সত্য।

কিন্তু মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। এমনি মানুষও দেখা যায়, যাঁর আবির্ভাব আছে, তিরোভাব নেই, যিনি জন্মেছেন, কিন্তু মৃত্যু নেই তাঁর। রক্তমাংসের শরীর তাঁর ভস্মীভূত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তাঁর স্মৃতি অবিনশ্বর, অপরিম্লান তাঁর অনুপ্রেরণা, শাশ্বত সত্যের মত প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য নিয়মকে পরাভূত করে তিনি চিরজীবি। অপরাজেয় মৃত্যুকে জয় করে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী!

এমনি একটি মানুষ ছিলেন যতীন দাস। মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাস।

১৯২৮ সাল। আমি তখন যাদবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিল প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক নীরেন লাহিড়ী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির, বিহার প্রদেশের বিখ্যাত ক্রিকেটিয়ার বিজয় সেন। আমার বয়স তখন আঠারো। স্বদেশী দলে কয়েক বছর আগেই যোগদান করেছি, ঢাকা শহরে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি সে যুগের অন্যতম দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নেতা সত্য গুপ্তের কাছে। সত্যদা তখন কলকাতায় চলে এসেছেন, থাকেন ১-সি রসা রোডের দোতলায়।

সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে। সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং সুভাষচন্দ্র বসু।

স্থির হল, সেবাদল নয়, গড়ে তোলা হবে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী। প্রতি বার কংগ্রেসের অধিবেশনে যা হয়ে থাকে, সেই যে সাদা খদ্দরের পোশাক—ধুতি, জামা, গান্ধী টুপি, বুকে-আঁটা ব্যাজ, নম্রতাবিগলিত চলাফেরা, বিনয়বিগলিত কথাবার্তা—না, তা নয়। এবার হবে খাঁটি সামরিক পোশাক—শার্ট, শর্ট,

ট্রাউজার্স, ষ্টকিং, পট্টি, বুট, বেল্ট, ক্যাপ, শোল্ডার ব্যাজ, মনোগ্রাম আর লাঠি। অফিসারদের হেলমেট, স্যাম-ব্রাউন বেল্ট আর স্টিক। শুধু পদাতিক বাহিনী নয়, ঘোড়সওয়ার, সাইকেল, মোটর সাইকেল ও মেডিক্যাল বাহিনী। মেয়েদেরও বাহিনী থাকবে। তারা অবশ্য শাড়ীই পরবে, কাজ করবে মহিলা ডেলিগেট, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যা ও মহিলা দর্শকদের মধ্যে।

দক্ষিণ কলকাতায় গড়ে উঠল পদাতিক বাহিনীর 'বি' কম্পানী সত্য গুপ্তের নেতৃত্বে। আমি তখন থাকতাম দক্ষিণ কলকাতাতেই ভবানন্দ রোডে, সেখান থেকে রোজ সাইকেলে যেতাম যাদবপুর কলেজে।

একদিন সত্যদাকে বললাম, সত্যদা, আমি আপনার কম্পানীতে জয়েন করতে চাই।

সত্যদা তৎক্ষণাৎ বললেন, অল্ রাইট। তাহলে এই সকালেই সোজা চলে যাও হরিশ মুখার্জী রোডের ন্যাশন্যাল স্কুলে। সেখানে দেখবে যতীন দাস নামে এক ভদ্রলোক খাতা নিয়ে বসে আছেন। তাঁকে আমার কথা বলো; তাহলেই নাম লিখে নেবেন তিনি।

তৎক্ষণাৎ গেলাম। দেয়াল দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণ পেরিয়ে স্কুলের অফিস, অফিসে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন।

বললাম, আমি মেজর সত্য গুপ্তের কাছ থেকে আসছি। যতীন দাস মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই—

আমিই যতীন দাস—বললেন তিনি, কি দরকার, বল।

বললাম। নাম লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলেন, মেজর গুপ্তের সঙ্গে কত দিনের পরিচয় ?

তিন বছর।

কোথায় আলাপ হয় ?

ঢাকায়।

তোমার দেশ ঢাকাতে ?

ঢাকা বিক্রমপুরে।

তারপর কি পড়ি, কোথায় থাকি জিজ্ঞেস করলেন। বললাম।

তারপর বেরিয়ে এলাম। প্রাঙ্গণে নামতেই দেখি, আর একজন যুবক গেট দিয়ে ঢুকে গট গট করে এগিয়ে আসছেন। আমায় অতিক্রম করে চলে গেলেন। থমকে দাঁড়ালাম। কি স্বাস্থ্যসমুন্নত চেহারা! যাকে বলে শালপ্রাংশু, দীর্ঘভুজ, বিস্তৃত বক্ষপট। আর পাকানো সরু গোঁফ। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। পরে শুধু পরিচয় নয়, অন্তরঙ্গতাও হয়েছিল। 'বি' কম্পানীতেই যোগদান করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বসু। প্লেটুন সার্জেণ্ট। আমারই মত। ভবানীপুর অঞ্চলের গুণ্ডা, বদমাস ও সমাজবিরোধীদের মহাত্রাস দেবেন বোস। স্বদেশী দলে আগেই যোগ দিয়েছিলেন। কি করে জানি না, সত্যদার অত্যন্ত ভক্ত হয়ে

পড়েন এবং কংগ্রেসের অধিবেশন চলবার সময় হঠাৎ দেখলাম দেবেনবাবু প্লেটুন সার্জেণ্টের কাজ পরিহার করে মেজর সত্য গুপ্তের বডি-গার্ডের কাজ নিজেই বেছে নিয়েছেন। সত্যদা চিরদিনই ভয়ডরহীন বেপরোয়া। অধিবেশনমণ্ডপের ভেতরে, বাইরে, প্রাঙ্গণে, পাশেই আয়োজিত বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীতে, কিংবা একেবারে বাইরে রাস্তায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশের মধ্যে যেখানেই সামান্যতম গোলমাল দেখা দিয়েছে, সেখানেই ছুটে যেতেন সত্যদা কোনো দিকে দৃকপাত না করে। তখনই দেখেছি তাঁর পাশে পাশে ছায়ার মত লেগে রয়েছেন বডি গার্ড দেবেন বোস। ছয় ফুট দীর্ঘ, কোমরে ঝোলানো নেপালী ভোজালি, পাকানো গোঁফ আর উল্লম্ফনোদ্যত বাঘের চোখদুটি। মেজর একবার ইসারা করলেই হয়, একাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন মূর্তিমান কৃতান্তের মত!

ভবানীপুর অঞ্চলের অধিবাসীরা স্নেহভরে নাম দিয়েছিলেন, 'দেবা গুণ্ডা।'

কেউ কেউ বলতেন, গুণ্ডার গুণ্ডা।

দেবা গুণ্ডার নামেই ভয়ে কাঁপত চোর, ডাকাত, ঠগ আর রকবাজের দল।

যতীন দাসের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল আরও পরে।

চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য? অনন্য কোন ব্যবহার? অগ্নিক্ষরা কোন ভাষণ? না, কিছুই না। অতি সাধারণ কথাবার্তা ও ব্যবহার। বোধ হয় দরজা-আঁটা বয়লার! বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু দরজা খুললেই আগুন।

দেশপ্রেমের অনির্বাণ অগ্নি!

ইউনিফরম পরে কয়েক দিন আমাদের প্যারেড করাবার পরই আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। সত্যদাকে জিজ্ঞেস করলাম। মৃদু হেসে বললেন—জি. ও. সি. তাঁকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠনের কাজে লাগিয়েছেন।

আসলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কাজ নয়, সারা ভারতে বিপ্লবী বাহিনী সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যতীন দাস। নিরুপদ্রব অহিংস কংগ্রেসী আন্দোলনের পথে নয়, কব্জির জোরে ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশ স্বাধীন করবার কাজে নেমেছেন বিপ্লবীরা। তাঁদের নীতি—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা তখন প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান আর্মি-নামে গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা, চলেছে সেই গুপ্ত সংস্থার দ্রুত বিস্তার, প্রদেশে প্রদেশে স্থাপন করা হচ্ছে তার শাখা, পাঞ্জাবের ভার নিয়েছেন ভগৎ সিং আর শুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ ভার নিয়েছেন উত্তর প্রদেশের, বিহার উড়িষ্যা রাজপুতনাতেও সংগঠন এগিয়ে চলেছে আর বাংলার ভার নিয়েছেন যতীন দাস।

গুপ্ত সমিতি সংগঠনের পুরো দায়িত্ব নিলে কি কোনো প্রকাশ্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে থাকা যায়, বিশেষ করে মেজরের মত অধিনায়কের পদে? সবাই

দেখবে, সবাই চিনবে, সবাই মনে রাখবে, পুলিশী গুপ্তচরদেরও দৃষ্টি পড়বে। তাই জি. ও. সি. সুভাষ যতীন দাসকে রিলিজ করে দিয়েছেন। আর মিলিটারী ইউনিফরম নয়, সাদা পোষাকেই সর্বত্র তাঁর অবাধ আনাগোনা।

নিজের দেশ নিজেরাই শাসন করবার যোগ্যতা আমাদের আছে কি না, থাকলেও তা কতখানি সুশৃংখল, শাসনের কতটুকু আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, সে সম্বন্ধে তদন্ত করে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট করবার উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশন যেদিন ভারতের মাটিতে পা দিল, সারা ভারতব্যাপী সেদিন পূর্ণ হরতাল। যেখানেই গেছে কমিশন, সেখানেই হরতাল বিক্ষোভ মিছিল ও ধিক্কার সভা। জনগণের উষ্মা শতধা হয়ে ফেটে পড়তে লাগল। ১৯২৮ সালের অকটোবরে কমিশন লাহোরে গিয়েছিল। অমনি বেরিয়ে পড়ল বিক্ষোভ মিছিল। এগিয়ে চলল রেল স্টেশনের পথে। পুরোভাগে অন্যান্যের সঙ্গে লালা লাজপৎ রায়।

পুলিশ সুপার স্কটের আদেশে ও পরিচালনায় পুলিশ মিছিলের ওপর এলোপাথাড়ি লাঠি চালাল।

মারাত্মকভাবে আহত হলেন লালাজী।

১৭ নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হাসপাতালে। টনক নড়ল বিপ্লবীদের। বিশেষ করে, পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের বুকে আগুন জ্বলে উঠল। হোক না এটা কংগ্রেসের আয়োজিত বিক্ষোভ ও বয়কট আন্দোলন, তবু এটা জাতীয় আন্দোলন। কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের পথ আমরা সমর্থন করি না বটে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই,—তার অহিংস আন্দোলনের সামিল আমরা না হলেও আমরা তার বিরোধিতা করব না। শুধু তাই নয়, অহিংস জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকার যদি নৃশংস জহ্লাদের মত বিক্ষোভকারীদের হত্যালীলায় মেতে ওঠে, তাহলে কখনও বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা তা সহ্য করবে না। হত্যা দিয়েই হত্যার জবাব দেবে।

সিদ্ধান্ত গৃহীত হল তৎক্ষণাৎ, লালা লাজপৎ রায়ের হত্যাকাণ্ডের নায়ক শয়তান স্কটকে খতম করতে হবে।

লালাজীর শোচনীয় মৃত্যুর ঠিক এক মাস পর ১৭ ডিসেম্বর বেরিয়ে পড়লেন রিভলভার নিয়ে পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা—ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং চন্দ্রশেখর আজাদ। স্কটের অফিসের কাছাকাছি ওৎ পেতে রইলেন, বেরোলেই গুলি করা হবে।

কিন্তু পরম সৌভাগ্য স্কটের।

সে না বেরিয়ে বেরিয়ে এল আর একজন, এল স্যাণ্ডার্স।

সব সাহেবকেই দেখতে প্রায় একই রকম। ওঁরা ভাবলেন স্যাণ্ডার্সই স্কট।

গুলী চালালেন বিপ্লবীরা। স্যাণ্ডার্সের প্রাণহীন দেহ ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল।

চলল এলোপাথাড়ি খানাতল্লাসী আর ধড়পাকড়।

কিন্তু তাতেই দমল না বিপ্লবীরা। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লীতে ভারতীয় আইন পরিষদের যখন অধিবেশন চলছে, তখন পরিষদকক্ষে বোমা নিক্ষেপ করলেন ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। তারপর ওখানেই স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। বললেন, ভারতে বিপ্লবের ঝড় আসন্ন, আমরা শেষ বারের মত তাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাবধান করে দিলাম।

তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হল। বিচার হল। বিচারক তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

জেলের মধ্যে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হত।

প্রতিবাদ জানালেন তাঁরা, আমাদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকার করতে হবে এবং প্রথম শ্রেণীভুক্ত বন্দীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও খাদ্য দিতে হবে।

কর্ণপাত করল না জেল-কর্তৃপক্ষ। বরং বাড়িয়ে দিল নির্যাতনের মাত্রা।

অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা অনশন শুরু করলেন ১৯২৯ সালের ১৫ জুন।

ওদিকে পুলিশ স্যাণ্ডার্স হত্যা মামলার আয়োজন করে ফেলেছে।

১৪ জুন অকস্মাৎ ওরা হানা দিল যতীন দাসের কলকাতার বাসভবনে। তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালাল, হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মির কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা।

পেল না কিছুই। কিন্তু যতীন দাসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে সেদিনই রওনা হল লাহোর অভিমুখে। পৌঁছল ১৬ জুন। পৌঁছেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল লাহোর জেলে।

সুরু হয়ে গেল স্যাণ্ডার্স হত্যা মামলা। আসামী ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু, শুকদেব, আরও কজন এবং যতীন দাস।

অনশনব্রতী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের প্রতি সহানুভূতি জানাবার ও তাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানাবার উদ্দেশ্যে অন্য রাজনৈতিক বন্দীরাও অনশন শুরু করলেন।

এই অনশনকে বন্দী জীবনে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের অস্ত্ররূপে ব্যবহারের কৌশল সম্বন্ধে যতীন দাস প্রথমটা খুব উৎসাহ বোধ করেননি। কিন্তু সহবন্দীরা যখন অনশন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, দিনের পর দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়লেও যখন তাঁরা তাঁদের সংকল্পে অটল হয়ে রইলেন, তাঁদের দাবী জোরদার করে তোলবার জন্য যখন বার বার চাপ আসতে লাগল, তখন, ১৩ জুলাই অনশন শুরু করলেন যতীন দাস। ঘোষণা করলেন—অনশন আমি ভঙ্গ করব সেদিন, যেদিন কর্তৃপক্ষ আমাদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকার করে নেবে এবং মেনে নেবে আমাদের প্রতিটি দাবী!

আমি তখন বেনারসে।

কলকাতার অভিভাবকেরা টের পেয়ে গেছেন যে, 'স্বদেশী গুন্ডাদের' খাতায় আমি নাম লিখিয়ে ফেলেছি। মুখ্য অভিভাবক সরকারী চাকুরে, স্বাভাবিক ভাবেই চাকরীর ভয় আছে তাঁর। তাই যাদবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে নাম কাটিয়ে সোজা চালান করে দিলেন আমায় সুদূর বেনারসে। সেখানে গিয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, থাকি দাদার বাসায়।

বাইরের খোলসটা গুড বয়ের মত হলে কি হবে, ভেতরের স্বদেশী গুন্ডাটা বার বার মাথা চাড়া দিচ্ছিল। তাই ওখানকার 'গুন্ডাদের' সঙ্গে যোগাযোগ হতে দেরী হল না। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে জিতেন লাহিড়ীর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান, স্টার এ্যান্ড কোম্পানী। জিতেন লাহিড়ী কাকোড়ী ট্রেন ডাকাতি মামলার ফাঁসীর আসামী রাজেন লাহিড়ীর দাদা। সেই অমূল্য রতনের সঙ্গে সহজেই পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। মেজর সত্য গুপ্তের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বিপ্লবী দলের ছেলে শুনে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ধীরে ধীরে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন ওখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে।

কলকাতার আই. বি. পুলিশও তখন বুঝে ফেলেছে যে, কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠনের মধ্য দিয়ে সুভাষ বসুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে সত্য গুপ্তের। এবং এও জানতে তাদের দেরী হয়নি যে, কলকাতা থেকে আমি চলে গিয়েছি বেনারসে; হয়ত সত্য গুপ্তের নির্দেশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

তাই বেনারসের আই. বি. পুলিশ আমার দাদাকে অনেক ভর্ৎসনা করল এবং আমাকে আশ্রয় দেয়া আর কালসাপকে ঘরে পোষা যে একই কথা, বার বার সে কথা উচ্চারণ করল। এমন কি, দাদাকে গ্রেপ্তারেরও ভয় দেখাল।

বাধ্য হয়ে আমি দাদার বাসা ছেড়ে দিলাম এবং পৃথক ঘর ভাড়া করে সেখানে উঠে গেলাম। খেতাম জিতেন লাহিড়ীর বাড়ীতে।

খবরের কাগজে যতীন দাসের অনশনের সংবাদ পড়ে চমকে উঠলাম। তাঁর সঙ্গে মাত্র একবার দুচারটে কথা হয়ে থাকলেও সত্যদার মুখে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। সত্যদা বলতেন, ঐ যে ওর জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা, স্বল্প ভাষণে নমনীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, এ সবই ইঞ্জিনের বয়লারের কুলুপ-আঁটা দরজার মত। দরজাটা যদি খুলে দিতে পার, ভেতরে দেখবে গনগনে আগুন, দেশপ্রেমের আগুন! দেশের কাজে নেমে জীবনকে যারা একমুঠো ধুলোর চাইতেও অকিঞ্চিৎকর মনে করে, যতীন দাস তাদের একজন।

সেই যতীন দাস যখন ঘোষণা করলেন যে, দাবী স্বীকার করে না নেয়া পর্যন্ত অনশন ত্যাগ করব না, যখন বুঝতে পারলাম প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে শুরু হল এবার প্রেস্টিজের লড়াই, তখন কি জানি কেন, বুকটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল।

দশ দিন কেটে যেতেই জেল কর্তৃপক্ষ যতীন দাসের নাকের মধ্যে রবারের নল

ঢুকিয়ে দিয়ে তরল খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ফলে, পরদিনই ২৪ জুলাই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল তাঁর অবস্থা। বলপ্রয়োগে খাওয়াবার চেষ্টায় বাধা দিতে গিয়ে তিনি সংজ্ঞা হারালেন।

জ্ঞান ফিরে আসতেই কর্তারা হুমকি দিল, বাধা দিলে ভাল হবে না কিন্তু।

সেদিন বুঝি মনে মনে হেসেছিলেন বিপ্লবী নায়ক। স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রয়োজন হলে বিলোপনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘর ছেড়ে যে বেরিয়ে এসেছে, মূর্খ ইংরেজ সরকার তাকে দেখাচ্ছে রক্ত চক্ষু? শোনাচ্ছে হুমকি?

বাইরে অনমনীয় কঠোরতা দেখালেও বৃটিশ সিংহ কিন্তু বিচলিত হয়ে উঠল।

রাজনৈতিক বন্দীদের দাবীদাওয়া সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য অচিরেই পাঞ্জাবে গঠিত হল একটি তদন্ত কমিটি। অনশনব্রতীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনশন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে রাজী করালেন কমিটি। যতীন দাস কিন্তু এ কথায় কর্ণপাত করলেন না। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের চাপে কমিটি প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেন যে, যতীন দাসকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হবে।

কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি তো বেইমান ইংরেজ সরকারের। তাই কার্যতঃ দেখা গেল, তারা যতীন দাসকে জামিনে মুক্তি দেবার আদেশ দিতে রাজী।

ওদিকে চিকিৎসকরা রিপোর্ট দিলেন, যতীন দাসের বাঁচবার আশা নেই বললেই হয়।

•

তখন অনশনের চুয়াল্লিশ দিন গত হয়েছে।

তার পর থেকে যতীন দাসের অনশন ধর্মঘটের রোজনামচা:

২৬ জুলাই দেখা দিল নিউমোনিয়া। জ্বর উঠল ১০৩ ডিগ্রি।

২৭ জুলাই থেকে ছোট ভাই কিরণ দাসকে তাঁর শয্যাপার্শ্বে থাকবার অনুমতি দেয়া হল।

৩১ জুলাই বার বার সংজ্ঞা হারাতে লাগলেন। জ্ঞান ফিরে আসতেই জল মিশিয়ে ওষুধ দেয়া হল। প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, জলজাতীয় কিছুই খাব না।

৬ আগস্ট একাদিক্রমে প্রায় চার ঘণ্টা সংজ্ঞাহারা ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের রক্ত চক্ষুর আগুন ম্লান হয়ে এল। আগেকার মত আর হুমকির বজ্রনির্ঘোষ নয়, এবার বিনয়নম্র অনুরোধ—ওষুধ খাও, জল খাও, অনশন প্রত্যাহার কর, দেখব আমরা কি করতে পারি।

অর্থাৎ সর্তযুক্ত আপোষরফার প্রস্তাব! অর্থাৎ ভারতের প্রেস্টিজের সঙ্গে লড়াইতে আহত হয়েছে বৃটিশ প্রেস্টিজ! তবু ঘেয়ো কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করা ছাড়বে না। তাই সর্ত, আগে অনশন প্রত্যাহার কর, তারপর বিবেচনা করা যাবে।

কিন্তু বিপ্লবীর জীবনে আপোষরফার সুযোগ আছে কি ? আছে কি কোন মধ্যপন্থা ? দর কষাকষির পর কিছু ছেড়ে দিয়ে, কিছু পেয়ে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমাত্র দুর্বলতাও নেই তার। শুরু করেছি যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম শেষ হবে সেদিন, যেদিন হয় ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে শত্রুর অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা, নয়ত আমার শবদেহের ওপর দিয়ে চলে যাবে তার রুধিরাক্ত জয়যাত্রা। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন !

২৩ আগস্ট এক মিনিটের জন্যও ঘুম হল না তাঁর, সারাটি রাত ছটফট করে কাটল। জেল সুপারিনটেনডেন্ট দেখতে এসেছিল। যতীন দাস অন্তিম ইচ্ছা জানালেন তাকে, কলকাতায় আমার স্বর্গতঃ মা ও বোনের শেষকৃত্য যে স্থানে করা হয়েছিল, আমাকে যেন সেই স্থানেই ভস্ম করে ফেলা হয়, তাঁদের পাশেই ঘুমোতে চাই আমি।

জেল সুপার তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা গভর্ণমেন্টকে জানাবার প্রতিশ্রুতি দিল।

২৬ আগস্ট দৃষ্টি ক্ষীণতর হয়ে এল। খুব কাছে ঝুঁকে না পড়লে মানুষ চিনতে পারেন না।

কিরণ দাস 'দৈনিক প্রতাপ' পত্রিকার বীরেন্দ্রকে ধরলেন।

বীরেন্দ্র অবিলম্বে সিমলায় ছুটে গেলেন।

গিয়ে ধরলেন কেন্দ্রীয় পরিষদের সরকার-বিরোধী কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রকে।

সত্যেন মিত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করালেন, যেহেতু যতীন দাস বিচারাধীন আসামী, সেই হেতু তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর শেষকৃত্য করবার জন্য তাঁর দেহ ভাই কিরণ দাসের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে।

বীরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলেন বোরস্টাল জেলে কিরণ দাসকে।

কিরণ দাস তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করলেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আর ধরলেন গোপীচাঁদ ভার্গবকে।

ভার্গবের চাপে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লাহোর এক্সপ্রেসে শবদেহ কলকাতায় নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন, তবে অগ্রিম ডিপোজিট চাইলেন ছয় শত টাকা।

কিরণ দাস টেলিগ্রাম করলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টকে। তৎক্ষণাৎ সুভাষচন্দ্র টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

ওদিকে—

১ সেপ্টেম্বর যতীন দাসের কোমর থেকে নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেল।

৩ সেপ্টেম্বর ভীষণ জ্বর এল।

৬ সেপ্টেম্বর সারাক্ষণ ছটফট করতে লাগলেন।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শবদেহ কলকাতা নিয়ে যাবার অনুমতি দেবার পরও আপত্তি জানালেন বেঙ্গল ও পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট এবং তাঁদের অভিভাবকরূপে

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট। তাঁরা বললেন, যতীন দাসের শবদেহ নয়, লাহোরে স্থানীয় কালীবাড়ীতে তাঁর শেষকৃত্য করে শুধু চিতাভস্ম কলকাতা নিয়ে যেতে পারা যাবে। হোম সেক্রেটারী ইমার্সন রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছিল যাতে শবদেহ নিয়ে যাবার চুক্তিটা বাতিল করা যায়।

রেল কর্তৃপক্ষ রাজী হল না। বলল, সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম টাকা নেবার পর কোনো অভূতপূর্ব কারণ ব্যতীত তা বাতিল করবার কোন আইন নেই আর বাতিল করতে হলে উভয় পক্ষের সম্মতি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।

৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠল।

১০ সেপ্টেম্বর তাঁর হাত পা অসাড় হয়ে গেল, মস্তিষ্কে দেখা দিল রক্তশূন্যতা।

১১ সেপ্টেম্বর পরিষদে হোম মেম্বার ঘোষণা করল যে, তাঁর অবস্থা সঙ্গীন।

১২ সেপ্টেম্বর সকালে রক্ত বমি হল।

তারপর এল সেই ঐতিহাসিক দিবস, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সাল। সকালবেলা নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবার পূর্বক্ষণে শেষ বারের মত জ্বলে উঠল। চোখে দৃষ্টিশক্তি নেই, হাত পা একেবারে অসাড়, মস্তিষ্ক হারিয়ে ফেলেছে কর্মশক্তি; তবুও অপরিসীম চেষ্টায় চাইলেন যতীন দাস, অনেক কষ্টে চিনতে পারলেন কিরণ দাসকে, ফিস ফিস করে কি যেন বলতে লাগলেন, কিরণ দাস কান পেতে শুনলেন—ভাই, প্রথমে আমি ভারতীয়, তারপর বাঙালী। আমার দেহ যেন লাহোর কালীবাড়ীতে না নিয়ে যাওয়া হয়। পাঞ্জাবের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরা যা বলেন, তাই যেন করা হয়।

তারপর বেলা বারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে ভারতের ম্যাকসুইনী যতীন দাসের দেহ চিরকালের মত নিথর হয়ে গেল। দীর্ঘ তেষট্টি দিন অনশনের ঘটল চির-সমাপ্তি।

তারপর ?

তারপর সারা বোরস্টাল জেল, সারা লাহোর শহর, সারা আকাশ বাতাস কম্পিত করে গর্জন করে উঠলেন রাজনৈতিক বন্দীরা, যতীন দাস জিন্দাবাদ।

তারপর ?

তারপর আকাশ দীর্ণ হল, বাতাস ফুরিয়ে গেল, মহাকাল তার আহ্নিক পরিক্রমার পথে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের যবনিকায় !

ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন,

If ever a man died a hero and martyr to a noble cause, that man is Jatindranath Das and the blood of the martyr has in all ages and countries been the seed of higher and nobler life, better social and political order....

মনে আছে, ১৩ সেপ্টেম্বর তখন আমি কলেজে অধ্যাপক পুস্টামবেকার লজিকের ক্লাস নিচ্ছিলেন, সহপাঠী অরুণ ত্রিবেদী আমার কানে কানে বলল, যতীন দাস শহীদ হো গিয়া। বড়া আফশোসকা বাত—

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। পুস্টামবেকারকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুনতে পাচ্ছিলাম না তাঁর বক্তৃতার একটি কথাও। চোখে ভাসছিল কলকাতার সেই ন্যাশন্যাল স্কুল, অফিসে টেবিলের ওপাশে বসে আছেন অতি সাধারণ চেহারার একটি ভদ্রলোক, অতি সাধারণ কথাবার্তা, হেসে জিজ্ঞেস করলেন, মেজর সত্য গুপ্তের সঙ্গে কত দিনের পরিচয়? তখন ততটা বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি, সেদিন বয়লারের দরজা আঁটা দেখেছিলাম, আজ সে দরজা সটান খুলে গেছে, ভেতরে আগুন, দেশপ্রেমের গনগনে আগুন, সেই মহাঅগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল বৃটিশের স্টীল প্রেস্টিজ, দধীচির হাড়ের সংঘাতে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চ্যালেঞ্জের প্রাকার।

ক্লাসের শেষে অভিভূতের মত বেরিয়ে এলাম। আর কোনো ক্লাসে গেলাম না। সাইকেলে উঠলাম। চলে এলাম পাঁচ মাইল দূরে বেনারস শহরের অপরিসর এক গলিতে একটি বাড়ীর দোতলায় আমার নির্জন কক্ষে। চুপটি করে বসে রইলাম।

পরদিনই কাগজে পড়লাম, যতীন দাসের মরদেহ লাহোর এক্সপ্রেস ট্রেনে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লাহোর এক্সপ্রেস মোগলসরাই দিয়ে যাবে। ছুটলাম মোগলসরাইতে।

স্টেশন প্ল্যাটফরমে লক্ষ লোকের সমাবেশ। কারু মুখে কথা নেই। চোখে উদ্বেগের চিহ্ন, মুখে বেদনার বিবর্ণতা। কি যেন হারিয়ে গেছে, কাকে যেন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, খুঁজে পাওয়া যাবে না, বুকের খানিকটে ফাঁকা হয়ে গেছে, ভেঙ্গে গেছে পাঁজরার একখানা হাড়। তাই বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লোকের জনতা, উদ্বেগাকুল দৃষ্টি বার বার প্রসারিত করছে ডিসট্যাণ্ট্ সিগন্যালের দিকে।

একটু পর এসে গেল ট্রেন।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করল প্ল্যাটফরমে।

খোলা দরজায় করজোড়ে প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে কিরণ দাস আর কামরার ভেতরে বরফ দিয়ে ঢাকা বাক্সবন্দী শহীদের মরদেহ।

তারপর ফুল, ফুল, ফুল আর ফুল। ফুল আর মালা, মালা আর ফুল। লক্ষ লোকের স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা আর ভালবাসার ফুল ও মালায় ঢেকে গেল বাক্স, উপচে পড়ল মেঝেয়, মেঝে ঢেকে গেল, স্তূপীকৃত হয়ে গেল, ফুলের সমাধির মধ্যে শুয়ে রইলেন যতীন দাস।

সেই অগণিত মালার সঙ্গে মন্দিরে শায়িত মহামানবের উদ্দেশ্যে আমিও একখানি মালা নিবেদন করলাম।

যতীন দাসের সঙ্গে সেই আমার দ্বিতীয় ও শেষ সাক্ষাৎ।

শহীদ যতীন দাসের লোকান্তরিত দেহ নিয়ে কলকাতার রাজপথে যে বিশাল শোকযাত্রা বেরিয়েছিল, তা অবিস্মরণীয়। ভাষায় তা বর্ণনা যায় না। চার্লস টেগার্ট তখন পুলিশ কমিশনার, যার নির্দেশে কথায় কথায় চলত লাঠি, বুট, রিভলবার, বন্দুক—ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় পড়ে থাকত নিহত ও আহতেরা। কিন্তু সেদিন সেই বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র যে পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তুলে আছড়ে পড়েছিল কেওড়াতলা শ্মশান-তীর্থে, হতবুদ্ধি পুলিশ সেই জনতরঙ্গকে রুখতে যাবার দুঃসাহস দেখায়নি, নির্বাক বিস্ময়ে শুধু চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে দেখছিল।

সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক তখন কে ছিলেন—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, না মনোরঞ্জন গুপ্ত, না অপর কেউ, আজ আর মনে পড়ছে না। কিন্তু স্বাধীনতা পত্রিকায় অগ্নিক্ষরা ভাষায় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল, হুবহু তার ভাষা মনে না থাকলেও বক্তব্য স্পষ্ট মনে আছে—

'দেখিলাম হাওড়া স্টেশনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান অগণিত মানুষ। ভারতমাতার দামাল ছেলে যতীন দাস, কানাইলাল ক্ষুদিরামের উত্তরসাধক যতীন দাস, অমৃতলোকের যাত্রী বাংলার দুলাল যতীন দাস বাংলায় ফিরিয়া আসিতেছেন।······

মদমত্ত ইংরেজের চ্যালেঞ্জ ধূলায় লুটাইয়া দিয়া যে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ আজ বীরের বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, রাজপথে দেখিলাম, লক্ষাধিক মানুষ অশ্রুপ্লাবিত নয়নে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে।······

খুশী হইতাম, যদি দেখিতাম, চৌরঙ্গী রোড দিয়া যাইবার সময় সহসা সেই উদ্বেলিত জনসমুদ্র দক্ষিণে ঘুরিয়া অজগরের ফণা উদ্যত করিয়া ধাইয়া চলিল, ময়দান অতিক্রম করিয়া সেই জনতরঙ্গ গিয়া আঘাত হানিল ঐ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গপ্রাকারে, সেখানকার কামান বন্দুকের সর্বপ্রকার প্রতিরোধ গুঁড়াইয়া দিয়া উহার লৌহ-কপাটে বিজ্ঞাপন লটকাইয়া দিল, To let ভাড়া দেওয়া যাইবে!

এই স্বপ্ন যেদিন বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিব, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের প্রতি সেদিনই আমাদের শোকাঞ্জলি সার্থক হইয়া উঠিবে।······'

মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাসের আবির্ভাব আছে, তিরোভাব নেই। যুগে যুগে অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িতের সংগ্রামে যতীন দাস একটি স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণা!

ফেরারী মাস্টারদা

সূর্য উঠেছিল।

উঠেছিল বাংলা দেশের পূর্ব সীমান্তে, চট্টগ্রামের আকাশে। সহস্র রশ্মির প্রচণ্ড দাবদাহে পুড়িয়ে দিয়েছিল চট্টগ্রামের আকাশ, বাতাসে ছড়িয়েছিল বারুদের গন্ধ, মাটি ফেটে চৌচির, কর্ণফুলী নদীতে উত্তাল করে তুলেছিল রক্ত-বন্যা।

কিন্তু সে কি শুধু চট্টগ্রামে? না, তা নয়। চট্টগ্রামের সূর্য শুধু বাংলা দেশ নয়, বাংলা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা ভারতের সংগ্রামী বিপ্লবীদের অন্তরে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড, পরাধীনতার শৃংখলভারে মুমূর্ষু দেশমাতৃকার বেদীতলে দেদীপ্যমান করে তুলেছিল একটি আশার প্রদীপ। চট্টগ্রামের সংহারী সূর্যের অগ্ন্যুদ্গীরণে, বিসুভিয়াসের লাভাস্রোতের সংঘাতে পম্পিয়াই নগরীর মত দগ্ধীভূত হয়ে গিয়েছিল সেই শহরের বর্বর শাসন, থর থর করে কেঁপে উঠেছিল ভারতে ইংরেজশোষণের রুধিরাক্ত বনিয়াদ!

আকাশের সূর্য আহ্নিক পরিক্রমার শেষে ম্লানায়মান ধূসরতায় অস্ত যায়। কিন্তু চট্টগ্রামের সূর্যের উদয় আছে, অস্ত নেই। উদয় হয়েছিল ১৯৩০ সালে, আজও তা অপরিম্লান। যুগে যুগে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের রোষাগ্নিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে সেই অন্তহীন সূর্যের লেলিহান শিখা।

সেই অন্তহীন সূর্যের নাম সূর্যকুমার সেন। সূর্য সেন। আপামর জনসাধারণের পরম প্রিয় 'মাস্টারদা'।

জন্ম ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে বি. এ. পাশ করে ফিরে আসেন চট্টগ্রামে। শিক্ষকতা গ্রহণ করেন ন্যাশনেল হাই স্কুলে। ছাত্রদের মধ্যে দেখতে দেখতে এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন যে, তারা সম্ভ্রমসূচক 'মাস্টারমশাই' অথবা 'স্যার' সম্বোধন পরিহার করে তাঁকে একেবারে আপনার জন করে নিয়ে ডাকতে লাগল, 'মাস্টারদা'।

বহরমপুরে থাকতেই অধ্যাপক সতীশ চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে বিপ্লবান্দোলনের দিকে ঝোঁকেন। চট্টগ্রামে এসে অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, নগেন সেন প্রভৃতির বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিলেন।

এবং অচিরেই হয়ে উঠলেন সংগঠনের একচ্ছত্র সর্বাধিনায়ক। সকলের মাস্টারদা।

নায়কোচিত চেহারা ? স্বাস্থ্য ? আচার আচরণ ? না কিছুই নেই। উচ্চতা পাঁচ ফুটের সামান্য বেশী হতে পারে। ক্ষীণ দেহ, হঠাৎ দেখলে মনে হবে হয়ত বা ভগ্নস্বাস্থ্য। চওড়া উঁচু কপাল, পাতলা চুল, চলাফেরা সাধারণ, কথা কন একেবারে নিরুত্তাপ আবেগশূন্য কণ্ঠে, সভা-সমিতিতে গিয়ে বসেন পিছনের সারিতে, কোন জনসভার বক্তৃতা-মঞ্চে দেখা যায়নি তাঁকে।

কিন্তু অনন্যসাধারণ একটি সম্পদ আছে তাঁর, দুটি অন্তর্ভেদী চোখ। রঞ্জন-রশ্মির মতন একবার ফোকাস করলেই দেখতে পান একেবারে অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত। যেন দুটি তীক্ষ্ণধার ছুরি, কূটকৌশলের সর্বপ্রকার প্রতিরোধ ভেদ করে সোজা নেমে যায় মনের গভীরে। একটিবার সেই চোখ দুটির পানে চাইলেই মনে হবে, সব দেখে ফেললেন তিনি, সব জেনে ফেললেন।

কংগ্রেসী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন তিনি। শহরের দেওয়ানবাজার অঞ্চলে 'সাম্যাশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই থাকতেন। অসহযোগ আন্দোলন-সম্পর্কিত কাজকর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল এই আশ্রম, যদিও পুলিশের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে ওখান থেকেই তিনি বিপ্লবী দল সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

সঠিক কিছু ধরতে না পারলেও পুলিশের যেমন ঘোরতর সন্দেহ হল এই লোকটি সম্বন্ধে, তেমনি মাস্টারদাও বুঝতে পারলেন তাঁকে আটক করবার জন্য বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের হাতকড়ায় তেল লাগাচ্ছে ওরা। তাই ১৯২৩ সালের শেষ দিকে অকস্মাৎ একদিন সাম্যাশ্রম থেকে মাস্টারদা উধাও হয়ে গেলেন, উঠলেন গিয়ে শহরের বাইরে 'সুলুকবাহার' নামের একটি বাড়িতে।

দলসংগঠন কার্যে প্রয়োজন টাকা, অজস্র টাকা। সে টাকা কোথায় পাওয়া যাবে ? কে দেবে ? ডাকাতি করা ছাড়া উপায় কি ?

অনন্ত সিংহ এগিয়ে গেল, হুকুম করুন মাস্টারদা।

মাস্টারদা স্মিতহাস্যে অনুমতি দিলেন।

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে অনন্তের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ১৮০০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে এল নিরাপদে।

মাস্টারদা বললেন, সাবাস।

বুঝতে দেরী হল না পুলিশের যে, এ কাজ সূর্য সেনের দলের। কিন্তু কোথায় সে ? তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল তারা।

অবশেষে সন্ধান পেল।

সশস্ত্র পুলিশ একদিন ঘিরে ফেলল সুলুকবাহার।

অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রনির্ঘোষ। হাতিয়ারের জবাবে হাতিয়ার।

রিভলভার চালিয়ে পুলিশের অবরোধ ভেদ করে সদলবলে বেরিয়ে গেলেন মাস্টারদা, গিয়ে আশ্রয় নিলেন পাহাড় অঞ্চলে।

শহর থেকে আরও পুলিশ এসে সমগ্র পাহাড় অঞ্চল ঘিরে ফেলল। সারা

দিনই চলল বিপ্লবীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। অবশেষে নিঃশেষ হয়ে গেল বিপ্লবীদের বুলেট-তহবিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়। অম্বিকা ও মাস্টারদা মুখে ফেলে দিলেন পটাসিয়াম সাইওনাইডের প্যাকেট। অচৈতন্য হয়ে পড়লেন, কিন্তু মৃত্যু হল না। যে কোন কারণেই হোক, বিষ তার মারণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

তাঁরা ধরা পড়লেন। বিচার হল। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মুক্তি পেলেন।

সেদিন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন বিপ্লব-বিধাতা। চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসনযন্ত্রে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে ফেলবার অসমসাহসিক কাজের জন্য যে চিহ্নিত হয়ে আছে, চট্টগ্রাম জেলের ফাঁসীর মঞ্চ যার পদরজঃ বুকে নিয়ে ধন্য হবার প্রতীক্ষায় দিন গুনছে, বিষ খেলেও কি তার কখনও মৃত্যু হতে পারে?

১৯২৪ সালের শেষ দিকে সারা বাংলা দেশের অসংখ্য বিপ্লবী কর্মীকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে আটক রাখা হয়। মাস্টারদার নামেও ওয়ারেন্ট বেরোল। কিন্তু বাতাসে বারুদের গন্ধ পেয়েই ফেরারী হলেন তিনি। ওয়ারেন্ট হাতে পুলিশ হন্যে হয়ে তাঁর সন্ধানে সারা চট্টগ্রাম সারা বাংলা দেশ চষে ফেলতে লাগল।

১৯২৫ সালে তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ১০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল।

অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ এবং আরও অনেকে অর্ডিন্যান্সে বন্দী হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় সেই দলপতি? সেই অসাধারণ সাধারণ চেহারার ক্ষীণদেহ ছোটখাটো মানুষটি?

একদিন গভীর রাত্রে নিঃসীম অন্ধকারে নয়াপাড়া গ্রাম থেকে আসছেন মাস্টারদা, সঙ্গে তারকেশ্বর দস্তিদার ও অর্ধেন্দু দস্ত। পাহাড়ী পথে অত্যন্ত সতর্ক তাঁদের পদক্ষেপ, কিন্তু হলে কি হবে, চৌধুরীঘাটের একমাত্র রাস্তার পাশেই পড়েছে সারি সারি পুলিশ শিবির। চট্টগ্রাম আগ্নেয়গিরি তখনও ঘুমন্ত। তাই তখনও পুলিশবাহিনীর টনক নড়েনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওঁদের, হঠাৎ প্রহরারত শান্ত্রী গর্জন করে উঠল, কৌন হ্যায়?

গর্জন শুনেই ওঁরা প্রাণপণে ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্ণফুলী নদীতে। বেগবান পাহাড়ী নদী পার হওয়া কি সহজ কথা? ভাগ্য ভাল, মাঝ নদীতে চর পড়েছিল, সেই চরে উঠে ওঁরা সে যাত্রায় নিস্কৃতি পেলেন।

কিন্তু অবশেষে ধরা পড়েছিলেন মাস্টারদা প্রায় দু'বছর পর ১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর। চট্টগ্রামে নয়, তার ধারে কাছেও নয়, কলকাতায়।

কিভাবে গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর নিজের কথাতেই বলি—

১৯২৬ সালের ৮ অকটোবর।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটের কাছাকাছি একটি shelterএ আছি।

সেদিন সেখানে ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় দেখলাম একজন যুবক বাসার সামনে blind laneটা দিয়ে বাসাটা pass করে চলে যাচ্ছে। দেখেই সন্দেহ হল। কারণ blind lane দিয়ে সে যাবে কোথায়? বাসাটির পরই blind lane বন্ধ হয়ে গেছে। তাই বাসা pass করে তাকে এগিয়ে যেতে দেখে spy বলে সন্দেহ হল। ২।১ মিনিট পরেই দেখি, সে আবার ফিরে আমরা যে room-এ বসেছি, তার জানালার ধারে এসে একজন লোকের নাম করে সে ও বাসায় থাকে কিনা জিজ্ঞেস করল। ও নামের কোন লোক সে বাসায় থাকত না, আমরা 'না' উত্তর দিলে সে চলে গেল। একটু পরে বাসার একটি ছেলেকে বাইরে রাস্তাটা দেখে আসতে বললাম। সে দেখে এসে বলল, রাস্তার দু'তিন জায়গায় দু'তিন batch plain dress-পরা লোক দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—I. B.-র লোক বলে মনে হচ্ছে।

দেরী না করে দেয়াল টপকে অন্য ধারের রাস্তায় পড়ে ছাতাটা খুলতে যাচ্ছি, দেখি, যে লোকটি জানালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, সেই লোকটি আমার ত্রিশ চল্লিশ হাত পেছনে।

ঐ লোকটি এক পা দু পা করে আমার ঠিক পেছনে এসে বলল, দাঁড়ান মশাই।

আমি কেন দাঁড়াব, জিজ্ঞেস করলে সে কোন জবাব দিল না এবং হঠাৎ আমার একটা হাত জোরে ধরে ফেলল। সে হাত নেড়ে কি একটা ইসারা করল, আর চার পাঁচ জন plain dress পরা লোক এসে আমায় ভালরূপে ধরে ফেলল।

১৯২৮ সালের শেষ দিকে রাজবন্দীদের একে একে মুক্তি দেয়া হল।

মাস্টারদাও মুক্তি লাভ করলেন।

তারপরই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন।

সভাপতি মতিলাল নেহেরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষের নেতৃত্বে এবার আর স্বেচ্ছাসেবক দল নয়, তৈরি করা হল ভলাণ্টিয়ার বাহিনী। সেই যে হাটুর নীচে পর্যন্ত মোটা খদ্দরের ধুতি, তেমনি মোটা সেমিজের মতন ঝুল সাদা জামা, সার্ট, বেশীর ভাগেরই পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা খদ্দরের গান্ধী টুপি, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, চলাফেরায় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা, কথাবার্তায় উৎসারিত আবেদন, ফরমাইয়ে আপকো লিয়ে ম্যয় কেয়া কর সকতা হু"—না এবার তা নয়। এবার খাঁটি মিলিটারী পোশাক শর্ট বা ট্রাউজার্স, শার্ট বা শার্টের ওপর কোট, হাইল্যাণ্ডার্স ক্যাপ বা হেলমেট, সব খাঁকি। পট্টি, বুট, চওড়া চামড়ার বেল্ট, কাঁধে ও টুপিতে মনোগ্রাম, বি. ভি. মানে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স। হাতে রাইফেলের বদলে লাঠি। মিলিটারীর মতই বিভিন্ন বিভাগ, পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, মোটর সাইকেল ও সাইকেল বাহিনী এবং মেডিক্যাল ইউনিট। মেয়েদেরও বাহিনী, তারা অবশ্য শাড়ীই পরবে।

চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে অন্যান্যের সঙ্গে মাস্টারদাও এসে কলকাতার অধিবেশনে যোগদান করেন।

ঐতিহাসিক অধিবেশন। এই অধিবেশনেই সুভাষচন্দ্র এনেছিলেন যুগান্তকারী প্রস্তাব—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা পূর্ণ স্বরাজে আমরা আর তুষ্ট নই। আমরা চাই, ইংরেজসম্পর্কশূন্য পূর্ণ স্বাধীনতা। তাই দোব ছ'মাসের আলটিমেটাম। যদি এর মধ্যে তলপিতলপা গুটিয়ে তোমরা সাগর পাড়ি দিয়ে চলে না যাও, তাহলে স্থাপন করব আমরা প্যারালাল গভর্ণমেণ্ট, শাসনযন্ত্র তোমাদের অচল করে দোব।

কিন্তু নরমপন্থী কংগ্রেসীদের বাধায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল।

মাস্টারদা সব দেখলেন, সব শুনলেন।

কানের কাছে ধ্বনিত হতে লাগল বিদ্রোহের প্রতীক সুভাষচন্দ্রের অগ্নিবাণী—তোমাদের শাসনযন্ত্র অচল করে দোব। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল সমর সাজে সজ্জিত অশ্বারূঢ় জি. ও. সি.-র রুট মার্চ, তাঁকে অনুসরণ করছে ভয়ডরহীন ভলাণ্টিয়ার-বাহিনী, লেফট, রাইট, লেফট, লেফট, রাইট, লেফট।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলেও সুভাষচন্দ্র এই ভলাণ্টিয়ার-বাহিনী ভেঙ্গে দিলেন না, বরং একে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য বাংলা দেশের জেলায় জেলায় ১৯২৯ সালের গোড়া থেকেই বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স-এর রেঞ্জ গঠিত হতে লাগল।

মাস্টারদার সংগঠনে চট্টগ্রাম শহরেও তৈরী হল একটি ভলাণ্টিয়ার-বাহিনী। সেই খাঁকি পোশাক, শর্ট, শার্ট, ক্যাপ, পট্টি, বুট, কোমরে চওড়া বেল্ট। শহরের রাস্তায় রাস্তায় যখন তখন সামরিক পোশাকধারী ভলাণ্টিয়ারদের রুট মার্চ দেখা যেতে লাগল, দেখা যেতে লাগল সাইকেলে বা পদব্রজে আনাগোনা।

অহিংসাপন্থী কংগ্রেসনিয়ন্ত্রিত ভলাণ্টিয়ার দল, সুতরাং এদের চালচলনে ভাবিত হওয়া দূরে থাক, শাসন কর্তৃপক্ষ এদের দিকে তেমন নজর দেবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করল না।

ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেল—

৮ এপ্রিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন চলবার সময় পরিষদ কক্ষের মেঝের ওপর বোমা নিক্ষেপ করলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত, কয়েকবার শূন্যে রিভলবার ছুঁড়লেন, হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান পার্টি, বিপ্লবী দলের নাম দিয়ে মুদ্রিত কতকগুলি ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন, স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন, স্পষ্ট ভাষায় বিবৃতি দিলেন, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে আমরা সাবধান করে দিলাম। ঝড় আসছে, সাবধান।

১৪ জুন যতীন দাসকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করে লাহোর নিয়ে যাওয়া হল।

সুরু হল স্যাণ্ডার্স হত্যা মামলা।

জেলে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে বিচারাধীন বিপ্লবী বন্দীরা অনশন সুরু করলেন ১৫ জুন। যতীন দাস অনশন সুরু করলেন ১৩ জুলাই।

বাষট্টি দিন অনশনের পর ১৩ সেপ্টেম্বর বেলা বারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে যতীন দাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শহীদের মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হল এবং লক্ষাধিক লোকের শোকযাত্রা মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী বীরকে মাথায় করে নিয়ে গেল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।

বাংলার শহরে শহরে, পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল বৈপ্লবিক ইস্তাহার, তার শিরোনাম, 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা!'

সুতরাং আর দেরী নয়। ১৯৩০ সাল পড়তেই মাস্টারদা সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকীয় আবার খুলে পড়লেন—খুশী হইতাম, যদি দেখিতাম চৌরঙ্গী দিয়া কেওড়াতলার দিকে যাইবার সময় সেই উদ্বেলিত জনসমুদ্র সহসা দক্ষিণে ঘুরিয়া অজগরের মত ফণা তুলিয়া ধাইয়া চলিল, ময়দান অতিক্রম করিয়া সেই সমুদ্রতরঙ্গ গিয়া আঘাত হানিল ঐ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গপ্রাকারে, সেখানকার কামান, বন্দুক, মেসিনগান সর্বপ্রকার অস্ত্রের প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া দিয়া উহার লৌহকপাটে বিজ্ঞাপন-ফলক লটকাইয়া দিল, 'টু লেট' ভাড়া দেয়া যাইবে।

আর দেরী নয়।

কানে বাজছে সুভাষচন্দ্রের দৃপ্ত ঘোষণা, তোমাদের শাসনযন্ত্র অচল করে দোব।

চোখে ভাসছে সৈন্যবাহিনীর রুট মার্চ, লেফট রাইট লেফট।

দেরী নয়, দেরী নয়।

কানে ভেসে আসছে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বরের উচ্চারিত সতর্কবাণী—সাবধান, তোমরা সাবধান।

চোখের সামনে ফুটে উঠছে স্বাধীনতার সম্পাদকীয়—লটকাইয়া দিল টু লেট।

অবিলম্বে চট্টগ্রাম ভলান্টিয়ার্স থেকে বাছাই-করা ছেলেদের নিয়ে তৈরী করা হল, Indian Republic an Army, Chittagong Branch, মাস্টারদার নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী দল। চলতে লাগল তাদের গোপন বৈঠক কংগ্রেস অফিসের সদরঘাট ফিজিক্যাল কালচার ক্লাব গৃহে, সদরঘাট জেটিতে, লোটাস সিনেমা ও সিনেমা প্যালেসের অফিসে। আরও কয়েকটি স্থানে।

মাস্টারদা তখন স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন, প্রাইভেট টিউশন করেন, থাকেন আসগর খাঁর দীঘির পাড়ে কংগ্রেস অফিসে। কংগ্রেসী সাদা আংরাখার অন্তরালে বিপ্লবীর শাণিত ছুরিকা কোমরে এঁটে মাস্টারদা রিপাবলিক্যান

আর্মির গোপন সভায় ঘোষণা করলেন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তারিখ—১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সাল।

স্থির হল, আক্রমণ করা হবে পাহাড়তলী পোলো গ্রাউণ্ডের বৃটিশ অকজিলিয়ারী সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগার গোলাবারুদের গুদাম ও সান্ত্রীদের ব্যারাক, তছনছ করে ফেলা হবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস, চট্টগ্রাম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে ডুমডুমা ও জারারগঞ্জের মাঝখানে রেল লাইন তুলে ফেলা হবে, চট্টগ্রামকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে, তারপর শুরু হবে ব্যাপকভাবে শেতাঙ্গহত্যা এবং—

এবং মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক্যান আর্মি চট্টগ্রামে স্থাপন করবে অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্ণমেন্ট।

১৯৩০ সাল, ১৮ এপ্রিল। বেলা আড়াইটা। হেড কোয়ার্টার্সে গুপ্ত বৈঠক। উপস্থিত হল অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, নির্মল সেন ও আরও ক'জন। মাস্টারদা অপেক্ষা করছিলেন। সবাই আবেগচঞ্চল। আর কয়েক ঘন্টা পরেই শুরু হবে রক্তের হোলিখেলা! কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, শক্তিমান শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার ফলে রণাঙ্গনে কে কোথায় চিরতরে ঘুমিয়ে পড়বে। জীবনে হয়ত এই শেষ বৈঠক, শেষ দেখা। কণামাত্রও আবেগ নেই, উত্তেজনা নেই মাত্র একটি লোকের, তিনি মাস্টারদা। ১৬ এপ্রিলও তিনি যথারীতি প্রাইভেট টিউশন করেছেন। আজকের বৈঠকেও খানিকক্ষণ স্বভাবজাত হাসি পরিহাস করলেন কমরেডদের সঙ্গে। তারপর শুরু হল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বিভিন্ন দল বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালাবে, প্রতিটি দলের কে হবে কমাণ্ডার, কে কোন্ দলে থাকবে, কোথায় কি অস্ত্র ব্যবহারে আশু ফল পাওয়া যাবে, এক দলের সঙ্গে অপর দলের যোগাযোগ রাখা যাবে কিভাবে, কার্য শেষ করে কোন নিরাপদ স্থানে আবার সবাই মিলিত হবে, প্রত্যেকটি বিষয়ের খুঁটিনাটি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

আক্রমণ শুরু করা হবে রাত ঠিক সাড়ে আটটায়, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী না পাওয়ায় মাস্টারদার নির্দেশে সময় দুঘণ্টা পেছিয়ে দেওয়া হল—রাত সাড়ে দশটায়।

নির্দিষ্ট সময়ে ওয়াটার ওয়ার্কস-এর পাশে গাছ-গাছালির কাছে অপেক্ষা করছিলেন মাস্টারদা, ইণ্ডিয়া রিপাবলিক্যান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেন্ট সূর্যকুমার সেন, পাশেই দণ্ডায়মান রিভলভার হাতে একজন দেহরক্ষী। যুদ্ধগামী জওয়ানদের সাফল্য কামনা করে বিদায় দিচ্ছিলেন। তাঁর পরনে কি ছিল সামরিক পোশাক শর্ট-শার্ট, বুট, হেলমেট ও ক্রস বেল্ট?—না, মোটেই না। অতি সাধারণ চেহারার মানুষটির হিমশীতল আচার-আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পরা ছিল একেবারে দুগ্ধফেণনিভ পোশাক—সাদা ধুতি মালকোছা এঁটে

পরা, সাদা লম্বা কোট, সাদা গান্ধী টুপি, সাদা জুতো। টুপিতে আঁটা ভারতের মানচিত্রের পিতলনির্মিত মনোগ্রাম আর বুকের এক পাশে আঁটা ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক্যান আর্মির প্রেসিডেন্টের পদক।

জওয়ানদের দল প্রণাম জানাতে আসছে আর তিনি তাদের সাফল্য কামনা করে একে একে বিদায় দিচ্ছেন।

চট্টগ্রামের ইংরেজ সরকার, পুলিশ, আই. বি., সেনাবাহিনী এত বড় অভিযানের প্রস্তুতির কথা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। কতকগুলি ছেলেকে শহরে খাঁকি পোশাকে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে দেখেছে, দেখেছে ওদের ড্রিল, সামরিক কুচকাওয়াজের নকল, দেখেছে ওদের রুট মার্চ, ভেবেছে এরা কংগ্রেসী পাণ্ডা সুর্য সেনের গড়া একদল কংগ্রেসী ভলান্টিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। ৬ এপ্রিল ডাণ্ডিযাত্রার মাধ্যমে 'দ্যাট নেকেড ফকির গান্ধী' যে নিরুপদ্রব অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে, এই নিরস্ত্র ভলান্টিয়ার দল হয়ত সেই আন্দোলনেরই মদত জোগাবে, নিরীহ মেষশাবকের মত ইংরেজের ভ্রূকুটিতে ভয় পেয়ে দলে দলে জেলে যাবে। তাই, পরম নিশ্চিন্তে ছিল তারা ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল।

কিন্তু রাত যখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা, অকস্মাৎ পর পর রিভলভারের গর্জনে ভেঙ্গে গেল ওদের মোহ। ওরা চমকে উঠল, লাফিয়ে উঠল, এলার্ম বাজিয়ে দিল, তারপর ছুটল হাতিয়ার নিয়ে!

কিন্তু ততক্ষণে কাজ শেষ হয়ে গেছে। অকজিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগার অধিকৃত হয়ে গেছে, নিহত হয়েছে সার্জেন্ট মেজর ফেরল, পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস বিধ্বস্ত, রেল লাইন তুলে ফেলা হয়েছে। বহির্জগৎ থেকে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন।

রণাঙ্গনে অকস্মাৎ আবির্ভাব সেই ক্ষীণদেহ ছোটোখাটো মানুষটির, যাঁর নাম মাস্টারদা। ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক্যান আর্মির সর্বাধিনায়ক।

মাস্টারদা গর্জন করে উঠলেন, পুড়িয়ে ফেল বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক।

তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে ফেলা হল।

হুকুম করলেন, উঠাও এবার ভারতের জাতীয় পতাকা।

তৎক্ষণাৎ উঠানো হল।

বাতাসে উড়তে লাগল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা।

গর্জন করে উঠল সমবেত জওয়ানেরা, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

সেই সিংহগর্জনে কেঁপে উঠল চট্টগ্রামের আকাশ, চট্টগ্রামের বাতাস, চট্টগ্রামের পাহাড় পর্বত, কর্ণফুলী নদীর বেগবান জলস্রোত।

তৎক্ষণাৎ গঠিত হল অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্ণমেন্ট।

মাস্টারদা অবিচল কণ্ঠে ঘোষণা-পত্র পাঠ করতে লাগলেন, ইণ্ডিয়ান

রিপাবলিক্যান আর্মি'র সভাপতি আমি শ্রীসূর্যকুমার সেন, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে—

প্রায় চার ঘণ্টা চলল এমনি জওয়ানদের একচ্ছত্র আধিপত্য।

ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে সরকারী সৈন্যদল। সুর্মাভ্যালি লাইট হর্স এবং ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর পনোরো শো সৈন্য এসে গেছে। রাইফেল, মেশিন গান, লুইস গান, আর্মার্ড গাড়ী নিয়ে পাল্টা আঘাত হানবার জন্য রাস্তায় নেমে পড়ল।

সারা রাত কেটে গেল আক্রমণ, প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণে।

টনক নড়ল সরকারী প্রশাসনের।

এতক্ষণে বুঝতে পারল, খাঁকি পোষাকপরা সেই কংগ্রেসী ভলান্টিয়াররাই অকস্মাৎ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর সেই আক্রমণকারীদের নেতা আর কেউ নয়, সেই সূর্য সেন, সেই যে খর্বাকার, ক্ষীণদেহ অর্ডিনারী লোকটা সেই যে মিন মিন করে অল্প কথা কয় আর চেয়ে থাকে দুটি ড্যাবডেবে চোখ মেলে। কোনো জনসভায় দেখা যায়নি তাকে, শোনা যায়নি তার কোনো বক্তৃতা কোনোদিন খাঁকি পোশাক পরেনি সে।

তারই মধ্যে এত !!

ধরে আন সেই লোকটাকে।

ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন, ধরে আন তাকে।

পুলিশ সুপার হুকুম দিলেন, বেঁধে আন তাকে।

সেনাবাহিনীর কমাণ্ডান্ট হুকুম দিলেন, জ্যান্ত না পাও, গুলী করে খতম করে দাও।

কিন্তু কোথায় তিনি? পড়ে আছে কংগ্রেস অফিস, পড়ে আছে তাঁর ব্যবহারের জিনিসপত্র, এটা, ওটা, সেটা, কিন্তু সূর্য সেন নেই।

মাস্টারদা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন!

না পেয়ে মরিয়া হয়ে সরকারী সেনাবাহিনী আক্রমণ চালাল বিপ্লবী সেনার ওপর।

একদিকে প্রায় দু হাজার সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ, আর একদিকে দুই হাজার দূরের কথা, এক হাজারও নয়, এমন কি, এক শতও নয়—মাত্র ষাট সত্তরটি বিপ্লবী জওয়ান।

তুমুল লড়াইয়ের পর বিপ্লবীরা ১৯ এপ্রিল সরে গেল সুলুকবাহার পাহাড়ে ২০ তারিখ ফতেয়াবাদ পাহাড়ে এবং সরকারী সেনাবাহিনী ২২ এপ্রিল দেখতে পেল বিপ্লবীদের জালালাবাদ পাহাড়ে।

এবং বুঝতে দেরী হল না যে, ওদের সঙ্গেই রয়েছে সেই ফেরারী আসামী, সূর্যকুমার সেন।

ওদের মাস্টারদা।

ফেরারী মাস্টারদার কর্মকাণ্ড

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সহ-বিপ্লবীদের নিয়ে শহর থেকে তিন মাইল দূরে জালালাবাদ পাহাড়ে সরে যাবার খবর পেয়েই সরকারী বাহিনী ঘিরে ফেলল জালালাবাদ পাহাড়। ঘিরে ফেলল তিন দিক থেকে, কমাণ্ডার পুলিশের ডি. আই. জি. ফারমার, টেট আর কর্ণেল ডেলাস স্মিথ। তাদের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল, লুইস গান, মেসিন গান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড। পঙ্গপালের মত সাঁড়াশী অভিযান চালাল সরকারী সৈন্যবাহিনী।

পাহাড়ের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে জমায়েৎ বিপ্লবী বাহিনীর একটি অংশ মাত্র। প্রায় সবারই বয়স উনিশ বৎসর বা তারও কম। চোদ্দ বৎসরের কাঁচ কিশোরও আছে। তাদের হাতে সাধারণ বন্দুক, কিছু মাসকেট আর কতকগুলি রিভলভার আর পিস্তল। সরকারী সেনার সঙ্গে তুলনায় তাদের সমরাস্ত্র নিকৃষ্ট, একেবারেই অপর্যাপ্ত, আধুনিক রণকৌশলে তারা অনভিজ্ঞ।

কিন্তু একটি জিনিসে তারা ওদের চাইতে বলীয়ান, গরীয়ান, মহীয়ান, একটি সম্পদে তারা অনন্য। সরকারী বাহিনীর ওরা মাইনে করা চাকর, খেটে-খাওয়া জহলাদ আর এই মুষ্টিমেয় অগ্নিশিশুর অন্তরের মণিকোঠায় দাউ দাউ করে জ্বলছে দেশপ্রেমের অনির্বাণ হব্যবাহন! কাজের শেষে ব্যারাকে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেবার পরিকল্পনা নেই এদের, এদের প্রতিজ্ঞা—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। দেশমাতৃকার পূজাবেদীতলে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ভয়ডরহীন বিপ্লবী।

আছে, আর একটি সম্পদ আছে এদের। এই আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী দলের নেতা বিপ্লবীর বিপ্লবী সূর্য সেন, এদের মাস্টারদা। সেই যে সেই লোকটি, খর্বকায়, ক্ষীণদেহ, উঁচু কপাল, সাধারণ অতি সাধারণ যাঁর চলাফেরা, যাঁকে জীবিত বা মৃত গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বন্দুক উঁচিয়ে মাস্টারদা হুকুম করলেন লোকনাথ বলকে, ফায়ার!

লোকনাথ প্রতিধ্বনি তুলল, ফায়ার।

অমনি জালালাবাদের গিরিকন্দর, অরণ্য ও আকাশ প্রকম্পিত করে মুহুর্মুহু গর্জন করে উঠল বিপ্লবী বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র। ১৯৩০ সালের ২১ এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় শুরু হল সেই অবিস্মরণীয় মুখোমুখি সংগ্রাম।

যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী কমাণ্ডাররা যা করে থাকে, কর্ণেল ডেলাস স্মিথ তাই করেছে। স্থান নিয়েছে সে রণক্ষেত্র থেকে দূরে কোন নিরাপদ স্থানে, সেখানে বসেই খবর নিচ্ছে যুদ্ধের টেলিফোনে, টেলিফোনেই পাঠাচ্ছে নির্দেশ।

আর মাস্টারদা? মাস্টারদা কোথায়? মাস্টারদা কি করছেন? তাঁর জন্য

নেই কোন দুর্ভেদ্য কংক্রিটের বাঙ্কার, নেই কোন নিরাপদ শিবির, কোন টেলিফোন, বার্তাবহ, দূরে থেকে বাইনোকুলারে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে হুকুম করবার বিলাস তাঁর নেই। তিনি আছেন, আছেন একেবারে ফায়ারিং লাইনে, কমরেডদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, ছায়ার মত তাদের সঙ্গে লেপটে। নিজেই কাঁধে তুলে এগিয়ে দিচ্ছেন গোলাবারুদের বাক্স, নিজেই পরিষ্কার করে দিচ্ছেন জ্যাম হয়ে যাওয়া মাসকেট, কখনো কভার করতে বলছেন মোটা গাছ বা পাথরের আড়ালে, কখনো পাহাড়ী খাদের এ্যামবুশ থেকে গুলী চালাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। কখনো তীরবেগে ছুটে গিয়ে কাউকে ঝোপের আড়ালে সরিয়ে দিচ্ছেন; বন-বিড়ালের মত কখনো পাথরে পাথরে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছেন টিলার ওপরে, জওয়ানের হাতে দিয়ে আসছেন নতুন বন্দুক, কখনো লোকনাথের পাশে দাঁড়িয়ে গুলী চালাচ্ছেন, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসছেন নির্মলের পাশে, চোদ্দ বছরের কচি কিশোরটির পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন; সাবাস জোয়ান।

শত্রুপক্ষের গুলী আসছে, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসছে, গুলী আসছে বৃষ্টিধারার মত, ভেঙ্গে পড়ছে গাছের ডাল, খসে পড়ছে মাটির চাঙ্গড়, তারই মধ্যে বেপরোয়া ছুটোছুটি করছেন মাস্টারদা একটি অনির্বাণ অগ্নিশিখার মত, সাহস দিচ্ছেন কমরেডদের, উৎসাহ দিচ্ছেন, আহতদের রক্ত মুছে দিচ্ছেন কাপড়ের খুঁটে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, মৃত জওয়ানের হাত থেকে অবিচলিত হাতে তুলে নিচ্ছেন বন্দুক, বেল্ট থেকে রিভলভার, পকেট থেকে বুলেট ও টাকাপয়সা, সহকর্মীকে চিরবিদায় দিতে গিয়ে প্রস্তরায়িত চোখে নেই একবিন্দু অশ্রু, মুখে নেই একটিও শোকের রেখা, হুঙ্কার করে উঠছেন মুহুর্মুহু, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

অমনি বিপ্লবী জওয়ানদের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠছে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

রাত্রির আকাশ বুঝি চৌচির হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেই সিংহগর্জনে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

এমনি অবিচ্ছিন্ন মুখোমুখি সংগ্রাম চলল পুরো আড়াই ঘণ্টা।

পশ্চাদপসরণ করে শহরে ফিরে যেতে হল সরকারী ব্যাটেলিয়নকে। রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রইল অগণিত নিহত সেনা।

আর দ্বাদশ সূর্যের মত বিপ্লবী বাহিনীর দ্বাদশ শহীদকে জালালাবাদ পাহাড়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মাস্টারদা রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন কমরেডদের সঙ্গে।

আশ্চর্য, কিছুই হয়নি তাঁর!

এমন বুলেট তৈরী করতে পারেনি ডেলাস স্মিথ যা মাস্টারদার বক্ষ ভেদ করতে পারে।

শহরের শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলার পর সহকর্মীদের সঙ্গে করে মাস্টারদা যখন পাহাড়ের দিকে সরে যান, তখন অনন্ত, গণেশ প্রভৃতি সেনানায়কেরা কিছু কর্মীসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মাস্টারদার সঙ্গে তারা যোগাযোগ

রাখতে পারেনি। মাস্টারদা তাই অমরেন্দ্র নন্দীকে পাঠিয়েছিলেন ওদের খুঁজে বার করতে আর শহরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে।

অমরেন্দ্র সমস্ত সম্ভাব্য স্থানেই খুঁজল ওদের, শুভানুধ্যায়ী ও সমর্থকদের জিজ্ঞেস করল কিন্তু হদিস মিলল না। কিন্তু এই না-মেলার সংবাদটাও ত মাস্টারদার কাছে পেঁৗছে দিতে হবে, তাই সে আবার ফিরে এল পাহাড়ে, এসে দেখে মাস্টারদারা সেখানে নেই। অনন্যোপায় হয়ে সে আবার শহরেই ফিরে গেল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

পুলিশ দেখে ফেলল তাকে, সন্দেহ করল, তাকে অনুসরণ করল, ধরবার জন্য তাড়া করল। অমরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বার করল রিভলভার। চলল যুদ্ধ কিছুক্ষণ, একা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে অমরেন্দ্র রিভলভার চালিয়ে আত্মহত্যা করল। সেদিন ২৪ এপ্রিল ১৯৩০ সাল।

জ্যালালাবাদ সংগ্রামের পর রাত্রির অন্ধকারে অতি দ্রুত সরে পড়বার সময় লোকনাথ ও আরও কয়েকজন প্রধান দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মাস্টারদা জনকতক জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এসে উঠলেন কোয়েপাড়ার বিনয় সেনের বাড়ীতে। লোকনাথরা পরে এল সেখানে।

জালালাবাদ পাহাড়ের সংগ্রামে জয়লাভ করলেও বারোটি সহকর্মীকে হারাবার বেদনা বোধ হয় মাস্টারদার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধছিল, তাই তিনি ঘোষণা করলেন, শত্রুপক্ষ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাদের সৈন্যসংখ্যা অগণিত, সে সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বাড়াচ্ছে ওরা বাইরে থেকে আরও সৈন্য আনিয়ে। সুতরাং আমরা আর সম্মুখ যুদ্ধে ওদের মোকাবিলা করবার ঝুঁকি নোব না, গেরিলা পন্থায় সংগ্রাম চালাব।

অতএব বিপ্লবীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

নির্মল সেন স্বনির্বাচিত দেহরক্ষীর মত মাস্টারদার সঙ্গে লেগে রইল ছায়ার মত।

ওদিকে পুলিশের বুঝতে দেরী হল না যে, ১৮ এপ্রিলের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ও সংগঠন সূর্য সেন নামক সেই খর্বকায় ক্ষীণদেহ অতি সাধারণ চেহারার লোকটির, সুতরাং ঐ লোকটিকেই সর্বাগ্রে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। ওর সাকরেদদের কাউকে পেলেও হবে, তাকে আচ্ছা রকম উত্তম-মধ্যম দিলেই বেরিয়ে পড়বে সব খবর। দলের পান্ডাকে ধরতে পারলেই টেরোরিস্টদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া যাবে।

সুতরাং পুলিশের গুপ্তচরেরা নজর রাখল শহরের ক্লাব, ব্যায়ামাগার ও লাইব্রেরীগুলির প্রতি, কর্ণফুলী নদীর ঘাটে ঘাটে, রেল স্টেশনে, বন্দরের জেটিতে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ওরা ওৎ পেতে বসে রইল, সাপের মত উদ্যত-ফণা হয়ে ঘুরতে লাগল অলিগলিতে, গ্রামের দিকেও প্রসারিত করল ওদের

গুপ্তচর-জাল। সাসপেক্টদের তালিকায় যাদের নাম আছে, তাদের মধ্যে অনেককেই পাওয়া গেল না, ১৮ এপ্রিল থেকে তারা নিরুদ্দেশ, যাদের পাওয়া গেল, তাদের সবাইকে ধরে আনা হল আই. বি. অফিসে, অমানুষিক অত্যাচার চালানো হল তাদের ওপর, কিন্তু তেমন খবর কিছুই পাওয়া গেল না সূর্য সেনের। অনুপস্থিত সাসপেক্টদের বাড়ীতে তল্লাসী চালাবার নামে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছিটিয়ে ফেলল, ভেঙ্গে ফেলল—বাসিন্দাদের অপমান করল, মেয়েদের সম্ভ্রমে হাত দিল।

অর্থাৎ চাবুক-খাওয়া পাগলা ঘোড়ার মত সমগ্র সৈন্য ও পুলিশবাহিনী উন্মত্ত লম্ফেঝম্পে চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে লাগল।

কিন্তু তথাপি পাওয়া গেল না সেই ফেরারী অধিনায়ককে। কোন হদিস মিলল না তাঁর।

তাহলে কি তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন? বেরিয়ে গেছেন কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে? না, কখনও না।

তখন কয়েকজন সহকর্মীসহ তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সারোয়াতলী গ্রামে, কখনো শচীন সেনের বাড়ীতে, কখনো গেছেন ভরত দত্তের বাড়ী, আবার গিয়ে উঠেছেন অর্ধেন্দু দত্তের বাড়ীতে। সর্বত্র তিনি সুস্বাগত। বাড়ীর সবাই বর্মের মত ঘিরে রেখেছে তাঁকে। কিন্তু নিজের জন্য বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, তাঁর সর্ব অন্তর আচ্ছন্ন করে রয়েছে সহকর্মীদের নিরাপত্তার ভাবনা। শুধু নিরাপত্তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে চলছে তাঁর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গেরিলা পন্থায় নতুন নতুন আক্রমণের প্ল্যান।

এমনি একটি আক্রমণের প্রস্তাব করল ছয়টি বিপ্লবী জওয়ান—স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, রজত সেন, ফণীন্দ্র নন্দী আর সুবোধ চৌধুরী। বলল, কর্ণফুলী নদী পেরিয়ে ওপারে হানা দিয়ে আমরা ইয়োরোপীদের পাড়া ও তাদের ক্লাব ধ্বংস করে দোব। মাস্টারদা, অনুমতি দিন।

সেদিন ৬ মে, ১৯৩০ সাল। মাত্র সতেরো দিন আগে চট্টগ্রাম শহরে আগুন জ্বালানো হয়েছে, সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অগণিত সরকারী সেনা, ওরা তখন অত্যন্ত সজাগ, শুধু যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তাই নয়, প্রত্যাঘাত হানবার জন্য ওরা বদ্ধপরিকর। তাই মাস্টারদা অনুমতি দিতে চাইলেন না।

কিন্তু ওরা ছাড়ল না। ওদের আকুল যুক্তি, জালালাবাদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে ঢলে পড়ে যেতে দেখেছি প্রিয় বন্ধুদের, শেষ নিঃশ্বাসেও তারা হুংকার করে উঠেছে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, মর্মবিদারী সেই দৃশ্য আমাদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে—মাস্টারদা, আমরা জালালাবাদের বদলা নোব, ধ্বংস করে দোব ইয়োরোপীয়ানদের পল্লী, প্রয়োজন হলে প্রাণ দোব। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন মাস্টারদা।

মাস্টারদা নীরব সম্মতি না দিয়ে পারলেন না।

ওরা আর পৌঁছতে পারেনি। পুলিশ টের পেয়ে যায়, লোকজন নিয়ে ধরে ফেলে দুজনকে, বাকি চারজন পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে রিভলভার চালিয়ে আত্মহত্যা করে। কালারপোলে চলে এই যুদ্ধ।

ওদিকে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত জালালাবাদ সংঘর্ষের দিন, ২২ এপ্রিল, ট্রেনে অতিক্রম করছিল ফেণী, এমন সময় রেল স্টেশনে ওদের ঘিরে ফেলে পুলিশ। তৎক্ষণাৎ রিভলভার চালায় ওরা এবং পুলিশের বেষ্টনী ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে যায় এবং সরে পড়ে নিরাপদ স্থানে।

ওদের মধ্যে অনন্ত আত্মগোপন করে অন্যত্র রইল আর চন্দননগরে এসে শশধর আচার্যের ভাড়াটে বাড়ীতে আশ্রয় নিল বাকি তিন জন আর লোকনাথ বল। ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর, ওরা ভেবেছিল নিরাপদেই থাকতে পারবে এখানে। ছিলও কয়েক মাস। কিন্তু তারপর পুলিশ টের পেয়ে গেল, খবর পৌঁছে গেল কলকাতায় ইংরেজ সরকারের কাছে।

ইতিমধ্যে কলকাতায় আরও কজন সহকর্মী ধরা পড়ে গেছে, তাদের কলকাতার জেলেই আটক রাখা হয়েছে।

হঠাৎ অনন্ত সিংহ ১৯৩০ সালের ২৮ জুন স্বেচ্ছায় ধরা দিল পুলিশের হাতে, তাকেও রাখা হল কলকাতার জেলে।

১ সেপ্টেম্বর কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী কলকাতা থেকে সোজা গিয়ে রাত প্রায় তিনটের সময় ঘিরে ফেলল চন্দননগরে শশধর আচার্যের বাড়ী। বাড়ীটার দক্ষিণ দিকে একটি পুকুর, বিপ্লবীরা গুলী চালাতে চালাতে সেদিক দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করল, পারল না। জীবন ঘোষাল মারাত্মকরূপে আহত হয়ে পুকুরে পড়ে ডুবে যায় আর আহত অবস্থায় ধরা পড়ে যায় লোকনাথ, গণেশ ও আনন্দ।

ওদের সবাইকে নিয়ে আসা হল চট্টগ্রামে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীরূপে।

আসামীদের পক্ষে দাঁড়ালেন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ।

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিপ্লবীবাহিনীর প্রথম সারির কয়েকজন নেতা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে, ধরা পড়েছে এবং তাদের সঙ্গে আরও ছেলেকে জুড়ে দিয়ে ঘটা করে গঠন করা হয়েছে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল, তাদের নামে মামলা সুরু করা হয়েছে এবং সে মামলার নাম দেয়া হয়েছে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা।

কিন্তু সে কি মাত্র অস্ত্রাগার লুণ্ঠন? না, চট্টগ্রাম যুবশক্তির সশস্ত্র অভ্যুত্থান? লুণ্ঠনই যদি হবে, তাহলে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস বিধ্বস্ত করা হল

কেন ? কেন রেল লাইন উপড়ে ফেলা হল? শহরের শাসনযন্ত্র কেন অচল হয়ে গেল ? কেন শহরের ইয়োরোপীয়েরা প্রাণভয়ে জাহাজে আশ্রয় নিয়ে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে সমুদ্রে চলে গিয়েছিল ?

যাই হোক, ঘটা করে মামলা সুরু করলেও ওদের মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, রাত্রে ওদের ঘুম হয় না, দিনের বেলা ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করে।

কারণ ?

কারণ একটি, মাত্র একটি—সূর্য সেন এখনও ফেরারী !

কলকাতা ও চন্দননগরে কিছু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তারের ফলে ওদের ধারণা হল, সূর্য সেনও নিশ্চয় কলকাতার দিকে চলে এসেছে, চট্টগ্রামে বা তার আশেপাশে কোথাও তার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু আশ্চর্য সত্য, মাস্টারদা চট্টগ্রামেই রয়ে গেছেন। একেবারে শহরে না থাকলেও শহর থেকে কুড়ি বাইশ মাইলের মধ্যেই তাঁর গতিবিধি। তিনি বলেছেন, যে চট্টগ্রামে আমার বুকের পাঁজর সোনার ছেলেদের এক দলকে হারিয়েছি, সেই চট্টগ্রাম ছেড়ে কোথাও যাব না আমি।

তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য গভর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল যখন, তখন তিনি চট্টগ্রামেরই নানা গ্রামে নানা স্থানে আত্মগোপন করে রয়েছেন। কখনও দোয়ারীবাড়ীর দুর্ভেদ্য সুপারী জঙ্গল, কখনও পোপাদিয়ায় মুসলমান চাষীর বাড়ী, কখনও হাওলা গ্রামে সহকর্মী মীর আহমদের মায়ের বাড়ী, কখনও-বা জ্যৈষ্ঠপুরায় কবিরাজ অশ্বিনী দের বাড়ীতে এবং আরও অনেক জায়গায়।

এবং শুধু নিজেকেই পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে চলতেন তাই নয়, ফেরারী হয়েও তিনি সংগঠনের কাজ পুরোদমে চালাতেন, নতুন নতুন ছেলে রিক্রুট করতেন, ছেলেদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাদের আশু কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। প্রথম দিকে বিপ্লবী সংগঠনে মেয়েদের নেয়া সম্বন্ধে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল, কিন্তু বিশ্বস্ত সহকর্মীদের যুক্তিপূর্ণ অনুরোধে সম্মত হয়ে তিনি গুটিকয়েক মেয়েকেও দীক্ষা দেন এবং এই ফেরারী অবস্থাতেই তাঁর নির্দেশে বা অনুমোদনে অনেকগুলি বৈপ্লবিক কার্য অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩০ সালের ২৪ জুলাই স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে বিচার শুরু হয় বত্রিশ জন বিপ্লবীর। শুরু হবার মুখে অর্ধেন্দু গুহ-সহ কয়েকজনকে জামিনে মুক্তি দেয়া হল। শুনানীর দিন ওরা আদালতে এসে অন্য বন্দীদের সঙ্গে একই লোহার খাঁচায় থাকত, শুনানীর শেষে ওরা বাড়ী চলে যেত আর অন্য বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হত জেলে। পুলিশের এই কারসাজি বুঝতে বিপ্লবীদের ভুল হল না। ওরা ভাবল, বন্দী বিপ্লবীরা নিশ্চয়ই ফেরারী সূর্য সেনের সঙ্গে যোগাযোগে করবার চেষ্টা করবে জামিনে মুক্ত সহকর্মিদের সাহায্যে। তাই গোপনে ওদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখলেই সূর্য সেনের গোপন আশ্রয়স্থলের হদিস পাওয়া যাবে। তাই সাবধান হল বিপ্লবীরা।

জামিনে মুক্ত অর্ধেন্দু গুহ এই যোগাযোগের কাজ করত। খাঁচার মধ্যে বসে অনন্ত, গণেশ ও লোকনাথের সঙ্গে নিম্ন কণ্ঠে কথা বলত, তাদের কথা পেঁছে দিত মাস্টারদার কাছে, আবার মাস্টারদার কথা বহন করে আনত ওদের কাছে। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে সে শহর থেকে দশ বারো মাইল দূরে মাস্টারদার গোপন আশ্রয়স্থলে যাতায়াত করত।

একদিন অনন্ত ও গণেশ অর্ধেন্দু মারফৎ মাস্টারদাকে খবর পাঠাল যে, ইন্‌সপেক্টার জেনারেল অব পুলিশ ক্রেগ সাহেব চট্টগ্রামে এসেছে, পরদিনই, অর্থাৎ ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতা মেল ট্রেনে সে কলকাতা ফিরে যাবে, সে যেন আর ফিরতে না পারে।

মাস্টারদা শুনে বলে উঠলেন, অল রাইট।

এই কাজের জন্য মনোনীত করা হল কালিপদ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে।

ইতিমধ্যে ২৫ আগস্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে বেঁচে গেছে।

বাঁচেনি ইন্‌সপেক্টার জেনারেল অব পুলিশ লোম্যান। ২৯ আগস্ট ঢাকা শহরে বি. ভি. বিপ্লবী দলের কর্মী বিনয় বসুর রিভলভারের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে সে।

তারই শূন্য আসনে বসেছে টি. জে. ক্রেগ।

সুতরাং মাস্টারদা বললেন, রেডি হও তোমরা দুজন, সঙ্গে নাও রিভলভার আর বোমা। রিভলভারই চালাবে, কিন্তু যদি অনেক লোক জড়ো হয়ে থাকে ক্রেগের চারিদিকে, তাহলে বোমা ফেলে ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে রিভলভারে খতম করবে ক্রেগকে।

ওদের রওনা করিয়ে দেবার সময় পিঠ চাপড়ে দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, মনে রেখো, না মেরে ফিরে আসবে না।

ক্রেগের সঙ্গে একই ট্রেনে ওরা চাঁদপুর চলে এল। এখানে ক্রেগ ট্রেনে থেকে নেমে গোয়ালন্দগামী স্টীমারে উঠবে। আগে প্লাটফরমে নামল পুলিশ ইন্‌সপেক্টার তারিণী মুখার্জী, ওরা তারই ওপর গুলী চালাল। তারিণী প্রাণ হারিয়ে পড়ে গেল। পালিয়ে যাবার পথে ওরাও ধরা পড়ে গেল।

মাস্টারদা সব খবর পেলেন। কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না।

পরাধীনতার শৃংখল ছিঁড়ে ফেলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে কণ্টকাকীর্ণ পথে বিপ্লবীদের যাত্রা, সেই পথের পাশে নেই কোনো পান্থপাদপ, নেই গাছগাছালির ছায়া, নেই কোনো বিশ্রামাগার। যোজনের পর যোজন চলেছে সেই পথ সাহারার বিস্তীর্ণ বালুকারাশির ওপর দিয়ে কোন্ অনিশ্চিত সুদূরের পানে, কে জানে। সেই পথে এগিয়ে যেতে যেতে ঢলে পড়বে কত সহযাত্রী, হাসিমুখে পেছনে ফেলে আসতে হবে আত্মীয় পরিজনের কত না দীর্ঘশ্বাস, কত না অশ্রু, হৃদয়

থেকে নিঙড়ে ফেলে দিতে হবে মায়া মমতা ও সমবেদনার শেষ বিন্দুটুকু। শুধু এগিয়ে যেতে হবে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন।

মাস্টারদা স্থির করলেন অনন্ত গণেশদের সুবোধ বালকের মত অসহায়ভাবে ইংরেজের বিচার-প্রহসনের শিকার হতে দেওয়া হবে না, জেল ভেঙ্গে ওদের বার করে আনতে হবে।

তৎক্ষণাৎ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

স্থির করা হল, কোর্টের কাছাকাছি একটি খালি বাড়ীতে পাঁচটি ল্যান্ড মাইন লুকিয়ে রাখা হবে। যে টিলার ওপর এই বাড়ীটি অবস্থিত, সে টিলার ওপরে যাবার পথের ধারেও পুঁতে রাখা হবে কয়েকটা মাইন। ট্রাইবিউন্যালের বিচারপতিরা যে পথে কোর্টে আসে, সেই লাভ লেন-এর নীচেও থাকবে মাইন। জেলের যে অংশে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীরা আছে, সেই ইয়ার্ডের জেলের প্রাচীর উড়িয়ে দেবার জন্য তার নীচেও ডিনামাইট পাতা থাকবে। ঐ প্রাচীর বিশেষভাবে গার্ড দেবার জন্য কলকাতার আলীপুর সেনট্রাল জেল থেকে আমদানী করা হয়েছে যে চারজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডার, প্রচুর টাকা দিয়ে তাদের হাত করা হবে যাতে প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বার পর তারা বাধা না দিয়ে প্রাণভয়ে ইয়ার্ড ছেড়ে পালিয়ে যায়। সমস্ত মাইন ও ডিনামাইটের সঙ্গে তার জুড়ে দিয়ে দূরে কোনও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে ওখানে বসেই সুইচ টিপে প্রয়োজনমত ওগুলির বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। বন্দীদের কাছে থাকবে রিভলভার, তারা রিভলভার চালাতে চালাতে জেল থেকে বেরিয়ে এসে উঠবে অপেক্ষমান মোটর গাড়ীতে ও নৌকোয়, অতি দ্রুত তারা গ্রামাঞ্চলে সরে পড়বে, তাদের জন্য রেডি রাখা হবে গোটাকতক নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা।

মাস্টারদার নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলতে লাগল।

অপারেশন হবে এমনি ভাবেঃ নির্দিষ্ট দিন যে করেই হোক সকালবেলা পুলিশের কানে খবরটা তুলে দিতে হবে যে, ঐ খালি বাড়ীটাতে কয়েকটি মারাত্মক ধরণের মাইন লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তল্লাসী চালাতে যাওয়ামাত্র মাইনগুলো ফাটিয়ে দিয়ে ওদের খতম করা হবে। খবর পেয়ে ওদের অফিসাররা যেই টিলার ওপর উঠতে যাবে, তখন পথের নীচেকার মাইনগুলো বিস্ফোরিত হবে, ওরা প্রাণ হারাবে। তারপরই শুনানী সুরু করবার জন্য ট্রাইবিউনালের বিচারকরা যেই লাভ লেন দিয়ে কোর্টের দিকে আসতে থাকবে, অমনি সুইচ টেপা হবে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ওদের গাড়ীগুলি উড়ে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রাচীরের নীচেকার ডিনামাইটগুলি বিস্ফোরিত হবে, বন্দীরা বেরিয়ে আসবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্ধেন্দু গুহ মারফৎ ও অন্য উপায়ে অনন্ত গণেশদের কাছে গোপনে পাঠানো হল গান পাউডার, গান কটন, কয়েকটি আর্মি রিভলভার, কতকগুলি ছোরা এবং কিছু স্ক্রু ড্রাইভার, হাতুড়ী ইত্যাদি যন্ত্রপাতি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

যে করে হোক, জেল কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ অনন্ত, গণেশ ও লোকনাথকে পৃথক পৃথক সেলে আবদ্ধ করা হল, চারিদিকের পাহারা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হল এবং মাটি খুঁড়ে তল্লাসী চালিয়ে বার করে ফেলল, মাইন, ডিনামাইট, রিভলভার, ছোরা, গান পাউডার, গান কটন—সব কিছু।

বাইরেও, গভীর রাত্রে আদালত গৃহে ল্যাণ্ডমাইন স্থাপন করবার সময় ছেলেরা সহসা পুলিশের নজরে পড়ে যায়। তারা গ্রেপ্তার করে কয়েকজনকে, তারপর ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে মাইন প্রস্তুতের গোপন কেন্দ্রটিও আবিষ্কার করে ফেলে।

এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন মাস্টারদা, সেই ফেরারী মহাবিপ্লবী, যাকে খুঁজে বার করবার জন্য কালান্তকের মত পুলিশ চট্টগ্রাম চষে ফেলছে, যাঁকে ফাঁসীর দড়িতে লটকে দেবার জন্য ইংরেজ সরকারের হাত নিসপিস করছে, সেই নির্ভয় নিঃশঙ্ক বিপ্লবী-নায়ক সূর্য সেন, আপামর জনসাধারণের মাস্টারদা জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের উদ্দেশ করে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে পাঠালেন, হতাশ হয়ো না। বিপ্লবীর জীবনে হতাশার স্থান নেই। যে আগুন জ্বালিয়ে তুলেছ তোমরা, পরাধীনতার নিগড় পুড়ে ছাই হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে আগুন নিভবে না। সেদিন হয়ত তোমরা থাকবে না, আমি থাকব না, আমাদের কেউই হয়ত বেঁচে থাকবে না, কিন্তু বিপ্লবীদের আত্মদানের মহাশ্মশানের বুকে উড্ডীন হবে স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনা ও প্রধান প্রধান সাক্ষীদের জেরা করবার জন্য ব্যারিস্টার শরৎ বোস বহুবার কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। একদিন জামিনে মুক্ত অন্যতম আসামী অর্ধেন্দু গুহ মারফৎ তিনি ফেরারী মাস্টারদার কাছে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, মাস্টারদা যে শরৎ বোস অর্ধেন্দু মারফৎ জবাব দিয়েছিলেন এবং তারপর মাস্টারদাকে যে উপহার পাঠিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে 'সূর্য সেন স্মৃতি' গ্রন্থে প্রকাশিত অর্ধেন্দু গুহের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি—

'...তিনি আমাকে অতি গোপনে বলেন, মাস্টারদার কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে। তাঁকে বল, তাঁর ন্যায় একজন নেতার প্রাণ রক্ষা করার সবিশেষ দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর আছে, এ বিষয়ে আমরা সচেতন। তিনি যদি সম্মত থাকেন, তাহলে তাঁকে নিরাপদে ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করব।

'শরৎ চন্দ্র বসুর এই কথা শুনে মাস্টারদা বলেছিলেন, শরৎবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বল, এখনও আমাদের লক্ষ্য অর্জনের বহু বিলম্ব আছে, এই অবস্থায় আমার কর্মক্ষেত্র এই চট্টগ্রাম জেলা ছেড়ে আমার নিরাপত্তার জন্য অন্য কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।...তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইখানেই আমাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে।...

'মাস্টারদার এই উত্তর শুনে শরৎ চন্দ্র বসু যথার্থই অভিভূত হয়ে যান এবং তারই কিছুদিন পরে যখন তিনি শেষ বারের মত চট্টগ্রামে আসেন; তখন তিনি তাঁর সুটকেস থেকে চারটি তাজা টি এন টি বোমা এবং দুহাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে বলেন, মাস্টারদাকে দিও এবং তাঁকে বল, আমার প্রস্তাবের যে জবাব তিনি দিয়েছিলেন, তারই উত্তরে এ হচ্ছে তাঁকে আমার গভীর শ্রদ্ধার উপহার। আশা করি এই উপহার তাঁর অনুপযুক্ত হয়নি।...'

সত্যিই, তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন মহাবিপ্লবী।

জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চট্টগ্রামেই ছিলেন।

যে মাটিতে তাঁর জন্ম, সেই মাটিতেই তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন।

সূর্য অস্তমিত, সূর্য চিরভাস্বর

না, কখনও চট্টগ্রাম জেলার সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে যাননি ফেরারী সূর্য সেন।

মাথার ওপর পলকা সূতোয় ঝুলছে ইংরেজের খড়্গ। ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে আগুন জ্বালিয়ে সরকারী শাসন স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। সেদিন থেকেই আরও অগণিত সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি ফেরারী। তারপর কবে এক বছর পার হয়ে গেছে। ভাঙ্গা শাসনযন্ত্র ইংরেজ আবার জোড়া দিয়ে নিয়েছে, জোরদার করেছে, জালালাবাদে বিপ্লবী সেনাদলের সম্মুখীন হয়েছে, নিহত হয়েছে একদল বিপ্লবী, চন্দননগরে ধরা পড়েছে বিপ্লবী লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, অনন্ত সিংহ স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে কলকাতায়, ডিনামাইট ও মাইনযোগে চট্টগ্রামের জেলের দেয়াল উড়িয়ে দিয়ে ওদের উদ্ধার করবার পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্ট ব্যর্থ করে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মর্মে মর্মে বুঝেছে ইংরেজ যে, সব কিছুর পশ্চাতে সেই খর্বকায় ক্ষীণস্বাস্থ্য, সাধারণ, অতি সাধারণ চেহারার লোকটির অদৃশ্য হস্ত কাজ করলেও তাকে হয়ত জীবিতভাবে ধরা যাবে না। তাই ঘোষণা করা হয়েছে জীবিত বা মৃত সূর্য সেনকে চাই, চাই, চাই।

শির লাও, শিরোপা লেও।

কিন্তু শির নেয়া দূরের কথা, তাঁর হদিসই করতে পারেনি পুলিশ। পারেনি তিন বছর।

কি করে পারবে? চেহারা যেমন তাঁর সাধারণ, সাধারণের মাঝে চকিতে মিশে অদৃশ্য হয়ে যাবার কৌশলটিও চমৎকারভাবে আয়ত্ত। কখনও তিনি ঝাঁকামুটে, কখনও স্যাম্পানের মাঝি, কখনও মোটবাহী কুলি, কখনও খালি গায়ে ফোঁটাতিলক কাটা পুরোহিত, কখনও-বা মুসলমান চাষী, কখনও চলেছেন গোয়ালার বেশে গরু নিয়ে, কখনও আবার কাপড়ের বোঝা-মাথায় ধোপা। এমন কি, কখনও মহিলার ছদ্মবেশেও তিনি পুলিশকে ধোঁকা দিতেন। পুলিশ হয়ত সংবাদ পেয়ে কোন বাড়ী ঘিরে ফেলেছে, তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালাচ্ছে, পালিয়ে যাবার পথ নেই, ধরা পড়া অবধারিত, এমন সময় ঠাণ্ডা মাথায় ধুতিখানা নেংটির মত পরে পাচনবাড়ি হাতে গোয়াল থেকে গরুবাছুর নিয়ে পুলিশের সামনে দিয়েই চলে গেলেন গোচারণের মাঠে।

ফেরারী সূর্য সেনের আশ্রয়স্থলের জন্য কোনো গ্রাম বা কোনো বাড়ী খোঁজাখুঁজি করতে হত না। চট্টগ্রামের সব গ্রামের সব বাড়ীতেই তিনি ছিলেন সুস্বাগত। তাঁকে আশ্রয় দান যে কতখানি বিপজ্জনক, তার পরিণাম যে

কতখানি ভয়াবহ হতে পারে, তা জেনেশুনেই সবাই তাঁকে আশ্রয় দিত, আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ মনে করত। আশ্রয়দাতাদের অনেকেই আগে হয়ত চোখেই দেখেনি, শুধু নামই শুনেছে, আশ্রয় নিতে এলে তাঁকে শুধু অভ্যর্থনা ও শ্রদ্ধাই জানাল না, কিছুদিন থেকে যাবার জন্য সনির্বন্ধ আবেদনও জানাল। যেন ফেরারী সূর্য সেনকে যে যত বেশী দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে, তত বেশী সৌভাগ্যের অধিকারী হবে সে, তত বেশী ধন্য হবে। কখনও পোপাদিয়ায়, কখনও হাওলা গ্রামে, কখনও জ্যৈষ্ঠপুরায়, কখনও বা কেলি শহরে, শ্রীপুরে বা পরৈকোড়ায় কখনও, আবার কখনও বোয়ালখালি বা কধুরখিলে—এমনিভাবে অসংখ্য গ্রামে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন।

আর শুধু কি আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছেন? মোটেই না। ফেরারী থাকাকালেও অসংখ্য বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড করেছেন।

সারা ১৯৩০ সাল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন ফেরারী মাস্টারদার কোনো হদিস করতে পারা গেল না, বরং ডিনামাইট দিয়ে জেলখানার প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার বিচারাধীন আসামী লোকনাথ, অনন্ত, গণেশ প্রভৃতিকে বার করে নেবার ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে মাস্টারদারই অদৃশ্য হাতের সন্ধান পাওয়া গেল, পুলিশ তখন ক্ষেপে গেল। যাকে তাকে ধরে নিয়ে এসে অকথ্য নির্যাতন চালাতে লাগল, শহরের ব্যায়ামাগার ও লাইব্রেরীগুলি তছনছ করে ফেলল, সান্ধ্য আইন জারী করা হল, নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনে বার হবার জন্য নানা রং-এর পাশের ব্যবস্থা করা হল, বন্দুক উঁচিয়ে শহরের পথে পথে কালান্তকের মত ঘোরাফেরা করতে লাগল সশস্ত্র পুলিশ। তারপর শহর ছাড়িয়ে ওরা গ্রামে গ্রামে হানা দিতে লাগল, তল্লাসীর নামে লণ্ডভণ্ড করে দিতে লাগল গৃহস্থের জিনিসপত্র. অধিবাসীদের ওপর বন্দুকের কুঁদা চালাতে লাগল, নির্বিচারে চালাতে লাগল বেটন ও বুট, অত্যাচারে অত্যাচারে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে লাগল।

সর্বত্র সবার কাছে ওদের একই প্রশ্ন, কোথায় সূর্য সেন? সূর্য সেন কোথায়?

এবং এই অমানুষিক অত্যাচারের পাণ্ডার কাজে যে বড্ড বেশী উৎসাহ দেখাচ্ছিল, তার নাম খান বাহাদুর আশানুল্লা, ইন্‌সপেক্টার অব পুলিশ।

আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে চাপা উত্তেজনা চলতে লাগল, চলতে লাগল রুদ্ধ আলোচনা ও ভ্রূকুঞ্চিত প্রশ্ন—চট্টগ্রামের ছেলেদের মধ্যে এমন কি কেউ অবশিষ্ট নেই, যে শায়েস্তা করতে পারে এই নরপিশাচকে? স্তব্ধ করে দিতে পারে ওর আস্ফালন?

মাস্টারদা হাত কামড়ালেন। বললেন, খতম করতে হবে ওকে।

পরামর্শ করলেন নির্মল সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেরী হল না। স্থির হল, নিজাম পল্টন খেলার মাঠে ওকে শেষ করা হবে।

দু-দুবার চেষ্টা করা হল। ব্যর্থ হল সে চেষ্টা।

এবার কর্মী বদলালেন মাস্টারদা। এবার ভার দেয়া হল হরিপদ ভট্টাচার্যকে, সঙ্গে থাকবে আরও দুটি ছেলে, প্রয়োজনে সাহায্য করবে।

কিন্তু ওরাও দু-দুবার চেষ্টা করেও আশানুল্লাকে নাগালের মধ্যে পেল না।

অবশেষে এল সেই স্মরণীয় দিনটি, ১৯৩১ সালের ৩০ আগস্ট।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে আরও কতকগুলি রাজনৈতিক হত্যা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

কলিকাতায় বাংলা সরকারের প্রধান দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর হানা দিয়েছিল বি ভি বিপ্লবী দলের বিনয় বসু, সুধীর (ওরফে বাদল) গুপ্ত আর দীনেশ গুপ্ত, খতম করেছে তারা ইন্‌সপেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্স সিম্পসনকে।

১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে হত্যা করেছে ঐ বি ভি দলেরই অপর দুটি ছেলে, বিমল দাশগুপ্ত ও যতিজীবন ঘোষ।

১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই আলীপুরের দায়রা জজ গার্লিককে শেষ করে দিয়েছে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের ছেলে কানাই ভট্টাচার্য।

তারপর এল ১৯৩১ সালের ৩০ আগস্ট। পুলিশ ইন্‌সপেক্টার আশানুল্লার জীবনের শেষ দিনটি।

নিজাম পল্টন মাঠে সেদিন অগণিত দর্শক। রেলওয়ে কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। একদিকে পুলিশ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত টাউন ক্লাব, অপর দিকে রেলওয়ে খেলোয়াড়দের কোহিনুর ক্লাব।

তুমুল উত্তেজনার মধ্যে খেলা শেষ হল, জিতল টাউন ক্লাব। মিলিটারী ব্যূহের সংরক্ষিত আসনে বসে খেলা দেখছিল আশানুল্লা। তাদের ক্লাবের জয়লাভে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেই সে ব্যূহের বাইরে বেরিয়ে এসেছে, দর্শকদের ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে, অমনি গর্জে উঠল হরিপদর হাতের রিভলভার। পর পর চার বার।

প্রাণহীন আশানুল্লার দেহ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল চট্টগ্রামবাসী।

তারপর প্রায় বছরখানেক কেটে গেছে।

১৯৩২ সালের জুন মাস।

ফেরারী মাস্টারদা তখন আত্মগোপন করে রয়েছেন ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে। সঙ্গে আছে নির্মল সেন আর অপূর্ব সেন।

নারী কর্মী প্রীতিলতা ওয়াদেদার মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে এল ৬ জুন।

সেদিনই রাত প্রায় নটায় নৈশ আহারে বসেছেন মাস্টারদা আর প্রীতি। অপূর্বর জ্বর হয়েছে, খাবে না সে। নির্মলও খাবে না জানিয়েছে। ওরা দুজন দোতলায় শুয়ে আছে।

ওঁদের আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় সদাসতর্ক মাস্টারদা বাইরে যেন কিসের শব্দ পেলেন। তখনই নির্মলা নামে ছোট মেয়েটিকে নিঃশব্দে দরজার খিল খুলে পাট সামান্য ফাঁক করে বাইরেটা একবারটি দেখতে বললেন।

নির্মলা দেখে এসেই বলল, পুলিশ! পুলিশ এসেছে উঠোনে।

খাওয়া ফেলে উঠে পড়লেন দুজন। প্রীতিকে নীচে থাকতে বলে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তিনি একটা বাঁশের মই বেয়ে দোতলার উঠে গেলেন, ওদের বললেন, পুলিশ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ রিভলভার বার করল নির্মল আর অপূর্ব।

ততক্ষণে ওরা দোতালায় সিঁড়ির দরজায় এসে গেছে। হাবিলদার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে তার পেছন পেছন উঠছে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে হাবিলদারকে সিঁড়ির ওপর ফেলে দিল অপূর্ব, পরক্ষণেই দ্রাম দ্রাম করে গর্জে উঠল নির্মলের হাতের রিভলভার। অব্যর্থ লক্ষ্য। প্রাণ হারিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ল ক্যামেরন আর টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল হাবিলদার।

পরক্ষণেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। একদিকে নির্মল, অপূর্ব আর মাস্টারদা, অপর দিকে ২১৮ নম্বর গুর্খাবাহিনী। একদিকে রিভলভার, অপর দিকে রাইফেল। তাতেও ভরসা পাচ্ছিল না হাবিলদার। দ্রুত লোক পাঠাল পটিয়া মিলিটারী ক্যাম্পে। চলে এল পনেরোজন রাইফেলধারী সৈন্য, সঙ্গে করে আনল একটি লুইস গান। চলল যুদ্ধ অবিরাম।

ওদিকে ছটফট করছে প্রীতি। সে আর নীচে থাকতে রাজী নয়, ওপরে যাবে, ওপরে যাবে মাস্টারদার কাছে, মাস্টারদার পাশে দাঁড়িয়ে গুলী চালাবে, তারপর মাস্টারদার পায়ের তলায়ই ঢলে পড়বে। যাবেই সে দোতালায়। বাধা দিচ্ছেন সাবিত্রী দেবী ও তাঁর ছেলেমেয়েরা। শুনছে না, মানছে না, ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করল প্রীতি। এক সময় ওদের হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে গিয়ে উঠল মই-এর ওপর, কিন্তু পারল না, ওরা ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে প্রীতিকে ফেলে দিল মাটিতে।

অকস্মাৎ একটা গুলী এসে লাগল নির্মলের বুকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বুক চেপে বসে পড়ল সে। মাস্টারদা ছুটে এলেন, ওর বুক চেপে ধরলেন। কিন্তু বিপ্লবীর অন্তরে তখনও নেতার নিরাপত্তার চিন্তা। আত্মদানেও যদি তাঁকে রক্ষা করা যায়! বলে উঠল নির্মল, পালিয়ে যান, পালিয়ে যান মাস্টারদা অপূর্ব আর প্রীতিকে নিয়ে—

আর আপনি?

আমার জন্য ভাববেন না, নির্মল জবাব দিল, I am fatally wounded, আমায় ছেড়ে দিয়ে আপনারা পালিয়ে যান, যান শীগগির, যান—

মুহূর্ত কাল থমকে দাঁড়ালেন মাস্টারদা। তারপর অপূর্বকে নিয়ে অতি

সন্তর্পণে পেছনের মই বেয়ে নীচে নেমে এলেন, প্রীতিকে বললেন, আমার পেছনে এস।

যুদ্ধ তখন থেমে গেছে। দোতলা থেকে গুলীবর্ষণ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় গুর্খাবাহিনী ভাবল, হয় বিপ্লবীরা নিহত কিংবা ওদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেছে। তাই হাবিলদার কজনকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। নীচেও রইল এক দল সৈন্য।

পেছনের নিবিড় অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছেন তিনজন। সামনে রিভলভার উঁচিয়ে অপূর্ব, পেছনে প্রীতি আর মাঝখানে মাস্টারদা। উত্তর দিকে একটা বড় আম গাছ, সেদিকেই চলেছেন তাঁরা।

অকস্মাৎ একটা গুলী এসে লাগল অপূর্বর বুকে। পড়ে গেল সে। ব্যথায় কাতর আর্তনাদ করতে লাগল। বসে পড়লেন মাস্টারদা ও প্রীতি। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। তখনও শোনা যাচ্ছে অপূর্বর আর্তনাদ। কিন্তু রণক্ষেত্রে সহকর্মীর জন্য শোক করার অবকাশ নেই। বিপ্লবীর জীবনে অশ্রু বলে কিছু নেই। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম অবিরাম, অবিচ্ছিন্ন। একমাত্র স্বাধীনতালাভেই সেই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি।

প্রীতিকে নিয়ে মাস্টারদা বুকে ভর দিয়ে এগোতে লাগলেন।

ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে বাইরে এসেই পড়ল মাঠ, বৃষ্টির জলে প্লাবিত, তার ওপর দিয়েই এগিয়ে চলেছেন ফেরারী মহাবিপ্লবী সূর্য সেন আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

এমনিভাবে প্রায় চার মাইল পথ অতিক্রম করে ওঁরা গিয়ে উঠলেন জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে কবিরাজ অশ্বিনী দের বাড়ীতে।

পাহাড়তলী ওয়ার্কশপের দক্ষ ফিটার নিশিকান্ত দে।

ওয়ার্কশপে এমনি কত ফিটারই ত আছে এবং দক্ষ ফিটার। সুতরাং নিশিকান্ত দের সম্বন্ধে পুলিশের ভাবনার কোন কারণ থাকতে পারে না। ভাবনার কারণ ছিল না বলেই সুযোগ নিয়েছিল তার ভাইপো বিপ্লবী কালীকিঙ্কর দে। নিশিবাবুর বাড়ী ডিনামাইট তৈরীর কারখানায় রূপান্তরিত হল। নিশিবাবু ডিনামাইট তৈরী করতে লাগলেন আর তৈরী করা দেখাতে লাগলেন ছেলেদের।

এক সময় পুলিশ কি করে খবর পেয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলে বাড়ীটা। আশা ছিল ফেরারী মাস্টারদাকেও ওখানে পাওয়া যাবে। তাঁকে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু বমাল গ্রেপ্তার হল কয়েকটি ছেলে এবং তাদের সঙ্গে নিশিবাবুও।

নিশিবাবু স্ট্রাইকার-লাগানো বোমা তৈরী করে মাস্টারদাকে সরবরাহ করতেন আর মাস্টারদা কাজে লাগাতেন সেই দুর্ধর্ষ বোমা।

চট্টগ্রাম শহর থেকে তিন মাইল দূরে আসাম-বেঙ্গল ইয়োরোপীয়ান ক্লাব, ছোট

করে বলা হয় পাহাড়তলী ইনস্টিটিউট। শুধু ইয়োরোপীয়রাই এর সদস্য হবার যোগ্য। প্রতিদিন রাত্রে সেখানে চলে সাহেব মেমদের যুগল নৃত্য। যেমন বে-আব্রু স্বচ্ছ পোশাক মেমদের, তেমনি তাদের নিতম্ব-দোলানো অশ্লীল নৃত্য। চলে মদ্যপান, নারী ও পুরুষের হৈ-হুল্লোড় মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর প্রায় আড়াই বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। ভয়ে একদা যাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যারা আশ্রয় নিয়েছিল সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজে, তারা এখন ফিরে এসেছে, তাদের অন্ধকার নৃত্য-বাসরে আবার আলো জ্বলে উঠেছে, আবার বেজে উঠেছে রুম্বা-সাম্বা ব্যাণ্ডবাদ্য।

মাস্টারদা স্থির করলেন এই পাহাড়তলী ইনস্টিটিউট আক্রমণ করতে হবে। করতে হবে গভীর রাত্রে, যখন চলবে নাচ, গান, বাদ্য আর মদ্যপান। দৈত্যের মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিপ্লবী দল আর সে দলের অধিনায়িকা প্রীতিলতা ওয়াদেদার।

সাজো সাজো রব পড়ে গেল। রেডি হল জওয়ানেরা, কালিকিংকর দে, মহেন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল দাস, শান্তি চক্রবর্তী, বীরেশ্বর রায়, সুশীল দে, পান্না সেন এবং আরও কয়েকজন। আর রেডি হল প্রীতিলতা ওয়াদেদার। তাদের হাতে মাসকেট, রিভলভার, পিস্তল, গ্রেনেড, ভোজালি আর নিশিবাবুর তৈরী স্ট্রাইকার-ফিলড বোমা। মিলিত হল সবাই জয়দ্রথের আশ্রয়স্থলে। তারকেশ্বর দস্তিদার সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের ছদ্মবেশে সেখানে এসে হাজির মাস্টারদা।

মাস্টারদা বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ফিরতে পারবে, কে পারবেনা, জানিনা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, তোমাদের লীডার প্রীতি আর ফিরবে না।

উত্তাপহীন আবেগহীন কণ্ঠ। যেন গল্পচ্ছলে জানালেন কথাটা। সৌম্য অচঞ্চল মূর্তি মাস্টারদার। স্থৈর্য ও ধৈর্যের জীবন্ত প্রতীক। বিপ্লবের রক্তরাঙ্গা পথে নিজে নেমে যাদের নামিয়ে এনেছিলেন, যাদের নিয়ে চলেছিলেন সেই বিপজ্জনক পথে, যে পথে আছে কালবৈশাখীর রণহুংকার, পদে পদে মৃত্যু-গহ্বর, নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করে সেই পথে যাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ঢলে পড়েছে শত্রুর আক্রমণে, অনেকেই শত্রুর হাতে বন্দী, কিন্তু পথের পাশে সেই আত্মজনদের ছেড়ে রেখে আজও এগিয়ে চলেছেন মহাবিপ্লবী। যে আবেগ, যে সংকল্প, যে গতিবেগ নিয়ে প্রথম দিন যাত্রা শুরু করেছিলেন, আজও রয়েছে তা অটুট, নিরবচ্ছিন্ন। তাই নিবাত নিষ্কম্প স্বরে ঘোষণা করলেন, শহীদ হয়ে প্রীতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

নইলে, ছেলেদের মত মেয়েরাও যে রিভলভার ধরতে জানে, রিভলভার চালাতে জানে, রিভলভার চালিয়ে শত্রুর বক্ষভেদ করতে জানে, ইতিমধ্যে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্টেট

স্টিভেন্সকে খতম করে দিয়েছে শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী, ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী বীণা দাস গুলী চালিয়েছিল স্বয়ং বাংলার গভর্ণর জ্যাকসনের ওপর।

ঘরের মধ্যে পরিপাটি করে সাজানো হল মা কালীর পট। পাশেই শ্রীকৃষ্ণের ছবি, সুদর্শনধারী মুরারি। জ্বালানো হল প্রদীপ, পোড়ানো হল ধূপ। ভক্তিনম্রচিত্তে পুজোয় বসল জওয়ানের দল আর তাদের নায়িকা প্রীতি। পুরোহিত স্বয়ং মাস্টারদা। পুজো শেষে সবাই অঞ্জলি দিল রক্তজবা, প্রণাম করল দেবদেবীকে, প্রণাম করল পুরোহিতকে।

পুরোহিত হাত তুলে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন, তোমাদের যাত্রা সফল হোক।

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা।

পাহাড়তলী ইনস্টিটিউটে তখন বাধাবন্ধনহীন আমোদের আসর জমজমাট হয়ে উঠেছে। জলদে বাজছে ব্যাণ্ডবাদ্য, উদ্দাম হয়ে উঠেছে লাস্য নৃত্য, ছুটছে মদের ফোয়ারা, চলছে জড়িত কণ্ঠে অশ্লীল গান, বেসামাল বেশবাস খসে পড়ছে, এমন সময় অকস্মাৎ খোলা জানালা দরজায় যমদূতের মত দেখা গেল বিপ্লবীকে। পরক্ষণেই গুম গুম করে গর্জে উঠল মাসকেট, রিভলভার, পিস্তল, বৃষ্টি-ধারার মত মেঝের ওপর পড়তে লাগল, গ্রেনেড, প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হতে লাগল।

নেশা ছুটে গেল সাদা চামড়ার নরনারীর, ছুটোছুটি হুটোপুটি পড়ে গেল, আলোগুলি ভেঙ্গে চুরমার, চুরমার গেলাস বোতল। আসবাব তছনছ। অন্ধকারে শুধু শোনা যেতে লাগল পলায়মান নরনারীর চীৎকার, আহতের আর্তনাদ।

যেমন ঝটিকার বেগে এসেছিল ওরা, তেমনি কাজ হাসিল করে ঝটিকার বেগেই ওরা মিলিয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারে।

পড়ে রইল মৃত সাহেব মেমের পাহাড়।

আর রইল একজন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার।

অভিযানের নায়িকা মাস্টারদার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। বিষ খেয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুতে ঢলে পড়ে চিরনিদ্রায় অভিভূত প্রীতি।

ফেরারী হবার পর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে।

এর মধ্যে ভারতের বাইরে গিয়ে আত্মরক্ষা করবার সনির্বন্ধ প্রস্তাব এসেছে। এসেছে অন্ততঃ চট্টগ্রাম জেলার বাইরে সরে যাবার অনুরোধ, কিন্তু মাস্টারদা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন শুভানুধ্যায়ীদের উদ্বেগাকুল পরামর্শ। বলেছেন চট্টগ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবেন না তিনি।

বস্তুতঃ শহরের বিশ মাইলের মধ্যেই ছিল তাঁর আনাগোনা।

পুলিশও তা বুঝতে পেরেছিল। তাই গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝেই স্থাপন করেছিল মিলিটারী ক্যাম্প। প্রতিদিন সেখানকার সৈন্যেরা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে বেড়াত সূর্য সেনের খোঁজে।

কিন্তু পাত্তা পায়নি তাঁর।

সূর্য সেন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন চট্টগ্রাম জেলার সীমানার মধ্যেই।

ফেরারী জীবনে তাঁর অন্যতম প্রিয় গান ছিল 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।' বীরেশ্বর রায় এবং অন্যেরা তাঁকে শোনাত, কখনও নিজেই গাইতেন গুন গুন করে, 'একলা চল রে'।

১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী।

পটিয়া থানা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গৈরালা গ্রাম। সেই গ্রামের বাসিন্দা শ্রীমতী ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস। প্রায় চার দিন হল সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন ফেরারী সূর্য সেন। সঙ্গে আছে মণি দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দাশগুপ্ত, নারী কর্মী কল্পনা দত্ত আর ব্রজেন সেন। ব্রজেনও গৈরালার অধিবাসী, একটু দূরেই তার বাড়ী। এই গুপ্ত আশ্রয়স্থলের তদারকির ভার তার ওপর। মাস্টারদাদের খাবার তৈরী হয় ব্রজেনদের বাড়ীতে, রাঁধেন ওর বৌদি, ব্রজেন সেই খাবার নিয়ে আসে ক্ষীরোদপ্রভার বাড়ীতে।

ব্রজেনের দাদার নাম নেত্ররঞ্জন সেন। কাদের জন্য রোজ ব্রজেন খাবার নিয়ে যায় বিশ্বাস-বাড়ীতে? নেত্রর কৌতূহল হল জানবার। জানে সে, ভাই কিছুই বলবে না। ওর চলাফেরা ও কথাবার্তা ভাল নয়, হয়ত স্বদেশীদের দলে ভিড়েছে, জিজ্ঞেস করলে দশ কথা শুনিয়ে দিতে পারে।

তাই সে স্ত্রীর শরণাপন্ন হল। মিঠে কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার কাছ থেকে জেনে ফেলল, ওরা সূর্য সেন আর তাঁর চ্যালাচামুন্ডারা।

সূর্য সেন? চমকে উঠল নেত্র। ফেরারী সূর্য সেন? ওদের সেই মাস্টারদা? তিন বছর ধরে যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী? যাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে দশ হাজার টাকা? নেত্র সেনের চোখ চক চক করে উঠল, লোভাতুর মন লক লক করে উঠল।

এক সময় সরে পড়ল সে। গেল পটিয়া থানায়।

তারপর সেই ১৬ ফেব্রুয়ারী।

রাত্রিকাল। খেতে বসেছেন মাস্টারদা আর সহকর্মীরা।

হঠাৎ মাস্টারদা বমি করে ফেললেন।

চিন্তিত হল ব্রজেন। ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওষুধের ব্যবস্থা করা দরকার। তক্ষুনি। ছুটল ব্লু-বাড়ীতে ওষুধ আনতে, গিয়ে দেখে নেত্র, বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে একটা লন্ঠন শূন্যে তুলে দোলাচ্ছে। সন্দেহ হল তার, ঘোর সন্দেহ।

তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে সব বলল মাস্টারদাকে। মাস্টারদা হুকুম দিলেন, রেডি হও সবাই, এখখুনি চলে যেতে হবে অন্য কোথাও।

But it was too late, দেরী হয়ে গেছে, দেরী হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন ওয়ামসলির নেতৃত্বে ততক্ষণে চল্লিশ জন রাইফেলধারী সৈন্য ঘিরে ফেলেছে ক্ষীরোদপ্রভার বাড়ী। তারা ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে কালান্তকের মত।

সুতরাং এসেছে চ্যালেঞ্জ। জালালাবাদ, চন্দননগর, ধলঘাট, কালারপোল চ্যালেঞ্জ। রিভলভার বাগিয়ে রেডি হল ওরা, পাঁচটি বীর পাঁচটি পাণ্ডবের মত। চল্লিশ জনের মহড়া নেবার জন্য ওরা প্রস্তুত। বলল, আমরা গুলী চালিয়ে ওদের ব্যাপৃত রাখব মাস্টারদা আর সেই অবসরে পালিয়ে যাবেন।

মাস্টারদা বললেন, না, তা নয়। আমরা কৌশলে ওদের বোকা বানিয়ে যে যে পারি, সরে পড়ব।

তিন দলে ভাগ হলেন ওঁরা, মণি ও কল্পনা, শান্তি ও সুশীল, ব্রজেন ও মাস্টারদা। বাড়ীর পূব দিকের পথ দিয়ে এসেছে ওয়ামসলি, তাই কোন দল পশ্চিমে, কোন দল উত্তরে আর তৃতীয় দল যাবে দক্ষিণ দিকে। নিবিড় অন্ধকার, তারপর গাছ-গাছালি ও ঝোপঝাড়ের নীচে যে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে! সন্তর্পণে এগোলে টের পাবে না ওরা। যদি পেয়েই যায়, তাহলে গুলী চালাবে।

দুটি দলকে রওনা করিয়ে দিয়ে ব্রজেনকে নিয়ে মাস্টারদা হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন পশ্চিম দিকে। সম্মুখে বাঁশ বন, তারপরেই বাঁশের বেড়া, সেই বেড়া পেরোতে পারলেই ঘন জঙ্গলে মিশে যাওয়া যাবে। কিন্তু শুকনো বাঁশের পাতায় শব্দ হতে লাগল।

অকস্মাৎ গুর্খা সেনার হাঁক শোনা গেল, কোউন হ্যায়?

জবাবে গুলী চালালেন মাস্টারদা।

জবাব এল না। হয় ওটা মরে গেছে, নইলে ভরসা পাচ্ছে না জবাব দিতে। কি জানি, এই অন্ধকারে যদি নিজেদের লোকের গায়েই লেগে যায়।

উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তখন সুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ। শোনা যাচ্ছে গুলীর আওয়াজ।

মাস্টারদা বেড়ার কাছে এগিয়ে এলেন। বেয়ে উঠে পার হতে পারছেন না।

এমন সময় ওয়ামসলির আদেশে একটা রকেট বোমা ছোঁড়া হল আকাশে। আতস বাজীর মত জ্বলে উঠল সেটা, মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল বনান্তরাল।

কোথা থেকে সুশীল মাস্টারদাকে দেখতে পেল। দ্রুতপদে এগিয়ে এল। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল তাঁকে। এমন সময় অকস্মাৎ একটা গুলী এসে তার হাতে লাগল। পারল না সে তাঁকে পার করে দিতে।

এবার ব্রজেন এগিয়ে এল। তুলে নিল মাস্টারদাকে। নিঃশব্দে, বুঝি নিজের নিঃশ্বাসও বন্ধ করে ওপারে তাঁকে নামিয়ে দিল।

কিন্তু হায়, ওপারে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসেছিল এক হাবিলদার, কয়েক পা এগোতেই মাস্টারদা তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন, প্রাণপণে সে মাটিতে চেপে ধরল তাঁকে, সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠল, ছুটে এল কজন গুর্খা।

মাস্টারদা ধরা পড়ে গেলেন। ধরা পড়ল ব্রজেন সেন।

ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক্যান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার প্রতিষ্ঠাতা সর্বাধিনায়ক ফেরারী সূর্য সেন দীর্ঘ দু বছর আট মাস পর শত্রুহস্তে বন্দী হলেন।

তারপর ?

তারপর আর কি ?

আমার কথাটি ফুরোল। কি যেন হারিয়ে গেল। মনে হল হারালাম নিজেরই হাত, চোখ, নিজেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মনে হল আমাদেরও হৃদপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেছে গৈরালা গ্রামের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ক্যাপ্টেন ওয়ামসলির রিভলভারের বুলেট, আমাদের কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারীর ফাঁসীর দড়ি, নিঃশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

তারপর সব ফাঁকা, ভ্যাকুয়াম। আলো নেই, হাওয়া নেই, পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে, স্তব্ধ হয়ে গেছে তার বার্ষিক পরিক্রমা, মহাকালের ঘড়িটা আর চলছে না।

ফাঁসির ঘর থেকে বৌদিকে লিখলেন সূর্য সেন,···আমি বেশ আনন্দ নিয়েই যাচ্ছি, আমার কোন দুঃখ নেই। আপনাদেরও দুঃখ করার কোন কারণ নেই।···

লিখলেন,···কেবল এইটুকুমাত্র বলতে চাই, আমার এই যাওয়াটুকুকে আপনারা পরম পিতার মঙ্গল ইঙ্গিত বলেই গ্রহণ করবেন, তাঁর শুভ আশিস্ বলেই উপলব্ধি করবেন।···

তাঁর শেষ বাণী জানিয়ে গেলেন,···What shall I leave behind for you ? Only one thing; that is my dream—a golden dream—a dream of Free India...Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the alter of India's freedom···Fare you well.

ফাঁসীর শেষে তাঁর শবদেহ ইস্ট ইণ্ডিয়া নৌবাহিনীর ব্যাটেল ক্রুইজার এইচ এম এস এপিংহাম-এ তুলে নিয়ে গিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বহু দূরে মধ্য সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আত্মম্ভরী বলদর্পী ইংরেজ গর্বভরে বলেছিল, সূর্য অস্তমিত হল।

কিন্তু ওরা মূর্খ, জানেনা সূর্য কখনও অস্তমিত হয় না।

এক সমুদ্রে তার বিলয়, অন্য সমুদ্রে তার অভ্যুদয়।

সূর্য চিরভাস্বর।

পেডিনিধন ঃ ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ

১৯২৮ সাল।

ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গুপ্ত সমিতির শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হতে লাগল দিকে দিকে—নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমায়, বিশেষ করে বিক্রমপুর পরগনায়। কলকাতায় শাখা বিস্তৃত হয়েছে আগেই। শাখা কেন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কারণ কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাসা করছেন সত্য গুপ্ত। বাসা তাঁর ১-সি রসা রোডের দোতলায়।

আরও আরও দূরে শাখা বিস্তার করলে ক্ষতি কি ?

দীনেশ গুপ্তের দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত মেদিনীপুর শহরে ওকালতি করেন। দীনেশ পড়ে ঢাকা শহরে। একটি সুচিন্তিত গুপ্ত পরিকল্পনা নিয়ে দাদার অনুমতি সংগ্রহ করে দীনেশ ১৯২৮ সালে মেদিনীপুরে পড়তে এল, কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু গুড বয়ের মত পড়াশুনাই ত তার লক্ষ্য নয়। অপরিচিত শহরে সে নজর রাখল কিশোর ও যুবকদের প্রতি, কার মাঝে দেখা যাচ্ছে আত্মত্যাগের অভীপ্সা, কার অন্তরে আছে পরাধীনতার জ্বালাবোধ, কোথায় সেই উর্বর জমি নিশ্চিত হয়ে যেখানে ঢাকা থেকে বহন করে আনা বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির চারাগাছটি রোপন করা যায়।

অবশেষে নজর পড়ল একটি সাধারণ সমাজসেবা সংগঠনের প্রতি—নাম, সৎকার সমিতি। শুধু শবদেহ সৎকারই সমিতির ছেলেদের কাজ নয়, শুধু শ্মশানে মৃত মানুষ পৌঁছে দেওয়াই তাদেব একমাত্র উদ্দেশ্য নয, সমাজ-সেবামূলক নানা কাজে এরা অগ্রণী। কি প্রচন্ড এদের উৎসাহ উদ্দীপনা, কি অকপট উদ্যম, কি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন! দীনেশ স্থির করল এখান থেকেই সুরু করতে হবে। পরিচিত হল প্রফুল্ল ত্রিপাঠির সঙ্গে, পরিমল রায়ের সঙ্গে, হরিপদ ভৌমিকের সঙ্গে এবং ক্রমে ক্রমে আরও, আরও অনেকের সঙ্গে।

দীনেশের সাফ কথা ঃ নিরুপদ্রব অহিংস সংগ্রামে আমাদের আস্থা নেই। যে শাসক ও শোষকের হাতে রয়েছে হাতিয়ার, তাকে অনুরোধ জানালেই অথবা হুমকির ফাঁকা আওয়াজ তুললেই সে তল্পি-তলপা নিয়ে সাগর পাড়ি দেবে আমরা তা বিশ্বাস করি না। হাতিয়ার সে তুলবেই, আঘাত সে হানবেই, ভারতের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার প্রয়াসে সে সর্ব পাশব-শক্তি প্রয়োগ করবেই। সুতরাং আমাদেরও হাতিয়ার তুলতে হবে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। আমাদের নীতি—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত!

মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংস্থার বীজ বপন করল দীনেশ গুপ্ত। দীনেশ,

মানে সেই দীনেশ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত, ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসু আর সুধীর (বাদল) গুপ্তের সঙ্গে যে হানা দিয়েছিল কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ।

দীনেশ বিপ্লবের বীজ বপন করল যখন, ঢাকার শ্রীসংঘ তখন ভেঙ্গে গিয়ে দু-টুকরো হয়নি। ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে পারিবারিক কারণে যখন তাকে আবার ঢাকায় ফিরে আসতে হল, শ্রীসংঘ ভেঙ্গে তখন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বিপ্লবী দল তৈরী হয়ে গেছে। সংক্ষেপে সবাই বলে, বি ভি। সে দলের সর্বাধিনায়ক মেজর সত্য গুপ্ত।

দীনেশ ফিরে এসে মেদিনীপুর সংগঠনের ভার ও দায়িত্ব তুলে দিল শশাঙ্ক (কমেট) দাশগুপ্তের হাতে। কমেট কলকাতায় কলেজে পড়ছিল, ১৯২৯ সালে সে গিয়ে মেদিনীপুর কলেজে বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হল। কলেজ হোস্টেলেই রইল সে।

মেদিনীপুর শহরের নানা জায়গায় তখন কুস্তির আখড়া তৈরী হয়ে গেছে, স্থাপিত হয়েছে ব্যায়ামাগার, খোলা হয়েছে লাইব্রেরী। সেখানে কিশোর ও যুবকদের ভিড়। কমেট তাদের সঙ্গে পরিচিত হল, মেলামেশা ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিচয় রূপান্তরিত হল নিবিড় বন্ধুত্বে। দীনেশ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যে বীজ বপন করে গিয়েছিল, কমেটের অক্লান্ত শ্রম ও ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগে সেই বীজ অঙ্কুরিত হল।

১৯২৯ সালের শেষ ভাগে কমেটেরই উদ্যোগে মেদিনীপুর যুব সম্মেলনের অধিবেশন হল। সভাপতি আর কেউ নন, স্বয়ং দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব করবার জন্য ঢাকা থেকে পাঠানো হল আর কাউকে নয়, দীনেশ গুপ্তকে। তার পাশে পাশে রইল সংগঠন-প্রধান কমেট।

কিশোর ও যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, দলে দলে এসে যোগদান করতে লাগল কুস্তির আখড়ায় ব্যায়ামাগারে, লাইব্রেরীতে। শরীর গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মন গড়ে উঠতে লাগল। ওদের মধ্যে থেকে বাছাই করে, যাচাই করে ছেলেদের গুপ্ত সংগঠনে টেনে আনতে লাগল কমেট। বি ভি-র মেদিনীপুর শাখা শক্ত বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠল। সবারই মুখে কমেটদা, কমেটদা।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রমাদ গুনলেন। কমেটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার মধ্যে তিনি সাংঘাতিক আপত্তিকর কিছু আঁচ করলেন। কলেজ ছুটির পর কোথায় যায় সে, এত রাত করে কেন ফেরে, হোস্টেলে তার কাছে এত ছেলের আনাগোনা কেন, কি মতলব এদের—কমেটকে নোটিশ দিলেন অধ্যক্ষ অবিলম্বে হোস্টেল ছেড়ে দেবার জন্য।

হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে কমেট ও তার এক সহপাঠী একখানা ঘর ভাড়া করল। মাথা গোঁজবার স্থান হল বটে, কিন্তু খাওয়া? ওরা নিজেরাই রান্না করতে লাগল। কমেটের বয়স তখন মাত্র বিশ বৎসর।

কমেটের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মানসরঞ্জন সেন কালেকটরেটে ট্রেজারী অফিসার। তখন একাই থাকতেন, চাকর রান্না করত। সরকারী চাকুরে বলে কমেট তাঁর ওখানে বড় একটা যেত না। কিন্তু কমেট নিজের হাতে রান্না করে শুনে তিনি ওকে নিজের বাড়ীতেই নিয়ে এলেন। তিনি কিন্তু আদৌ টের পাননি যে, বিশ বৎসর বয়সী কমেট মেদিনীপুরে পড়তে শুধু আসে নি, বিপ্লবী দল গঠনেও সে আত্মনিয়োগ করেছে এবং সেটাই তার প্রাথমিক কাজ।

১৯৩০ সালের এপ্রিলে মহাত্মা গান্ধী কাঁথিতে সদলবলে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। তিনি ভঙ্গ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা মেদিনীপুরে, বাংলাদেশে, সমগ্র ভারতে আইনভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। দলে দলে সত্যাগ্রহীরা কারাবরণ করতে লাগল।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন কর্ণেল জেমস পেডি। কাঁথি মহকুমার এস ডি পি ও সামসুদ্দোহা আর সেখানকার মহকুমা হাকিম আবদুল গফুর। এই তিনটি দানব মিলে নিরুপদ্রব আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য সত্যাগ্রহী নরনারীর ওপর যে বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছিল, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। লরিভর্তি সত্যাগ্রহীদের পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে হয় নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, নয়ত জনবসতিহীন প্রান্তরে লাথি মেরে ফেলে আসা হত রাত্রির অন্ধকারে। বুট চালাত, লাঠি চালাত, গুলী চালানো হত। নরপিশাচ পেডি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের উলঙ্গ করিয়ে আমোদ উপভোগ করত, তারপর নারী-খাদক নরপশুদের কবলে তাদের ফেলে দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ত।

সারা বাংলা দেশ, বিশেষ করে মেদিনীপুরবাসী সেদিন প্রচণ্ড ক্রোধে নিজেদের হাত কামড়েছিল। সবার মুখে মুখে ঘুরছিল একটি অসহায় জিজ্ঞাসা ঃ এই নৃশংস অত্যাচারের কি কোন জবাব নেই? কোন প্রতিবিধান নেই? এমন কি কেউ নেই মেদিনীপুরে—

সরকারী কর্মচারী মানস সেনও মাঝে মাঝেই কমেটের কাছে মন্তব্য করতেন, শালা পেডিকে কেউ মারতে পারে না?

বি এস সি-র টেস্ট পরীক্ষা তখন হয়ে গেছে। কমেট তখন চলে এসেছে হিজলীতে। এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার আত্মীয় ইন্দুভূষণ দাশগুপ্তের বাড়ীতে সে থাকে, মাঝে মাঝেই সাইকেলে চলে যায় মেদিনীপুরে। গেলেই মানসবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসে আর দেখা হলেই মানস সেন বলেন, শালা পেডিকে কেউ মারতে পারে না?

পারে, পারে, নিশ্চয় পারে। দীনেশ গুপ্ত যে সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, কমেট দাশগুপ্ত যে ভিত্তির ওপর গড়ে তুলেছে বি ভি-র মেদিনীপুর শাখা, স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-বলিদানের মন্ত্র গ্রহণ করে যে শাখার ছেলেরা প্রাণ-প্রাচুর্যে টগবগ করে ফুটছে, কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তারা, নরপিশাচ

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডিকে চিরদিনের মত ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

কলকাতায় সুপতি রায় একদিন প্রফুল্ল দত্তকে, আমাদের ফুলদাকে বলল যে, মেদিনীপুরের ছেলেরা পেডি নিধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এমন কি, দুটি ছেলেকেও মনোনয়ন করেছে তারা, যারা আক্রমণ করবে, তাদের নাম বিমল দাশগুপ্ত আর যতিজীবন ঘোষ।

স্থির হল, ফুলদাই যাবেন মেদিনীপুরে একটি আটত্রিশ বোরের রিভলভার ও একটি পিস্তল নিয়ে, কথা বলবেন ছেলেদের সঙ্গে, বিশেষ করে বিমল ও যতির সঙ্গে, শুনবেন ওদের প্ল্যান, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন, তারপর ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দুটি দিয়ে ফিরে আসবেন কলকাতায়। এ্যাকশন হবে তারপর।

নির্দিষ্ট দিনে ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবী পরে একটি ষোল ইঞ্চি চামড়ার এ্যাটাচি কেস নিয়ে মেদিনীপুরগামী ট্রেনের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ফুলদা উঠে বসলেন ফুলবাবুটি সেজে। সঙ্গে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, একটি আটত্রিশ বোরের রিভলবার, আর একটি পিস্তল।

সরকারী সেচ বিভাগীয় এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার খগেন্দ্রনাথ গুহ মেদিনীপুর শহরে থাকেন। ফুলদার আত্মীয়। পেডির অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচরদের অন্যতম তিনি। ১৯৩০ সালে অনেকগুলি বৈপ্লবিক এ্যাকশন হয়ে গেছে, তাই সতর্ক হয়েছেন ইয়োরোপীয় অফিসাররা, কার্ড না পাঠিয়ে কেউ তাঁদের খাস কামরায় প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এতই বিশ্বস্ত খগেনবাবু যে, পেডির কামরায় কার্ড ছাড়াই যখন খুশী ঢুকে পড়তেন এবং শুধু তাই নয়, উনি এলেই পেডি অন্য কেউ থাকলে তাকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলত। লোকে তাই বলাবলি করত আড়ালে, খগেন গুহ পেডি সাহেবের এক নম্বর ইনফরমার।

এ হেন আত্মীয়ের গৃহই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফুলদা এসে খগেনবাবুর বাড়ীতে উঠলেন।

কমেট এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করল, বলল সব।

তারপর কাঁসাই নদীর চরে ফণী দাস, নরেন দাস দেখা করল, বলল সব।

তারপর একদিন রাত্রে শহরের একটি বাড়ীতে এসে ফুলদার সঙ্গে দেখা করল বিমল আর যতিজীবন, বলল সব। নিশ্চিন্ত হলেন ফুলদা যে, যোগ্য দুটি ছেলেকেই মনোনয়ন করা হয়েছে। রিভলভার আর পিস্তল দিলেন, নির্দেশ দিলেন, কাজ শেষ করে পালিয়ে যাবে তোমরা।

তারপর ফুলদা আবার ফুলবাবুটি সেজে কলকাতায় ফিরে এলেন।

১৯৩১ সাল। ৭ এপ্রিল।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। অনুগ্রহ করে একদিন প্রদর্শনীতে পদধূলি দিয়ে উদদ্যোক্তাদের ধন্য করবার জন্য জেলা শাসককে সবিনয় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রাক্তন সামরিক অফিসার কর্ণেল জেমস পেডি অতুল স্বাস্থ্যের অধিকারী, বোধহয় সেজন্যই বেশ সাহসী ও কতকটা বেপরোয়া।

৭ এপ্রিল পেডি সদলবলে গিয়েছিল শিকার অভিযানে। সেদিনই আবার প্রদর্শনীর শেষ দিন। সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে ফেরবার পথে উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণের কথা মনে পড়ল। ভাবল, প্রদর্শনীটা একবার ঘুরেই যাওয়া যাক।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলন তখন প্রত্যাহৃত। ৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীরা মুক্তি লাভ করেছেন। তখন চলছে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠক, আলাপ আলোচনা, দর কষাকষি, গভর্ণমেণ্ট কতখানি স্বায়ত্তশাসন দিতে সম্মত এবং তাতে করে কংগ্রেসের দাবী কতখানি পূর্ণ হবে, তাই নিয়ে টানাপোড়েন। প্রচণ্ড ঝটিকার শেষে মৃত্যুর শীতলতার মত সমগ্র দেশে কেমন একটা থমথমে ভাব।

পাঠান দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে পেডি যখন প্রদর্শনীতে এসে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা উত্‌রে সাতটা বেজে গেছে।

উদ্যোক্তারা ছুটে এলেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। প্রদর্শনীতে আলোর ব্যবস্থা থাকাসত্ত্বেও ছুটে লণ্ঠন নিয়ে এলেন পেডিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শনী দেখাবার জন্য। চতুর্দিকে দর্শকদের ভিড়, সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে চললেন পেডি ও তার দেহরক্ষীকে।

স্কুলের কক্ষে কক্ষে প্রদর্শনীর পোস্টার, ছবি, ফটো ও নানারকম দ্রব্য। পেডি প্রথম কক্ষে প্রবেশ করল। সঙ্গে উদ্যোক্তারা, পোস্টার, ও ছবিগুলি ব্যাখ্যা করছেন। পশ্চাতে ক্ষুদ্র জনতা।

রাত্রি ঠিক সাড়ে সাতটায় পেডি যেই দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করে মনোযোগ সহকারে পোস্টারগুলি দেখছে, উদ্যোক্তারা কথা বলছেন, এমন সময় অকস্মাৎ পেডির পেছনে মাত্র তিন ফুটের মধ্যে থেকে রিভলভার আর পিস্তল গর্জে উঠল পর পর সাত আট বার। পেছনেই দরজা, দরজা দিয়ে আততায়ীরা প্রাণপণে ছুটল।

হৈ চৈ পড়ে গেল। ঠেলাঠেলি, দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি। লণ্ঠন ছিটকে পড়ে দপ দপ করে নিভে গেল। পাঠান দেহরক্ষী বেল্ট থেকে চকিতে রিভলভার খুলে ফেললেও গুলী করবে কাকে? কোথায় আততায়ী?

জনতার মধ্যে থেকে কে একটি ছেলে চীৎকার করে উঠল, আরেঃ, ও যে বিমলদা!

বিমলদা মানে, বিমল দাশগুপ্ত। যতিজীবনকে কেউ চিনতে পারেনি।

কিন্তু আততায়ীরা পালিয়ে গেলেও পেডি কোথায় ? পেডি ?

দেখা গেল, পাশের কক্ষে চলে গেছে সে, দেয়াল ঠেস দিয়ে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনটে বুলেট পিঠের মধ্য দিয়ে তার শরীরে ঢুকে গেছে, দুটি বুলেট বিঁধেছে দুই হাতে। রক্তস্রোতে মেঝে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য, তখনও সংজ্ঞা হারায়নি সে। দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মারাত্মক অবস্থায় তৎক্ষণাৎ একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে পেডিকে হাসপাতালে পাঠানো হল।

ফোন করা হল কলকাতায়।

একখানা স্পেশ্যাল ট্রেনে সার্জন ও নার্স এসে পেঁছিলেন রাত আড়াইটেতে।

তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করে একটি বুলেট বার করে ফেলা হল।

পরদিন সকালে দশটায় আবার অস্ত্রোপচার।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল।

অবশেষে, ডাক্তারদের সর্বপ্রকার চেষ্টা ও শ্রম ব্যর্থ করে দিয়ে, বি ভি-র মেদিনীপুর শাখার প্রথম টার্গেট দুর্ধর্ষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্ণেল জেমস পেডি ৮ এপ্রিল অপরাহ্ন পাঁচটায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

নিরস্ত্র নিরুপদ্রব আইন অমান্য হলেও এবং গান্ধীজীর এই আন্দোলনের ফলে দেশ স্বাধীন হবে, বিপ্লবীরা তা বিশ্বাস না করলেও এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলন, এই জাতীয় অহিংস আন্দোলনের সত্যাগ্রহীদের ওপর, বিশেষ করে মা বোনের ওপর যে ইয়োরোপীয় পামর নৃশংস অত্যাচার করেছিল, বি ভি-র অকুতোভয় বিপ্লবীরা তার জীবনের ওপর রক্তাক্ত যবনিকা টেনে দিল।

কিন্তু ঐ যে, একটি ছেলে বলে উঠেছিল, ও যে বিমলদা, পুলিশ তাতেই জানতে পারল যে, আততায়ী দুজনের অন্যতম বিমল দাশগুপ্ত। কিন্তু আরেকজন ? হয়ত প্রদর্শনীতে আলোর ব্যবস্থা প্রচুর ছিল না কিংবা হয়ত নিরীহ গোছের ছেলে যতিজীবনকে কেউ বড় একটা চিনত না কিংবা হয়ত তার প্রতি ভাল করে নজর দেবার পূর্বেই সে দ্রুত ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তাই পরম নিশ্চিন্তে যতিজীবন আবার বাড়ীতে ফিরে গেল।

পুলিশ তৎক্ষণাৎ হানা দিল বিমলদের বাড়ীতে। নেই। হানা দিল শহরের সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায়। নেই। শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সবগুলো পথের ধারে ওৎ পেতে অপেক্ষায় রইল। নাঃ, বিমলের পাত্তা নেই। বিমলকে গ্রেপ্তারের জন্য আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল।

বিমল তখন নিরাপদে কলকাতায় চলে এসেছে।

ফেরারী বিমলকে কোথায় রাখা যায় ? পুলিশের চর গিজগিজ করছে কলকাতায়। সুতরাং কলকাতা আদৌ নিরাপদ নয়। বিমল কিন্তু রোম্যান-

নিধনকারী বিনয় বসুর মত বার বার দাবী জানাতে লাগল, আর একটা এ্যাকশনে আমায় নিয়োগ করা হোক। কিন্তু পরবর্তী টার্গেটনির্বাচনেও ত সময় লাগবে, ততদিন কোথায় রাখা যায় ওকে লুকিয়ে ?

ঝরিয়ায় আপার লোধনা কোলিয়ারীর অন্যতম কয়লা তোলার ঠিকাদার কৃষ্ণকালী বসু। তাঁর নিজেরও একটা কারখানা আছে। সেখানকার ইঞ্জিনীয়ার পুলিনবিহারী পাইন। এঁরা ফুলদার বিশেষ পরিচিত। ফুলদা ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব বললেন, ওঁরা রাজী হলেন। বিমলকে সেই আপার লোধনা কোলিয়ারীতে পাঠানো হল।

নিশ্চিন্ত রইল সে দু তিন মাস।

তারপর অন্য একটা কোলিয়ারীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন রসময় সুর বি ভি-র অন্যতম প্রথম সারির নেতা। তারপর সরে গেল বিমল আর এক জায়গায়। আবারও সে দাবী জানাতে লাগল দ্বিতীয় এ্যাকশনের।

অবশেষে ফুলদা সুপতি রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, এবার খতম করতে হবে ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ভিলিয়ার্সকে আর সে কাজের ভার দেওয়া হবে ফেরারী বিমল দাশগুপ্তকে। ভিলিয়ার্সের নিজের একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। অফিস ক্লাইভ স্ট্রীটে গিল্যাণ্ডার্স হাউস বিল্ডিং-এর তেতলায়। স্থির হল, সেখানেই যাবে বিমল।

আক্রমণের তারিখ নির্দিষ্ট করা হল ২৯ অকটোবর, ১৯৩১ সাল।

আবার ফুলদার সেই ভূমিকা। রাইটার্স অভিযানের মাত্র দু দিন পূর্বে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রীধারী ফুলদা চাকরিপ্রার্থীর ভূমিকা নিয়ে গিয়েছিলেন সোজা রাইটার্স বিল্ডিংস-এ দেখে আসতে কোথায় দোতলায় যাবার সিঁড়ি, দোতলায় পাশাপাশি চেম্বারগুলোর বাইরে কোন্ কোন্ ইয়োরোপীয় অফিসারের নেম প্লেট, কোথা দিয়ে উঠবে বিনয় বাদল দীনেশ আর কোথা থেকে সুরু করবে আক্রমণ।

ভিলিয়ার্সকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত যখন নেয়া হল, ফুলদা তখন শিল্পপতি। বরানগরে গোপাললাল ঠাকুর রোডে স্থাপন করেছেন শিল্পপীঠ নামে প্রতিষ্ঠান। সুতরাং আর চাকরিপ্রার্থীর ভূমিকা চলবে না! আক্রমণের মাত্র পাঁচ সাতদিন পূর্বে ফুলদা সোজা গেলেন ভিলিয়ার্সের অফিসে। কার্ড পাঠালেন। ডাক এল। ফুলদা এ্যাটাচি কেস হাতে ভিলিয়ার্সের কক্ষে প্রবেশ করলেন। আলোচনা মুখোমুখি বসে ঃ শিল্পপীঠে নির্মীয়মান স্পিরিট স্টোভ ও স্পিরিট ল্যাম্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ভিলিয়ার্স সরবরাহ করতে পারবে কিনা।

আলোচনা করে, যা যা লক্ষ্য করবার, সব ভাল করে দেখে ফুলদা চলে এলেন।

মেদিনীপুরের ছেলে বিমল দাশগুপ্ত। মেদিনীপুরে বি ভি-র শাখা সংগঠক

শশাঙ্ক (কমেট) দাশগুপ্ত। মেদিনীপুরে পেডিকে হত্যা করে বিমল এসেছে কলকাতায় ফেরারী হয়ে। বিমল আজ ২৯ অকটোবর ১৯৩১ সাল, ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কমেট কি আর হিজলীতে থাকতে পারে নিশ্চিন্তে বসে? সে তাই কলকাতায় চলে এসেছে। বি ভি-র বিনয় (ওরফে সর্বা) সেন তখন থাকত বহুবাজার স্ট্রীটে ডোমিনিয়ন ক্লাব নামীয় একটি মেসে। কমেট এসে সেই মেসে উঠেছে সর্বার গেস্ট হয়ে।

আক্রমণের দিন সকাল বেলা-সর্বা কমেটকে বলল দেখে আসতে ভিলিয়ার্স তার অফিসে এসেছে কিনা, অফিসে আছে কিনা।

চাকরিপ্রার্থীর ভূমিকা নিয়ে বেলা দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে কমেট গিয়ে হাজির হল গিল্যাণ্ডার্স হাউসে। লিফট-এ উঠল তেতলায়। করিডরের দুপাশে সারি সারি অনেক অফিস। প্রায় শেষ দিকের একটি ঘরের বাইরে চক চক করছে নেম প্লেট—ই. ভিলিয়ার্স। দরজায় চাপকান-পরা বেয়ারা।

সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে বেয়ারা ভিজিটর্স শ্লিপ দিল, কমেট নাম লিখে দিল, মাধব রায়। সাক্ষাতের কারণ লিখল, সিকিং এমপ্লয়মেণ্ট।

শ্লিপ হাতে হাফ সুইং ডোর ঠেলে বেয়ারা ভেতরে ঢোকবার সময়ই এক ঝলক দেখতে পেল কমেট যে, দরজার সোজা বেশ বড় সেক্রেটারীয়েট টেবিল, টেবিলের ওপাশে বসে ভিলিয়ার্স নিবিষ্ট মনে কি লিখছে।

বেয়ারা একটু পরই ফিরে এল। বলল, সাহেব বললেন কোন চাকরি খালি নেই, এখন দেখা হবে না।

না হল, কমেটের যা দেখবার, তা সে দেখে নিয়েছে। বেয়ারার কাছে বেকারের দুঃখ-বেদনা জানিয়ে সে ধীরে ধীরে চলে এল। নেমেই সোজা ডোমিনিয়ন ক্লাবে। সর্বা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল, শুনল সব।

একটি গোপন আশ্রয়ে রেডি হয়ে অপেক্ষা করছিল বিমল। পরনে কেতাদুরস্ত সাহেবী পোশাক, মাথায় মুসলমানী ফেজ, এখন যাকে বলে, জিন্না টুপি। আর দুই পকেটে দুটো রিভলবার। একই সঙ্গে দুহাতে দুটো চালাবার জন্য নয়। একটির চেম্বারগুলো খালি হয়ে গেলে আবার তাতে গুলী ভরে নেবার সুযোগ ও সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই একটি শেষ হয়ে গেলেই আরেকটি বার করবে।

বেলা প্রায় বারোটা। সর্বা বিমলকে ভিলিয়ার্সের অফিসে নিয়ে চলল। লিফট-এ উঠল তেতলায়। করিডরের আধখানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দুজনে হ্যাণ্ডশেক করল। তারপর সাফল্য কামনা করে সর্বা নেমে চলে গেল। বিমল এগিয়ে চলল।

বেয়ারা জানাল, শ্লিপ দিতে হবে। তবে সাহেব এখন তিনজন সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। ওঁরা চলে যাবার পর দেখা হতে পারে।

চলে যাবার পর। সে ত আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টাও হতে পারে। পেডি-

নিধনকারী ফেরারী বিমল দাশগুপ্ত, যার মাথার দাম ধার্য হয়েছে আড়াই হাজার টাকা, এতগুলো অফিসের সামনে এত লোকজন আনাগোনার মাঝে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে সে ? যদি কেউ চিনে ফেলে ?

এক ধাক্কা মেরে বেয়ারাকে সরিয়ে দিয়ে সুইং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিমল। ঢুকেই গুলী চালাল।

প্রাণভয়ে ভিলিয়ার্স টেবিলের নীচে ঢুকতেই বিমল লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর উঠে উপুড় হয়ে আবার গুলী চালাল। আগের দুটো গুলী লাগেনি, তৃতীয়টি ওর পিঠ ছড়ে দিয়ে গেল।

এমন সময় সাহেব তিনজন মরিয়া হয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টেবিলের সঙ্গে চেপে ধরল। ধস্তাধস্তি করল বিমল, কিন্তু তিনজনের সঙ্গে পারা কি সম্ভব ?

বিমল ধরা পড়ে গেল।

সুসংবাদ বহন করে নিয়ে যাবে বলে নীচের ফুটপাথে অপেক্ষা করছিল সর্বা।

কিন্তু হায়, সুসংবাদ দুঃসংবাদে পরিণত হল।

ডোমিনিয়ন ক্লাবে যখন ফিরে এল, তার উসখুস চেহারা আর বিবর্ণ মুখ দেখে কমেট উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি বিনয়বাবু, কি হয়েছে আপনার ?

কোনো জবাব না দিয়ে সর্বা কুঁজোটা তুলে নিল। কমেট বলে উঠল, আরে মশাই, গ্লাসে খান। শুনল না সর্বা, কুঁজোটা তুলে ঢক ঢক করে অনেকখানি জল খেল, তারপর বিছানায় পড়ে রইল চোখ বুঁজে।

কমেট স্পষ্ট কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারল না। গুপ্ত সমিতির সদস্যদের সর্বপ্রকার কৌতুহল অবশ্য পরিত্যাজ্য। তোমার ডান হাত কি করছে, বাঁ হাতের তা জানবার অধিকার নেই।

বিকেলেই বেরুল খবরের কাগজের বিশেষ সংস্করণ, তাতে বড় বড় হরফে শিরোনামা, ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স আক্রান্ত। বিপ্লবীর উপর্যুপরি গুলীবর্ষণ। ভিলিয়ার্স সামান্য আহত। হাতেনাতে ধৃত বিপ্লবীর নাম বিমল দাশগুপ্ত। পেডি হত্যার ব্যাপারে ফেরারী।

সর্বা বলল, আজই মেস ছাড়তে হবে আমাদের।

যেই কথা সেই কাজ। সেই রাত্রেই সর্বা চলে গেল অন্যত্র আর কমেট এসে আশ্রয় নিল বিপ্লবী সহকর্মী মনোরঞ্জন সেনদের ১০-এ শ্যাম স্কোয়ারের বাসায়।

দুদিন পর রাত্রে এসে বিপ্লবী-বন্ধু বীরেন ঘোষ খবর দিল, পুলিশ মনোরঞ্জন আর কমেটকে খুঁজছে। শোভাবাজারে বিপ্লবী সহকর্মী ইন্দুভূষণ সরকারের একটি গুপ্ত আশ্রয়-স্থল ছিল একটি দরজির দোকান। মনোরঞ্জন আর কমেট সেই রাত্রেই সেখানে সরে পড়ল।

পরদিন সকালেই বীরেন নিয়ে গেল বৌবাজারে একটি মেসে। রাত্রেই ওরা আবার চলে গেল দক্ষিণ কলকাতায় কমেটের দিদির বাসায়।

রাত এগারোটায় বীরেন ওদের নিয়ে এল ৩১ কানাই ধর লেনে বন্ধু সুকুমার মজুমদারের বাড়ীতে। পৌঁছে দিয়ে বীরেন চলে গেল। পরদিন আবার আসবে সে, ওদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে।

কিন্তু ভোরবেলাই পুলিশ বাড়ীখানা ঘিরে ফেলল। ওদের শিকার বিপ্লবী সুকুমার মজুমদার। সে থাকত দোতলায়। তাকে গেপ্তার করে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখতে পেল নীচের তলার একটা ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা খোল, দরজা খোল, পুলিশ হাঁক দিতে লাগল।

আর উপায় নেই। দরজা খুলে দিল কমেট। ধরা পড়ে গেল কমেট (শশাঙ্ক) দাশগুপ্ত আর মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত।

সেটা নভেম্বর মাস, ১৯৩১ সাল।

কিন্তু বিমল? বিমল দাশগুপ্ত? অনেক চেষ্টা করল পুলিশ পেডি হত্যা এবং ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ কেন্দ্র করে একটি ষড়যন্ত্র মামলা করার। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন শুরু হল বিমলের নামে ভিলিয়ার্সকে আক্রমণের মামলা।

তার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল!

কিন্তু মনোরঞ্জন আর মেদিনীপুর সংগঠনের অন্যতম নায়ক কমেটের নামে কোন মামলা করতে পারল না পুলিশ। তাদের রাজবন্দী করে আটক রাখা হল।

সেসন্স জজ গার্লিক নিধন

১৯৩১ সাল।

ইংরেজ সরকারের প্রধান দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযান সমাপ্ত। ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর সেই অবিস্মরণীয় 'অলিন্দ যুদ্ধ' পরিচালনা করেছিল বি ভি বিপ্লবী দলের তিনটি অকুতোভয় কিশোর—বিনয় বসু, সুধীর (ওরফে বাদল) গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। যাদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ ডালহাউসি স্কোয়ারের নতুন নামকরণ হয়েছে, 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ'।

৯ ডিসেম্বর স্টেটম্যান পত্রিকায় সংবাদ বেরিয়েছিল, '...Lt. Col. Simpson was shot dead. Mr. J. W. Nelson, Judicial Secretary, was wounded in the leg. Another bullet narrowly missed Mr. A. Marr, Finance member...orderly of D. P. I. was wounded in the leg......'

অমৃতবাজার লিখেছিল, '...Mr. Towneu, Agricultural and Industrial Secretary, had the skirts of his coat and waist coat shot through. ...They dashed to the Passport Office and reloaded their revolvers there. One American Missionary, Mr. E. S. Johnson, waiting in that office, out of fear, made his escape down with the help of a drain pipe....'

অভিযানের শেষে বাদল পটাসিয়াম সাইওনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে, বিনয় গুলী চালায় তার মাথায়, তৎক্ষণাৎ নয়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ১৩ ডিসেম্বর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, আর দীনেশ ? নিশ্চিত হবার জন্য সে যেমন বিষ খায়, তেমনি আবার গুলীও চালায় কণ্ঠনালীতে রিভলবার চেপে ধরে।

কিন্তু তথাপি সে বেঁচে উঠেছিল। ইংরেজ সরকার পরম যত্নে চিকিৎসা করে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। তারপর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের বিচার প্রহসনের মধ্য দিয়ে টেনে এনে তাঁকে হত্যা করেছে। সেই ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর. আর. গার্লিক।

১৯৩১ সালের ৭ জুলাই শেষ রাত্রে ৩-৪৫ মিনিটে আলীপুর সেনট্রাল জেলে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়ে গেছে।

সেদিনকার সংবাদপত্রের শিরোনাম, 'Dauntless Dinesh Dies At Dawn.'

কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব, 'This

Corporation records its sense of grief at the execution of Dinesh Chandra Gupta who sacrificed his life in the persuit of his ideal'.

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সভাতেও প্রস্তাব নেয়া হয়েছে, '...that this meeting records its deep sense of sorrow...'

দীনেশ গুপ্তের নিজের হাতে গড়া বি ভি দলের মেদিনীপুর শাখা। গর্জে উঠল সেখানকার বিপ্লবীরা। সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্ণেল জেমস পেডিকে হত্যা করল যতিজীবন ঘোষ ও বিমল দাশগুপ্ত। কাজ হাঁসিল করে পালিয়ে যাবার সময় কয়েকটি ছেলে চিনতে পেরেছিল বিমলকে। চীৎকার করে উঠেছিল, আরেঃ, ও যে বিমলদা!

কিন্তু বিমলকে ধরা গেল না। সে ফেরারী হল। কলকাতায় চলে এল।

আমি বি ভি-র কর্মী ছিলাম।

১৯২৬ সালে ঢাকার জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে যখন পড়ি, বিনয় বসু তখন ঢাকার মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র, থাকত আর্মানীটোলার মেডিক্যাল ছাত্রদের মেসে।

একসঙ্গে একই আখড়ায় কুস্তি করেছি, লাঠি ও ছোরা চালনা শিখেছি, দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে কাটিয়েছি। একটিই মাত্র গল্প ছিল আমাদের, কারণ একটিই মাত্র চিন্তা—ভারতের স্বাধীনতা। কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নয়, বিপ্লবের রক্তরাঙ্গা পথে। আমার বয়স তখন ষোল, বিনয়েরও কাছাকাছি। আমাদের স্বপ্নের বিপ্লব কবে আসবে, কে করবেন সেই রক্তক্ষয়ী বিপ্লব পরিচালনা, কি করে এদেশ থেকে বিতাড়িত হবে ইংরেজ, কিভাবে দেশের শাসনযন্ত্র আমরা অধিকার করব, দেশকে করব স্বাধীন, ষোল বছরের কিশোর আমাদের সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ধারণা ছিল না। শুধু একটা সত্য আমরা মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম যে, মায়ের জন্য আমরা বলিপ্রদত্ত। সর্বাধিনায়কের হুকুমে যে-কোনদিন যে-কোন সময় এক মুঠো ধুলোর মত আমাদের জীবন বিসর্জন দিতে হতে পারে।

তারপরই আমায় ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়। এর পর ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে বিনয়ের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। তারপর আর দেখা হয়নি।

বাদলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পরিচয় ছিল না দীনেশের সঙ্গেও।

কিন্তু ভগবানের বিধান, তাই পরিচয় হয়ে গেল। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে আলিপুরের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর গণেশ সেনের রিভলভার চুরি

সম্পর্কে আমায় গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেনট্রাল জেলে আনা হয়। রাখা হয় সেই ইয়ার্ডে, যেখানে ছিল দীনেশ।

আলাপ হয়, পরিচয় হয়, গুরুভাইকে গুরুভাইয়ের চিনে নিতে দেরী হয় না।

দীনেশের তখন বিচার চলেছে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে, বিচার শেষ হয়ে এল। বিচার-প্রহসনের ফলাফল কি হবে, তা ত জানা কথাই! কিন্তু রাইটার্স অভিযানের কাহিনী দেশবাসী জানবে কি করে? ত্রয়ীর দুজন স্বর্গতঃ, তৃতীয় দীনেশ গুপ্ত, বিচার সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে যাকে নিয়ে যাবে ফাঁসির সেল-এ। কাহিনী বলে যাবার সুযোগ আর সে না-ও পেতে পারে।

তাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল সব—রাইটার্সের ফুটপাথে ট্যাকসি থেকে নামা থেকে সুরু করে একেবারে বিনয়ের মৃত্যু পর্যন্ত। ভগবানের বিধান, তাই একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে জেলের মধ্যে একান্তে আমায় পেয়ে গেল সে। আমিই একমাত্র ব্যক্তি, যে দীনেশের মুখ থেকে শুনেছে সেই মুখোমুখি অলিন্দ যুদ্ধের কাহিনী।

লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে একটি রেল স্টেশন, নাম জয়নগর-মজিলপুর। জয়নগরের একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, নাম সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[১]। রাস্তার ওপর তাঁর ডাক্তারখানা। রোগীরা আসে যায়, আর আসে যায় ছেলেরা। আসে যায় শুধু নয়, সাতকড়ির নেতৃত্বেই চব্বিশ পরগণার বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছে। তিনি সবার সাতদা। সুনীল চাটার্জীরও সাতদা। জয়নগরেই সুনীলদের বাড়ী[২]। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ী, বাড়ীর পেছনে আমকাঁঠালের বাগান, আরও নানাজাতীয় গাছগাছালি।

সুনীল ও তার বন্ধুরা মিলে জয়নগরে স্থাপন করেছে জয়নগর-মজিলপুর ব্যায়াম সমিতি। সঙ্গে পাঠাগার। সুনীলরাই সংগঠক ও পরিচালক হলেও পশ্চাতে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে সাতদা'র অনুমোদন ও আশীর্বাদ। সুনীলের প্রধান সহচর মন্মথ ঘোষ (ওরফে কোকো) সৌরেন দত্ত, জিতেন ঘোষ ও আরও ক'জন।

১৯৩১ সালে ব্যায়াম সমিতির বার্ষিক উৎসবে সাতদা'র প্রভাবে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এসে যোগদান করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। উদ্দীপনায় ফেটে পড়ল জয়নগরের ছেলেরা। তাদের মধ্যে একজন কানাই ভট্টাচার্য। ব্যায়াম সমিতির মাধ্যমে সুনীল তাকে গুপ্ত বিপ্লবী দলে টেনে নিল। তখন তার বয়স কতই বা আর হবে? উনিশের বেশী নয়। কিন্তু উম্মাদনায় যেন টগবগ করে ফুটছে! কাজ চাই, কাজ চাই সুনীলদা। এ্যাকশন!

১ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিসপেনসারি বারুইপুরে ছিল, জয়নগর-মজিলপুরে নয়।

২ সুনীলের বাড়ী জয়নগরের কাছে, গঙ্গাঘাটা গ্রামে।

সুনীল একদিন জিজ্ঞেস করল, রিভলভার দেখেছিস ?

না ত। জবাব দিল কানাই।

এই দ্যাখ। সুনীল পকেট থেকে বার করল রিভলভার। দেখাল। ওর চেম্বার কোনগুলো, ট্রিগার কোনটা, ট্রিগার টানার সঙ্গে সঙ্গে চেম্বার কেমন ঘুরে যায়, বুলেট দেখতে কেমন, কি করে রিভলভার ছুঁড়তে হয়—সব দেখাল। তারপর বাড়ীর পেছনের বাগানে নিয়ে গিয়ে ওকে দিয়েই গুলী ছোড়াল। মহা খুশী কানাই। তার দাবী আরও সোচ্চার হয়ে উঠল—সুনীলদা, এ্যাকশন ? এ্যাকশন ?

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেণ্ট আর. আর. গার্লিক দীনেশ গুপ্তের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন, দীনেশের ফাঁসি হয়ে যাবার পর প্রেসিডেন্সী জেলে বসে বন্দী বিপ্লবী নেতারা গার্লিকের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করলেন। প্রথম স্থির হয়েছিল, বি ভি-র কর্মীরাই এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করবে। পেডী-নিধনকারী বিমল দাশগুপ্ত তখন ফেরারী, তাকেই এ কাজের ভার দেয়া হবে। তারপর সাতদা'র অনুরোধে স্থির হল, বি ভি-র নেতা রসময় সুরের সংগঠনে জয়নগরের একটি ছেলে এই কাজ করবে।

সাতদা খবর পাঠিয়ে দিলেন সুনীল চাটার্জীকে।

সুনীল পাল্টা অনুরোধ জানাল সাতদাকে। জয়নগরের গুপ্ত সংগঠনের কর্মীরা এ্যাকশনের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। সুতরাং ওদের কাউকে পাঠিয়ে দেবার চাইতে, সুনীল অনুরোধ জানাল—সাতদা, পুরো কাজের ভারটাই আমার উপর ছেড়ে দিন।

সাতকাড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রাজী হলেন। জানালেন রসময় সুরকে। রসময় সুর রাজী হলেন।

কাজে নেমে পড়ল সুনীল।

সাতদা'র নির্দেশ ছিল, এ্যাকশন করতে যাবার সময় শুধু রিভলভার নয়, সঙ্গে বিষও থাকবে। এ্যাকশনটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করবার পর যদি পার সরে পড়বে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বিষ খেয়ে সুইসাইড করবে। কখনো ধরা দেবে না। দেশের জন্য আমাদের জীবন যখন উৎসর্গীকৃত, তখন মৃত্যুকে আর ভয় কিসের ?

সুনীল মনোনয়ন করল কানাই ভট্টাচার্যকে। কিন্তু সে কথা তখনই বলল না তাকে। কাউকে বলল না।

হাজরা রোড ও রসা রোডের মোড়ে বর্তমানের 'হোটেল এলিট' তখন ছিল একটি মেস। ওর তেতলায় সুনীল একটি পুরো ঘর ভাড়া করে রেখেছিল। থাকত না সে। কলকাতায় এলে এখানে উঠত। নইলে থাকত তালাবন্ধ। বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে সে গুপ্ত বৈঠকে বসত। ওটা ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম গোপন আড্ডা।

১৯৩১ সালের ২৫ জুলাই সুনীলের নির্দেশে জিতেন ঘোষ আর সৌরেন দত্ত জয়নগর থেকে কানাইকে নিয়ে এল ঐ মেসে। সুনীল এল। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব হল। কিন্তু সুনীল আসল কথা কাউকে বলল না।

পরদিন ২৬ জুলাই কানাই ও জিতেনকে নিয়ে সুনীল গেল তপসিয়ায়। সেখানকার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করবার পর বলল কানাইকে, কানাই, এখানে এসেছি আমরা চাঁদমারি করতে। তারপর একটা মোটা গাছের গায়ে চক দিয়ে 'বুলস্ আই' এঁকে কানাইকে রিভলভার দিয়ে বলল, বুলস্ আই যদি বিঁধতে পারিস, তাহলে বুঝব তুই এ্যাকশনের উপযুক্ত।

হাসিমুখে এগিয়ে এল কানাই, দ্রাম দ্রাম করে ছ'বার গুলী নিক্ষেপ করল। দেখা গেল, চার বারই সে 'আই' বিদ্ধ করেছে।

তারপরই চেপে ধরল সুনীলকে—সুনীলদা, আমি তাহলে ফিট, ফিট ফর এ্যাকশন। বল এবার কি এ্যাকশন করতে হবে?

সুনীল ওকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু আসল কথা বলল না।

২৬ জুলাই দুপুরে কানাইকে নিয়ে বেড়াতে গেল সুনীল আলিপুরে কোর্ট প্রাঙ্গণে। বেড়াতে লাগল দুজন। মুনসেফদের কোর্ট, সাব জজদের কোর্ট, বার লাইব্রেরী, বার এ্যাসোসিয়েশনের ঘর, মুহুরীদের আস্তানা, টাইপিস্টদের আড্ডা, চারিদিকের দোকানপাট, কোর্টপ্রাঙ্গণে প্রবেশ ও নির্গমনের রাস্তা সব দেখিয়ে শুনিয়ে সুনীল বলল, চল্, এবার সেসন্স জজের কোর্ট দেখে আসি।

দোতলায় উঠল সুনীল আর কানাই।

গার্লিকের আদালত। গার্লিক এজলাসে বসে কাজ করছেন।

আগেই একটা ভীতিপ্রদর্শক বেনামী চিঠি পেয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর আদালতকক্ষের দরজায় দণ্ডায়মান রিভলভারধারী সার্জেণ্ট। কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা যায় না, তাই যে-ই আসছে, সার্জেণ্ট তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। কক্ষে সমবেত উকিল, মোক্তার ও জনসাধারণের মধ্যে গার্লিকের দেহরক্ষী হিসেবে সাদা পোশাকে কোন অস্ত্রধারী আছে কিনা কে জানে!

সহসা কানাই জিজ্ঞেস করল, এত কিছু দেখাচ্ছ কেন? এখানে কোন এ্যাকশন—

সুনীল কোন জবাব দিল না।

কানাইয়ের জন্য এক জোড়া সাদা ক্যাম্বিসের জুতো কিনল সুনীল। বর্ষাকাল। জয়নগর থেকে কানাই তার পুরোনো ছাতাটা নিয়ে এসেছে।

কানাইয়ের মা তখন কলকাতাতেই ওর দাদার বাড়ীতে থাকতেন। সুনীল বলল, একটা কাজে বাইরে দূরে পাঠাব তোকে, কবে ফিরতে পারবি ঠিক নেই। যা, মার সঙ্গে দেখা করে আয়।

সন্ধ্যার পর কানাই গেল মার কাছে।

প্রণাম করে বলল, মা, কলকাতার বাইরে যাব, ফিরতে দেরী হতে পারে। সেজন্য ভেবো না যেন। চিঠি দোব তোমায়।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবি রে? আর কি করতে যাবি?

কি জবাব দেবে কানাই? সুনীলদা বলেছে কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে হবে। কোথায় তা বলেনি। কি কাজ তাও বলেনি। কানাই তাই মাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে লাগল।

কিন্তু দুনিয়ার সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও মাকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়! গর্ভে যিনি ধারণ করেছেন, অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে যিনি তিল তিল করে সন্তানকে বড় করে তুলেছেন, যার কল্যাণের জন্য হাসিমুখে যিনি জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, তার সমগ্র অস্তিত্বের ওপর তাঁর সহস্র প্রখরতম দৃষ্টি সর্বদাই প্রসারিত থাকে। বুঝতে পেরেছেন তিনি যে ব্যায়াম সমিতিতে যোগ দেবার পর থেকেই শুধু ওর শরীরে নয়, মনেও এসেছে এক পরিবর্তন। দারিদ্রের সংসার, দু'বেলা দু মুঠো যেখানে নিশ্চিত নয়, মাত্র উনিশ বৎসর বয়স হলেও যার উচিত সেই দারিদ্র অপনোদনে সাধ্যমত সাহায্য করা—সে যেন আজ কিসের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে!

তাই দূরে যাবার কথা শুনেই তাঁর বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু জানেন, প্রশ্ন করে লাভ নেই, বলবে না, বাধা দেয়া নিষ্ফল, শুনবে না। তাই শুধু বললেন, এখানেই খেয়ে যা।

মা নিজের হাতে পরিবেশন করলেন, পাশে বসে খাওয়ালেন।

বিদায়ের প্রাক্কালে মাকে প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কানাই বলে উঠল, এ কি, কাঁদছ কেন?

আঁচলে চোখ মুছে মা বললেন, ফিরতে যদি দেরী হয়, চিঠি দিস। বুঝলি?

কানাই জবাব দিল, আচ্ছা দোব।

সুনীলদের মেসে যখন ফিরে এল, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। এসে দেখে, ওর জন্য অপেক্ষায় বসে আছে জিতেন ঘোষ, সৌরেন দত্ত আর সুনীল চট্টোপাধ্যায়।

কানাই বলে উঠল, সুনীলদা, আমি খেয়ে এসেছি।

সুনীল বলল, চল, সবাই ছাদে যাই।

মেসের ছাদে অর্থাৎ হাজরা রোড ও রসা রোডের মোড়ে আজকের লাল রংয়ের তেতলা বাড়ী হোটেল এলিটের ছাদে গিয়েই ১৯৩১ সালের ২৫ জুলাই সুনীল প্রকাশ করল বিপ্লবী দলের সেই গোপন অর্ডার। কানাই, কাল—কালই তোর এ্যাকশন হবে, খতম করতে হবে আলীপুরের সেসন্স জজ গার্লিককে তার এজলাসে। পারবি না?

নিশ্চয়ই পারব। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল কানাই। রাইটার্স অভিযানের অমর কাহিনী শুনেছে সে। গর্বে ভরে উঠেছে বুক। বিনয় ও বাদলের স্বেচ্ছামৃত্যুতে

কিশোর মনে যেমন ঘনিয়ে উঠেছে দুঃখের বাষ্প, তেমনি ফাঁসির মঞ্চের ওপর নির্ভীক নিঃশঙ্ক দণ্ডায়মান দীনেশকে কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। সেই দীনেশকেই ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল এই গার্লিক। সেই গার্লিককে নিধন করবার সুযোগ পাওয়া গেছে।

আনন্দকলরব করে উঠল কানাই। বলল, 'সুনীলদা, কিভাবে কি করতে হবে, তোমরা স্থির করে কাল সকালে আমায় জানিও। আমি এখন ঘুমুতে যাই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

পরদিন। ১৯৩১ সাল, ২৭ জুলাই।

গভীর ঘুমে অচেতন কানাইকে ডেকে তুলল সুনীল। এক টুকরো কাগজ দিয়ে বলল, যা বলছি, লিখে ফ্যাল্ ত।

সুনীল বলতে লাগল আর কানাই লিখতে লাগল—'ধ্বংস হও। দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসী দেবার পুরস্কার লও। ইতি—বিমল গুপ্ত।' তারপর কানাইকে বলল, স্নান করে খেয়ে নে।

পেডির অন্যতম নিধনকারী বিমল দাশগুপ্ত তখন পলাতক। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। সুইসাইড স্কোয়াডে কানাই ভট্টাচার্য একটি নতুন নাম, নতুন রিক্রুট। কাজ সমাধা করে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করবে কানাই, নীচের গাড়ী বারান্দায় ট্যাকসি নিয়ে অপেক্ষা করবে সুনীল। যদি সে না-ই পালাতে পারে, তাহলে, সঙ্গে থাকবে পটাসিয়াম সাইওনাইড, প্যাকেটটা মুখে ফেলে দেবে। পুলিশ ওর পকেটে পাবে ঐ চিরকুটখানা। দেখে ভাববে, এই কি মেদিনীপুরের বিমল দাশগুপ্ত? বিভ্রান্ত হবে পুলিশ। ভুল ভাঙ্গবে বটে, কিন্তু বুঝতে পারবে না, কে এই গার্লিকের হত্যাকারী, কি নাম এর, বাড়ী কোথায়। আরও বোকা বনে যাবে পুলিশ।

স্নানাহার সেরে আসতেই সুনীল কানাইকে রণসাজে সাজিয়ে দিল। বিচিত্র রণসাজ। ওরা দেখে এসেছে আগের দিন, দরজায় রিভলভারধারী সার্জেণ্ট থাকলেও গার্লিকের আদালত কক্ষে জনসাধারণ প্রবেশ করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রামের লোক। তাই কানাইকে সে গ্রামের ছেলেই সাজিয়ে দিল। উসকো খুসকো চুল; কোঁচা-দোলানো আধ-ময়লা প্রায়-হেঁটো ধুতি, হাত ও গলা-আঁটা ময়লা সার্ট, তার ওপর কোট। পায়ে নতুন সাদা ক্যাম্বিসের জুতো আর হাতে ওরই সেই পুরোনো ছাতা। ছাতার মধ্যে গুলীভরা ছঘরা রিভলভার আর কোটের এক পকেটে পটাসিয়াম সাইওনাইডের প্যাকেট, আরেক পকেটে সেই চিরকুটখানা।

সুনীলকে হাসিমুখে প্রণাম করল কানাই। সুনীল হাসিমুখে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, নীচে ট্যাকসি নিয়ে অপেক্ষা করব আমি। একবার ওপরে গিয়েও দেখে আসব তোকে। সাতদা'র নির্দেশ ভুলিস না যেন—কাজ হাঁসিল করবে, ধরা দেবে না।

বেলা যখন প্রায় বারোটা, আলিপুরগামী একখানা ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে বসল এই গ্রাম্য কিশোরটি ছাতা হাতে।

বেলা যখন একটা, সেসন্স কোর্টের নীচে গাড়ী-বারান্দায় এসে থামল একখানা ট্যাক্সি। ট্যাক্সিচালক প্রেম সিং আর ট্যাক্সির আরোহী সুনীল চট্টোপাধ্যায়। অত্যন্ত বিশ্বাসী প্রেম সিং। জানে, এরা বিপ্লবী, দেশকে স্বাধীন করবার ব্রতে ব্রতী। মারাত্মক পথে এদের আনাগোনা। কিন্তু কোনদিন কোন সময় বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না। ডাকলেই ট্যাক্সি নিয়ে আসে। দিনে ও রাতের যে কোন সময়।

ওপরে উঠে গেল সুনীল। দেখল, গার্লিক এজলাসে নেই, লাঞ্চে গেছেন। কক্ষের অভ্যন্তরে জনতার সঙ্গে মিশে সুবোধ বালকটির মত বসে রয়েছে কানাই ছাতা হাতে ধরে। বুঝল, দরজার সার্জেণ্ট ওকে সন্দেহ করতে পারেনি। সার্থক বিচিত্র রণসাজ!

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় হল দুজনের। তারপর নেমে এল সুনীল। বলল, প্রেম সিং, ইঞ্জিন চালু করে রাখ, আমি বললেই গাড়ী ছাড়বে।

বেলা প্রায় দুটো। লাঞ্চ সেরে গার্লিক ফিরে এলেন। আদালত কক্ষে প্রবেশ করতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। জজ বসলেন, সবাই বসল।

মামলার সওয়াল শুরু হল। গার্লিক এ্যাডভোকেটের বক্তৃতা শুনতে শুনতে টেবিলের ওপর মাথা নীচু করে কি লিখছেন, এমন সময়—

এমন সময় উঠে দাঁড়াল কানাই। দ্রুত পায়ে উঠল সাক্ষীর শূন্য কাঠগড়ায়। সিলিং লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল, শব্দ হল দ্রাম। চমকে উঠে মুখ তুললেন গার্লিক। অমনি কানাই লাফ দিয়ে উঠল কাঠগড়ার রেলিং-এর ওপর, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল গার্লিকের টেবিলে, তারপর মাত্র হাতখানেক দূরে থেকে গার্লিকের কপাল লক্ষ্য করে গুলী করল, তারপর আবার গুলী। গুলী গার্লিকের মগজ ভেদ করল। ঢলে পড়লেন চেয়ারের ওপর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, গলগল করে মগজ বেরিয়ে আসতে লাগল। গার্লিক প্রাণত্যাগ করলেন।

কক্ষের জনতার মধ্যে সাদা পোশাকপরা পুলিশ ছিল, তৎক্ষণাৎ কানাইকে লক্ষ্য করে গুলী চালাল সে। গুলী লাগল না। পাল্টা গুলী চালাল কানাই, লাগল পুলিশের কাঁধে। যন্ত্রণায় বসে পড়ল সে।

সার্জেণ্ট এবার গুলী চালাল পর পর। এবার লাগল গুলী কানাই-এর পেটে আর পায়ে। টেবিল থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল সে। পড়ে গিয়েও শেষ গুলীটা চালাল কানাই সার্জেণ্টকে লক্ষ্য করে। লাগল না, লাগল দরজার পাটে।

ছুটে এল সার্জেণ্ট, পর পর গুলী চালাল কানাই-এর ওপর।

কানাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ দৌড়চ্ছে সবাই।

টেবিল চেয়ার উলটে পড়ে গেছে। কাগজপত্র বিক্ষিপ্ত। পাশের ঘর থেকে টেলিফোন চলে গেছে থানায়, লালবাজারে, হাসপাতালে। সশস্ত্র পুলিশ পাঠাও, এ্যাম্বুলেন্স পাঠাও। চতুর্দিকে হল্লা, চীৎকার।

আর ওদিকে গাড়ী বারান্দায় গর্জনমান ট্যাকসিতে পাথরের মত বসে রয়েছে সুনীল। যাকে নিয়ে যাবে বলে ট্যাকসি নিয়ে এসেছিল, সে আর ফিরে এল না।

পলায়নরত কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মশাই ওপরে?

ওরা জবাব দিল, Garlick shot dead and the assailant shot dead!

সুনীল শান্তকণ্ঠে বলল, প্রেম সিং, চল।

ট্যাকসি চলল।

এরপর সেই চিরকুট। 'ধ্বংস হও। দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেবার পুরস্কার লও।' ইতি—বিমল গুপ্ত।

কে এই বিমল গুপ্ত? পেডী হত্যার ফেরারী আসামী বিমল দাশগুপ্ত? খবর পাঠাল পুলিশ মেদিনীপুরে। আত্মীয়-স্বজন ছুটে এলেন। বললেন, না, এ ত আমাদের বিমল নয়! তবে কে এ? কে এই ছেলেটি, যে বিমল গুপ্তের ছদ্মনাম নিয়ে গার্লিককে হত্যা করেছে? কোথায় এর বাড়ী? কোথায় এর মা বাবা আত্মীয়-স্বজন?

আপ্রাণ চেষ্টা করল আই বি পুলিশের বাঘা বাঘা অফিসার, কিন্তু আততায়ীর কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। কেউ এল না সনাক্ত করতে।

অবশেষে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল পুলিশ, 'A reward is hereby declared, worth Rupees Five hundred to be given to one who can identify the murderer of Mr. Garlick.'

না। তথাপি কেউ এল না।

ওদিকে পুত্র-বিরহবিধুরা মা আকুল আগ্রহ নিয়ে দিন গুনছেন। কানাই বলে গেছে, দেরী হলে আমি তোমায় চিঠি লিখব। কোথায়, চিঠি ত আসছে না।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে ব্যর্থ প্রতীক্ষায়।

কানাই-এর চিঠি আর এল না।

গভর্ণর জ্যাকসন বেঁচে গেল

এম. এ. ক্লাসে সহপাঠিনী দুই বন্ধু, কমলা দাশগুপ্ত আর কল্যাণী দাস। লক্ষ্মী মেয়ের মত তারা ক্লাসে নিয়মিতভাবে হাজিরা দেয়, নিবিষ্ট মনে অধ্যাপকদের লেকচার শোনে, নোট করে, বাড়ীতে বসে অভিনিবেশ সহকারে সেই নোট পড়ে। বাবা মা আত্মীয় পরিজন সবাই মনে মনে বলেন, লক্ষ্মী মেয়ে!

কিন্তু এই লক্ষ্মী মেয়েদুটিই যে লুকিয়ে লুকিয়ে পাঠ্য গ্রন্থ ছাড়া অন্য বইও পড়ে, নিরালায় দুটিতে বসে অস্ফুট স্বরে অন্য আলোচনা করে, অভিভাবকরা তা জানবেন কি করে?

সেটা ১৯২৮ সাল, ডিসেম্বর মাস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে সবে সমাপ্ত হয়েছে। এই অধিবেশন উপলক্ষে রেগুলার আর্মির ধাঁচে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল, তাকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য বাংলার শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স প্যারেড শুরু করে দিয়েছে, শাসক ইংরেজের অবিরাম অত্যাচারে নেতিয়ে-পড়া জনগণের শিরায় শিরায় আবার রক্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সেই চাঞ্চল্যের ঢেউ এই লক্ষ্মী মেয়েদুটিরও অন্তরে বুঝি এসে ঘা দিয়েছে। তাই গোপনে গোপনে ওরাও দুষ্টু হয়ে উঠেছে!

কল্যাণী একদিন কমলাকে বলল, ভাই আমাদের বাড়ীওয়ালার ছেলে দীনেশের যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি লাঠিচালনা জানে সে। তেতলার ছাদে সে মেয়েদের লাঠিখেলা শেখায়। মেয়েদের একটা ক্লাবই তৈরী করে ফেলেছে দীনেশ, নাম দিয়েছে, ছাত্রী সংঘ। আমার মনে হয়—

কি মনে হয় রে? জিজ্ঞেস করল কমলা।

মনে হয়—মনে হয়, ছেলেটা স্বদেশী করে। কল্যাণী জবাব দিল।

ব্যস, বলে উঠল কমলা, ভালই হল। আয়, আমরা দীনেশের সঙ্গে পরিচয় করি, ওর ছাত্রী সংঘের মেম্বার হয়ে যাই, লাঠিখেলা শিখি।

অল রাইট। প্রতিধ্বনি করল কল্যাণী।

দীনেশ, মানে দীনেশ মজুমদার। সেই ডেয়ার ডেভিল দীনেশ মজুমদার। ১৯৩০ সালের ২৫ আগস্ট কলকাতার কমিশনার টেগার্টের ওপর আক্রমণকারীদের অন্যতম ছিল যে, যে ধরা পড়েছিল, তারপর বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে ১৯৩২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী শচীন করগুপ্ত ও সুশীল দাশগুপ্তের সঙ্গে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পলায়ন করেছিল, পলাতক অবস্থাতেই যে ১৯৩৩ সালের ৯ মার্চ চন্দননগরের কমিশনার কুইন

সাহেবকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তারপর ঐ বছরই ২২ মে ১৩৬/৪-এ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ীতে পুলিশদলের সঙ্গে রিভলভার যুদ্ধের পর যে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিল, তারপর বিচারে প্রাণদন্ডে দণ্ডিত হয়ে ১৯৩৪ সালের ৯ জুন ফাঁসীর মঞ্চে যে গেয়ে গেছে জীবনের জয়গান!

সেই দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হল কল্যাণী ও কমলার।

দীনেশ কমলাকে একদিন নিয়ে গেল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে, পরিচয় করিয়ে দিল রসিকলাল দাসের সঙ্গে।

৭১ মির্জাপুর স্ট্রীটের দোতলার মেসেও যাতায়াত ছিল দীনেশের। সেই মেস, যে মেসে সে যুগের জনকয়েক বিপ্লবী নেতা থাকতেন; ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ এবং আরও দুচার জন।

সুহাসিনী গাঙ্গুলী শিক্ষিকার চাকরি করে মূক বধির বিদ্যালয়ে এবং তখন থাকে একটি বোর্ডিং-এ! কমলা তাকে দলে টেনে নিল, পরিচয় করিয়ে দিল দীনেশ ও রসিকদার সঙ্গে।

কমলা, কল্যাণী ও সুহাসিনী, তিন বন্ধু ছাত্রী সংঘের শাখাপ্রশাখা বিস্তারে ও সংঘের মাধ্যমে মেয়েদের মধ্যে বিপ্লবমন্ত্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করল।

কল্যাণী দাসেরই ছোট বোন বীণা।

বীণা রীতিমত লক্ষ্মী মেয়ে। ১৯২৭ সালে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ষোল বছর বয়সে সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে স্কলারশিপ নিয়ে। বেথুন কলেজেই আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। ভাল ছাত্রী। কলেজে সুনাম! কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছাপা হয়, বিতর্কে সে শুধু অংশ গ্রহণ করে না, বিতর্কে সে অপরাজেয়।

ওর বাবা বেণীমাধব দাস। সেই সুপরিচিত বেণীমাধব, একদা কটকে যে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক, সেই বিদ্যালয়েই পড়ত বালক সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি। সুভাষ মেধাবী ছাত্র ছিল বলেই নয়, বালক সুভাষের মধ্যে বুঝি তিনি উত্তরকালের নেতাজীর অঙ্কুরোদ্গম উপলব্ধি করেছিলেন।

অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন বেণীমাধব। অন্যায় দেখলে কখনও মুখ ঘুরিয়ে নেননি, পাশ কাটিয়ে যাননি, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফাও করেননি কোনদিন, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়েছেন ফলাফলের কথা চিন্তা না করেই। ফলে, মাঝে মাঝেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর খটাখটি লেগে যেত।

এর ফলেই তাঁকে কটক থেকে একেবারে কৃষ্ণনগর হাই স্কুলে বদলি করা হয়।

বীণা ভাল ছাত্রী এবং লক্ষ্মী মেয়ে হলেও বইয়ের পোকা ছিল না। দিদি কল্যাণী ও তার বন্ধু কমলা ও সুহাসিনীর গতিবিধি তার নজর এড়াতে পারত না। নানারকম বই নিয়ে আসত দিদি, গোপনে রাত জেগে পড়ত, বন্ধুরা

এলে তাদের সঙ্গে নিভৃতে বসে আলোচনা করত, ছাদে দীনেশ মজুমদারের কাছে লাঠিচালনা শিখতে গিয়ে তার ফাঁকে ফাঁকে কি সব পরামর্শ করত ওর সঙ্গে, সহসা ওরা কোথায় বেরিয়ে যেত, ফিরত অনেক দেরী করে—এ সবই দেখত বীণা।

প্রথম মনে সন্দেহ জাগল, তারপর ভয়, তারপর আরও আগ্রহী হয়ে গোপনে তথ্যানুসন্ধান করে যখন জানতে পারল যে, ওরা বিপ্লবী দলে যোগদান করেছে, বিপ্লবের পথে দেশ স্বাধীন করাই ওদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, বীণা তখন ওদের সঙ্গে যোগদানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। দেশ কি তারও নয়? সেও কি এই দেশের মেয়ে নয়? দিদিদের মত তারও কি পরাধীনতার বেদনাবোধ নেই? সেই পরাধীনতার শৃংখল হাতিয়ারের ঘায়ে ভেঙ্গে ফেলবার জন্য দিদিরা যদি আত্মনিয়োগ করে থাকে, তাহলে সেও কেন পারবে না তাদের সঙ্গে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে? তবে কি তাকে ওরা অযোগ্য মনে করে? মনে করে বীণা একেবারে আক্ষরিক অর্থে বুকওয়ার্ম লক্ষ্মী মেয়ে?

ললিতবীণা যে প্রয়োজনে অগ্নিবীণায় রূপান্তরিত হতে পারে, জননী ও জায়াসুলভ কোমলতা ও বাৎসল্য পরিহার করে প্রহরণধারিণী দুর্গার মত খর্পর হাতে মহিষাসুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, দিদিরা কি জানে না তা? বীণা মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করল সেও যোগ দেবে বিপ্লবী দলে, দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে সেও এগিয়ে যাবে।

আই এ পড়বার সময়ই সহপাঠিনী সুহাসিনী দত্ত ও শান্তি দাশগুপ্তের সঙ্গে তার বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তারা ছিল গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য। প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর একদিন তারা দলের নেতা ভূপালচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল গোপনে। অর্থাৎ বীণা বিপ্লবী দলে যোগদান করল। দিদি কল্যাণী এক দলে, সে দলের নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত আর বোন বীণা আর এক দলে, তার নেতা ভূপাল বসু।

দুই নেতাই অবশ্য যুগান্তর দলভুক্ত। ভূপেন দত্ত থাকতেন ৭১ মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে—মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহদের সঙ্গে, আর ভূপাল বসু ছিলেন রসময় সুর, ভবেশচন্দ্র নন্দী, প্রফুল্লকুমার দত্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, অরুণ নন্দী, মণীন্দ্রকিশোর রায়, সুকুমার চক্রবর্তী এবং সত্যভূষণ গুপ্তের সহপাঠী ঢাকা শহরে। মণীন্দ্র রায় পড়তেন পগোজ স্কুলে, আর সবাই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে।

এই দলটিই বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিল রায় ও লীলা নাগের সঙ্গে তৎপর হয়ে ঢাকা শহরে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন, যার প্রকাশ্য সংগঠনের নাম ছিল শ্রীসংঘ।

১৯২৯ সালে শ্রীসংঘ থেকে বেরিয়ে আসেন এই দলটির প্রায় সবাই। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের পর থেকে সত্যভূষণ গুপ্ত মেজর গুপ্ত

নামে সুপরিচিত হয়ে পড়েন, তাঁরই নেতৃত্বে ও সহপাঠিদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে সেই অনন্য বিপ্লবী সংস্থা, যার নাম 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'।' এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সেরই কর্মী বিনয় বসু ঢাকা শহরে গুলী চালিয়ে পুলিশের আই জি লোম্যানকে হত্যা করেছিল, গুরুতরভাবে আহত করেছিল পুলিশ সুপার হডসনকে। এই বিনয়ই আবার আরও দুজন কর্মী দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর (ওরফে বাদল) গুপ্তকে সঙ্গে করে ১৯৩০ সালে হানা দিয়েছিল রাইটার্স বিল্ডিংস-এ, হত্যা করেছিল জেলসমূহের আই জি সিম্পসনকে। এই দলেরই কর্মী বিমল দাশগুপ্ত ও যতিজীবন ঘোষ খতম করেছিল মেদিনীপুরের ডি এম পেডীকে, এই বিমলই আবার ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সের ওপর গুলী চালিয়েছিল, মেদিনীপুরের ডি এম ডগলাসকে নিধন করেছিল এই দলেরই কর্মী প্রভাংশু পাল ও প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুরের তৃতীয় ডি এম বার্জকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল এই দলের কর্মী অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত। এই দলেরই ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী দার্জিলিং-এর লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে ১৯৩৪ সালে গভর্ণর এ্যান্ডারসনের ওপর গুলী চালিয়েছিল। ডালহাউসি স্কোয়ার এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কর্মীদেরই নাম পরিগ্রহণ করে আজ হয়েছে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ' আর এ্যান্ডারসন হাউস হয়েছে 'ভবানী ভবন।'

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স গঠনের প্রথম দিকেই ভূপাল বসু দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই একটি গ্রুপ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। বীণা দাস যোগ দেয় সেই দলে।

বীণা আই এ পাশ করল ১৯২৯ সালে। ম্যাট্রিকুলেশনের মত ফল না হলেও সে অধিকার করল পঞ্চদশ আসনটি। বি এ পড়বার জন্য ভর্তি হল ডায়োসেসান কলেজে। একডালিয়া প্লেসে তখন বীণাদের নিজেদের বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে। বীণা সেখানে থাকত।

১৯৩০ সালে মনোরঞ্জন গুপ্তের সংগঠনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে নিধন করবার প্ল্যান অব এ্যাকশন তৈরী করা হয়। রসিক দাসের কাছে তিনটি বাছাই করা ছেলে চান তিনি। রসিক এনে দিল শৈলেন নিয়োগী, অনুজা সেন, অতুল সেন আর দীনেশ মজুমদারকে। সেই দীনেশ, যে কমলা দাশগুপ্ত ও কল্যাণী দাসকে বাড়ীর ছাদে লাঠিচালনা শেখাত, কমলাকে যে রসিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিপ্লবী দলে রিক্রুট করেছিল।

টেগার্ট হত্যার জন্য সে সময় যে ধরনের বোমা তৈরী করা হয়েছিল, তা ছুঁড়ে মারলেই বিস্ফোরিত হত না। খোলের বাইরে একটি ক্ষুদ্র সলতে, তাতে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়তে হত। বাইরে খোলা জায়গায় দেশলাই জ্বালিয়ে আগুন ধরানো বেশ অসুবিধে। প্রথমতঃ, হাওয়ায় দেশলাইয়ের কাঠি নিভে

যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, না নিভলেও কাঠি থেকে ধরানো সময়সাপেক্ষ। সিগারেটের আগুন থেকে ধরানো খুব সুবিধা। ছেলেরা কেউ ধূমপান করে না, অনভ্যস্ত হাতে হয়ত সিগারেটই চট করে ধরাতে পারবে না, অথচ চরম মুহূর্তের একটু আগেই সিগারেট ধরিয়ে স্বাভাবিক ধূমপানকারীর মতই সিগারেট টানতে হবে এবং ঠিক সময়ে ওটা চেপে ধরতে হবে সলতের মুখে।

হঠাৎ একদিন রাত্রে কমলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দীনেশ পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাল ও নেশাখোরের মতই টানতে লাগল।

কমলা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। শুধু দীনেশ কেন, সুধীর ঘোষ বা অন্য যে সহকর্মীদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে অথবা নেতৃস্থানীয় যাঁরা, এমন কি, ভূপেনদা—কই, তাঁদের একজনকেও ত কোনদিন সে সিগারেট খেতে দেখেনি। এমন কি, একটি পানও না। সে যুগে ব্রহ্মচর্যের কঠোর নিয়মগুলি বিপ্লবীদের পালন করে চলতে হত, সঙ্গে সাত্ত্বিক আহার, তার মধ্যে নেশা করবার সুযোগ কোথায়? মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইতস্ততঃ করতে লাগল কমলা, অথচ প্রশ্নটা তার মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল।

দীনেশ বুঝি নিজেই বুঝতে পারল তা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ আমায় সিগারেট খেতে দেখে। হেসে বলল, কোন দিন খাইনি, আজ খাচ্ছি। কেন খাচ্ছি, পরে বলব একদিন। কিন্তু বল দেখি কমলা, আমার দেশলাই জ্বালাবার, সিগারেট ধরাবার এবং সিগারেট টানবার কায়দাটা ঠিক রেগুলার ধূম্রপায়ীদের মত হচ্ছে কি না, না মনে হয় আনাড়ী?

কমলা চুপ করে রইল।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর দীনেশ ডাকল, কমলা।

কমলা জবাব দিল. বলুন।

অনেক দূরে যেতে হবে, দীনেশ বলতে লাগল, কবে ফিরতে পারব, আদৌ পারব কিনা, বলতে পারব না। যদি না-ই পারি, তাহলে কাজের নির্দেশ নেবে রসিকদার কাছ থেকে। আর রসিকদাকেও যদি না পাও, তাহলে যাবে ৭১ মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে মনোরঞ্জন গুপ্তের কাছে। বুঝলে?

এর কয়েক দিন পরেই ২৫ আগস্ট বোমা পড়ল টেগার্টের মোটরের ওপর দিনের বেলা জনবহুল ডালহাউসি স্কোয়ারে। দীনেশ মজুমদার ধরা পড়ে গেল। তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল।

টেগার্টের ওপর বোমা আক্রমণের ফলে গ্রেপ্তার হলেন ভূপাল বসু, নারায়ণ রায়, রসিক দাস, মনোরঞ্জন রায় ও আরও অনেকে। কমলাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। ডালহাউসি বোমার মামলা হল। ভূপাল বসুও দণ্ডিত হলেন অন্যান্যের সঙ্গে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

মনোরঞ্জন গুপ্ত ফেরার হলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

ভূপাল বসুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নিজের হাতে গড়া দলটিও ভেঙ্গে যায়।

বীণার মনে দারুণ আঘাত লাগল।

১৯৩১ সালে বীণা বি. এ. পাশ করল। ভর্তি হল বি. টি. ক্লাসে। তখন সে থাকত নিজেদের বাড়ী একডালিয়া প্লেসে। কিন্তু বাড়ী থেকে ক্লাস এ্যাটেন্ড করা অসুবিধা হওয়ায় সে চলে এল ডায়োসেসান কলেজ হোস্টেলে। ডায়োসেসানেই হত বি. টি. ক্লাস।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর বিপ্লবীরা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। একদল এসে আশ্রয় নিয়েছিল চন্দননগরে। সে বাড়ীতে থাকতেন ওদের বন্ধু বিপ্লবী শশধর আচার্য। একজন অবিবাহিত পুরুষের ভাড়াকরা বাড়ীতে আরও কজন পুরুষ গিয়ে থাকলে প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তাই দলের নির্দেশে সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে চন্দননগর পাঠান হল। সে গ্রহণ করল শশধরের স্ত্রীর ভূমিকা। সেখান থেকেই সে শিক্ষিকার কাজ করবার জন্য ডেইলি প্যাসেঞ্জারী করত।

২ সেপ্টেম্বর পুলিশ সেই বাড়ীতে অতর্কিতে হানা দিয়ে ফেরারী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করল।

কমলা ও কল্যাণী তখন ছাত্রী সংঘের শাখাপ্রশাখা স্থাপনে ব্যস্ত।

কিন্তু বীণা কি করবে? নেতা কারাদণ্ডিত, সহকর্মীরা ছত্রভঙ্গ, প্ল্যান করবার, নেতৃত্ব দেবার মত কেউ নেই। অথচ একটা কিছু করবার জন্য বীণা অস্থির হয়ে উঠেছে!

ওদিকে পর পর বৈপ্লবিক এ্যাকশন হয়ে যাচ্ছে।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হানা দিয়েছে বিনয়, বাদল ও দীনেশ।

পেডিকে খতম করেছে বিমল ও যতিজীবন।

গার্লিককে হত্যা করেছে কানাই।

সরোজ আর রমেন গুলী চালিয়েছে ডুনোর ওপর।

ভিলিয়ার্সের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে বিমল।

এলিসনকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে শৈলেশ।

বীণা অধীর হয়ে উঠল। আমাকেও একটা কিছু করতে হবে। নেতা নেই, নাই-বা রইল। নাই-বা রইল বুদ্ধি ও পরামর্শ দেবার মত কোন সহকর্মী বা সুহৃদ। তবু একক চেষ্টায় একটা কিছু করতে হবেই হবে।

বীণা ছটফট করতে লাগল।

এমন সময় ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি. জি. বি. স্টিভেনস্‌কে নিধন করল শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামের দুটি মেয়ে। মেয়ে নয়, বালিকা। শান্তি ষোল পেরোয়নি সুনীতির বয়স আরও এক বছর কম। স্কুলের ছাত্রী।

বীণা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল।

সুহাসিনী দত্তের সঙ্গে পরামর্শ করল।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে খতম করতে হবে।

দুটি স্থানে তাকে নাগালের মধ্যে পাবার সম্ভাবনা—এক, রেসকোর্সের মাঠে। প্রতি শনিবার জ্যাকসন সপরিবারে ঘোড়দৌড় দেখতে যায়। কিন্তু সেখানে বিশেষভাবে নির্মিত তার আসনটি বিশেষভাবে রক্ষিত, চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরা, ওপরে নীচে এদিকে ওদিকে অসংখ্য মানুষ, সেই ভিড়ের মধ্যে গভর্ণরের সম্মুখীন হওয়া, তাকে রিভলভারের রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় পথটির কথা সহসা বীণার মনে এল, সুহাসিনীও তৎক্ষণাৎ সমর্থন করল তা। আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৩২ সালের প্রথম দিকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হবে, একত্রিশ সালে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর হিসেবে গভর্ণর জ্যাকসন কনভোকেশনে শুধু ভাষণই দেবে না, ডিপ্লোমাগুলি স্বহস্তে সেই গ্র্যাজুয়েটদের হাতে তুলে দেবে। বীণা যখন তার মুখোমুখি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ডিপ্লোমা নেবে, ঠিক সেই সময়—

কিন্তু রিভলভার? রিভলভার কোথায় পাওয়া যাবে? বীণা আজ পর্যন্ত রিভলভার হাতে করেনি। ওটা চালানোও ত শিখতে হবে। কে শেখাবে?

ভাবনায় পড়ল বীণা। পরিকল্পনা যতই নিখুঁত হোক, তা রূপায়ণের উপায় কোথায়?

বীণা অস্থির হয়ে উঠল।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস। কল্যাণী কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেছে, এমন সময় একদিন কমলা বীণাদের বাড়ীতে আসতেই বীণা তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেল।

কমলাদি!

কি বীণা?

আমার মনের অত্যন্ত গোপন একটা ইচ্ছা তোমায় জানাব, বীণা বলল, আগামী মাসের ৬ তারিখে কনভোকেশন, গভর্ণর ডিপ্লোমা দেবে, ডিপ্লোমা নিতে গিয়ে আমি ওকে শেষ করে দিতে চাই। কমলাদি, তুমি আমায় একটা রিভলভার দিতে পার!

কমলা বলল, তোমাদের দলের দাদাকে বল না—

দাদারা কেউ জেলের বাইরে নেই কমলাদি, বীণা বাধা দিয়ে বলল, আমাদের দল প্রায় ভেঙ্গে গেছে বলা যায়। কমলাদি, তুমি আমায় সাহায্য কর। দলের হয়ে নয়, আমি একাই এই এ্যাকশনটা করতে চাই।

যদি ধরা পড়ে যাও, তাহলে তোমার কি হবে বুঝতে পারছ? কমলা ভয় দেখাল।

বুঝতে পারছি, দৃঢ় স্বরে জবাব দিল বীণা, তাহলে হাসিমুখে ফাঁসিতে যা । ।

কমলা রাজী হল, আচ্ছা, আমি তোমায় রিভলভার দোব।

চালানোটাও ভাল করে শিখিয়ে দিও, বীণার কণ্ঠে উৎসাহ ঝরে পড়ল, তারপর বলল, আর একটা কাজ তোমায় করতে হবে কমলাদি, পটাসিয়াম সায়নাইডের একটা প্যাকেটও দিও—

কেন ? চমকে উঠল কমলা।

কাজ হাঁসিল হয়ে গেলে আর পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে লাভ কি, গম্ভীর স্বরে বলল বীণা, কাজ শেষ করে পালাতে চাই না, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ইংরেজকেও বাহোবা পেতে দিতে রাজী নই, তাই চাই পয়জন প্যাকেট। দেবে ত কমলাদি ?

কমলা ওকে জড়িয়ে ধরল, দোব। দোব রিভলভার, দোব পটাসিয়াম সায়নাইড—

একজন এ্যাসিস্টেণ্টও দিলে ভাল হয় কমলাদি ; বীণা বলে উঠল।

সে কি করবে ?

তাকেও রিভলভার দিও, বীণা জবাব দিল। আমি ত এই প্রথম চালাব রিভলভার, যদি ঠিকমত না পারি, তাই দর্শক হিসেবে ওখানে গিয়ে সেও রিভলভার চালাবে। জ্যাকসন যাতে কিছুতেই না নিস্তার পায়।

কমলা বলল, আচ্ছা, দেখব, তেমনি কাউকে পাওয়া যায় কি না।

সুধীর ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করল কমলা। সে বলল, এ্যাকশনের পরিকল্পনাটা খুব চমৎকার, ঠিকমত সব করতে পারলে গভর্ণরের মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু বীণার সঙ্গে দেবার মত তেমন কাউকেই ত দেখছি না।

কমলা জিজ্ঞেস করল, রিভলভার ?

শ তিনেক টাকা দিলে স্মাগল-করা একটা জোগাড় করা যেতে পারে।

তাই হবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই কমলা দু শো আশী টাকা এনে দিল সুধীরের হাতে; সুধীর জোগাড় করে দিল একটি রিভলভার, সঙ্গে পটাসিয়াম সায়নাইডের ছোট্ট একটা পুরিয়া।

একদিন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে লেডিজ পার্কে নির্দেশমত বীণা এসে দেখা করল কমলার সাথে। এমনিতেই বিরাট পার্কে খুব বেশী মেয়ে বেড়াতে বা খেলাধুলা করতে আসে না, তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই সবাই চলে যায়। জনশূন্য পার্কের কোণে নিয়ে গিয়ে বীণার হাতে রিভলভারটি দিল কমলা। শুধু দিল নয়, ছটি বুলেট কি করে ভরতে হয়, ট্রিগার টানতে হয় কি করে, একটা বুলেট ফায়ার্ড হয়ে গেলে কেমন আটোমেটিক আর একটা বুলেট ব্যারেলের মুখে এসে যায়, সব শিখিয়ে দিল কমলা।

কিন্তু বিষের প্যাকেটটি দিতে মন চাইছিল না তার।

বীণা বলল, কমলাদি, স্বাধীনতার জন্য অনেক ছেলে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু

আজ পর্যন্ত প্রাণ দেয়নি কোন মেয়ে। চন্দননগরে সুহাসিনীদি ধরা পড়েছেন, কুমিল্লায় ধরা দিয়েছে শান্তি আর সুনীতি। মেয়েদের প্রাণ দেবার পথ আমিই প্রথম দেখাব, এই আমার সঙ্কল্প। তুমি আমায় বাধা দিও না কমলাদি।

একুশ বছরের মেয়ে বীণার পানে চেয়ে রইল কমলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভাল ছাত্রী বীণা। ম্যাট্রিকে স্কলার, আই. এ-তে ফিফটিনথ্, ভালভাবে বি. এ. পাশ করা মেয়ে। গায়ের রং ফর্সা নয় বটে, কিন্তু চোখে মুখে তারুণ্যের দীপ্তি। দেশপ্রেমের আগুন যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সংকল্পে অটল, কিন্তু সঙ্কল্প সাধনের পর আর বেঁচে থাকতে চায় না। যেন এই সুকঠিন কাজটি করবার জন্যই বিধাতাপুরুষ তাকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। সব্যসাচী যেমন পারিপার্শ্বিক সমগ্র দুনিয়া ভুলে গিয়ে শুধু পাখীর চোখটিই দেখতে পাচ্ছিল, বীণার সর্ব অন্তর তেমনিভাবে ছেয়ে রয়েছে একটি স্থান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, একটি মানুষ, বাংলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। সেই লক্ষ্যভেদের পর তার কাজ শেষ, সে চিরবিদায় নিতে চায়।

কমলা আর বাধা দিতে পারল না।

ললিতবীণা আজ অগ্নিবীণায় রূপান্তরিত!

সে বিষের প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে দিল।

তারপর সাফল্য কামনা করে বিদায় দিল বুকে জড়িয়ে ধরে।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ তারিখ।

গম গম করছে সিনেট হল। সমাগত অতিথিরা, গ্র্যাজুয়েটগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ এবং দর্শকবৃন্দ। হলের বাইরে সশস্ত্র ও সাদা-পোশাক পুলিশের কড়া পাহারা, হলের অভ্যন্তরে দর্শকদের মধ্যেও হয়ত দর্শক সেজে বসে আছে কোমরে আঁটা রিভলভার আই. বি. পুলিশের লোক।

আলো ঝলমল সুসজ্জিত মঞ্চ। দেয়ালে ফুলের রিং, ঝকঝকে ক্লথে ঢাকা টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাসে সুগন্ধ ফুলের তোড়া, বক্তৃতা-ডেস্ক-এর সম্মুখে মাইক্রোফোন।

চ্যান্সেলর জ্যাকসন প্রবেশ করল।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

মঞ্চে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ভাইস চ্যান্সেলর কর্ণেল সুরাবর্দী, বিশিষ্ট অধ্যাপক দীনেশ সেন প্রমুখ সুধীবৃন্দ।

তারপর বক্তৃতা শুরু হল।

সবার শেষে গভর্ণরের ভাষণ।

কিন্তু হঠাৎ সুরাবর্দী ঘোষণা করলেন যে, এ বছর ডিপ্লোমা আর হাতে হাতে দেয়া হবে না। যারা যে-কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, ডিপ্লোমাগুলি সেখানে পাঠানো হবে, সেখান থেকে নিতে হবে।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এই পরিবর্তন কেন? চিরাচরিত রীতি চ্যান্সেলরের হাত থেকে ডিপ্লোমা নেবে গ্র্যাজুয়েটরা, এবার কেন তা দিতে দেয়া হবে না? তাহলে কনভোকেশনের তাৎপর্যই বা রইল কোথায়? এই ব্যয়-বহুল বর্ণাঢ্য সভার প্রয়োজন তাহলে কেন?

উপস্থিত গ্র্যাজুয়েটদের মনে এসব প্রশ্ন জাগলেও চমকে উঠল একটি গ্র্যাজুয়েট, সে বীণা দাস। ভাবল, নিশ্চয়ই আশংকা করেছে কর্তৃপক্ষ যে, এত লোকের মাঝে গভর্ণরের এত কাছাকাছি যেতে পারার সুযোগ হয়ত গ্রহণ করতে পারে বিপ্লবীরা, তাই বিনা নোটিশে আকস্মিক এই প্রচলিত রীতির পরিবর্তন।

আস্তে বুকের ওপর হাত রাখল বীণা, ঠিক আছে গুলিভরা রিভলভার।

আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিল, ঠিক আছে পটাসিয়াম সায়নাইডের প্যাকেট।

গভর্ণর ভাষণ শুরু করল মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে।

উঠে দাঁড়াল বীণা। এক্ষুনি বার করবে নাকি রিভলভার? না, না, আর একটু পরে। ভাষণ পাঠ আরও খানিকটে এগোক, দর্শকরা নিবিষ্ট হয়ে উঠুক।

বসে পড়ল সে।

একটু পর আবার উঠে দাঁড়াল, কি ভাবল, আবার বসে পড়ল।

জ্যাকসন ভাষণ পাঠ করে চলেছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে শ্রোতাদের পানে চাইছে।

এমনি করে ত ভাষণ এক সময় শেষ হয়ে যাবে। বেরিয়ে যাবে সে হলের বাইরে। পুলিশ প্রহরায় গাড়ীতে উঠে চলে যাবে। তাহলে যে ব্যর্থ হয়ে যাবে আজকের প্ল্যান অব এ্যাকশন। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে বীণা?

উঠে দাঁড়াল বীণা, তড়িৎ পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা, তারপর রিভলভার বার করে ট্রিগার টানল, দ্রাম্! দ্রাম্! দ্রাম্!

কিন্তু চকিতে জ্যাকসন মাথা সরিয়ে নিয়েছে, বসে পড়েছে ডেক্স-এর নীচে।

বেঁচে গেছে গভর্ণর।

লাফিয়ে পড়লেন কর্ণেল সুরাবর্দী। চেপে ধরলেন বীণাকে? আরও ছুটে এল কজন। চেপে ধরল ওকে মেঝেতে।

কিন্তু তখনো চলছে বীণার রিভলভার এলোপাথারি। যেখানে লাগে, লাগুক।

ধরে ফেলল ওরা তার হাত।

ছিনিয়ে নিল রিভলভার।

বিষের প্যাকেটটা ব্লাউজের মধ্যেই রয়ে গেল।

বীণা ধরা পড়ে গেল।

আহত হলেন অধ্যাপক দীনেশ সেন ও আরও কয়েক জন। অবশ্য সামান্য আঘাত।

তার পরের কাহিনী সহজ সরল।
সেখান থেকে লর্ড সিংহ রোডে আই বি অফিস।
তারপর হাজত।
তারপর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে বিচার। চার্জ, গভর্ণরকে হত্যার চেষ্টা।
বীণা দাসের প্রতি নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

ললিত বীণা অগ্নিবীণায় রূপান্তরিত হয়ে অকস্মাৎ ঝড় তুলেছিল।
বীণার তার ছিঁড়ে গেল।
ঝড় থেমে গেল।
গভর্ণর জ্যাকসন বেঁচে গেল।

পেডির পরে ডগলাস খতম

অকস্মাৎ মেদিনীপুর শহরের পথে পথে দেয়ালে দেয়ালে প্রাচীর-পত্র দেখা গেল, শিরোনামা, 'হত্যার বদলে চাই হত্যা' আর নীচে প্রচারকের নাম লেখা, 'বৃটিশ উচ্ছেদ সমিতি।'

দেখা গেল নয়, দেখা যেতে লাগল মাঝে মাঝেই। কোথায় এই সমিতি, কোথায় দপ্তর, কারা এর সভ্য, ইংরেজ অফিসারদের একেবারে উচ্ছেদ করে দেবার দিবাস্বপ্ন দেখছে, এমনি মতিচ্ছন্ন করা, তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও আই বি ধুরন্ধরেরা হদিস করতে পারল না। শহরের একদিকে নজর রেখে ওৎ পেতে বসে থাকলে কি হবে, সে রাত্রে আর একদিকে পোস্টার পড়ে, হত্যার বদলে চাই হত্যা! কারা, কখন্, কোন্ ফাঁকে লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়ে, কিছুতেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অকস্মাৎ একদিন একেবারে কোতোয়ালী থানার দেয়ালেই দেখা গেল সেই পোস্টার।

প্রমাদ গুনল পুলিশ।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন রবার্ট ডগলাস। গত বছর ৭ এপ্রিল কর্নেল জেমস পেডি বিপ্লবীর গুলীতে খতম হবার পর তারই শূন্য সিংহাসনে এসে বসেছে ডগলাস। বসবার কয়েক মাস পরেই তার ওপর একটি তদন্তের ভার পড়েছিল। হিজলী বন্দীশিবিরে ১৬ সেপ্টেম্বর সিপাইদের গুলীচালনার ফলে নিহত হন রাজবন্দী তারকেশ্বর সেন আর সন্তোষ মিত্র। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চাপে ইংরেজ সরকার এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার দেন ডগলাসের ওপর। ডগলাসের রিপোর্টে হিজ মাস্টারস ভয়েসেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়, '...দাঙ্গাকারী মারমুখী বন্দীদের প্রতিহত করে আত্মরক্ষা করবার জন্যই সিপাইদের রাইফেল ব্যবহার করতে হয়েছিল। তারা নির্দোষ।...'

সেই ডগলাস। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। চার্জ নেবার পরই কিন্তু বুঝতে তার ভুল হয়নি যে, বিপ্লবীদের নজর এবার তার মাথার ওপর। রাজমহেন্দ্রী কলেজের অধ্যক্ষ তার ভাই। ১৯৩১ সালের ৫ আগস্ট সে তার ভাইকে এক পত্রে লিখেছিল, '...আসল সত্য হচ্ছে, আমার জীবনের ওপর গুরুতর বিপদ দেখা দিয়েছে।...'

হঠাৎ একদিন ডাকযোগে তার নামে একখানা চিঠি এল। সেই পোস্টার, 'হত্যার বদলে চাই হত্যা।' তার পেছনে লেখা ঃ 'ডগলাস, সুরুলিয়া ও অন্যান্য থানার এলাকায় কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর পুলিশের যে অমানুষিক

নির্যাতন চলছে, আমরা জানতে চাই, সেই নির্যাতনের হুকুম কি তুমি দিয়েছ কিংবা তোমার জ্ঞাতসারেই এসব চলছে? আমাদের কাজ শুরু করবার পূর্বে আমরা এর জবাব চাই। এর পর আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করব, নজর রাখব তোমার ওপর, দেখব, এই অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করবার জন্য তুমি কোন আদেশ দাও কিনা। যদি না দাও, তাহলে আজ হোক বা কাল হোক, এর জন্য মারাত্মক ফল তোমায় ভোগ করতে হবে।'

প্রমাদ গুনল ডগলাস।

আরও আরও সতর্ক হল সে, তার দেহরক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হল। কোয়ার্টার্সের চতুর্দিকে সশস্ত্র রক্ষী, রক্ষী অফিসের দরজায়। অচেনা কাউকে সহজে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না, সভাসমিতিতে যাওয়াও কমিয়ে দেয়া হল। সাদা পোশাকে আই বি-র লোকেরা জামার নীচে গুলীভরা রিভলভার নিয়ে তাকে গার্ড দিতে লাগল।

নিকুঞ্জ বিহারী সেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী, থাকেন কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটি মেসে। তাঁর কক্ষে একদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসল। বৈঠকে যোগদান করলেন বি ভি-র জনকয়েক বিশিষ্ট কর্মী, তাঁদের মধ্যে একজন প্রফুল্ল কুমার দত্ত, দলের আমরা, বয়োকনিষ্ঠরা, যাঁকে 'ফুলদা' বলে ডাকি। মেদিনীপুরের ছেলেরা প্রস্তাব পাঠিয়েছে, পেডির মত তারা ডগলাসকেও খতম করতে চায়। বৈঠকে প্রস্তাব অনুমোদিত হল। পেডির বেলায় যেমন হয়েছিল, ডগলাসের বেলাতেও স্থির হল, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ফুলদাই যাবেন মেদিনীপুরে, ছেলেদের সঙ্গে কথা বলবেন, কথা বলবেন এবারকার এ্যাকশনের জন্য মনোনীত প্রভাংশু পাল আর প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের সঙ্গে, যদি বোঝেন ওদের মনোনয়ন নির্ভুল, তাহলে অস্ত্রদুটি ওদের হাতে দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চলে আসবেন।

একটি আটত্রিশ বোরের রিভলভার, তার অনেক বুলেট আছে, আর একটি প'য়তাল্লিশ বোরের, তার বুলেট আছে মাত্র ছয়টি। ঢাকুরিয়া লেকের দক্ষিণে রেলওয়ে লাইন, মাঝে মাঝেই ট্রেন যায়। রিভলভার দুটি নিয়ে সেখানে গেলেন ফুলদা। ট্রেন ছোটবার সময় ঘর্ঘর আওয়াজ হয়, ঠিক সেই সময় গুলী চালিয়ে দেখলেন, ঠিক আছে রিভলভার। তবে প'য়তাল্লিশ বোরের রিভলভারটি পরীক্ষা করা গেল না। ছয়টি মাত্র বুলেট আছে ওটার, ডগলাসের জন্যই প্রয়োজন হবে।

পেডি নিধনের পূর্বে যেমনটি করেছিলেন, ১৯৩২ সালের ২৩ মার্চ প্রফুল্ল দত্ত ফুলবাবুটি সেজে একটি এ্যাটাচি কেস হাতে মেদিনীপুরগামী ট্রেনের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলেন। রিভলভার দুটি কেসের মধ্যে নয়, ছিল তাঁর জামার নীচে কোমরেই, গুলীভরা। যদি পুলিশের গুপ্তচরেরা সন্দেহ করে, অনুসরণ করে, তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে চলবে রিভলভার, প্রথমে প'য়তাল্লিশ বোর, ছ'টা বুলেট ফুরিয়ে যেতেই আটত্রিশ, অনেক বুলেট আছে ওর,

অনেকবার অনল উদ্গীরণ করতে পারবে, অনেকগুলো শব পেরিয়ে তারপর হয়ত ওরা পৌঁছুতে পারবে ফুলদার কাছে।

কিন্তু একটি বুলেট কি আর নিজের জন্য রাখবেন না ফুলদা? স্বেচ্ছা-মৃত্যুর পাঠ যিনি দিতে চলেছেন প্রভাংশু আর প্রদ্যোৎকে, সে পাঠ যে অনেক আগেই গ্রহণ করেছেন তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক ও বন্ধু মেজর সত্য গুপ্তের কাছে। হাতে অস্ত্র থাকতে এবং অস্ত্র চালনার বুলেট থাকতে শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত যে রিভলভার চালাতে হবে, এ নির্দেশ বিপ্লবীদের পক্ষে অলঙ্ঘনীয়।

অদ্ভুত যোগাযোগ। ডগলাসকে আক্রমণ করবে প্রভাংশু আর প্রদ্যোৎ এবং তাদের শেষ নির্দেশ দিতে চলেছেন প্রফুল্ল। এই তিন 'প্র'-য়ের যোগাযোগ কি ব্যর্থ হতে পারে?

খড়্গপুর এসে নিশ্চিত হলেন ফুলদা যে, কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে না। এ্যাটাচি নিয়ে ল্যাভেটরীতে ঢুকলেন, রিভলভার দুটি এবার এ্যাটাচিতে ভরতে হবে। কিন্তু আনলোড করতে গিয়ে সহসা হাত ফসকে আটত্রিশ বোরের ছয়টা বুলেটই পায়খানার নলের মধ্য দিয়ে ট্রেনের নীচে পড়ে গেল। ট্রেন অবশ্য তখন প্ল্যাটফরমে থেমে আছে, কিন্তু ট্রেনের নীচে ঢুকে কি করে ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন, কেউ যদি দেখে ফেলে? তবু রক্ষে যে, আটত্রিশ বোরের বুলেট পড়ে গেছে। অনেক আছে, ছ'টা খোয়া গেলেও কিছু যাবে আসবে না।

এ্যাটাচি কেসে অস্ত্র দুটি ভরে তিনি অন্য একটি ফার্স্টক্লাস কামরায় গিয়ে উঠলেন। ট্রেন ছেড়ে দিল।

মেদিনীপুর শহরে সরকারী সেচ বিভাগীয় এ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার খগেন্দ্রনাথ গুহ ফুলদার আত্মীয়। পেডির বেলায় যা করেছিলেন, এবারও তাঁর বাড়ীতেই উঠলেন। বললেন, গত বছর এসেছিলাম, আবার এলাম বেড়াতে। মেদিনীপুর শহরটা আমার খুব ভাল লেগেছে।

বেশ ত, খুব ভাল করেছেন! বললেন খগেনবাবু।

বস্তুতঃ খগেনবাবু ছিলেন এক নম্বর খয়ের খাঁ সরকারী কর্মচারী। ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেবের অন্যতম অতি বিশ্বস্ত সুহৃদ। ডগলাসও শুনেছিল সে কথা। ফলে, ডগলাসের সঙ্গেও তাঁর দারুণ খাতির। লোকে বলাবলি করত, পেডির সময় দেখেছি, ডগলাসের সময়েও দেখছি, খগেনবাবু নিশ্চয়ই ওর ইনফরমারের কাজ করে।

এ হেন লোকের গৃহ যে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারলেন না খগেনবাবু যে, মেদিনীপুরে আনন্দ-ভ্রমণের অজুহাত দেখিয়ে ডগলাসের মৃত্যুর সনদ সঙ্গোপনে বহন করে নিয়ে এসেছেন প্রফুল্ল দত্ত এবং তা কার্যকরী করবার জন্য দুটি অগ্নিনালিকা!

রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানকারীদের অন্যতম বি ভি-র কর্মী এবং

মেদিনীপুরে বি ভি-র প্রথম শাখা সংগঠক দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়ে গেছে গত বছর ৭ জুলাই। যে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনাল দীনেশকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, তার প্রেসিডেণ্ট আলীপুরের সেসন্স জজ গার্লিককে হত্যা করেছে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের কর্মী কানাই ভট্টাচার্য ২৭ জুলাই। ২৮ অক্টোবর ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোর ওপর বিপ্লবীরা আক্রমণ চালিয়েছিল। ২৯ তারিখেই আবার কলকাতায় ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সের ওপর গুলী চালিয়েছিল বি ভি-র কর্মী বিমল দাশগুপ্ত, পেডি নিধন ব্যাপারে যাকে গ্রেপ্তারের জন্য আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৩২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ দেড় মাস আগে এই মেদিনীপুরেরই সেন্ট্রাল জেল থেকে পালিয়ে গেছে তিন জন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, মেছুয়া বাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত শচীন করগুপ্ত, পাটিয়া মেল ব্যাগ ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত সুশীল দাশগুপ্ত আর কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা মামলায় দণ্ডিত দীনেশ মজুমদার।

তাই চতুর্দিকে পুলিশের গুপ্তচর গিজগিজ করছে।

তাই অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করলেন ফুলদা।

অত্যন্ত গোপনে সংবাদ পাঠালেন। রাত্রির অন্ধকারে কাসাই নদীর চরে এসে দেখা করল ফণী দাস, ফণী কুণ্ডু, হরিপদ ভৌমিক ও পরিমল রায়।

পরদিন রাত্রে ঐখানে নিয়ে এল প্রভাংশু আর প্রদ্যোৎকে।

দুই 'প্র'-কে তৃতীয় 'প্র' বাজিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, একবারে খাঁটি ইস্পাত, ঠং করে উঠল। ভাঙ্গবে, ভাঙ্গতে পারে, কিন্তু দোমড়াবে না। তারপর প্রভাংশু ত রীতিমত দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ জওয়ান। রিভলভার কেন, ওর একখানা লাথি খেলেই ডগলাসের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি অবধারিত।

রিভলভার দুটি ওদের হাতে দিয়ে সাফল্য কামনা করে কলকাতায় ফিরে এলেন ফুলদা। রওনা হবার প্রাক্কালে খগেনবাবুকে বললেন, চারিদিকে গ্রাম আর গাছগাছালি ঘেরা মেদিনীপুর শহরটি ভারী সুন্দর।

খগেনবাবু আমন্ত্রণ জানালেন, আবার আসবেন কিন্তু।

ফুলদা বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

১৯৩২ সাল, ৩০ এপ্রিল।

মিউনিসিপ্যাল অফিসের হল ঘরে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সভা। স্বভাবতঃই সভাপতি ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাস। নিজেই যে শুধু সশস্ত্র, কোটের নীচে বেল্টে আঁটা গুলীভরা রিভলভার, তাই নয়, পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন সশস্ত্র অর্ডারলী, দুইজন অস্ত্রধারী গার্ড, হল-এর বাইরে সশস্ত্র পুলিশ। মহকুমা অফিসাররাও পকেটে রিভলভার নিয়ে এসেছেন। বোর্ডের

অনেক সভ্য এসেছেন, এসেছেন স্বার্থপ্রাণোদিত অনেক লোক জেলার কর্তার মন ভিজিয়ে অনুগ্রহের খুঁদকুঁড়া সংগ্রহের আশায়, কিছু জনতাও ভিড় করেছে। এদের মধ্যেও কি আর সাদা পোশাকে আই. বি-র লোক অস্ত্র নিয়ে আসেনি ?

অপরাহ্ণ চারটেতে সভার কাজ শুরু হল।

আলোচ্যসূচী দীর্ঘ, বিষয় সংখ্যা অনেক। কিন্তু তুখোড় সভাপতি ডগলাস কোনো বিষয়েই দীর্ঘ আলোচনা বা বিতর্কের সুযোগ দিচ্ছে না, সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে চটপট। সুরক্ষিত হলেও বেশীক্ষণ সভায় বসে থাকা নিরাপদ মনে করছে না, উসখুস করছে।

রক্ষাপ্রাচীর যতই কেন না নিশ্ছিদ্র হোক, অভেদ্য হোক, লক্ষীন্দরের লৌহ কুঠরীতেও কি অনুপ্রবেশ করেনি কাল নাগিনী ?

মৃত্যুকে যে পরোয়া করে না, আত্মবিলোপনের অগ্নিমন্ত্রে যে দীক্ষিত, দেশ-মাতৃকার পায়ের শৃঙ্খল চূর্ণ করে ফেলার রক্তাক্ত সংগ্রামের যে সৈনিক, সেই আপনভোলা বিপ্লবীকে কে বাধা দিতে পারে ? কে পারে ঠেকিয়ে রাখতে ?

পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে লোকজন যাওয়া আসা করছে। কেউ লক্ষ্য করল না যে, দুটি নিরীহ গোছের ছেলে তাদের সঙ্গে মিশে প্রবেশ করল অফিস প্রাঙ্গণে। তারপর টানা বারান্দা দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ডগলাসের দুদিকে দুজন, মাত্র চার গজ দূরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে সভার অনুষ্ঠান দেখতে লাগল। দেখলে মনে হয় বোকা।

সময় যখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা, মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আটটি বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত শেষ করে যখন নবম বিষয়টির আলোচনার সূত্রপাত করা হবে, ইত্যবসরে সভাপতি ডগলাস যখন ডিসট্রিক্ট বোর্ডের কিছু কাগজপত্র স্বাক্ষর করছে মাথা নীচু করে, প্রভাংশু আর প্রদ্যোতের চোখে চোখে তখন মারাত্মক এক ইঙ্গিত ঝলক দিয়ে উঠল।

তারপরই গর্জে উঠল রিভলভার পর পর ছয় বার।

তিনটি লক্ষ্য ভেদ করল, একটি ডগলাসের হাতে, আরেকটি বুকে, তৃতীয়টি ওর পেটে। চেয়ারের ওপর ঢলে পড়ল সে।

চমকে উঠল অর্ডারলীরা, চমকে উঠল গার্ডরা, চমকে উঠল সাদা পোশাক-পরা আই. বি-র লোকেরা। সবাই প্রায় একযোগে রিভলভার বার করল।

কিন্তু জনতার হৈ চৈ, চীৎকার, ইতস্ততঃ ছুটোছুটি, হুটোপুটির মধ্য দিয়েই ছুটে বেরিয়ে এল ওরা দুজন।

বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ল প্রাঙ্গণে।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে প্রধান গেট।

গেট পেরিয়ে রাজপথ।

রাজপথে পড়ে দুজনে প্রাণপণে দৌড়ুতে লাগল। পশ্চাতে ধেয়ে আসছে অস্ত্রধারী পুলিশের দল আর তাদের সঙ্গে খোলা রিভলভার উঁচিয়ে তমলুকে

মহকুমা হাকিম জর্জ। ঘন ঘন গর্জে উঠছে এদের হাতের অস্ত্র, অথচ একটিও লক্ষ্য ভেদ করতে পারছে না। আততায়ী দুজন এঁকেবেঁকে ছুটছে।

কিছুদূর গিয়েই দুই রাস্তার মোড়ে একখানা বাড়ী, 'অমর লজ।' মুহূর্তের জন্য পাশাপাশি এল ওরা, কি একটা কথা হল, তারপরই দেখা হল দুজন ছুটছে দু' রাস্তায়, একজন উত্তর-পূর্ব দিকে, আরেকজন সোজা দক্ষিণে।

হকচকিয়ে গেল পুলিশের দল। এখন কোন দিকে যাবে? কে কার পেছনে ধাওয়া করবে? ভাগাভাগি হতেও ওদের ভয়। তাই একজনকে ছেড়ে দিয়ে ওরা দ্বিতীয় জনের পেছনেই ধাওয়া করল সবাই মিলে। সে প্রদ্যোৎ।

প্রভাংশু চলে গেল চোখের আড়ালে। চতুর ছদ্মবেশী সে। প্রকাশ্য দিবালোকেই তার বলিষ্ঠ শরীরের সঙ্গে মানানসই মোটা একটি পাকানো গোঁফ স্পিরিট গাম দিয়ে নাকের নীচে এঁটে নিয়েছিল, যাতে কেউ না চিনতে পারে। সত্যিই কেউ চিনতে পারেনি।

নাড়াজোল রাজ কাছারির উত্তর সীমান্তে এসে প্রভাংশু লক্ষ্য করল তার পেছনে পুলিশ নেই, কেউ নেই। দাঁড়াল সে। তারপর ধীরে ধীরে এগোল সতীকুণ্ডগামী সড়ক দিয়ে। এল লাল দীঘির পাড়ে। গোঁফ জোড়া, ফেলে দিল দীঘির জলে, ফেলে দিল জুতো জোড়া তারপর রিভলভার ও অবশিষ্ট বুলেট-গুলি একটি কালভার্টের নীচে সাবধানে লুকিয়ে রেখে মাণিকপুরের দিকে রওনা হল শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মত। ধীরে ধীরে প্রবেশ করল শহরে, উঠল গিয়ে ছোট মামা অমল বসুর বাড়ীতে।

যেন অপরাহ্নকালীন চায়ের আসরে যোগ দিতে এসেছে সে।

পরদিন সোজা কলকাতায়।

পরে কিন্তু পুলিশ পলাতক আততায়ীর গ্রেপ্তারের জন্য ২১ মে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, কিন্তু কে সে কোন হদিস পাওয়া গেল না।

ওদিকে প্রদ্যোৎ প্রাণপণে ছুটছে।

বড় রাস্তা ছেড়ে ছুটল মেটো রাস্তা দিয়ে। সামনেই একটা বস্তি দেখে তার মধ্যেই ঢুকে পড়ল, ঢুকে পড়ল দক্ষিণ দিকের সব শেষের ঘরটিতে। দরজা বন্ধ করে দিল।

দুজন পুলিশ এবং আরও দুজন গার্ড দিতে লাগল বেরিয়ে যাবার রাস্তাদুটি। আর ডগলাসের আর্ডারলি দুজন দরজার মধ্যে দিয়েই পর পর গুলী চালাতে লাগল।

প্রদ্যোৎ দেখল এমনিভাবে বন্ধ ঘরে থাকা নিরাপদ নয়। হঠাৎ বেরিয়েই সে আবার ছুটল উত্তরমুখে।

পেছনে থেকে ওরা পর পর গুলী চালাতে লাগল।

প্রদ্যোৎ ছুটতে গিয়ে হঠাৎ কাঁটা গাছে আটকে গেল।

প্রদ্যোৎ উলটে পড়ে গেল।

প্রদ্যোতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা।

প্রদ্যোৎ ধরা পড়ে গেল।

তল্লাসী করে ওর পকেটে পাওয়া গেল একটি প'য়তাল্লিশ বোরের রিভলভার, তার চেম্বারগুলির পাঁচটাতে রয়েছে তাজা বুলেট, আরেকটির বুলেট মিসফায়ার্ড।

ওদিকে ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের সেই গুরুত্বপূর্ণ সভা মাঝপথেই ইতি হয়ে গেছে। রক্তাপ্লুত সভাপতি ডগলাসকে মুমূর্ষু অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

জরুরী টেলিফোন পেয়ে খড়্গপুর থেকে ছুটে এলেন সিভিল সার্জন এবং একদল নার্স। চলল যম আর ডাক্তারের টাগ অব ওয়ার।

কিন্তু পাঁচ ঘণ্টাও পার হল না। রাত ন'টা প'য়তাল্লিশ মিনিটে ডগলাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

প্রদ্যোৎকে নিয়ে যাওয়া হল আই. বি অফিসে।

ওর পকেটে পাওয়া গেল এক টুকরো কাগজ, 'হিজলী বন্দী শিবিরে হত্যাকাণ্ডের ক্ষীণ প্রতিবাদমাত্র। এ থেকেই যেন বৃটেন শিক্ষা লাভ করে এবং জেগে ওঠে ভারত আমাদের আত্মোৎসর্গের ফলে।'

কিন্তু প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও আততায়ীদের একজন, দ্বিতীয়টি কোথায়? কি তার নাম? থাকে কোথায়? কোথায় পেলে রিভলভার? কে বলেছিল হত্যা করতে?

প্রশ্ন, প্রশ্ন, হাজারো প্রশ্ন। তবে আই. বি-র প্রথম দাওয়াই অত্যন্ত মোলায়েম, যেন মধুমাখানো বুলি, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, দাদু আমার, বলত ভাই সব কথা। তুমি বল, আমি টুকে নিই। আহা হা, কাঁচ ফুলের মত মুখখানা একেবারে কালচে হয়ে গেছে। যাকে বলে মেদিনীপুরের গরম, একেবারে ফার্নেস! বলত সোনা, সেই লোকটা কে, যে তোমায় রিভলভার দিয়ে বলেছিল, যাও ডি এম-কে খতম কর? অর্থাৎ ফাঁসী যেতে তুমি আর নাম করতে আমি।—বল ত ভাই!

মধু দানে ভাই যখন মাধব হয়ে উঠল না, তখন দেখানো হল লোভ। এক তাড়া নোট মেলে ধরা হল চোখের সামনে, টেবিলের ওপর, হাতের নাগালে। চুপ করে থেকে কি লাভ? নাও না, নিয়ে নাও না, এই এক তাড়া নোট। যদি চাও, আরও এক তাড়া এনে দোব, তাড়া তাড়া টাকা। তোমার বাড়ীর অবস্থা ভাল নয় জানি। তাই টাকা নিয়ে যাও। ফুরিয়ে গেলে আবার দোব। তোমার পড়ার সব খরচ দোব, পড়া শেষ হলে ভাল একটা চাকরি দিয়ে দেব, সংসারের দুঃখ ঘুচে যাবে। শুধু বলে দাও সেই বদমাস ছোকরার নামটি, যে তোমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে জুটিয়ে নিয়ে এসে কাজটি করিয়ে নিজে দিব্যি সরে পড়েছে আর ঝক্কি পোহাচ্ছ তুমি। বল ত হে!

লোভের দাওয়াই ব্যর্থ হলে দেয়া হল শকুনির কূট পরামর্শ। কে জানছে বল্ ত? আমরা ত আর তোকে দিয়ে সই করিয়ে নিচ্ছি না, ঢাকঢোল পিটিয়েও জানাচ্ছি না যে, প্রদ্যোৎ সব বলে দিয়েছে। ডি এম কে মারতে গিয়েছিলি, মেরেছিস, পার্টিতে সুনাম হয়েছে। এখন যদি শুধু তোর সঙ্গীর নামটি আমার কানে কানে বলে দিস, কে জানতে পারছে রে? আমরা ত খুঁজছিই তাকে, যেন খুঁজতে খুঁজতেই ধরে ফেললাম এমনি ভাব দেখাব, পার্টিতে তোর সুনাম ঠিকই থাকবে, পজিশন থাকবে, আমরাও সেই ছেলেটাকে জেলে পুরে তোকে হয় ছেড়ে দোব, নইলে প্রথমে লোক দেখানো রাজবন্দী করে রাখব, ছয় মাস পর খালাস, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবি। নে, বলে ফ্যাল, আর দিক করিস নি।

শকুনির বকবকানিতে কোন ফল না পাওয়ায় বার করা হল হান্টার, এগিয়ে এল সিপাই। মুখে থুতু ছেটানো হল, চুল ধরে ওঠ-বোস করানো হল, চালানো হল এলোপাথারী হান্টার। শালা, শুয়োরের বাচ্চা, তোর মত পুঁচকে ছোকরা ভেবেছিস চুপ করে থেকে পার পেয়ে যাবি? শালা বেজন্মা, তোর হাড়মাস আলাদা করে ছাড়ব, তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দোব। সিপাই, এই পিন নাও, দাও নখের নীচে ঢুকিয়ে, মাথায় বরফ চাপিয়ে বসিয়ে রাখ, কম্বল ধোলাই দাও, মরুক শালা মুখ দিয়ে রক্ত উঠে।

প্রদ্যোতের ওপর চলল এমনি নৃশংস নির্যাতন দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা।

নির্যাতন এড়াবার জন্যই ৪ মে প্রদ্যোৎ বলল, আমার সঙ্গে ছিল সীতাংশু, সীতাংশু বোস।

খোঁজ, খোঁজ এই সীতাংশু বোসকে।

তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালানো হল, চষে ফেলা হল সারা মেদিনীপুর শহর, গ্রেপ্তার করা হল অনেককে। কিন্তু তাদের মধ্যে সীতাংশু বোস কেউ নেই।

অবশেষে ষড়যন্ত্র মামলা ফাঁদবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পুলিশ মামলা শুরু করল একা প্রদ্যোতের নামেই। স্টেট ভার্সাস প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। ১৯৩২ সালের ৮ জুন গঠিত হল স্পেশাল ট্রাইবিউনাল। প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে নরহত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হল। মামলায় প্রকাশ পেল যে, প্রদ্যোতের রিভলভারের পাঁচটি চেম্বারেই ছিল গুলী ভরা, আরেকটি চেম্বারে মিসফায়ার্ড বুলেট। ডগলাসের শরীর থেকে যে ক'টি বুলেট বার করা হয়েছে, তা সবই আটত্রিশ বোর রিভলভারের। তার অর্থই হল যে, প্রদ্যোতের পঁয়তাল্লিশ বোর অস্ত্রের একটি বুলেটও ছোঁড়া হয়নি, ওর সঙ্গীর আটত্রিশ বোরের গুলীতেই ডগলাসের মৃত্যু হয়েছে।

তাহলে? তাহলে প্রকৃত হত্যাকারী কে? অমর লজের কাছে একটি বুলেট কুড়িয়ে পাওয়া গেছে সেই রাস্তায়, যে রাস্তা দিয়ে ওর সঙ্গী পালিয়ে গেছে। তাহলে ত হত্যাকারী ওর সঙ্গী, প্রদ্যোৎ নয়।

কিন্তু তাহলে কি হবে? ইংরেজের আদালতে বিপ্লবীদের বিচার ত একটি

প্রহসন। লোকদেখানো ঠাট। দুনিয়ার কাছে নিরপেক্ষতার ভান। একটি প্রকাণ্ড তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৫ জুন প্রদ্যোতের ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল।

চরম দণ্ড দিতে গিয়ে রায়ে যে অভিনব যুক্তি দেখানো হল, তার মর্ম এই : এই হত্যা ইচ্ছাকৃত এবং ঠাণ্ডা মাথায় করা হয়েছে। আসামী ডগলাসকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যেই রিভলভার তুলেছিল, রিভলভার ছুঁড়েছিল, অন্ততঃ একবার কিন্তু তার গুলীটি ছোটেনি। না ছুটলে কি হবে? যদি ছুটত, তাহলে হয়ত সেই গুলীটা ডগলাসের শরীরে লাগত এবং আসামীর সঙ্গীর নিক্ষিপ্ত গুলীর সঙ্গে ঐ গুলীটাও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াত। সুতরাং প্রকৃত হত্যাকারীর সঙ্গে আসামীর বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তাই আসামীকে ঝুলিয়ে দেবার হুকুম দিলাম—to be hanged till death.

তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াল? প্রদ্যোৎকে বেকসুর খালাস দেবার কথা হচ্ছে না, কারণ আইনের চক্ষে সে অপরাধী। কিন্তু সে অপরাধের গুরুত্ব কতখানি? যে পাঁচবার গুলী করেছে, যার গুলীতেই ডগলাসের মৃত্যু হয়েছে, তার অপরাধ যতখানি গুরুতর, যে মাত্র একটিবার ট্রিগার টেনেছে অথচ গুলীটা ছোটেনি, ডগলাসের শরীরে লাগা ত দূরের কথা, তার অপরাধের গুরুত্বও কি ততখানি? 'যদি' এবং 'হয়ত' শব্দ দুটি ব্যবহার করে রায়ে যা বলা হয়েছে, তা যদি মেনে নেয়া যায়, তাহলে, একজন ছোরা চালিয়ে আরেকজনকে খুন করা ত দূরের কথা, ছোরা যদি তার গায়ে আঁচড়টিও না কাটতে পারে, তবুও তার ফাঁসী হবে। কারণ, 'যদি' লাগত, 'তাহলে' ত মৃত্যু হতে পারত! এই যদি এবং তাহলে-র যুক্তি দেখিয়ে একেবারে ফাঁসীর হুকুম দেয়া সঙ্গত ও ন্যায় বিচার কি না, সেটাই প্রশ্ন, আরও বিশেষ করে যখন সন্দেহাতীতরূপে জানা গেছে যে, হত্যাকারী অপরে। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত কি?

সমগ্র দুনিয়া প্রদ্যোতের জন্য অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করলেও নির্ভীক কিশোর বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ফাঁসীর ঘরে বসে সে মাকে চিঠি লিখেছিল, '...একটি আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন, আমার মন আনন্দে ভরপুর...'

মা শেষ সাক্ষাৎ করে গেলেন।

১৯৪৩ সালের ১২ জানুয়ারী, ভোর পাঁচটায়, মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে অগ্নিশিশু প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসী হয়ে গেল।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি ঢাকা থেকে দীনেশ গুপ্ত গিয়ে মেদিনীপুরে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের একটি শাখার গোড়াপত্তন করে এসেছিল, তারপর সংগঠনের দায়িত্ব নেয় শশাঙ্ক (ওরফে কমেট) দাশগুপ্ত। তারই অক্লান্ত চেষ্টায় ওখানে যে নিবেদিত-প্রাণ বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, মাত্র দুই বৎসর পর থেকেই শুরু হল তাদের এ্যাকশন।

প্রথম টার্গেট জেমস পেডি। দ্বিতীয় টার্গেট রবার্ট ডগলাস।

কামাখ্যার যম কালিপদ

২৮ জুন, ১৯৩২ সাল।

স্থান ঢাকা শহরের জেনারেল পোস্ট অফিস। সময় বেলা প্রায় দুটো। পোস্ট অফিসে সর্বদাই ভিড়। সেভিংস ব্যাঙ্ক, মনি অর্ডার স্ট্যাম্প, রেজিস্ট্রেশন, টেলিগ্রাম সর্বত্র। ভিড় অফিসের মধ্যেও। অফিস কর্মীদের যেন নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই।

প্রতিটি কাউন্টারের উইন্ডোর মধ্য দিয়ে অনেকগুলো হাত ঢুকে আছে। সবাই আগে চায়। সবারই জরুরী। যারা হাত ঢোকাতে পারেনি, তারা ভিড় করে আছে। একখানা হাত বেরিয়ে এলেই দুখানা হাত ঢোকাবার মতলব। এরই মধ্যে টেলিগ্রাম উইন্ডোর মধ্য দিয়ে কোনরকমে হাত ঢুকিয়ে দিল একটা লোক, বলল, দয়া করে এখানা পাঠিয়ে দিন। কত লাগবে দেখুন—

টেলিগ্রামখানায় কয়টি শব্দ আছে গুনতে গিয়েই চমকে উঠলেন টেলিগ্রাফ মাস্টার। কপালে কুঞ্চন ফুটে উঠল, চোখ বিস্ফারিত হল, বুক কেঁপে উঠল, রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লাগলেন—

To Dr. Suresh Chandra Ganguly
Sarada Medical Hall
Ichhupure Bazar
Tel. office—Ichhapura

KAMAKHYA'S OPERATION SUCCESSFUL NO ANXIOUS

Sender—Surendramohon Chakrabarti
7 Patuatuli
Dacca

সন্দেহ হল টেলিগ্রাফ মাস্টারের। দারুণ সন্দেহ। তাকালেন লোকটার দিকে। সাধারণ অনভিজ্ঞ ধরণেরই বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা ত বাইরের চেহারা মনের চেহারা কেমন, কে জানে। 'স্বদেশীদের' চেনা ভারী কঠিন। ওরা হাসতে হাসতে অনায়াসে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে এবং বসিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যেতে পারে। কে জানে গত রাত্রে এই লোকটাই কামাখ্যা সেনকে মার্ডার করে আজ সাধুটি সেজে পোস্ট অফিসে এসে খবর পাঠাচ্ছে কিনা দলপতির কাছে, কামাখ্যাজ অপারেশন—তারপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া নির্দেশ এসে গেছে, সন্দেহজনক টেলিগ্রাম দেখলেই যেন তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেয়া হয়।

লোকটিকে বললেন টেলিগ্রাফ মাস্টার, একটু অপেক্ষা করতে হবে ভাই, অনেক জমে গেছে। এই কখানা পাঠিয়ে দিয়ে তারপর তোমার খানা ধরছি।

লোকটি ক্ষুণ্ণ মনে হাতখানা টেনে নিয়ে উইণ্ডোর কাছেই অপেক্ষা করতে লাগল।

টেলিগ্রাফ মাস্টার খানিকক্ষণ টরেটক্কা করতে করতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। যেন একটা জরুরী কাজ মনে পড়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে কয়েকখানা কাগজ হাতে তুলে নিয়ে হন হন করে চলে গেলেন পোস্ট মাস্টারের চেম্বার অভিমুখে।

মাস্টার মশায়কে দেখালেন টেলিগ্রামখানা। সেই কামাখ্যাজ অপারেশন—

তাঁরও সন্দেহ হল। কামাখ্যা সেন নিহত হয়েছেন কাল রাত্রেই। পুলিশ সারা শহর চষে ফেলেও হত্যাকারীর কোন হদিশ পায়নি। এমনি অবস্থায় টেলিগ্রাম, কামাখ্যাজ অপারেশন—

ফোন করা হল কোতোয়ালীতে।

মুহূর্তের মধ্যে এসে গেল লরীভর্তি সশস্ত্র পুলিশ।

লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর প্রশ্ন, হাজারো প্রশ্ন, কে এই কামাখ্যা? কিসের অপারেশন হয়েছে তার? কোথায়? কোন হাসপাতালে? কিংবা কোন বাড়ীতে? সেই বাড়ীর ঠিকানা কি? কে অপারেশন করল? কোন ডাক্তার?

হকচকিয়ে গেল লোকটা। সত্যিই অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষ। সে বলল যে, অত কথার জবাব সে দিতে পারবে না! একটা দর্জির দোকানের এক ভদ্রলোক এই টেলিগ্রাম আর টাকা দিয়ে বলেছিলেন—

কে সেই ভদ্রলোক?

কোথায় থাকে সে?

চিনি না, লোকটি বলল, দেখাতে পারি, অবশ্য যদি এখনও সেখানে থেকে থাকেন—

চল্ সেখানে।

পাটুয়াটুলির সেই দর্জির দোকানে গিয়ে দেখা গেল, পাতলা চেহারার একজন ভদ্রলোক তক্তপোষে শুয়ে বিশ্রাম করছেন। লোকটি বলল, এই ইনি—

তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে।

টেলিগ্রাম কে পাঠিয়েছিল?

আমি।

কেন পাঠিয়েছিলে?

তা দিয়ে আপনার কি দরকার?

কি নাম তোমার?

চশমার কাঁচটা কোঁচার খুটে মুছতে মুছতে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, কালিপদ মুখোপাধ্যায়।

পশ্চাৎপটে দৃষ্টি প্রসারিত করা যাক।

১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল গান্ধীজি ডাণ্ডি অভিযান শুরু করে আইন অমান্য আন্দোলনের দামামা বাজিয়ে দিলেন। বেরিয়ে এল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ। শুধু লবণ আইন নয়, নিপীড়নমূলক কোনো আইনই মানব না আমরা। সত্যাগ্রহীরা গ্রেপ্তার হতে লাগল দলে দলে, হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে। ইংরেজের আদালতে বিচার প্রহসনে কোন অংশ গ্রহণ না করে স্বেচ্ছায় তারা কারাবরণ করতে লাগল। কারাগারগুলি ভরে গেল, ভরে উপচে গেল। খোলা হল অনেকগুলো ক্যাম্প জেল, অস্থায়ী বন্দীশালা। তাও ভরে গেল। সরকারী প্রশাসনের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে ছাত্রেরা এসে ভর্তি হতে লাগল সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে। স্বায়ত্তশাসিত নানা সংস্থা থেকে ভারতীয় সদস্যরা পদত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেশী সংবাদপত্রগুলি অত্যাচারের প্রতিবাদে বন্ধ করে দেয়া হল।

সমগ্র ভারতব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সংঘাতে টলমল করে উঠল ভারতে ইংরেজের সিংহাসন। প্রমাদ গুনলেন বৃটিশ সরকার। বাধ্য হলেন বড়লাট লর্ড আরউইন মারফৎ কারাগারে গান্ধীজির কাছে আপোষ প্রস্তাব পাঠাতে। গান্ধীজি তাতে আপত্তি করলেন না, আপত্তি করলেন না সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতারা। তাঁরা বললেন, প্রকৃত সত্যাগ্রহী যে, কখনও সে শত্রুপক্ষের বিপদের সুযোগ নেবে না এবং সর্বদাই তার সঙ্গে আপোষ রফার পথ খোলা রাখবে।

ফলে, ১৯৩১ সালের ৫ মার্চ সম্পাদিত হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। সর্বভারতীয় নেতারা প্রত্যেকেই সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন, করলেন না শুধু একজন, একটিমাত্র মানুষ, তিনিই বাংলার পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্র বসু। মেঘগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন তিনি, ওটা গান্ধী-আরউইন চুক্তি নয়, ওটা দিল্লীর দাসখৎ, কোন দাসখতে সই করব না আমি।

এবং চুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলন সরকারীভাবে প্রত্যাহৃত হল বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের বাংলা দেশ সেই নির্দেশ সহসা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারল না। এখানে ওখানে চলতে লাগল লবণ তৈরী, শোভাযাত্রা, সভা, সভায় বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ পাঠ, কানাইলাল ক্ষুদিরামের জীবনী এবং আরও গ্রন্থ।

চলতে লাগল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণাতেও।

ঢাকার কর্তৃপক্ষের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। চুক্তি অগ্রাহ্যকারীদের সায়েস্তা করবার প্ল্যান তৈরী করলেন। সেই প্ল্যানমতই ঢাকার অন্যতম সাব ডেপুটি কালেক্টর কামাখ্যাপ্রসাদ সেনকে ডবল প্রমোশন দিয়ে নিয়োগ করা হল স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট, নির্দেশ দেয়া হল, তোমার স্পেশ্যাল কাজ এবং একমাত্র কাজ বিক্রমপুর পরগণার আইন অমান্যকারীদের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া, তা সে পুরুষই হোক কিংবা হোক স্ত্রীলোক।

আঃ, কি চমৎকার ঢালাও হুকুম! কামাখ্যা সেনের পঙ্কিল অন্তর নারকীয় উল্লাসে ফেটে পড়ল। নিরস্ত্র জনগণের ওপর নির্বিচারে চাবুক চালাও। ওরা একটুও প্রতিরোধ করবে না, পড়ে পড়ে নীরবে মার খাবে, চাবুকের প্রতিটি আঘাত ওদের শরীরে কালাশরে ফুটিয়ে তুলবে, তবু ঘাড় বেঁকাবে না, ফিরে চাইবেনা। কিংবা পালাবে, পালাবে। তাড়া খাওয়া ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মত পালাবে, কিংবা শিয়ালের মত প্রাণ বাঁচাতে পালাবে খাল বিল সাঁতরে।

আর যদিই-বা কোন অর্বাচীন দুঃসাহসী সামান্যতম প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসে, বিক্ষোভের একটিমাত্র অঙ্গুলিও উত্তোলনের স্পর্ধা দেখায়, তাহলে আর ঐ মৃদু তিরস্কারের মত চাবুক নয়, তাহলে চালাও হাণ্টার, বুট, লাঠি, রিভলভার। আর যদি তার পরেও মাথা তোলে, রুখে দাঁড়ায়, কথা কয়, তাহলে সিপাইদের হুকুম দেবে কামাখ্যা সেন, ফায়ার! পুরুষ আর মেয়ে বলে বাছ-বিচারের কোনই দরকার নেই। সরকারী মুখপত্র স্টেটসম্যানের সম্পাদক ওয়াটসন ত স্পষ্ট বলে দিয়েছে, Women who come out in the street cannot expect better treatment than street girls.

অথচ তদন্ত হবে না, এ প্রশ্ন কেউ তুলতেই সাহস করবে না যে, শান্ত জনসমাবেশের ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলী চালাবার হুকুম দেয়া হয়েছিল কি না। ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন তুললে হোম মেম্বার সপদদাপে জবাব দেবেন, বেশ করেছিল। এর পরও যদি জনমতের চাপে একটা লোক দেখানো তদন্ত করতে হয়, তাহলেও সেই তদন্ত কমিশনের সুপারিশ হবে, মারমুখী বে-আইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য ন্যূনতম বলপ্রয়োগের হুকুম দিয়ে সাব ডেপুটি কামাখ্যা সেন শুধু ঠিক কাজই করেননি, তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কর্মবীর কামাখ্যা সেন পাবলিক সার্ভিসে অন্যতম যোগ্য ব্যক্তি।

আঃ, ভাবতেও আনন্দ লাগে কামাখ্যা সেনের। কর্মবীর শুধু ওপরওয়ালার নেক নজরেই পড়বে না, ডবলের পরেও আরও প্রমোশনের বরমালাখানি নির্ঘাৎ তার কণ্ঠে শোভা পাবে।

অতএব আসরে নামল কামাখ্যা সেন।

টাঙ্গিবাড়ি থানায় স্থাপন করল হেড কোয়ার্টার্স।

তারপর সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে চষে ফেলল সারা বিক্রমপুর। বিশেষ করে শ্রীনগর, সেরাজদীঘা, তালতলা থানার অধীন গ্রামগুলি। যেখানেই শোভাযাত্রা বা সভা, সেখানেই যমদূতের মত সদলবলে হাজির কামাখ্যা সেন। ইছাপুরা গ্রামে আয়োজিত মহিলা সভায় হানা দিয়ে এলোপাথারি চাবুক চালাল সে।

ধিক্কার দিল সবাই। হাত কামড়াতে লাগল। দাঁত কড়মড় করতে লাগল। লোকের মুখে মুখে একটি জিজ্ঞাসা সোচ্চার হয়ে উঠল, এমন কি কেউ নেই, এই নরপিশাচকে যে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিতে পারে? কেউ নেই?

এই হৃদয়মথিত প্রশ্নের জবাবে দুলে উঠেছিল ঐ ইছাপুরা গ্রামেরই পাতলা চেহারার একটি যুবকের বুক। মানুষের লাঞ্ছনা, বিশেষ করে নারীজাতির অবমাননার জ্বালা সে নিজের শিরায় শিরায় অনুভব করেছিল। ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করেছিল, আমি কামাখ্যা সেনের যম।

এই যুবকটিরই নাম কালিপদ মুখোপাধ্যায়।

ধূর্ত কামাখ্যা সেনও বুঝি বিপদের গন্ধ পেল। ঈষাণ কোণে বুঝি দেখতে পেল ঘনায়মান পিঙ্গল মেঘ। পাগলা হাওয়ার ঝাপটা। বিদ্যুতের শাণিত ছুরির ঝিলিক। বজ্রনির্ঘোষে বুঝি বিধাতার ধমকানি। ঝড়ের সঙ্কেত। বুঝতে এতটুকুও ভুল হল না ধুরন্ধরের। তিন মাসের ছুটি নিল। ভাবল, বিভীষিকা সৃষ্টির উল্লাসে বড্ড বেশী এগিয়ে গেছি। রণক্ষেত্র থেকে তাই সাময়িকভাবে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও যমের হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেয়েছে কি? কামাখ্যা সেনের কিন্তু আশা ছিল, এ যাত্রায় যমকে সে ফাঁকি দিতে পারবে। সারা বিক্রমপুরে সে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, মাস তিনেক সেখানে থেকে দূরে সরে থাকলেই তা প্রশমিত হবে। দিনের ব্যবধানে ক্ষত সেরে যাবে, অত্যাচারের কথা লোকে ভুলে যাবে। তাই নিশ্চিন্ত মনে সে এল ঢাকা শহরে ছুটির মাইনে নিতে। ওয়ারি অঞ্চলে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটের ওপর ফুলবাগান দিয়ে ঘেরা সদর মহকুমা হাকিম শচীন্দ্রনাথ চাটার্জীর দোতলা কোয়ার্টার্স, কামাখ্যা সহকর্মীর বাড়ীতে উঠল। দোতলায় সপরিবারে চাটার্জী থাকেন, নীচের তলায় ড্রয়িং রুম, তার পাশে গেস্ট রুম, সেই গেস্ট রুমেই কামাখ্যার থাকবার ব্যবস্থা হল।

যম কিন্তু ছায়ার মত তার পেছনে লেগে রয়েছে। কিংবা ছায়া নয়, ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। এ যেন এক অনিবার্য অভিশাপ, বিধাতার অমোঘ দণ্ডাদেশ! সেই আদেশ তামিল করবার জন্য যেন অশরীরী যমদূত মৃত্যু-ছুরিকা হাতে তার পেছনে লেগে রয়েছে ফেউয়ের মত শুধু সুযোগের অপেক্ষায়!

কামাখ্যা সেন ঢাকাতে আসবার পরদিনই, ১৯৩২ সালের ২৪ জুন, কালিপদও এল ঢাকাতে। উঠল পাটুয়াটুলিতে এক স্বল্প-পরিচিত দর্জির দোকানে। আগেও দু-একবার এসে এখানে উঠেছিল। হোটেলে খেয়ে আসত। শুয়ে থাকত এখানে পেছন দিকের ঘরে।

উঠেই দর্জিকে বলল যে, সে যাচ্ছে মিটফোর্ড হাসপাতালে বিশেষ পরিচিত একজন রোগীকে দেখে আসতে, তার হার্নিয়া অপারেশন হয়েছে। ফিরে এসে বলল, অপারেশনটা ভালমত হয়নি। আসলে, সেদিন রাত্রেই সে বেরিয়েছিল শচীন চাটার্জীর বাড়ীটা চিনে আসতে, কোন ঘরে রাত্রে শোয় কামাখ্যা, কোন পথে যাওয়া আসা নিরাপদ।

পরদিন কালিপদ একখানা টেলিগ্রাম পাঠাল ইচ্ছাপুরা গ্রামের ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলীর কাছে, Mukherjee! fractured seriously—Operation failure--Sending him Calcutta—Mintoo Mukherjee.

২৬ জুন রাত আটটায় সে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল, কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরবে কিছুই বলে গেল না। ফিরে এল প্রায় রাত শেষ করে। আসলে, ঐ দিনই শিকারের সন্ধানে গিয়েছিল সে। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি।

২৭ জুন গভীর রাত্রে আবার বেরিয়ে পড়ল সে। দর্জিকে বলে গেল যাচ্ছে হাসপাতালে।

অত রাত্রে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে লোক চলাচল বিরল। দুপাশের বাড়ীগুলোতে আলো নিভে যাচ্ছে। শুয়ে পড়ছে সবাই। চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে এল কালিপদ, শচীন চাটার্জীর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল! কেউ নেই। দোতলা; নীচের তলা সব ঘরের আলো নিভে গেছে। শুয়ে পড়েছে সবাই। সীমানা প্রাচীর বেশী উঁচু নয়, অনায়াসে টপকে নামল সে ফুল বাগানের মধ্যে। রাস্তার আলো তেমন জোরালো নয়। বাগানে ঝোপঝাপের আড়ালে চাপ চাপ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে রইল সে। আরও গভীর হোক ওর ঘুম।

কামাখ্যা সেনের শয়ন কক্ষে দুটি জানালা। আগের রাতেই দেখে গেছে কালিপদ একটিতে শিক আছে, আরেকটিতে নেই। জুন মাস। পুরোপুরি গ্রীষ্মকাল। প্যাচপেচে গরম। সাংঘাতিক মশা। দুটো জানালাই খুলে রাখে কামাখ্যা আর মশারী টাঙ্গায়।

রাত যখন প্রায় সাড়ে তিনটে, বন বিড়ালের মত বেরিয়ে এল কালিপদ ঝোপের আড়াল থেকে, নিঃশব্দে প্রবেশ করল কামাখ্যার শয়ন কক্ষে শিকহীন জানালা দিয়ে, সন্তর্পণে এগিয়ে গেল খাটের পাশে, ধীরে ধীরে মশারীটা তুলে ধরল বাঁ হাতে, রাস্তার আলোর আভায় দেখা গেল, হ্যাঁ, কামাখ্যা সেনই বটে, সেই নরপিশাচ, মা বোনের লাঞ্ছনাকারী সেই নরকের কীট, কেমন নিশ্চিন্তে চিৎ হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, জানে না পামর যে, ওর শিয়রে শমন এসে গেছে!

খুব ঠাণ্ডা মাথায় কালিপদ ওর বুকে রিভলভার চেপে ধরে দুবার ট্রিগার টানল, শরীরটা অকস্মাৎ পায়ে ভর দিয়ে বেঁকিয়ে উঠতেই সে আবার গুলী করল ওর পেটে, তারপর মুখে। চারটে বুলেটে একেবার ঝাঁঝরা হয়ে গেল কামাখ্যা সেন, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, ভেসে গেল বিছানা, মাখামাখি হয়ে গেল কালিপদর জামা কাপড়।

চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ল কামাখ্যা সেন।

পর পর গুলীর শব্দে দোতলার ওরা জেগে গেছে ততক্ষণে, পায়ের শব্দ, কথার আওয়াজ কানে আসছে, নেমে আসছে ওরা।

ঠাণ্ডা মাথায় অথচ দ্রুতপদে বেরিয়ে এল কালিপদ। প্রাচীর টপকে রাস্তায়। তারপর দ্রুত পায়ে পাটুয়াটুলীর পথে। তখন চারটে বাজে। ভোর হয়ে আসছে।

দর্জির দোকানে কেউ ওঠেনি তখন। কালিপদ রক্তমাখা জামা ধুতি খুলে ফেলল, ভিজিয়ে রাখল এক বালতি জলে, পরে কেচে দিলেই হবে, তারপর স্নান করল ভাল করে, তারপর আর কাউকে না জাগিয়েই সোজা বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখল ওরা উঠেছে। দর্জিকে বলল, হাসপাতালে ছিলাম। আবার সেই অপারেশন হল। এই ত আসছি সেখান থেকে। এবার একটু বিশ্রাম করব ভাই, ঘুমোব। তুমি যদি একটা কাজ করে দাও, ভাল হয়। এই টেলিগ্রামখানা কাউকে দিয়ে যখনই হোক, বড় পোস্টাফিসে পাঠিয়ে দিও। খুব জরুরী। এই টাকা নাও।

কালিপদ তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে গেল যখন পুলিশ তখন তাকে ঘিরে ফেলেছে।

বালতির জলে ভিজিয়ে রাখা জামা কাপড়ের সন্ধান ততক্ষণে পেয়ে গেছে ওরা। রক্তের দাগ ওতে পাওয়া না গেলেও জলগুলো কেমন লালচে হয়ে গেছে। কিন্তু রিভলভার? কোথায় লুকিয়ে রেখেছ সেটা? গর্জে উঠল পুলিশ, শীগগির বার করে দাও।

কালিপদ চুপটি করে রইল। একবার তাকাল দারোগার মুখের দিকে। হাসির বিদ্যুৎ ওর মুখে চমকে উঠল নাকি? কানেই তুলল না ওদের ধমক। ওরা হুমকি দিল, মারের ভয় দেখাল, কিন্তু কালিপদ মুখ খুলল না। তাই পুলিশ ওকে নিয়ে গেল আই বি অফিসে।

আই বি অফিসে যাবার পরই কিন্তু কালিপদর ভিন্ন মূর্তি। বেশ হালকা-ভাবেই বলে উঠল, বলুন এবার, কি কি জানতে চান।

শুরু হল আই বি পুলিশের প্রশ্ন আর কালিপদর উত্তর।

প্রশ্ন ঃ স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার কামাখ্যা প্রসাদ সেনকে তুমি মেরেছ?

উত্তর ঃ বলুন মার্ডার করেছি কি না। মার্ডার করেছি বলার চাইতে বলা উচিত, নৃশংস অপরাধীকে যোগ্য শাস্তি দিয়েছি। আমি কামাখ্যার যম।

প্রশ্ন ঃ কি অপরাধ করেছিলেন উনি?

উত্তর ঃ কেন, জানেন না আপনারা? কাগজ পড়েন না? কালিপদর চোখে অগ্নিকণা চক চক করে উঠল, আইন অমান্য আন্দোলন দমন করবার অছিলাতে ইংরেজের পদলেহী কুকুরের মত এই কামাখ্যা সেন কিভাবে নিরীহ মানুষের ওপর লাঠি চালিয়েছে, গুলী চালিয়েছে, সে সব খবর পাননি আপনারা? আমাদের মা বোনের ওপর যে হাত তোলে, সেই নরাধমকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেবার কাজকে আমি দেশ সেবা বলে মনে করি। সে কাজ করতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি।

বিস্মিত হল আই বি অফিসাররা। এমনি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি? ফলাফল সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই নাকি ওর? ফাঁসী যে অবধারিত, তা কি ও বুঝতে পারছে না? না কি মাথায় একটু ছিট আছে? যাই হোকগে, আবার প্রশ্ন সুরু করল।

কি করে জানলে মিস্টার সেন ঢাকাতে এসেছেন? উঠেছেন মিস্টার চাটার্জীর বাড়ীতে? কি করে জানলে উনি নীচের তলায় শুয়েছেন?

সমস্ত খবর আমি নিজেই সংগ্রহ করেছি। কোঁচার খুটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে কালিপদ বলতে লাগল, আপনারা যেভাবে কারুর উপর নজর রাখেন, ফলো করেন, সেইভাবে আমি ওর ওপর নজর রেখেছি, ওকে ফলো করেছি। দেখেছি ও ঢাকাতে এল, উঠল এস ডি-ওর বাড়িতে, নীচের তলায় ওর শোবার ঘর, জানালা খোলা রেখেই ঘুমোয় আর একটা জানালার শিক নেই।

কি করে ঐ ঘরে গেলে?

রাত প্রায় বারোটার সময় ফুল বাগানের দেয়াল টপকে ভেতরে গেলাম, তখনই কিছু করলাম না, লুকিয়ে রইলাম ঝোপের আড়ালে, গরমের চোটে প্রথম রাত্রে হয়তো ওর ঘুম আসবে না, শেষ রাতের জন্য তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু থেমে সে আবার বলতে লাগল, রাত তিনটের পর এগিয়ে গেলাম, শিকহীন জানালার ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। নাক ডাকার শব্দেই বুঝতে পারছিলাম রাস্কেলটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মশারীর বাইরে থেকেই গুলী করতে পারতাম, কিন্তু যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, ঠিকমত না লাগে, ব্যাটা আবার বেঁচে ওঠে, তাই নিশ্চিন্ত হবার জন্য আস্তে আস্তে মশারীটা তুলে রাস্তার আলোতে ভাল করে দেখে অটোমেটিক পিস্তলটা ওর বুকে চেপে ধরে—

কে তোমায় পিস্তলটা দিয়েছিল?

মৃদুভাবে হাসল কালিপদ, মাফ করবেন। আমি পাগল নই, আমার মাথা বেশ ঠাণ্ডা আছে। ঠাণ্ডা মাথায় কামাখ্যাকে খতম করেছি, যা বলব বলে স্থির করেছি, বলছি, তার চাইতে বেশী জানতে চাইলে জবাব পাবেন না। পিস্তল আর বুলেট আমায় একজন দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার নাম-ঠিকানা জানতে চাইবেন না, আমি বলব না।

বেশ, তার নাম নাই-বা বললে, কিন্তু পিস্তলটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

হো হো করে হেসে উঠল কালিপদ, তাও জানতে হবে? না পিস্তলটা আপনাদের চাই? তারপরই গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, কামাখ্যার মত নরাধমকে হত্যা করা হয়েছে যে অস্ত্র দিয়ে, আমি তো মনে করি ঐ অস্ত্রটাই গেছে অপবিত্র হয়ে, বিপ্লবীরা ওটা আর ব্যবহার করবে না। তাই ওটা লাল কুঠির ঘাটের কাছে বুড়ীগঙ্গায় ফেলে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, ডুবুরী নিয়ে চলুন, জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এখনও পাওয়া যেতে পারে।

আই বি অফিসাররা আর প্রশ্ন করবে কি, অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল এই

অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ভয়ডরহীন যুবকটির প্রতি। নরহত্যার অনেক আসামী দেখেছে ওরা। রক্তমাখা ছোরাসহ ধরা পড়লেও বলে, কিছুই জানে না সে। এমন একটি আসামীর কথাও মনে পড়ে না, থানায় এসেই যে বলেছিল, আমি খুন করেছি, আমি ডাকাতি করেছি। স্বীকারোক্তি কেউ স্বেচ্ছায় করে কি? স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে হয় কৌশলে বা হান্টারের ডগায়। অথচ এই যুবকটি কেমন হালকাভাবে চায়ের টেবিলে বসে পাখী শিকারের গল্প বলার মত অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছে নিজের হাতে খুন করার কাহিনী। হেসেও উঠছে মাঝে মাঝে। অফিসারদের আরও একবার অভিজ্ঞতা লাভ হল যে, বিপ্লবীদের চরিত্র ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়া, সাধারণ মানুষের মাপকাঠি দিয়ে তা মাপা যায় না। মৃত্যুকেই যারা পরোয়া করে না, তাদের কাছে যেমন সর্বপ্রকার কৌশল বিফল, তেমনি ব্যর্থ তোষামোদ, প্ররোচনা, হুমকি ও নির্যাতন। নিজে থেকে যা বলবে, তার চাইতে একটি কথাও বেশী আদায় করা যাবে না।

তথাপি ধূর্ত একজন অফিসার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কালিপদ, কেন তুমি নিজের ইচ্ছায় এই স্বীকারোক্তি করছ? কি তোমার উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য? বলদৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল কালিপদ, উদ্দেশ্য—যাতে আপনারা এই মার্ডারকে কেন্দ্র করে কতকগুলো নির্দোষ লোককে টানাটানি না করেন। আর একটি উদ্দেশ্য, কামাখ্যা সেনের মৃত্যুর ফলে শিক্ষালাভ করুক ইংরেজের পদলেহী কুকুর অফিসারের দল যে, বিপ্লবীদের হাতে অত্যাচারীদের নিস্তার নেই।

১৯৩২ সালের ১ নভেম্বর ঢাকার একজন স্পেশ্যাল জজের আদালতে মামলা শুরু হল স্টেট ভার্সাস কালিপদ মুখোপাধ্যায়।

পুলিশ তাকে নিয়ে গিয়েছিল লাল কুঠির ঘাটে। জলের নীচে পাওয়া গেছে সেই অটোমেটিক পিস্তলটি। এই মামলায় ওটা একজিবিট। আরও একজিবিট কামাখ্যা সেনের বিছানায় পাওয়া চারটি বুলেটের খোল এবং বাইরে বাগানের ড্রেনে পাওয়া আরও একটি। আরও একজিবিট দর্জির দোকানে বালতির জলে ভেজানো কালিপদর রক্তমাখা জামা ও কাপড়। আর একটি একজিবিট কালিপদর স্বহস্তে লেখা সেই টেলিগ্রামখানা, যার সূত্রে ধরে ওর সন্ধান পাওয়া যায়। আরও অনেক একজিবিট উপস্থাপিত করল পুলিশ।

৪ নভেম্বর কালিপদর বিরুদ্ধে হত্যাপরাধে চার্জসীট গঠন করা হল।

অনেকখানি পরিশ্রম বেঁচে গেল জজ সাহেবের একজিবিটগুলি দেখে আর পাবলিক প্রসিকিউটরের সদম্ভ ঘোষণা শুনে যে, আসামী স্বীকার করেছে যে সে অপরাধী—

তৎক্ষণাৎ বাধা দিল কালিপদ, I am guilty if it is objectionable to love one's Motherland—মাতৃভূমিকে ভালোবাসা যদি অপরাধ হয়, তাহলে স্বীকার করছি আমি অপরাধী।

জজ সাহেব তবু স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কামাখ্যা প্রসাদ সেনকে হত্যা করেছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কালিপদ দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, আপনার টেবিলের উপর যে পিস্তলটি রয়েছে, ঐ পিস্তল দিয়ে।

৮ নভেম্বর রায় দিলেন জজ সাহেব, প্রাণদণ্ড, to be hanged till death।

৯ ডিসেম্বর হাইকোর্ট সেই চরম দণ্ডাদেশ অনুমোদন করলেন।

ফাঁসির হুকুমের পরও বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না কালিপদর। আগের মতই সে নিস্পৃহ, বরং আরও হাসিখুশি বলা যায়। নিয়মিত স্নান, নিয়মিত আহার, নিয়মিত নিদ্রা, সুযোগ পেলেই জেলের সিপাই ও কর্মিদের সঙ্গে হাসি-পরিহাস। যেন কিছুই হয়নি। সব যেমন ছিল, তেমনই আছে। আগের মত সে যেন ইছাপুরা গ্রামের স্বাধীন অধিবাসী, হেসে খেলে ঘুরে বেড়াতে ঢাকা সহরে এসেছে, আতিথ্য গ্রহণ করেছে জেল সুপারের।

সুপারিনটেনডেণ্ট লিওনার্ড একদিন রাউণ্ডে এসে জিজ্ঞেস করল সে কিছু খেতে চায় কি না।

হ্যাঁ, চাই। কালিপদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

কি খাবে ?

বিড়ি।

বিড়ি!

হ্যাঁ, বিড়ি। কালিপদ বলল, অনেক দিন বিড়ি খাই না।

লিওনার্ড তৎক্ষণাৎ সিগারেট কেস বার করল, একটা সিগারেট অফার করতেই কালিপদ বলে উঠল, সিগারেট ? বিলিতি ? বিলিতি জিনিস খাই না আমি, তাই ত বিড়ি চেয়েছি।

লিওনার্ড কেসটা বন্ধ করে চাইল জেলার সুধীন মুখাজীর পানে, মুখাজী বলল যে, সে ধূমপান করে না, তবে বিড়ির ব্যবস্থা করে দেবে।

সদলবলে সুপারিনটেনডেণ্ট বেরিয়ে যেতেই পেছন থেকে সহসা একটি সিপাই ছুটে এল কালিপদর কাছে, ঝটিতি ওর মুখে একটা বিড়ি গুঁজে অগ্নি সংযোগ করে দিয়ে আবার ছুটে চলে সুপারের দলে।

১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল কালিপদকে।

জেলার বলল, রেডি হয়ে নাও—

আমি সব সময় রেডি।

নতুন জাঙ্গিয়া আর কুর্তা পরল সে, কোমর বেরিয়ে বাঁধল গামছা, মাথায় পড়ল কয়েদীদের টুপী। তারপর চশমাটা চোখে দিতে যেতেই জেলার বলল, ওটা

আর কেন কালিপদ, ওটা বরং আমায় দিয়ে দাও। তোমার স্ত্রী বা আত্মীয়স্বজন কেউ এলে ওটা—

মাপ করবেন, বাধা দিল কালিপদ, আমার চশমা আপনাকে দোব কেন? কাউকে দোব না। আমার চোখেই থাকবে। আর কেউ আসবে না আমার বাড়ি থেকে। বারণ করে দিয়েছি।

চশমা চোখে রেখেই সে উঠেছিল ঢাকা সেনট্রাল জেলের ফাঁসীর মঞ্চে।

আর সত্যিই তার বাড়ী থেকে কেউ আসেনি। না সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী, না কোন আত্মীয় পরিজন।

শবদেহ সৎকারের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল ব্রাহ্মণ সভার হাতে।

ওয়াটসনের ওপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ

ওয়াটসনকে হত্যা করা যায়নি। এ্যালফ্রেড ওয়াটসন। স্টেটসম্যান পত্রিকার তখনকার সম্পাদক। দিনের পর দিন তার পত্রিকায় যে বিপ্লবীদের গালিগালাজ করত, জাতীয় আন্দোলনকে ধিক্কার দিত। মহিলাদের সম্বন্ধে যে কুৎসিত মন্তব্য করেছিল, 'Women who come out on the street cannot expect better treatment than street girls.' যে নারীজাতিকে বিপ্লবীরা মনে করে দেশমাতার প্রতীক, সেই নারীজাতির এমনি অবমাননা? আগুন জ্বলে উঠল বিপ্লবীদের হৃদয়ে। সুনীল চ্যাটার্জী এগিয়ে এল, যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

১৯৩২ সালের ৫ আগস্ট স্টেটসম্যান পত্রিকার গেটের পাশে ওৎ পেতে অপেক্ষায় ছিল অতুল সেন, একটু দূরে ট্যাকসি নিয়ে সুনীল চ্যাটার্জী। কাজ শেষ করে ফিরে আসবে অতুল, তারপর ট্যাকসিতে উধাও হয়ে যাবে দুজন।

বাইরে লাঞ্চ সেরে এসে ওয়াটসন যখন অফিস প্রাঙ্গণে ঢুকছে, দ্বারোয়ান গেট খুলছে মোটর এগোচ্ছে ধীরে ধীরে, ঠিক সেই সময় ছুটে গেল অতুল, জানালায় হাত বাড়িয়ে গুলী করল। কিন্তু গুলীটা ওয়াটসনের কপালটা ছড়ে দিয়ে গেল। ছুটে এল দারোয়ান, ছুটে এল রাস্তায় প্রহরারত পুলিশ, ছুটে এল লোকজন। কিন্তু ধরা পড়বার আগেই পটাসিয়াম সায়নাইডের প্যাকেট মুখে পুরে দিয়েছে অতুল।

অর্থাৎ অতুলকে হারাতে হয়েছে অথচ ওয়াটসন এখনও বেঁচে রয়েছে।

খালি ট্যাকসি নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল সুনীলকে, তাই ব্যর্থতার জ্বালা তার বুকেই বেশী করে বিঁধছে। কি করা যায়? কিভাবে খতম করা যায় নরাধমকে।

দুধর্ষ বিপ্লবী নেতা সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এদের গুরু, দাদা। দাদার নির্দেশ, কখনও ধরা দেবে না। হাতে থাকবে মারণাস্ত্র রিভলভার আর পকেটে থাকবে মরণাস্ত্র বিষের প্যাকেট! কাজ হাঁসিল করবার পর অবশ্য সরে পড়বার চেষ্টা করবে, প্রয়োজনবোধে চালাবে মারণাস্ত্র, এক-একটি ছেলে আবার এক-একটি হাড়, একটিও হাড় ফাঁসীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়ে হারাতে চাই না। কিন্তু যদি সরে পড়বার পথ না পাওয়া যায়, কোনো উপায় না থাকে, তাহলে বার করবে সেই মরণাস্ত্র, হারিকিরি করবার মত মুখে ফেলে দেবে সেই অমোঘ প্যাকেটটি। প্রমাণিত হবে তার ফলে যে, বিপ্লবীরা ফাঁসীর রজ্জুকে যেমন থোড়াই কেয়ার করে, তেমনি স্বাধীনতার বেদীমূলে স্বেচ্ছামৃত্যুকে মনে করে শ্রেষ্ঠতরো আত্ম-বলিদান! প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জনের সংকল্প নিয়ে যখন বিপ্লবী দলে যোগদান করেছি, কেন তখন ইংরেজ সরকারকে সুযোগ দোব আমার ওপর আই বি

লেলিয়ে দেবার, আমায় জেলে পচিয়ে মারার, ন্যায়বিচারের নামে প্রহসন করার এবং অবশেষে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে মোসাহেব ও জো-হুকুমদের কাছে বাহোবা নেবার ?

অতুল সাতদার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চিরবিদায় নিয়েছে।

কিন্তু পামর ওয়াটসন এখনও জীবিত।

সুনীল নিজের হাত কামড়াতে লাগল।

তথ্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করল সে। আবার সংগঠনে নামল।

প্রথম আক্রমণের পর ওয়াটসনের দাম বেড়ে গেছে ইংরেজ সরকারের কাছে, ওর জীবন অতীব মূল্যবান মনে করে তারা। ওকে জিইয়ে না রাখলে কংগ্রেসী আন্দোলন অথবা বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডকে এমনি অসভ্য ভাষায় কে ধিক্কার দিয়ে সরকারী অত্যাচারের স্ব্যর্থহীন গুণগান করবে ? তাই স্টেটসম্যান অফিসের সামনে এখন আর শুধু দারোয়ান নয়, গার্ড দেয় একজন রিভলভারধারী লালমুখো সার্জেন্ট।

সুতরাং ওখানে আর কিছু করা যাবে না।

চৌরঙ্গী রোড ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থলে ক্যালকাটা ক্লাব। ওয়াটসন থাকে সেই ক্লাবে। দিনের শেষে অফিস থেকে বেরিয়ে সে যখন ক্লাবে ফিরে যায়, তখন তার গাড়ীর কিছু আগে চলতে থাকে সেই সশস্ত্র সার্জেন্টের মোটর সাইকেল। সে ওকে ক্লাবে পেঁছে দিয়ে আসে। ক্লাবের প্রাঙ্গণেও রাতে থাকে সশস্ত্র পাহারা।

ওয়াটসনের মোটর চৌরঙ্গির সোজা পথে কিন্তু যায় না। আকটারলোনী রোড দিয়ে সোজা চলে যায় পশ্চিমে, তারপর ইডেন গার্ডেন রোড অতিক্রম করে স্ট্যাণ্ড রোড, তারপর দক্ষিণে ঘোরে, ন্যাপিয়ার রোড, ক্লাইভ রো পার হয়ে এসে পড়ে লোয়ার সার্কুলার রোডে, লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে পূব দিকে এসে ডান হাতে ক্যালকাটা ক্লাবের গেট দিয়ে ঢোকে।

১৯৩০ সাল থেকে মাত্র দু বছরে অনেকগুলি বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে। নিহত হয়েছে পুলিশের আই জি লোম্যান, কারাসমূহের আই জি সিম্পসন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি, ডগলাস, স্টিভেনস, দায়রা জজ গার্লিক, স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেন, এ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার এলিসন এবং কজন কুখ্যাত সরকারী অফিসার ও পুলিশের গুপ্তচর। আক্রমণ চালানো হয়েছে পুলিশ সুপার হডসন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো, এ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার গ্র্যাসবি, ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স, বাংলার গভর্নর জ্যাকসন, পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ও আরও কজনের ওপর। মরিয়া হয়ে তাই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে একা শুধু স্টেটসম্যান সম্পাদক ওয়াটসন নয়, বাংলায় বসবাসকারী প্রধানতঃ ইয়োরোপীয়দের দ্বারা গঠিত 'রয়ালিস্ট'

নামীয় দলও রীতিমত ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করল ভিলিয়ার্সের ওপর আক্রমণের পরদিনই। ইস্তাহারখানি এমনি ঃ

Congress
TERRORISM
must be
CRUSHED
—BENGAL OUTRAGES—
MURDERED !!
Lowman
Simpson
Peddie
Mukherjee
Garlick
Asanulla
... ...
WOUNDED
Hodson
Nelson
Cassels
... ...
Down Sent home for
SAFETY
... ...
Yesterday...Durno
This morning...Villers
WE WANT ACTION
ROYALISTS

Printed for the Royalists by W. H. Armour, Ganges Printing Co. Ltd., Sibpur, Howrah.

সুনীল মনে মনে স্থির করল, অফিস সেরে ক্যালকাটা ক্লাবে যাবার পথেই ওয়াটসনকে খতম করতে হবে।

হাজরা রোড ও রসা রোডের সংযোগস্থলের কাছেই তিনতলা একটি মেস বাড়ী। বর্তমান নাম, এলিট হোটেল। এই মেসের তিন তলায় সুনীল চ্যাটার্জী একটি ঘর ভাড়া করে রেখেছে। কখনও কখনও সে ওখানে রাত কাটিয়ে যায়, হয়ত খায়ও মেসে। যখন থাকে না, তখন তালাবন্ধ থাকে সেই ঘর। আসলে, ওটা বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত আড্ডা। প্রয়োজনে সুনীল ও তার

বন্ধুরা আসে, তালা খোলা হয়, প্রয়োজনের শেষে আবার তালাবন্ধ পড়ে থাকে। বাড়ীওয়ালা নিয়মিত ভাড়া পায়।

সেই গুপ্ত আড্ডায় বিপ্লবীদের বৈঠক বসল। একবার নয়, একাধিক বার। বৈঠকের নেতা সুনীল চ্যাটার্জী। বৈঠক বসল বিজয় মোদকের বোসপাড়া লেনের বাড়ীতেও। এই সব বৈঠকে যোগদান করল মন্মথ (ওরফে কোকো) ঘোষ, জিতেন ঘোষ, সৌরেন দত্ত, অমূল্য দাশগুপ্ত, আশুতোষ লাহিড়ী, শচীন করগুপ্ত, দীনেশ মজুমদার আর সুনীল। মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত শচীন এবং টেগার্টের ওপর আক্রমণের মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত দীনেশ সুনীল দাশগুপ্তসহ মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল থেকে ১৯৩২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী পালিয়ে তখন ফেরারী।

আশুতোষ লাহিড়ীর প্রস্তাব সবাই সমর্থন করল, ওয়াটসন একবার বেঁচে গিয়ে থাকলেও নিস্তার নেই, ওকে শেষ করতে হবে। শেষ করতে হবে অফিসের শেষে ক্যালকাটা ক্লাবে ফিরে যাবার পথে। ঠিক কোন জায়গায়, তা স্থির করবে সুনীল চাটার্জী। সুনীল এই অভিযানের নায়ক। ওর সঙ্গে থাকে রিভলভারধারী সার্জেণ্ট, তাই এবার কাজে নামবে একা কেউ নয়, চারজন—ফণী লাহিড়ী, অনিল ভাদুড়ী, বীরেন রায় আর সুনীল চাটার্জী স্বয়ং! এবার ধাবমান মোটরকে মোটরে আক্রমণ চালানো হবে, দলের ছেলে ফণী বাড়ুই মোটর চালাতে জানে, তার রীতিমত ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, সে চালাবে মোটর। কিন্তু মোটর কোথায় পাওয়া যাবে? সবাই বলল, কিনে ফেলা হোক। টাকা?

টাকা দেবার জন্য এগিয়ে এলেন অসীমকৃষ্ণ দত্ত, অবিনাশ মজুমদার, আশুতোষ লাহিড়ী এবং আরও কজন শুভানুধ্যায়ী—বললেন, তোমাদের অভিযান সফল হোক।

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চার সিলিণ্ডারের হুডওয়ালা একখানা শেভ্রোলেট টুরার মোটর ছাব্বিশ শো টাকায় কেনা হল পার্ক সার্কাসের এক পাঞ্জাবীর কাছ থেকে শচীন মুখার্জীর নামে।

তাছাড়া সুনীলের প্রিয় বিশ্বাসী ট্যাকসি ড্রাইভার প্রেম সিং তার ট্যাকসি নিয়ে ত সর্বক্ষণ রেডি আছেই। ডাকলেই এগিয়ে আসবে। অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ এই প্রেম সিং। 'পথের দাবী' গ্রন্থের হীরা সিং-এর মত। সবই বুঝতে পারছে সে, বুঝতে পারছে এক দল তরুণ বিপ্লবের পথে দেশ স্বাধীন করবার ব্রত নিয়ে আসরে নেমেছে, এদের মধ্যে কজন ফেরারী, কজন জেল পলাতক, বিপ্লবের কাজেই এদের ট্যাকসিতে যাতায়াত, বিপ্লবের কর্মসূচী অনুযায়ী এরা ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করে, হত্যা করতে যায় ইয়োরোপীয় অফিসার ও তাদের ভারতীয় মোসাহেবদের, কতবার তারই ট্যাকসিতে এরা অভিযান পরিচালনা করেছে, সবই বুঝতে পারছে প্রেম সিং, কিন্তু আশ্চর্য সত্য, কোনো দিন কোনো প্রশ্নই করেনি সে সুনীলকে। ওয়াটসনের ওপর ১৯৩২ সালের ৫ আগস্ট

প্রথম আক্রমণ চালাবার সময় সুনীল ওরই ট্যাকসি নিয়ে গিয়েছিল, ট্যাকসি দাঁড় করিয়েছিল স্টেটসম্যান অফিস গেটের অনতিদূরে, কাজের শেষে অতুল ছুটে এসে ট্যাকসিতে যাতে উঠতে পারে, মুহূর্তে ট্যাকসি যাতে বায়ুবেগে পালিয়ে যেতে পারে, তাই ট্যাকসির দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল সুনীল, ইঞ্জিন স্টার্ট করা ছিল, স্টীয়ারিং ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল প্রেম সিং। ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই আলীপুরের দায়রা জজ গার্লিককে খতম করবার জন্য কানাই ভট্টাচার্য যখন দোতলায় উঠে গেল, নীচের গাড়ী বারান্দায় ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে স্টীয়ারিং ধরে অপেক্ষা করছিল এই প্রেম সিং, পাশে দাঁড়িয়ে সুনীল।

সবই বুঝতে পারছে প্রেম সিং, দেখতে পাচ্ছে অনেক কিছুই, কিন্তু নির্বাক। দলের লোক ত সে নয়ই, কোনো 'স্বদেশী কথাই' সুনীল কোনোদিন ওকে বলেনি, অথচ তুলনাহীন তার নিষ্ঠা; দুর্জয় তার সাহস, অপূর্ব তার দক্ষতা। কি চোখেই দেখেছে সে সুনীলকে, তার কথায় বুঝি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয় সে।

হীরা সিং যেমন ভালবাসত সব্যসাচীকে, প্রেম সিংও তেমনি সুনীলের একনিষ্ঠ ভক্ত।

ধরা পড়ে গেলে কি হত প্রেম সিং-এর ?

না, সে কথা কখনও ভাবেনি সে কিম্বা আমলই দেয়নি সে ভাবনাকে।

এমনি নীরব নিবেদিত প্রাণ প্রেম সিং-দের ইতিহাস লেখা নেই কোনখানে।

২৬ সেপ্টেম্বর এবং পরদিন সুনীল প্রেম সিং-এর ট্যাকসিতে ওয়াটসনের মোটরকে অনুসরণ করল। ক্লাইভ রো-র একটি বাঁক ঘুরতে গিয়ে নিশ্চয়ই ওর গাড়ীর গতিবেগ কমাতে হবে, কিন্তু ততক্ষণে সার্জেন্টের মোটর সাইকেল সহজেই বাঁক ঘুরে একটু বেশী এগিয়ে পড়বে, ওয়াটসনের গাড়ী থেকে দেখা যাবে না, বাঁকের মোড়ে একটা লাইট পোস্ট, তার পাশেই ছোট্ট খাদ আর একপাশে অর্ডন্যান্স ক্লাবের গেট—সুনীল সেই স্থানটিই আক্রমণের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করল। সেইভাবে জানিয়ে দিল বন্ধুদের।

২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটায় ওয়াটসন অফিস ত্যাগ করল। পেছনের সিটে ওয়াটসন আর তার সেক্রেটারী বিপুলকায়া মহিলা মিসেস গ্রসম্যান।

স্টেটসম্যান অফিস গেটের সামান্য উত্তরে হুড খুলে সেই শেভ্রোলেট টুরারে ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল বীরেন রায়, তার সঙ্গে পিস্তল, মণি লাহিড়ী আর অনিল ভাদুড়ী, ওদের দুজনের সঙ্গে রিভলভার। ফণী বাড়ুই ষ্টীয়ারিং-এ। সবার পকেটেই আছে সোডিয়াম সায়নাইডের বিষের প্যাকেট।

টুরার সামান্য পেছনে থেকে ওয়াটসনের সিডান বডি মোটরকে অনুসরণ করল। এখন যেখানে মেট্রো সিনেমা, সেইখানেই ছিল স্টেটসম্যান পত্রিকার অফিস।

ছটা পঁচিশ মিনিটের সময় প্রেম সিং-এর ট্যাকসিতে সুনীল এসে সেই

নির্বাচিত স্থানে অবতরণ করল। তার সঙ্গেও রিভলভার আর বিষের প্যাকেট। প্রেম সিং বিদায় নিল।

ওদিক থেকে গট গট করে এগিয়ে আসছে যেন কোন ভি আই পি-র কনভয়। সম্মুখে চতুর্দিকের সবাইকে হুশিয়ার করে দিয়ে মোটর সাইকেলে ছুটে চলেছে সশস্ত্র সার্জেণ্ট, তার কিছুটা পেছনে ভি আই পি এ্যালফ্রেড ওয়াটসনের ঢাকা গাড়ী আর তার পেছনে যেন দেহরক্ষিদের হুড-খোলা টুরার, রিভলভার নিয়ে রেডি হয়ে আছে তিন জন।

সুনীল যেন সেই ভি আই পি-কে স্বাগত জানাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

ঐ ত এসে পড়ল সেই সার্জেণ্টের মোটর সাইকেল, মোটর সাইকেল বেরিয়ে গেল। তারপর যেই ওয়াটসনের গাড়ী বাঁক ঘুরবে, অমনি পেছনের টুরার বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এসে ডান দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে সহসা বাঁ দিকে ঘুরে মোটরের সঙ্গে সামান্য ধাক্কা খেল, ফলে টুরারের বাঁ দিকের হেড লাইট ভেঙ্গে গেল, দাঁড়িয়ে গেল গাড়ী দুখান।

কালবিলম্ব না করে অনিল টুরার থেকেই গুলী চালাল, গুলী গিয়ে লাগল মোটরের ড্রাইভারের ডান কানে। মণি গুলী চালাল, লাগল ওয়াটসনের ঘাড়ে। ওয়াটসন আর মিসেস গ্রসম্যান দুজনেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

টুরার থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল বীরেন, রিভলভারের হাতলের আঘাতে মোটরের ফ্রণ্ট গ্ল্যাস ভেঙ্গে চালাল গুলী। হয়ত এবার আর নিস্তার থাকত না ওয়াটসনের, কিন্তু গুলী ছুটল না, জ্যাম হয়ে গেছে।

এবার সুনীল লাফিয়ে উঠল টুরারে, এক পা সিটে এবং আরেক পা সাইডে রেখে মোটরের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গ্রসম্যানের পিঠের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়া ওয়াটসনের ওপর ঝুঁকে পড়ে গুলী চালাল তিন তিন বার। লাগল আবার ওয়াটসনের ঘাড়ে। গাড়ীর মধ্যে আলো নেই, টুরারের ডান দিকের হেড লাইটটা শুধু জ্বলছে, বাঁ দিকের লাইট ভেঙ্গে গেছে, রাস্তার আলোরও তেমন জোর নেই—সুনীলরা মনে করল ওয়াটসন সাবাড়। চল, এবার সরে পড়ি।

অর্ডন্যান্স ক্লাবের গেট পাহারা বন্দুকধারী গুর্খাটি মনে করল, ই লোগ ডাকু হ্যায়। বন্দুক তাক করতে লাগল ওদের দিকে।

তৎক্ষণাৎ বীরেন মণির রিভলভার টেনে নিয়ে গুলী চালাল। লাগল না বটে, কিন্তু বীরপুঙ্গব গুর্খা বন্দুক ফেলেই ক্লাবের ঘরের মধ্যে ছুটে পালাল।

কনভয়ের পথ প্রদর্শক সার্জেণ্ট ততক্ষণে টের পেয়েছে ভি আই পি-র মোটরে দেয়ার ইজ সাম ট্রাবল। অন্ধকার গাড়ী ভূতের মত কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে? এতগুলো গুলীর আওয়াজ কেন? পাশেই ঐ একটা হেডলাইট জ্বালানো গাড়ীটা কার?

খানিকটে ফিরে গিয়ে গুলী চালাল সার্জেণ্ট, হেড লাইটটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

হেড লাইট ছাড়াই শুধু সাইড লাইট জ্বালিয়ে বিদ্যুৎবেগে টুরার চালাল ফণী, হুস করে বেরিয়ে গেল খিদিরপুরের দিকে। লাইট নেই, কিন্তু অনুক্ষণ হর্ন বাজাচ্ছে ফণী। সার্জেন্ট অনুসরণ করল রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

খিদিরপুর পোলের ওপর ট্র্যাফিক পুলিশ হাত তুলেছে।

মানল না টুরার। ঝড়ের বেগে ছুটে চলল দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে।

সার্জেন্ট বেশীক্ষণ অনুসরণ করতে পারল না। প্রায়ান্ধকার পথে অন্ধকার টুরার যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কেউ আর ফলো করছে না, বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে টুরার, তাই বর্ধমান মহারাজার বাড়ীর কাছে নেমে পড়ল দলের নেতা সুনীল চ্যাটার্জী। ওদের বলে দিল, তোমরা আরও এগিয়ে যাও, মাজেরহাট পোল পেরিয়ে গাড়ী থামিও, যার যার বাড়ী চলে যেও। আর ফণী, গাড়ীখানা গ্যারেজে রেখে দিও। কালই সারাতে হবে হেড লাইট দুটো।

রাত প্রায় সাতটা। মাজেরহাট রেল স্টেশনের কাছে বুড়ো শিবতলায় একটা গরুকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ীখানা একটা লাইট পোস্টে ধাক্কা মারল।

সুনীল ভেবেছিল নিরাপদে সহকর্মীরা বাড়ী চলে যাবে।

কিন্তু নিয়তি কে ন বাধ্যতে?

ধাক্কা খেয়ে গাড়ীটা থেমে যেতেই লোকে ভাবল কোন এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ছুটে এল তারা।

রেলস্টেশনে পাহারায় ছিল একজন পুলিশ, সেও ছুটে এলো।

ওরা ভাবল ওদের ধরতে আসছে সবাই।

গাড়ী ফেলে রেখে ফণী রায় বাহাদুর রোড ধরে একটা রাইস মিলের রাস্তা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

মণি লাহিড়ী আর অনিল ভাদুড়ী মুখের মধ্যে ফেলে দিল সোডিয়াম সায়নাইডের প্যাকেট। তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়ল ওরা।

বহু লোক জমে গেছে। আরও লোক ছুটে আসছে। আবার একজন পুলিশও রয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তারা এগিয়ে আসতেই বীরেন ভাঁওতা দিল এ্যাকসিডেন্টে পড়েছে এই দুটি ছেলে, এখখুনি ডাক্তার ঢাকা দরকার। আপনারা দয়া করে এদের একটুক্ষণ দেখুন, এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

বলেই সে কাছেই একটা ট্যাকসি দেখে তাতে উঠে পড়ল, বলল, চালিয়ে সর্দারজী।

কোথায় মাজেরহাট আর কোথায় মধ্য কলকাতার মেছুয়াবাজার।

মেছুয়াবাজার এল ট্যাকসি। বীরেন বলল, একটু অপেক্ষা করুন, সর্দারজী, এক্ষুণি ফিরে আসছি।

ট্যাকসি দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ। কিন্তু বীরেন আর ফিরে এল না।

অগত্যা থানায় গেল সর্দারজী। এজাহার করল।

ততক্ষণে পুলিশ জেনে গেছে ওয়াটসনের ওপর বিপ্লবীদের পুনরাক্রমণের কাহিনী। জেনে গেছে মাজেরহাট রেল স্টেশনের কাছে একখানা মোটর গাড়ী পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, দুজন আরোহী মৃত, ড্রাইভার পলাতক আর ট্যাকসি করে চলে গেছে তৃতীয় আরোহী। ফিরে আসেনি।

কোন্ বাড়ীতে ঢুকেছে ছেলেটি পুলিশ দেখতে চাইল, দেখিয়ে দিল ট্যাকসি চালক।

তৎক্ষণাৎ সার্চ করা হল। ঘরে কেউ নেই। পেছনের দরজা ভেজানো। প্রাঙ্গণের ওপারে নাতিউচ্চ প্রাচীর। বোঝা গেল, লোকটা পালিয়ে গেছে।

আই বি অফিসে খবর পাঠাল পুলিশ।

আসলে, ওটা সুনীল চ্যাটার্জী ও তার বিপ্লবী বন্ধুদের আর একটি গোপন আশ্রয়স্থল।

ট্রামার থেকে নেমে সুনীল চলে এল হাজরা রোডের মোড়ে সেই মেসে, যেখানে ওদের গুপ্ত বৈঠকে ওয়াটসনকে হত্যার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। যাক্, ওয়াটসন খতম, কাজ হাসিল। খুশী মনে ঘুমিয়ে পড়ল সুনীল।

পরদিন কাগজের হেডিং দেখে টনক নড়ল। ওয়াটসন শুধু মরেনি নয়, তার আঘাত সামান্য। সে এখন পিজি হাসপাতালে। আরও সংবাদ, মাজেরহাটের কাছে পরিত্যক্ত মোটর, দুজন অপরিচিত যুবকের মৃতদেহ, বোধ হয় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সঙ্গে অন্য পৃষ্ঠায় আর একটা খবর, 'ট্যাকসির ভাড়া না মিটাইয়া জনৈক ব্যক্তি উধাও।'

শক খেল সুনীল। ওয়াটসন তাহলে মরেনি!

সন্দেহ হল ওর। ভাড়া না মিটিয়ে কে পালাল?

তখনই চলল সে মেছুয়াবাজার।

সেই বাড়ীটার দু তিনখানা পরের বাড়ীর রকে বসে চারজন লোক তাস খেলছিল, সুনীল দেখেও দেখল না। ঘরে ঢুকতে যেতেই দেখল দরজা ভেজানো। ভেজানো থাকবার তো কথা নয়, সর্বদাই বন্ধ থাকবে। কেউ না থাকলে—তালা, কেউ থাকলে—খিল বন্ধ থাকে। এমনি কেন?

ভেজানো দরজা ঠেলে যেই সে ঢুকতে যাবে, অমনি সেই চারজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। আই বি পুলিশের হাতে সুনীল ধরা পড়ে গেল।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল সুনীল চট্টোপাধ্যায়। আরও কজনের কারাদণ্ড হল।

ওয়াটসন দ্বিতীয়বারের চেষ্টাতেও মরল না।

কুমিল্লার সেই মেয়ে দুটি

নির্দেশ ছিল, এ্যাকশনের পর ধরা দেবে স্বেচ্ছায় রিভলভার হাতে। এবং হাসিমুখে।

কি এ্যাকশন ?

কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট সি জি বি স্টিভেন্সকে হত্যা। এবং দিনেদুপুরে। এবং তার সরকারী কোয়ার্টার্সে। এ্যাকশনের পর ধরা দিয়ে বলবে, হ্যাঁ, আমরা ওকে মেরেছি। কোন ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়। মেরেছি স্টিভেন্স শয়তান ইংরেজ গভর্ণমেন্টের অত্যাচারী অফিসার বলে। মেরেছি, কারণ আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে, ভারতে ইয়োরোপীয় রাজকর্মচারীদের জীবন নিরাপদ নয়, দেখিয়ে দিতে চাই যে ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলিয়ে বিপ্লবের রক্তরাঙ্গা পথে এগিয়ে যেতে মেয়েরাও জানে। রাজনৈতিক হত্যাকে অপরাধ বলি না আমরা ! আমরা নির্দোষ।

এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল কুমিল্লার সেই মেয়ে দুটি, শান্তি ও সুনীতি। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। যুবতী নয়, কিশোরী নয় প্রায় বালিকাই বলা চলে। শান্তির বয়স পনেরোর কিছু বেশী আর সুনীতির বয়স চোদ্দ বছর ছ মাস। কুমিল্লা শহরে ফৈজুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাশ এইটের ছাত্রী।

এমনি নির্দেশ এর আগে দেখা যায় নি !

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কক্ষে বোমা নিক্ষেপ করে এবং রিভলভার ছুঁড়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে বলেছিলেন বিপ্লবী ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, কারুকে হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ভারতের জনসমুদ্রের আপাতস্থিরতার অন্তরাল থেকে যে এক প্রবল ঝড় আসন্ন হয়ে উঠছে, সেই সমাসন্ন বিপদের প্রতি দৃকপাত না করে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এগিয়ে চলেছে বলেই আমরা বোমা ও রিভলভার নির্ঘোষে তাকে সাবধান করে দিলাম।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে পালিয়ে গিয়েছিল অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগী, দীনেশ মজুমদার পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।

ইন্‌সপেক্টার জেনারেল অব পুলিশ লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট হডসনের ওপর গুলী চালিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বিনয় বসু।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হানা দিয়ে ইন্‌সপেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্স সিম্পসনকে হত্যা করে বিষের প্যাকেট মুখে ঢেলে দিয়েছিল এই বিনয় বসু, সুধীর (বাদল) গুপ্ত আর দীনেশ গুপ্ত। বিনয় ও দীনেশ আত্মহত্যা করবার জন্য গুলীও চালিয়েছিল।

মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে হত্যা করে নির্দেশমত বিমল দাশগুপ্ত ও যতিজীবন ঘোষ পালিয়ে গিয়েছিল।

আলীপুরের দায়রা জজ গার্লিকের হত্যাকারী কানাই ভট্টাচার্যের প্রতিও নির্দেশ ছিল, পালিয়ে আসবার চেষ্টা করবে, না পারলে মুখে ফেলে দেবে পটাসিয়াম সাইওনাইড। কখনও ধরা দেবে না।

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্ণোর ওপর গুলী বর্ষণ করে পালিয়ে গিয়েছিল সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক।

ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করে বিমল দাশগুপ্তেরও ধরা দেবার নির্দেশ ছিল না।

এমন কি চট্টগ্রামেও যে একদল দামাল ছেলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আঘাতে অন্ততঃ কয়েক দিন চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসনযন্ত্র নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, তারপর দিনের পর দিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রক্তরাঙ্গা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তাদের একজনেরও প্রতি নির্দেশ ছিল না স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের।

কিন্তু শান্তি সুনীতির প্রতি ছিল। তাই তাদের সঙ্গে ছিল না কোন বিষের প্যাকেট, ছিল না আত্মহত্যার জন্য অতিরিক্ত বুলেট। রিভলভারের ছয়টি বুলেট স্টিভেন্সকেই উপহার দেবার নির্দেশ ছিল। নির্দেশ ছিল, ধরা দেবার পর যে যতই জেরা করুক না কেন, তোমাদের শুধু একটিই জবাব, হ্যাঁ, আমরা—আমরাই স্টিভেন্সকে খতম করেছি, কিন্তু আমরা নির্দোষ।

শান্তির বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ কুমিল্লা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আদর্শবাদী জনপ্রিয় ব্যক্তি। রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল, তবে তিনি ছিলেন অহিংসায় বিশ্বাসী। মারা যান ১৯২৬ সালে।

সুনীতির বাবা উমাচরণ চৌধুরী ছিলেন পেসকার। সাধারণ সরকারী চাকরিজীবি যেমন, তেমনি। দীর্ঘকাল একঘেয়ে চাকরীর পর শান্তিময় অবসর জীবন যাপন করছিলেন। তবে পুরোপুরি শান্তি নয়, কারণ কন্যা সুনীতি লাঠি ও ছোরা চালনা শিক্ষায় মত্ত হয়ে উঠেছে এই বয়সেই ওর দাদাদের মত। সঙ্গে সঙ্গে শিখেছে সাময়িক ড্রিল ও প্যারেড। শান্তি ঘোষ ওর শুধু সহ-পাঠিনীই নয়, এসব কাজে অতীব উৎসাহী। ওদের ওপরের ক্লাশের মেয়ে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের সঙ্গে ওদের দারুণ হৃদ্যতা। ছুটির দিনে ত প্রফুল্লর বাড়ীতে যাবেই, তা ছাড়া স্কুলের ছুটির পরও কোন কোন দিন অনেকক্ষণ

কাটিয়ে আসে ওদের বাড়ীতে। প্রফুল্লও আসে, যখন তখন ডেকে নিয়ে যায়। রাশভারী উমাচরণ একটা কিছু আঁচ করে আশঙ্কিত হয়ে মাঝে মাঝে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেন, কোথায় যায়, কি করে, কেন যায় ?

সুনীতির মা খানিকটা টের পেয়েছিলেন। কি সব বই দিয়ে যায় প্রফুল্ল, গোপনে পড়ে সুনীতি, কাউকে দেখলেই লুকিয়ে ফেলে, প্রফুল্ল শান্তিকে নিয়ে আসে, তারপর তিনজনে মিলে একান্তে কি সব আলোচনা করে, কেউ কাছে গেলেই হঠাৎ চুপ করে যায়, লাঠি ও ছোরা চালনা শিখছে, কেন শিখছে জিজ্ঞেস করলেই হাসে আর বলে, এমনি, মিলিটারী প্যারেড শিখছে, কি হবে শিখে জিজ্ঞেস করলেই বলে, আমাদের ছাত্রী সংঘের কনফারেন্সে আমি হব মেয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনীর কমাণ্ডার—মা বুঝতে পেরেছিলেন মেয়ে তাঁর 'স্বদেশীর' দিকে ঝুঁকেছে। ঝুঁকলেও লেখাপড়ায় যখন গাফিলতি নেই, নিয়মিত স্কুলে যায়, ভেবেছিলেন মেয়ে তাঁর সাংঘাতিক কিছুতে যাবে না। তাই স্বামীর প্রশ্নের জবাবে বলতেন ও কিছু না। কিন্তু জানতেন না তিনি যে, কুমিল্লার বিপ্লবী দলের অন্যতম নায়ক বীরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রফুল্লনলিনী ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গেছে ওদের।

সে সময় পরাধীনতার বেদনাবোধ অনেক বাবা মায়ের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করেছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্তান এগিয়ে গেলে ক্ষুব্ধ হতেন না তাঁরা। কিন্তু বৈপ্লবিক কোন ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে ছেলে বা মেয়েকে চিরদিনের জন্য অথবা দীর্ঘকালের জন্য হারাতে হলেই সন্তানবৎসল বাবা মায়ের অন্তর দুঃখের দাবদাহে স্বভাবতঃই আর্তনাদ করে উঠত, আকুল হয়ে প্রশ্ন করতেন, এত ছেলে এত মেয়ে থাকতে তুই কেন ?

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম নেতা দীনেশ গুপ্তের মাও ঠিক এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আলীপুরের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর গুণেশ চন্দ্র সেনের বাড়ী থেকে তাঁর রিভলভার চুরি সম্পর্কে ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করেছিল। চোদ্দ দিন পার্ক স্ট্রীট থানার হাজতে রেখে প্রতিদিন লর্ড সিংহ রোডের এস বি অফিসে নিয়ে গিয়ে থার্ড ডিগ্রি পদ্ধতিতে অঙ্গ সংবাহনের ফলে আমি রীতিমত খোঁড়াতে লাগলাম। সেই অবস্থাতেই আমায় পাঠানো হল আলীপুর সেনট্রাল জেলে।

কাষ্টোডি ওয়ারেন্টে লেখা ছিল, changed under section 380 I. P. C.। কি চুরি, তা লেখা ছিল না, লেখা থাকেও না। ফলে, জেলার সোয়ান আমায় সাধারণ বার্গলার মনে করে সিকসটিন সেলস-এ অনেক সেল খালি থাকায় সেখানেই পাঠিয়ে দিল।

ঢুকেই দেখি, দীনেশ গুপ্ত। দুজনেই আমরা "বি ভি" বিপ্লবী দলের

কর্মী, যে দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন মেজর সত্য গুপ্ত। দীনেশের মত আমারও দেশ ঢাকাতে। ওর নাম শুনেছিলাম, কিন্তু সরকারীভাবে পরিচয় ছিল না। না থাকলেও গুরুভাইকে গুরুভাইয়ের চিনতে দেরী হবে কেন ?

তখন স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে ওর মামলা চলছিল। মামলার কথা জিজ্ঞেস করতাম। কোন খোঁজখবর রাখত না। কোর্টে যায়, স্টেটসম্যান পায়, পড়ে বসে বসে, শুনানীর শেষে কোর্ট পুলিশ জেলে দিয়ে আসে।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, মা আসেন না কোর্টে ?

দীনেশ জবাব ছিল, রোজ আসে।

মা কী বলেন ?

হাসল দীনেশ, কি আর বলবেন বল, সব মা-ই যা বলে থাকেন, তাই বলেন। ও কিছু নয়—

না, না, শুনব, বাধা দিয়ে বললাম, বল, মা কি বলেন।

হালকাভাবে ও বলল, বলেন, আরও ত কত ছেলে ছিল, তারা কেউ না গিয়ে এই সাংঘাতিক কাজে তুই কেন গেলি ?

সব বাবা মায়েরই সন্তানবৎসল অন্তর বিমথিত করে এই প্রশ্নটাই বেরিয়ে আসে, এত ছেলে এত মেয়ে থাকতে তুই কেন ?

শান্তি সুনীতির মায়ের মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল।

এর জবাব কি ?

দীনেশের ভাষাতেই এর জবাব আছে, সব বাবা মা-ই যদি ছেলেমেয়েকে বুক দিয়ে আটকে রাখেন, তাহলে বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, তাহলে পরাধীনতায় শৃঙ্খল ভাঙ্গার কাজটা কে করবে ?

বিপ্লবীর বাবা মায়ের চিরন্তন অশ্রুরুদ্ধ প্রশ্ন, এত ছেলে, এত মেয়ে থাকতে তুই কেন ?

বিপ্লবীর চিরন্তন সশ্রদ্ধ নিবেদন, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সেই স্বর্গ থেকে বড় জন্মভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার সংগ্রামে কাউকে না কাউকে এগিয়ে যেতে হবেই। সংগ্রামে জয়লাভ করবই, জয়লাভ করে হাসিমুখে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসবই, এ নিশ্চয়তা কে দিতে পারে ? এগিয়ে যে যাবে, এগিয়েই চলবে সে। হয়ত তার জন্য কোন বিবর ঘাঁটিতে ওৎ পেতে রয়েছে শত্রুপক্ষের মেসিন গান, হয়ত ফাঁসীর গহ্বরের ওপর চোরাবালি ছড়ানো পথেই তার বিপজ্জনক যাত্রা কিংবা হয়ত তার পথের শেষে অজগরের মত মুখব্যাদান করে রয়েছে কারাগারের লৌহকপাট, নইলে হয়ত আত্মবিলোপনের প্রতিজ্ঞা-পত্রে বুকের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করে সংগ্রামে নেমেছে সে। তারও ত বাবা আছে, মা আছে, ভাইবোন আত্মীয় পরিজন সবাই আছে। তাঁদের বুক ভেঙ্গে যাবে বলে আমি যদি না যাই, তাহলে সেই-বা যাবে কেন ? এমনি করে কেউই যদি না যায়, বাবা মায়ের পক্ষপুটচ্ছায়ায় আরামে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দেয়, তাহলে

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি যে রসাতলে তলিয়ে যাবে মদমত্ত ইংরেজের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে।

বিপ্লবিনী শান্তি সুনীতির অন্তরের কথাও তাই।

কিন্তু মুখে তাদের রা'টি নেই।

আরও দশটা মেয়ের মতই সাধারণ হয়ে চলে। সকালে পড়তে বসে, দশটা বাজতেই বই খাতা পেন্সিল নিয়ে স্কুলে যায়, পিরিয়ডে পিরিয়ডে মনযোগ দিয়ে দিদিমণিদের পড়ানো শোনে, পড়া দেয়, টিফিন পিরিয়ডে চানাচুর কিনে খায়, অন্য মেয়েদের সঙ্গে হৈ চৈ দৌড়ঝাঁপ করে, ছুটির পর কিংবা কোন কোন দিন একটু পরে বাড়ী ফেরে, বিকেলে লাঠি বা ছোরা চালনা শেখা, সন্ধ্যায় আবার পড়তে বসা, তারপর আহারান্তে নিদ্রা—একেবারে ছক কাটা সুবোধ বালিকার জীবন।

চোদ্দ বছরে পা দিলেই সে যুগে বাবা মা মেয়েকে সাবালিকা মনে করতেন, বিয়ের কথা ভাবতেন, চেষ্টা শুরু করে দিতেন, যাতে ম্যাট্রিকটা পাশ করলেই দায় থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। ফুটফুটে মেয়ের জন্যে টুকটুকে বর খুঁজতেন। শান্তি সুনীতির অভিভাবকদের এর ব্যতিক্রম ভাববার কারণ নেই।

ওদিকে বাংলা দেশে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান যেন বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে তূর্য নিনাদ! বেরিয়ে পড়েছে বিপ্লবীরা। বেরিয়ে পড়েছে কলকাতায়, ঢাকায়, মেদিনীপুরে, সর্বত্র। প্রাণ হারিয়েছে চট্টগ্রামের অকজিলিয়ারী বাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সের সার্জেণ্ট মেজর ফ্যারেল, পুলিশ ইনসপেক্টর তারিণী মুখার্জী, ইনসপেক্টর আশানুল্লা, অগণিত বৃটিশ সেনা, প্রাণ হারিয়েছে লোম্যান, সিম্পসন, পেডি, গার্লিক।

সুতরাং প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম দাদাদের চেপে ধরল, মেয়েরা কেন পিছিয়ে থাকবে? আমরাও রিভলভার ধরব, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স আমাদের টার্গেট।

টার্গেট আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। স্থির হয়েছিল, এ্যাকশনের শেষে বিপ্লবী ধরা দেবে, দৃঢ় কণ্ঠে বলবে, হ্যাঁ, আমিই হত্যা করেছি, কিন্তু এই হত্যাকে আমি কোন অপরাধ মনে করি না। এটাই হবে কুমিল্লার আগামী এ্যাকশনের বৈশিষ্ট্য। আর যাবে একজন নয়, নিশ্চিত হবার জন্য দুজন।

প্রফুল্ল বলল, আমি দুটি মেয়ে দোব।

কে কে?

শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী।

কুমিল্লার জনসাধারণের কাছে ওরা আর অপরিচিত নয়। ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে শহরে মেয়েদের যে সম্মেলন হয়েছিল, শান্তি ঘোষ ছিল তার সেক্রেটারী আর সুনীতি চৌধুরী ছিল মেয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনীর ক্যাপ্টেন। দাদারা ওদের কাজ লক্ষ্য করেছেন। অপূর্ব! সম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট প্রফুল্লনলিনী তাই প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, ওরা পারবে।

দাদাদেরও তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ছেলেরাও যে উতলা হয়ে উঠেছে। তারাও কাজ চায়।

প্রফুল্ল বলল, সব জায়গায় ছেলেরাই কাজ করে, এবার দেয়া হোক মেয়েদের।

কিন্তু ছেলেরাও যে নাছোড়বান্দা। তারাও যেতে চায়। 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি কাড়াকাড়ি!' সবাই এ্যাকশনের জন্য পাগল, ছেলেরা, মেয়েরা।

সুতরাং স্থির করা হল, টস করা হবে কারা দুজন যাবে, ছেলেরা, না মেয়েরা।

ময়নামতী পাহাড়ের জঙ্গলে গোপন বৈঠক বসল, নেতাদের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন অখিল নন্দী ও নির্মল ভট্টাচার্য। টস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, যাবে দুজন মেয়ে। স্টিভেন্সকে খতম করতে যাবে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। যাবে সকাল দশটায় তার সরকারী কোয়ার্টার্সে। দেখা করবার অজুহাত হিসেবে ওদের সঙ্গে থাকবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবরে লেখা একখানা দরখাস্ত। দরখাস্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হবে, 'আমরা মেয়েদের একটি সন্তরণ ক্লাব গঠন করিতে আগ্রহী, এ ব্যাপারে আমরা আপনার মূল্যবান পৃষ্ঠপোষকতা ও সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনা করি।' শান্তি দরখাস্তখানা দেবে স্টিভেন্সের হাতে, স্টিভেন্স যখন দরখাস্তখানা পড়তে থাকবে, সেই অবসরে রিভলভার বার করে প্রথম গুলী চালাবে সুনীতি, তারপর শান্তি, তারপর দুজনেই, যতক্ষণ না রিভলভার দুটির বারোটি বুলেটই শেষ হয়ে যায়।

তারপর ধরা দেবে শান্তি সুনীতি। এবং হাসিমুখে। বলবে মাত্র একটি কথা, হ্যাঁ, আমরাই হত্যা করেছি, তবে এই হত্যাকে আমরা কোন অপরাধ বলে মনে করি না।

তারিখ নির্দিষ্ট করা হল, ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর।

টসের ফলাফলে শান্তি সুনীতির আনন্দ ধরে না। প্রফুল্লনলিনী নিজেই যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দাদারা রাজী হলেন না। সংগঠন কাজের স্বার্থে তার বাইরে থাকা দরকার।

শান্তি সুনীতিকে নিয়ে যাওয়া হল আবার সেই ময়নামতীর জঙ্গলে। দেখানো হল রিভলভার। কটা চেম্বার কিভাবে নিশানা করতে হয়, ট্রিগার টানতে হয় কিভাবে। বুলেটের খোলগুলো ফেলে দিয়ে আবার বুলেট ভরার পদ্ধতিটাও দেখানো হলেও এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওদের সঙ্গে বেশী বুলেট থাকবে না।

ডিসেম্বর মাস। অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে ফৈজুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়েরও বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল।

গুড গার্লের মত শান্তি সুনীতিও খুব সিরিয়াসলি পড়ছে বাড়ীতে, তারপর এই শীতের মধ্যেই সকাল সকাল স্নান সেরে কালিকলম নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা দিতে। প্রশ্নপত্র নিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করে,

আগামী পরীক্ষায় কি কি প্রশ্ন আসতে পারে, তা নিয়েও গবেষণা চালায়। খুব কড়া ধাতের হেড মিসট্রেস নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান সুহাসিনী বিশ্বাস। চোখ তাঁর দুটো নয়, দশটা, বোধ হয় মাথার পেছনেও চোখ আছে। সেই দশ-দশটি চোখ মেয়েদের পেছনে লেগে আছে। প্রতিটি মেয়ের। ক্লাশে কে কার পাশে বসতে ভালবাসে, টিফিন পিরিয়ডে ওরা কি আলোচনা করে, কে কি খায়, কে কাকে ভাগ দেয়—সব দিকে তাঁর প্রখর নজর। আর একটা অনারারী কাজও করে থাকেন তিনি, কোনো মেয়ের 'স্বদেশী' মতিগতির আঁচ পেলেই মূল্যবান সংবাদটি আই বি পুলিশের গোচরে আনতে বিলম্ব করেন না।

শান্তি সুনীতি এই কালনাগিনীকে ধোকা দেবার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় গুড গার্ল হয়ে চলতে লাগল। ওরা যে ইতিমধ্যেই ওঁর নজরে পড়ে গেছে। মেয়ে সম্মেলনের সেক্রেটারী ছিল শান্তি আর সুনীতি ছিল ভলান্টিয়ারদের ক্যাপ্টেন। ওরা লাঠি ও ছোরা খেলে। সুহাসিনীর তাই ওদের প্রতি ছিল শ্যেন দৃষ্টি। আর প্রফুল্লনলিনী ত একেবারে বখে গেছে! স্বদেশীদের সঙ্গে মিশে জাহান্নামে যাচ্ছে।

এল সেই ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সাল।

সেদিনও স্কুলে পরীক্ষা আছে। পরীক্ষা দেবার জন্য যথারীতি স্নানাহার সেরে কালিকলম নিয়ে প্রস্তুত হল ওরা। পরীক্ষা দিতে যাবে। স্কুলের পরীক্ষা নয়। সাহসের পরীক্ষা। নিশানার পরীক্ষা। ভাইয়েরা যেভাবে শেষ করেছে লোম্যানকে, সিম্পসনকে, পেডিকে, গার্লিককে, বোনেরাও তেমনিভাবে স্টিভেন্সকেও খতম করতে পারে কি না, তারই অগ্নিপরীক্ষা!

প্রায় সাড়ে নটার সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ী এসে থামল সুনীতিদের বাড়ীর বাইরে।

সুনীতি প্রস্তুত হয়েই দরজায় অপেক্ষা করছিল, জানালা দিয়ে সতীশ রায় মুখ বাড়াতেই সে এসে গাড়ীতে উঠল।

শান্তিও ছিল প্রস্তুত হয়ে। গাড়ী ওদের বাড়ীর কাছে আসতে সেও উঠে পড়ল।

চলল গাড়ী স্টিভেন্সের বাসভবন অভিমুখে।

সতীশ সেই দরখাস্তখানা বার করে দিল শান্তিকে। তারপর দুজনের হাতে দুটি রিভলভার দিয়ে বলল, 'ছটা চেম্বারই লোড করা আছে।' ডিসেম্বরের শীত, ওদের গায়ে জড়ানো ব্যাপার। রিভলভার ওরা ব্লাউজের মধ্যে ভরে নিল।

স্টিভেন্সের বাড়ীর কাছাকাছি যাবার আগেই নেমে গেল সতীশ রায়, বলল, দাদার নির্দেশ পালন করো। তোমাদের সাফল্য কামনা করি।

গাড়ী এসে থামল স্টিভেন্সের বাড়ীর সামনে। নামল শান্তি সুনীতি। ভাড়া মিটিয়ে দিতে গাড়ী চলে গেল।

খোলা গেট! বেলা প্রায় দশটা। স্টিভেন্স অফিস কক্ষে বসেছে। কত দর্শনপ্রার্থী আসে কতরকম আবেদন নিয়ে। তাই প্রায় অবারিত দ্বার বলা যায়।

কিন্তু বাংলা দেশে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে, একটু সাবধান থাকা দরকার। তাই চাপরাশী রয়েছে দুজন আর দুজন অর্ডারলী। এস ডি ও মিস্টার নাথ এসে গেছে। তার সঙ্গে জরুরী আলোচনা চলছে। এগারোটা বাজতেই স্টিভেন্স যাবে তার কালেকটরেটের অফিসে।

এমন সময় এল সেই দুটি মেয়ে। ডিসেম্বরের সকাল। প্রচণ্ড শীতে মিঠে রোদ, তার মধ্যে ফুটফুটে দুটি বালিকা। চাপরাশীরা তাকিয়ে দেখল। আসুক। হুজুরের কাছে নানারকম আবেদন জানাতে কত লোকই ত আসে। এরা ছোট দুটি মেয়ে। কোন প্রশ্ন করবার প্রয়োজন বোধ করল না চাপরাশীরা।

বারান্দায় উঠতেই একজন অর্ডারলী এগিয়ে এল। শান্তি বলল, আমরা ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দেখা এমনিতে হয় না, নাম এবং কেন সাক্ষাৎপ্রার্থী, তা স্পষ্ট করে লিখে দিতে হয়। অর্ডারলী ভিজিটর্স স্লিপ নিয়ে এল। শান্তি লিখল, 'একটি গার্লস সুইমিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।' আমরা কারা? কি নাম আমাদের? শান্তি ফস ফস করে লিখে দিল, 'ইলা সেন এ্যাণ্ড মীরা দেবী!'

অর্ডারলী স্লিপ নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

ওদের কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। এবার ডাক পড়বে। দরখাস্তখানা দেবে শান্তি। যেই স্টিভেন্স মুখ নীচু করে পড়তে থাকবে, অমনি ফায়ার করবে সুনীতি। তারপর দুজনেই। দাদাদের নির্দেশ কানে বাজছে।

কিন্তু এ কি, স্টিভেন্স ত ডেকে পাঠাল না, নিজেই যে বারান্দায় এসে হাজির। সঙ্গে এস ডি ও মিস্টার নাথ।

কি চাও তোমরা?

দরখাস্তখানা হাতে দিয়ে শান্তি শান্ত কণ্ঠে উদ্দেশ্য বলল। রেডি হচ্ছিল সুনীতি, চাদরের তলায় হাতও ঢুকিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ কিছু না বলেই দরখস্ত নিয়ে স্টিভেন্স ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নাথও।

চঞ্চল হয়ে উঠল ওরা। অনুচ্চকণ্ঠে সুনীতি বলে উঠল, কি রে, আমাদের যদি অফিসের মধ্যে না ডাকে? যদি অর্ডারলীকে দিয়ে বলে পাঠায়, পরে জবাব দোব?

শান্তি বলল, সত্যিই ত, তাহলে কি করা যাবে? আমাদের ডাকল না, নিজেও এল না, তাহলে? তাহলে কি এ্যাকশন করতে পারব না? ফেল করব? ফিরে যাব?

দাদাদের নির্দেশ কানে বাজছে। সুনীতি বলে উঠল, আমরাই ঢুকে পড়ব তাহলে। এ্যাকশন করতেই হবে।

ভাগ্য ভাল, দরখাস্ত হাতে ফিরে এল স্টিভেন্স, সঙ্গে সেই লেজুড় নাথ।

রেডি হল সুনীতি। চাদরের নীচে হাত রাখল।

দরখাস্ত শান্তির হাতে দিয়ে স্টিভেন্স বলতে লাগল, আমি তোমাদের চিনি না, তাই দরখাস্তে লিখে দিলাম, **Headmistress, Faizunnesa Girls'**

School, for favour of suggestion অর্থাৎ এখানা তোমাদের হেডমিসট্রেস সুহাসিনীকে—

ঠিক সেই মুহূর্তে রিভলভার বার করেই ট্রিগার টানল সুনীতি। দু হাত দূর থেকে। একেবারে বুক লক্ষ্য করে। গুলি বুকে বিঁধে গেল।

নাথ 'পাকড়ো' 'পাকড়ো' বলে ঘরের মধ্যে উধাও।

আর পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে স্টিভেন্স প্রাণপণে ছুটল ডাইনিং হলের মধ্য দিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দিকে।

আবার গুলী ছুঁড়ল সুনীতি। আবার। আবার। কিন্তু একটিও লাগল না। বাকি পাঁচটাই ব্যর্থ।

সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও ছুঁড়ল। একটা গুলী ব্যর্থ হল। পরের বার জ্যাম হয়ে গেল রিভলভার।

কিন্তু সুনীতির প্রথম গুলীটাই ছিল মোক্ষম। স্টিভেন্স ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে প্রাণ হারিয়ে পড়ে গেল। রক্তের স্রোত বয়ে চলল।

ছুটে এল অর্ডারলীরা। ছুটে এল চাপরাশীরা।

ফোন চলে গেল পুলিশ লাইনে।

এ্যালার্ম বাজিয়ে দেয়া হল। হুড় হুড় করে বেরিয়ে পড়ল বন্ধুকধারী পুলিশ, বেরিয়ে পড়ল আই বি অফিসারের দল, ছুটে এল কোতোয়ালী থানার দারোগা সদলবলে। দুই কালনাগিনীকে ধরবার জন্য ওরা লাফিয়ে পড়ল, খুশীমত চালাতে লাগল চড়চাপড়, ঘুসি, লাথি।

না, পালাবার চেষ্টা করল না ওরা। দাদাদের নির্দেশ কানে বাজছে। তাই ধরা দিলো রিভলভার হাতে। এবং হাসিমুখে। এবং কুমিল্লার ডিসস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সি জি বি স্টিভেন্সের বাসভবনে। এবং ডিসেম্বরের শীতের সকালে। সেই ফুটফুটে বালিকা দুটি। শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী। শান্তি সুনীতি।

সুইমিং ক্লাব গঠনের দরখাস্তখানা আর হেডমিসট্রেস সুহাসিনী বিশ্বাসের হাতে পৌঁছোয়নি বটে কিন্তু অনতিবিলম্বে খবর পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর কাছে। নতুন করে মনে পড়ল তাঁর, সেই যে মেয়েদের সম্মেলন হয়েছিল এই বছরের গোড়ার দিকে, শান্তি ঘোষ হয়েছিল তার সেক্রেটারী আর সুনীতি চৌধুরী ভলান্টিয়ার বাহিনীর ক্যাপ্টেন। আর প্রেসিডেণ্ট? প্রেসিডেণ্ট কে হয়েছিল? হয়েছিল সেই স্বদেশী বখাটে মেয়ে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম। সুহাসিনী ভ্রূকুঞ্চন করলেন।

অমনি গ্রেপ্তার হয়ে গেল প্রফুল্লনলিনী।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহের দিদি ইন্দুমতী সিংহ তখন কুমিল্লায় এসেছিলেন চট্টগ্রামের মামলায় বিপ্লবীদের ডিফেন্সের ব্যয় মেটাবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হল।

পরে অবশ্য এঁদের দুজনকেই ছেড়ে দেয়া হয়।

১৯৩২ সালের ১৮ জানুয়ারী শুরু হল শান্তি সুনীতির বিচার।

ইংরেজদের আদালতে বিচার। বিচারের প্রহসন।

চাপরাশী অর্ডারলীরা এক বাক্যে বলল, গুলী ছুঁড়তে দেখেছে তারা। ছুঁড়েছে এই মেয়ে দুটি।

পানবিড়িওয়ালা, মুচি, চানাচুরওয়ালা, কালেকটরেটের দারোয়ান পথচারী এক গাদা সাক্ষী কাঠগড়ায় উঠে বলে গেল হ্যাঁ, একখানা ঘোড়ার গাড়ী কালেকটরেটের সামনে এসে থামল, তাতে ছিল তিন জন ছেলে আর হ্যাঁ, এই মেয়ে দুটি। সাহেব ওখানে তখনও আসেননি শুনে গাড়ীটাকে সাহেবের বাড়ীর দিকে নিয়ে যেতে বলল কোচোয়ানকে, তারপর ছেলেরা চলে গেল আর গাড়ীটা মেয়ে দুটিকে নিয়ে চলল কুঠির দিকে। হ্যাঁ, এই মেয়ে দুটি।

বীরকুলচূড়ামণি এস ডি ও মিস্টার নাথ ঈশ্বরের নামে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করে গর্বের সঙ্গে সাক্ষী দিল, আমি ডি এম-এর সঙ্গে ছিলাম এবং আমিই প্রথম ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলি। হ্যাঁ, এই দুটি মেয়ে।

আর সেই দুটি মেয়ে দাবী জানাল জজকে, বসবার টুল চাই।

নরহত্যা মামলার আসামী আবার বসতে চায়? জজ আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন।

ওরা বলল, তাহলে জজ সাহেব দেখুন আমাদের ব্যাক। ওরা কাঠগড়ায় কোর্টের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

অগত্যা টুল মঞ্জুর করতে হল।

চার্জ মার্ডার ও মার্ডারের পারস্পরিক ষড়যন্ত্র। জজ জিজ্ঞেস করলেন, আর ইউ গিলটি? ওদের কানে তখনও বাজছে দাদাদের নির্দেশ! দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, গিলটি উই আর নট।

প্রহসনের রায় বেরোল ২৭ জানুয়ারী। 'সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আসামী দুজন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী পারস্পরিক হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ডিসস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার সি জি বি স্টিভেন্সকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করিয়াছে। মৃত্যুদণ্ডই এর উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু যেহেতু আসামীদের মধ্যে শান্তি ঘোষের বয়স ষোলোর কম এবং সুনীতি চৌধুরী আরও এক বছরের ছোট, আমি এই টিন-এজার দুটি মেয়েকে করুণাপরবশ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দান করিতেছি।'

দাদাদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী।

কুমিল্লার সেই মেয়ে দুটি।

পেডি শেষ, ডগলাস শেষ, এবার পালা বার্জের

কোথায় ঢাকা আর কোথায় মেদিনীপুর !

কিন্তু সুবিধে ছিল দীনেশ গুপ্তের, তার দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত মেদিনীপুরের উকিল। সুতরাং ১৯২৮ সালে দীনেশ মেদিনীপুরে পড়তে এল, ভর্তি হল কলেজে। দাদার বাড়ীতে থাকে আর অপরিচিত শহরে গুড বয়ের মত কলেজে যায়। কখনও ছুটিছাটায় ঢু মেরে আসে কলকাতায়। সেখানে ১-সি রসা রোডের দোতলায় আছেন সত্য গুপ্ত।

১৯২৯ সালের মধ্যেই মেদিনীপুরে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির বীজ বপন করল দীনেশ। বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের একটি শাখার গোড়াপত্তন হল। আশীর্বাদ জানালেন বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের মেজর সত্য গুপ্ত।

দীনেশ যে বীজ বপন করে এসেছিল, তারপর শশাঙ্ক (ওরফে কমেট) দাশগুপ্ত গিয়ে সেই বীজের পরিচর্যা শুরু করল। বীজ থেকে উদ্ভব হল অঙ্কুরের, অঙ্কুর থেকে চারা, চারা থেকে গাছ, তারপর সেই গাছ দেখতে দেখতে রূপান্তরিত হল বিরাট মহীরুহে। ঢাকা ও মেদিনীপুরের মধ্যে স্থাপিত হল নিবিড় বিপ্লবী বন্ধুত্ব। বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স অর্থাৎ বি ভি-র হেডকোয়ার্টার্স তখন স্থানান্তরিত হয়েছে ঢাকা থেকে কলকাতায় আর সেই হেডকোয়ার্টার্সের হেড হচ্ছেন সত্যদা, আমাদের রাঙ্গাদা। কলকাতা প্রায় মাঝামাঝি স্থানে হওয়াতে মেদিনীপুর থেকে ঢাকার দূরত্ব দূরীভূত হল।

১৯২৯ সালের বিপ্লবী দলের শাখা ১৯৩১ সালেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, মেদিনীপুরে ইংরেজ ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে দেয়া হবে না। অনুপ্রাণিত হয়েছিল ওরা শুধু ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস পাঠে নয়, শুধু দীনেশ ও কমেটের অগ্নিক্ষরা ভাষণে নয়, শুধু প্রফুল্ল ত্রিপাঠি, পরিমল রায়, হরিপদ ভৌমিক, নরেন দাস, ফণী কুণ্ডু, ফণী দাস প্রভৃতির অপূর্ব সংগঠনের ফলে নয়, চোখের ওপরই দেখেছিল ওরা বাঙ্গলা-মায়ের দামাল ছেলেদের জীবনাহুতির প্রতিযোগিতা !

তেষট্টি দিন অনশনের পর মৃত্যুকে জয় করে শহীদ হয়েছেন বাঙ্গলার বিপ্লবী বীর যতীন দাস ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা, মূর্তিমান শমনের মত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পথে বেরিয়ে পড়েছে বিপ্লবী সেনা। বক্ষে তাদের বাত্যার সাহস, চক্ষে তাদের সূর্যের শিখা, অন্তরে তাদের স্বাধীনতার

স্বপ্ন, সর্বাধিনায়ক তাদের মাস্টারদা, সূর্য সেন। তারপর চট্টগ্রাম ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে আর ৬ মে কালারপোলে।

দেখেছে তারা ২৫ আগস্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের ওপর বোমা নিক্ষেপ করল অনুজা সেন, দীনেশ মজুমদার, শৈলেন নিয়োগী আর অতুল সেন।

২৯ আগস্ট ঢাকা শহরে বি ভি-র কর্মী বিনয় বসু গুলী চালাল পুলিশের আই জি লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপার হাডসনের ওপর।

তারপর ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর অবিস্মরণীয় সেই রাইটার্স অভিযান। অভিযানকারী তিনজনই বি ভি-র কর্মী, বিনয় বসু, সুধীর (ওরফে বাদল) গুপ্ত এবং আর একজন কে? দীনেশ গুপ্ত। কোন দীনেশ? মেদিনীপুরে বি ভি সংগঠনের যে গোড়াপত্তন করেছিল মাত্র গত বৎসর, সেই দীনেশ গুপ্ত। ওদের দীনেশদা।

সুতরাং ১৯২৯ সালের সংগঠন ১৯৩১ সালেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, আমাদের প্রথম টার্গেট মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডি। পেডিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিল যতিজীবন ঘোষ এবং বিমল দাশগুপ্ত ১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল।

পেডির শূন্য সিংহাসনে এসে উপবেশন করল রবার্ট ডগলাস। পরের বছরই সেই এপ্রিল মাসেরই ৩০ তারিখ ডগলাসকেও খতম করল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য এবং প্রভাংশু পাল।

ডগলাসের পর এসেছে বি ই জে বার্জ ১৯৩২ সালের মে মাসে। ইংরেজ সরকার যেন চ্যালেঞ্জ করেছে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সিংহাসন কখনও খালি থাকবে না এবং সেই সিংহাসনে সর্বদাই বসবে ইয়োরোপীয়ান। বি ভি-র মেদিনীপুর শাখা গ্রহণ করেছে সেই চ্যালেঞ্জ, মেদিনীপুরে ইয়োরোপীয়ান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে দেয়া হবে না।

পেডি শেষ, ডগলাস শেষ, এবার পালা বার্জের।

বার্জ আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করল না। আগের দুজন গত হয়েছে, অথচ পেডির বেলায় হত্যাকারীকে খুঁজেই বার করতে পারেনি পুলিশ আর ডগলাসের বেলায় যাও দুজন আততায়ীর একজনকে ধরা হয়েছিল, দেখা গেছে তার রিভলভার থেকে একটাও গুলী ছোটেনি। তবু তাকেই ঝুলিয়ে দেবার সর্বপ্রকার আয়োজন ও প্রচেষ্টা চলছে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মেদিনীপুরের ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর বিপ্লবীদের কড়া নজর পড়েছে এবং পুলিশের সাধ্য নেই যে সেই যমের নজর উৎখাত করে। তাই বার্জ কায়দা করে আর মিথ্যে সাহস দেখাতে গেল না, আষ্টে-পৃষ্ঠে সতর্কতা অবলম্বন করল, সিকিউরিটির চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বাংলো থেকে সে বড় একটা বার হত

না। ওখানেই অফিস করত আর টেলিফোনে কাজ সারত। ভীষণ কড়াকড়ি ছিল তার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে। তার টেবিলের পাশে সশস্ত্র রক্ষী, জানালার বাইরে সশস্ত্র রক্ষী, দরজায় সশস্ত্র রক্ষী এবং প্রাঙ্গণে প্রহরারত সশস্ত্র রক্ষী। অনেক জেরার জবাবে খুশী করতে পারলে তারপর হবে দেহতল্লাসী। তারপর সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হবে কি, হবে না, স্থির করা হবে।

আড়ালে লোকে হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই বলাবলি করে, ভীরু কাপুরুষ ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বার্জ সে নিন্দার পরোয়া করত না। আগে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে, তারপর নিন্দা প্রশংসার কথা।

কত সভায় পদধূলি দেবার জন্য আমন্ত্রণ আসত, কত বিভিন্ন প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের, কত শিক্ষায়তনের পারিতোষিক বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণের—কিন্তু যেত না, কোথাও যেত না বার্জ, এ্যাডিশনাল ডি এম অথবা এস ডি ও-কে পাঠিয়ে কাজ সারবার চেষ্টা করত।

শুধু একটিমাত্র দুর্বলতা ছিল বার্জের, সে নিজে ফুটবল খেলোয়াড়, তাই ফুটবল খেলা সম্বন্ধে তার প্রচণ্ড উৎসাহ। মাঝে মাঝেই মাঠে যেত খেলা দেখতে। কোন কোনদিন নিজেও নেমে যেত। মেদিনীপুর টাউন ক্লাবের সে একস-অফিসিও প্রেসিডেণ্ট। বাইরের নাম-করা দলগুলিকে আমন্ত্রণ করে আনিয়ে কখনো কখনো টাউন ক্লাবের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচের ব্যবস্থা করত। হয়ত সুপ্ত আশা মনে ছিল, এমনি মাঝে মাঝে প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করে দর্শকদের আনন্দ দিতে পারলে টেরোরিস্টদের উষ্মা প্রশমিত হবে। কারণ তারা ত জনসাধারণেরই অংশ।

কিন্তু বিপ্লবীদের সঙ্কল্প যে পর্বতের মত স্থির। তাকে কি টলানো যায় ?

ছেলেরা মাঝে মাঝেই গোপন বৈঠকে মিলিত হতে লাগল। আলোচ্য বিষয় মাত্র একটি, বার্জ হত্যা। পেডিকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে, ডগলাসকেও শেষ করা হয় ১৯৩২ সালের সেই এপ্রিলে, সুতরাং ওদের প্রস্তাব ছিল ১৯৩৩ সালের সেই এপ্রিলেই বার্জকে শেষ করতে হবে।

প্রস্তাব পাঠানো হল বি ভি-র হেডকোয়ার্টার্স কলকাতায়। নেতারা কেউ নেই, সবাইকে রাজবন্দী করে আটক করা হয়েছে জেলে বা বন্দী-শিবিরে। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়ে গেছে দু বছর আগে, কমেটকেও রাজবন্দী করা হয়েছে ১৯৩১ সালের নভেম্বরে। সত্য গুপ্ত, রসময় সুর, সুপতি রায়, জ্যোতিষ জোয়ারদার প্রমুখ সবাই তখন জেলে।

কিন্তু হেডকোয়ার্টার্স কি কখনও খালি থাকতে পারে ? একজন চলে গেলে আর একজন দাঁড়ায় সেখানে। রক্ত বীজের ঝাড়। এক ক্ষুদিরাম চলে গিয়ে কি শত শত ক্ষুদিরাম হয়ে ফিরে আসেনি ? ওদের প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদিত হয়ে এল।

তারপরই সাজো সাজো রব !

এই এ্যাকশনের নায়ক মনোনীত করা হল দুজনকে, মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত এবং অনাথবন্ধু পাঁজা। ওরা চলে গেল কলকাতা ভাল করে রিভলভার চালনা শিখে আসবার জন্য। কদিন পরেই গেল ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মলজীবন ঘোষ এবং রামকৃষ্ণ রায়। পাঁচজন কলকাতা থেকে পাঁচটি রিভলভার ও অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে ফিরল। খড়্গপুর পর্যন্ত এল ট্রেনে, সেখানে একটি বোর্ডিং হাউসে এক বন্ধুর কাছে অস্ত্রগুলি লুকিয়ে রেখে দিল। দিনের বেলা মেদিনীপুরে ট্রেনে গিয়ে নামলে ওদের পুলিশের নজরে পড়বার আশংকা। তাই রাত্রির অন্ধকারে ওরা সাইকেলে মেদিনীপুরে চলে এল।

চতুর্দিকে ঘন জঙ্গল পরিবেষ্টিত গোপ পাহাড়, সেই পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে একটি বহুকালের পরিত্যক্ত ধ্বংসপ্রায় বাড়ী। গভীর রাত্রে সেই বাড়ীতে মিলিত হল ওরা। তারপর আগ্নেয়াস্ত্র স্পর্শ করে দেশমাতার নামে শপথ গ্রহণ করল, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

১৯৩৩ সালের এপ্রিল পার হয়ে যাচ্ছে দেখে ওরা দু-দুবার চেষ্টা করেছিল! একবার বন্যা-ত্রাণ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় বার্জ সভাপতিত্ব করছিল। গিয়েছিল ওরা। কিন্তু সভামণ্ডপের বাইরে, গেটে ও ভেতরে পোশাকধারী ও সাদা পোশাক সশস্ত্র পুলিশ এমনি গিজগিজ করছে যে, ওরা 'বুলস আই' ফুটো করে দেবার সুযোগ করতে পারল না। আর একবার অনেক পরে ৩১ আগস্ট; বার্জ এসেছিল ফুটবল ম্যাচ দেখতে। দর্শক সেজে ওরাও গিয়েছিল। কিন্তু অস্ত্রধারী পুলিশ ও পুলিশ অফিসাররা এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, বার্জের পঞ্চাশ হাতের মধ্যেও কেউ যেতে পারছে না। রিভলভার চালিয়ে যদি কাজই না হয় অথবা সাফল্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে এ্যাকশন করা ঠিক নয়, কারণ একবার মিস করলে আবার সুযোগ পেতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

ওরা ফিরে এল। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, খেলার মাঠে ছাড়া বার্জকে ঠিক রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া যাবে না। সুতরাং সেইভাবে রেডি হতে লাগল ওরা।

৩১ আগস্টের আয়োজন ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরদিনই—আশ্চর্য, একটি মহামূল্য আনন্দ-সন্দেশ সংগ্রহ করে নিয়ে এল নির্মল। ২ সেপ্টেম্বর সেণ্ট্রাল জেলের কাছে পুলিশ গ্রাউন্ডে কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে মেদিনীপুর টাউন ক্লাবের প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ হবে, টাউন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট সাহেবের সেই খেলায় নামবার কথা আছে। শুধু একা বার্জই নয়, সহকারী পুলিশ সুপারও খেলবে আর রেফারী হবে রিজার্ভ ইনসপেক্টার। ওরা দুজনও ইয়োরোপীয়।

আর দেরী নয়। সুযোগ এসে গেছে। মেদিনীপুরে ইয়োরোপীয় ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে দেওয়া হবে না, এই হচ্ছে বি ভি বিপ্লবী দলের সিদ্ধান্ত।

দু-দুবার সেই সিদ্ধান্ত কার্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে, দু-দুবারই এপ্রিল মাসে, এবার ১৯৩৩ সালের এপ্রিল কবে পার হয়ে গেছে, দু-দুবার চেষ্টা করেও কিছু করা যায়নি। তাহলে কি মেদিনীপুর পরাজিত হবে? ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর? উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল ওরা। সেদিনই, ১ সেপ্টেম্বরই পাঞ্চেৎ দীঘির পাড়ে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হল ওরা। সিদ্ধান্ত হল, এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া হবে না, ম্যাচ শুরু হবার প্রাক্কালেই এ্যাকশন করতে হবে। ব্রজ থাকবে মাঠের অদূরে টিলার ওপর দর্শকদের সঙ্গে মিশে আর মাঠে ঢুকবে অনাথ ও মৃগেন। ব্রজ হাত তুলে সঙ্কেত জানানো মাত্র ওরা গুলী চালাবে। বার্জকে খতম করে ছুটে দর্শকদের মধ্যে মিশে যাবে ওরা, বেরিয়ে আসবে মাঠ থেকে, তারপর যে পথ দিয়ে পাবে, পালিয়ে যাবে। তাঁতিঘেরিয়া রেল স্টেশনের কাছে সশস্ত্র একজন পাহারায় থাকবে, নির্মল নিজে থাকবে মিশন গার্লস স্কুলের কাছে। আরও কয়েকজন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করবে, অনাথ ও মৃগেন মাঠের বাইরে বেরিয়ে পড়লে যাতে ওরা দুজনকে গার্ড দিয়ে পলায়নে সাহায্য করতে পারে। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

পরদিন।

১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর।

পুলিশ গ্রাউণ্ডে লোকে লোকারণ্য। যেমন হাজার হাজার দর্শক ভিড় করেছে, তেমনি পুলিশী সতর্কতারও অন্ত নেই। মাঠের চতুর্দিকে লাঠিধারী পুলিশ, কিছু দূরে দূরে এক-একজন করে বসেছে। রিভলভারধারী অফিসাররা ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছে। বিশেষ করে মাঠের পুব দিকটায় যেন মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতা! সেখানে দর্শকদের আসনে বসে আছে জোন্স, লিনটন, স্মিথ ও জনকতক সামরিক অফিসার। সাধারণ দর্শকদের সেদিকে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ।

পাঁচটায় খেলা শুরু হবে। পাঁচটা বেজে চার পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে মহামেডানের খেলোয়াড়রা মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে নেমে প্রাক্‌টিস শুরু করেছেন। সে যুগে খেলোয়াড়দের হাফ প্যাণ্ট ও বুট পরা আবশ্যিক ছিল না, তাই খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ কেউ ধুতি ও গেঞ্জি পরেই নেমেছেন। আর মফঃস্বলে যা হয়ে থাকে ওদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের কয়েকটি ছেলেও নেমেছে, ওঁদের প্রাক্‌টিসের ফাঁকে ফাঁকে তারাও বল পেটাপেটি করছে। রেফারী রিজার্ভ ইনসপেক্টার বাঁশী হাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য, যিনি টাউন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট, যাঁর নাম বি ই জে বার্জ, জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আজকের প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে যিনি কৃতার্থ করবেন টাউন ক্লাবের সদস্যদের, আনন্দ বর্ধন করবেন অগণিত দর্শকদের। টাউন ক্লাবের খেলোয়াড়রাও সার বেঁধে অপেক্ষা করছে।

পাঁচটা পনেরো মিনিটে দূরে দেখা গেল বার্জের মোটর। সচকিত হয়ে উঠল সবাই।

বার্জের মন খুশীতে ভরপুর। পর পর দু বছরে দুটি ডি এম শেষ হলেও বার্জ চার্জ নেবার পর এক বছর পার হয়ে আরও তিনমাস চলে গেছে। সব চাইতে স্বস্তির কথা পার হয়ে গেছে সেই ভয়ংকর এপ্রিল মাস। অবশ্য ইতিমধ্যে অন্যত্র কতকগুলো টেরোরিস্ট এ্যাকশন ঘটে গেছে। ঢাকায় নিহত হয়েছে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেন, ঢাকাতেই গুলী করা হয়েছে এ্যাডিশনাল এস পি গ্র্যাসবিকে, কলকাতায় স্টেটসম্যানের সম্পাদক ওয়াটসনকে মারবার চেষ্টা করা হয়েছে একবার নয়, দু-দুবার। চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে প্রীতিলতা ওয়াদেদারের নেতৃত্বে হানা দিয়েছে একদল টেরোরিস্ট।

কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও আশাব্যঞ্জক ঘটনাও যে একেবারেই ঘটেনি, তা নয়। ডগলাসের অন্যতম আততায়ী প্রদ্যোৎকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া গেছে এ বছরই, ১৯৩৩ সালের ২২ জানুয়ারী, মে মাসে কলকাতায় প্রচণ্ড রিভলভার যুদ্ধের পর ধরা পড়ে গেছে মেদিনীপুর জেল থেকে পালানো দ্যাট মোস্ট নোটোরিয়াস টেরোরিস্ট দীনেশ মজুমদার, টেগার্ট সাহেবের ওপর বোমা ফেলার অপরাধে যার অলরেডি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়ে গেছে অথচ পলাতক অবস্থাতেই যে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার কুইনকে হত্যা করে এই বছরই ৯ মার্চ তারিখে আর ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হল বার্জ যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্বস্তির কথা, আইনানুগ জনসাধারণের পক্ষে শান্তির কথা এবং পুলিশ ও সেনা বিভাগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্বের কথা যে, ১৯ মে তারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী টেরোরিস্টদের সেই দুর্ধর্ষ নেতা সূর্য সেনকে। মোটরে আসতে আসতে ভাবল, মেদিনীপুরের ছোকরারা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ওরা আর সাহস করবে না ঘাঁটাতে। খুশীতে বার্জের মন ভরে উঠল।

মোটর এসে থামল পূর্বদিকের সেই সংরক্ষিত স্থানে। হাসিমুখে নামল বার্জ, নামল খোলা রিভলভার হাতে দুজন রক্ষী। অমনি চারিদিকে খটাখট বুটের আওয়াজ, স্যালুট করার ধুম পড়ে গেল। রেফারী প্রথম বাঁশী বাজিয়ে মাঠে নামল। রক্ষী দুজনকে টাচ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবার নির্দেশ দিয়ে বার্জ স্মিতহাস্যে সেনটারের দিকে অগ্রসর হল।

ঠিক সেই সময় টিলার ওপরে দর্শকদের মধ্যে দণ্ডায়মান ব্রজ হাত তুলে সংকেত জানাল।

বাইরের যে কটা ছেলে মহমেডান খেলোয়াড়দের সঙ্গে নেমে বল পেটাপেটি করছিল, তাদের মধ্যে দু'জন বলটা নিয়ে আস্তে আস্তে মারতে মারতে সেনটারের দিকে এগিয়ে এল। সবাই ভাবল এবং রেফারী ও বার্জও ভাবল, এরা

বলটা সেনটারে বসিয়ে দিতেই আসছে, বসিয়ে দিয়েই মাঠের বাইরে চলে যাবে, চলে গেলেই শুরু হবে খেলা, এমন সময়—

অকস্মাৎ দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

একই সঙ্গে গর্জে উঠল রিভলভার আর অটোমেটিক পিস্তল।

সেই ছেলে দুটি! মৃগেন সম্মুখ থেকে গুলী চালিয়েছে তিন বার আর পেছন দিক থেকে পাঁচ বার চালিয়েছে অনাথ। ছয়টি গুলী বার্জের শরীর ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে। প্রাণ হারিয়ে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল বার্জ কাটা কলাগাছের মত।

দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে মিশে পালিয়ে যাবার কথা ছিল ওদের। কিন্তু যাওয়া হল না।

হঠাৎ গুলীর আওয়াজে চমকে উঠল সবাই। কি হল? কে গুলী করল? কে মারল বার্জকে? বাইরের দর্শকরা ঠিক বুঝতে পারল না মাঠের সেনটারে কি ঘটে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। কাছেই ছিল সহকারী এস পি, ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃগেনের ওপর। তৎক্ষণাৎ গুলী চালান মৃগেন। কিন্তু জোর বরাত এস পি-র, আগেই সে থাবা মেরেছে মৃগেনের হাতে। ফলে সাঁ করে গুলীটা বেরিয়ে গেল এস পি-র দু পায়ের ফাঁক দিয়ে। এমন সময় দেহরক্ষী দুজন এসে গেছে। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তিনজন অবশেষে ধরে ফেলল মৃগেনকে।

রিজার্ভ ইনসপেক্টার রেফারী, বাঁশী নিয়ে এসেছে, অস্ত্র নিয়ে আসবে কেন? এর মধ্যেই ছুটে এসেছে কজন সশস্ত্র পুলিশ, একজনের কাছ থেকে রিভলভার নিয়ে গুলী চালাল সে। অনাথের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল।

এইবার চাঞ্চল্য দেখা গেল দর্শকদের মধ্যে। চীৎকার শুরু হল, ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়ল, খেলোয়াড়রা সেই জনসমুদ্রে তলিয়ে গেলেন, হারিয়ে গেলেন। পালিয়ে যাবার জন্য হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে পুলিশ সারা মাঠ বেষ্ঠন করে ফেলেছে। প্রত্যেকের দেহতল্লাসী করা হল। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া গেল না। তবুও সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা হল চারজনকে।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বিপ্লবী মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত।

পেডি ও ডগলাসের বেলায় যা করতে পারেনি পুলিশ, এবার প্রাণপণ চেষ্টায় তাই করল, ষড়যন্ত্র মামলা ফেঁদে বসল। অনেক লোভ দেখিয়ে, অমানুষিক নির্যাতন করে, অনেক পরিশ্রম করে শুধু যে জনকতক প্রত্যক্ষদর্শী (?) সাক্ষী আমদানী করল, তাই নয়, মনীন্দ্র চৌধুরী নামের একটি ছেলেকে অনেক শিখিয়ে-পড়িয়ে একেবারে রাজসাক্ষী খাড়া করে ফেলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ফসকে গেল, মনীন্দ্র স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে বসল। অভিযুক্ত আসামী রইল নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নন্দলাল সিং, পূর্ণানন্দ

সান্যাল, শৈলেশচন্দ্র ঘোষ, কামাখ্যা রায়, সনাতন কর, সুকুমার সেনগুপ্ত, সরোজ দাস কানুনগো, ফেরারী শান্তিগোপাল সেন এবং মনীন্দ্র চৌধুরী।

১৯৩৪ সালের ৩ জানুয়ারী স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে বিচার শুরু হল। চার্জ—আইন ও শৃংখলার ওপর প্রতিষ্ঠিত হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেন্টকে হিংসার দ্বারা উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের হত্যার ষড়যন্ত্র ও নরহত্যা।

১০ ফেব্রুয়ারী রায় দেয়া হল, নির্মল, ব্রজ ও রামকৃষ্ণের ফাঁসী, চারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অবশিষ্টরা অব্যাহতি পেল।

২৫ অক্টোবর মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ভোর হবার আগেই ব্রজ ও রামকৃষ্ণের ফাঁসী হয়ে গেল। নির্মলের হল পরদিন।

ইংরেজ সরকারের আহ্লাদের আর সীমা নেই। দুনিয়াকে ভাঁওতা দিয়ে বলতে লাগল, দেখলে, শেষ পর্যন্ত আমরাই জয়লাভ করেছি। পেডির বেলায় কিছু করতে পারিনি, ডগলাসের বেলায় যে করেই হোক, একজনকে ঝোলাতে পেরেছি, কিন্তু বার্জের বেলায় ? গুলীতে খতম দুজন আর ফাঁসীর দড়িতে তিনজন। তাহলেই গ্র্যান্ড টোটাল দাঁড়াচ্ছে, আমরা তিনটে ম্যাজিস্ট্রের মৃত্যুর জন্য ছ-ছয়টা টেরোরিস্টকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার মানেই আমরা জিতেছি।

কিন্তু দুনিয়া ইংরেজ সরকারের মত মূর্খ নয়। হিসেব তারাও জানে। হিসেব করেই দেখা গেছে, সেবার মেদিনীপুরের বি ভি বিপ্লবীদলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল ইংরেজ সরকার। চ্যালেঞ্জ ছিল, মেদিনীপুরে কোন ইয়োরোপীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে দেয়া হবে না, ইংরেজ সরকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেছিল, রাখবই রাখব। পেডি গেল, ডগলাস গেল, বার্জ গেল—ব্যাস অমনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন ? লাথি-খাওয়া ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মত দুই পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে অমনি কেঁউ কেঁউ করে কান্না ? সাহসই হল না আর কোন ইংরেজকে পাঠাতে, পাঠাতে হল একজন বাঙ্গালীকে।

জয়লাভ তাহলে কে করল, শুনি !

পুনশ্চ ঃ—১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী থানায় অন্তরীন ছিলাম। থানার এ এস আই অবিনাশবাবু বদলি হয়ে গেলে তাঁর স্থানে যিনি এলেন, ধরুন তাঁর নাম বীরেন বাবু। বীরেনবাবু এতদিন আই বি-তে ছিলেন, এই প্রথম এলেন থানায়। থানায় আসবার কারণ যখন একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তখন কয়েক মাস কেটে গেছে, তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। বীরেনবাবু বললেন, এলাম ভাই ভয়ে, স্রেফ ভয়ে। বার্জকে যখন গুলী করা হয়, আমি তখন মাঠে ছিলাম। অফ

ডিউটি, খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। ছুটে বার্জের কাছেও গিয়েছিলাম। —ওরে বাবা। মানুষের ছেলে নয় রে ভাই, মানুষের ছেলে নয়। শের কা বাচ্চা। তিন তিনটে জোয়ান মিলে একটা ছেলেকেই কায়দা করতে পারছে না। আর একজন? গুলী লেগে পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে, চোখ বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু—ওরে বাবা, রিভলভারটি হাতে ধরাই আছে আর সামনে ট্রিগার টেনে চলেছে। মানে; যদি আরেকবার লোড করা থাকত না, তাহলে আরও কয়েকজনকে সাবাড় করে দিত। এরা মরে যাবার পরও গুলী চালাতে পারে, বুঝলেন দীপঙ্করবাবু? তিন-তিনটে ডি এম খতম, আই বি-তে থেকে কবে পৈতৃক প্রাণটা হারাব—তাই অনেক ধরাধরি করে চলে এলাম থানায়। ভাল করিনি, ভাই? তুমি কি বল?

লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে

১৯৩৬ সাল। যতদূর মনে পড়ে, জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস। আমি তখন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। ১৯৩১ সালে রাজবন্দী হয়ে দিনের পর দিন নয়, বৎসরের পর বৎসর কাটাচ্ছিলাম, আমার মত 'ঝঞ্ঝাটে রাজবন্দীকে' নিয়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সোয়াস্তি ছিল না, যেখানেই আমাকে রাখা হয়েছে, কি বন্দী শিবির, কি জেল, কি গ্রাম্য থানায় অন্তরীণে, কি নিজেদের দেশের গৃহে অন্তরীণে, সর্বত্রই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লাগত, তাই বার বার আমায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল, এমন সময় বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে ভাল করে আটঘাট বেঁধে ঢাকার আই বি পুলিশ শুরু করল বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা, শুনানী শুরু হল মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হাকিম বি. সি. রায়ের আদালতে, তাঁকে দেয়া হয়েছে বিশেষ ক্ষমতা, যার ফলে তিনি সাত বৎসর পর্যন্ত দণ্ডদান করতে পারবেন, আসামী আমরা পাঁচ জন, অনাথ চক্রবর্তী, খগেন ব্যানার্জী, বিপদভঞ্জন চ্যাটার্জী, আমার ছোট ভাই রঙ্গলাল ও আমি। আমাদের বিরুদ্ধে দারুন অভিযোগ, আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেণ্টকে বোমা ও রিভলভার দিয়ে উচ্ছেদ সাধনের ষড়যন্ত্র করেছি এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করেছি।

বি. সি. রায় অর্থাৎ ভবেশচন্দ্র রায় স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে তাঁর স্পেশ্যাল পাওয়ার পুরোপুরি প্রয়োগ করেছেন শুধু আমারই বেলায়, তাই আমার সাত বৎসর দণ্ড, অনাথ, খগেন ও রঙ্গলালের পাঁচ বৎসর আর বিপদভঞ্জনের দু বৎসর। আমি তখন ছিলাম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী থানায় অন্তরীণ, সেখান থেকে এনে আমায় সাজা দেয়া হয়েছে।

আমরা সবাই বি. ভি. নামীয় বিপ্লবী দলের কর্মী, যার সর্বাধিনায়ক হচ্ছেন মেজর সত্য গুপ্ত, যে দলের শহীদদের তালিকা দীর্ঘ, বিনয় বসু, সুধীর (ওরফে বাদল) গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, নির্মল ঘোষ, ব্রজ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, মতিলাল মল্লিক এবং ভবানী ভট্টাচার্য ও আরও কজন।

ঢাকা জেলের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড একটি বিরাট লম্বা দোতলা বিল্ডিং, তার নীচের তলায় এক প্রান্তের একটি ছোট ঘরে এক দল সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে রাখা হয়েছিল আমাকে আর বরিশালের শান্তি মুখার্জীকে। তার কাছে নাকি একটি রিভলভার পাওয়া গিয়েছিল, তাই অস্ত্র আইনে তার সাজা হয়েছে পাঁচ বৎসর। আমার সহ-আসামীরাও ছিল বিভিন্ন ইয়ার্ডে। তাদের কাউকেই আমার সঙ্গে

রাখা হয়নি, কারণ, পুলিশের মতে, আমি ছিলাম 'ঝঞ্ঝাটে রাজবন্দী', এখন আমি 'ডেঞ্জারাস প্রিজনার !'

তখন সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মিঃ এ লিওনার্ড আর জেলার ছিলেন সুধীর মুখার্জী। শান্তি ও আমাকে রোজ যাঁতা ঘুরিয়ে আধ মণ গোটা মটর বা মুশুরি ডাল ভেঙ্গে ভাল করে ঝেড়ে দিতে হত।

সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে থাকতে ভাল লাগছিল না আমাদের। অনেকগুলো ওয়ার্ডেই শুধু রাজনৈতিক বন্দী আছে, বিশেষ করে চাল্লিশ ডিগ্রি, বিশ ডিগ্রি ও ছয় ডিগ্রিতে সবাই। শুধু আমরা দুজন এমন কি ডেঞ্জারাস হয়ে পড়েছি যে, আমাদের সেই সব ওয়ার্ডে থাকতে না দিয়ে সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ? স্থির করলাম, আমরা সুপারের কাছে নালিশ করব।

পরের সপ্তাহে লিওনার্ড সদলবলে যখন সাপ্তাহিক রাউন্ডে এলেন, আমরা নালিশ করলাম। বললাম, যেসব ওয়ার্ডে পলিটিক্যাল প্রিজনার আছে, আমাদের তার যে কোনটিতে ট্রান্সফার করা হোক।

লিওনার্ড ব্যক্তিত্বহীন বোকা ধরনের সরল প্রকৃতির মানুষ আর সুধীর মুখার্জী এক নম্বর ধূর্ত ও কৌশলী। হয়ত লিওনার্ডের প্রতি গভর্ণমেন্টের অলিখিত নির্দেশ ছিল, জেলারের অনুমোদন ছাড়া কিছু করো না, বিশেষ করে, পলিটিক্যাল প্রিজনারদের বেলায়।

তাই লিওনার্ড প্রথমটা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তাইত, অর্ডিনারীদের সঙ্গে এদের রাখবার ত কোনও কারণ নেই। কোনো পলিটিক্যাল প্রিজনারকে রাখা হয়েছে বলে ত মনে পড়ছে না। সুতরাং লিওনার্ড প্রায় হুকুম দিয়েই ফেলেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল সুধীর মুখার্জীর চোখের প্রতি। ক্ষুদে চোখ, কথা বলতে গেলে যেন আরও ক্ষুদে হয়ে যায়। লিওনার্ড থেমে গেলেন, কথা ঘুরিয়ে নিলেন, বললেন, অল রাইট, আই উইল সি হোয়াট ক্যান বি ডান।

ভাবলাম, কিছুই হল না। চাণক্য সুধীর মুখার্জী ঐ ভ্যাবাগঙ্গারামকে ঠিক বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা দুটো মোস্ট টার্বুলেন্ট টাইপ ছেলে, পলিটিক্যাল ওয়ার্ডে রাখলে আমরা সবাইকে উত্তেজিত করে তুলব, এমন কি, মিউটিনি ঘটাতে পারি। আমরা স্থির করলাম, সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠবেই না, তখন কড়া দাওয়াই কিছু দিতে হবে! কি সে দাওয়াই কিভাবে তা প্রয়োগ করব, আমরা দুজনে প্ল্যান আঁটতে লাগলাম।

চারদিন কেটে গেল।

পরদিন সকালবেলা আমাদের বিস্মিত করে দিয়ে জেলার অনুমোদিত সুপারের হুকুম এসে গেল। শান্তিকে কোন্ ইয়ার্ডে নিয়ে গিয়েছিল, আজ আর মনে নেই, আমায় নিয়ে গেল চাল্লিশ ডিগ্রিতে, হ্যাঁ একেবারে চাল্লিশ ডিগ্রিতে, যেখানে চাল্লিশ জনের মধ্যে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ জনই ছিল রাজনৈতিক বন্দী।

চার দিন ধরে অনেক চিন্তাভাবনার পর কূটকৌশলী জেলার সুধীর মুখার্জী যে কি ভীষণ ভুল করেছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন কয়েকদিন পরে।

চল্লিশ ডিগ্রিতেই পেলাম সুশীল চক্রবর্তীকে। বি ভি-র অন্যতম কর্মী সুশীল। দার্জিলিং-এর লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাংলার গভর্ণর স্যার জন অ্যান্ডারসনের উপর গুলী চালনা মামলার বারো বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। একই দলের কর্মী হলেও এর আগে ওর সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি। না হলেও গুরুভাইকে চিনে নিতে এবং তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে গুরুভাইয়ের দেরী হবে কেন?

লেবং-এর ঘটনাবলী যতখানি সে জানে, বলল আমাকে। মনে আছে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলাম তাকে। তার মধ্যে প্রধান প্রশ্ন ছিল, গভর্ণরের ওপর গুলী চালিয়েছিল ভবানী ভট্টাচার্য আর রবি ব্যানার্জী, দুজনেই আহত হয়ে তখনই ধরা পড়ে যায়, ধারে কাছে সহকর্মীদের কেউ ছিল না, তাহলে ওরা ধরা পড়ার পর কয়েক দিনের মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে কি করে পুলিশ গ্রেপ্তার করল এই এ্যাকশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত প্রায় সবাইকেই? কি করে পুলিশ জানতে পারল যে, মধুসূদন ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, উজ্জ্বলা মজুমদার, সুকুমার ঘোষ আর তুমি এই এ্যাকশনের সঙ্গে যুক্ত? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, ফাঁসীর হুকুম শেষ পর্যন্ত টিঁকেছিল দুজনের প্রতি, ভবানী ও রবি, অথচ ভবানীর ফাঁসী হয়ে গেল, রবির হয়নি, কেন? পাদ্রী নর্টন সাহেবের অনুরোধে গভর্ণর নাকি বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার ফাঁসী রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করে দিয়েছেন, কেন?

সুশীল জবাবে বলেছিল, আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নেই নিহিত রয়েছে। রবি পুলিশের অত্যাচারে কনফেশন করেছিল। জয়দেবপুর ভাওয়াল স্টেটের ম্যানেজার রায় বাহাদুর যোগেন ব্যানার্জীর ছেলে রবি, গভর্ণমেণ্টের কাছে বাপের এত সুনাম, তার নিজের চেহারাটিও রাজপুত্রের মত, বাবাই নর্টনকে বুঝিয়েছে যে, রবির ফাঁসীটা যদি রদ করিয়ে দিতে পার আর গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দেয়, তাহলে রবিকে আমি বিলেতে পাঠিয়ে দোব পড়তে, অন্ততঃ অনেক বছর সে আর ভারতে ফিরবে না, যেসব বন্ধু ওকে বিপথে চালিত করেছিল, তাদের আওতার অনেক বাইরে থাকবে সে, ভবিষ্যতে সে ভাল ছেলে হয়ে যাবে আশা করা যায়। নর্টন তাই তৎপর হয়ে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বলেছিলাম, কনফেশনের পুরস্কার স্বরূপ তাই বুঝি রবি ডিভিশন টু প্রিজনার হয়ে ছয় ডিগ্রিতে রাজার হালে খাচ্ছে-দাচ্ছে আর গদি-আঁটা খাটে নেটের মশারীর নীচে ঘুমচ্ছে, বিলেতের স্বপ্ন দেখছে আর তোমরা সবাই কুর্তা-জাঙ্গিয়া পরা অখাদ্য আহারী তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হয়ে রয়েছ?

সুশীল এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় নি।

কি আর জবাব দেবে?

সে যুগে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আনীত অসংখ্য রাজনৈতিক মামলার পুলিশী সাফল্যের পশ্চাৎপটে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, সেই ঢক্কানিনাদে বিঘোষিত সাফল্যের অনেকখানিই নির্ভরশীল ছিল কোনো সহকর্মী, বন্ধু; আত্মীয় বা কোন পরিজনের স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি অথবা সংবাদ সরবরাহের ওপর। সেই বিবৃতি বা সংবাদকে পাথেয় করেই পুলিশ মামলার তদন্ত শুরু করত এবং তার ফলেই এ্যাকশনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সামান্য যুক্ত ব্যক্তিও ধরা পড়ে যেত।

রবি ছিল ভবানীর সহপাঠী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। রবি কোন বিবৃতি না দিলেও বন্ধুকে অবশ্য রক্ষা করতে পারত না, কিন্তু তাহলে আর কেউ গ্রেপ্তার হত না, মামলা দার্জিলিং-এই ঠেকে থাকত, বেঁচে যেত কয়েকটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

পুলিশ গ্রেপ্তার করলে, বিশেষ করে হাতেনাতে ধরে ফেললে যে কখনও জামাই আদরে রাখবে না, সে ত জানা কথা। সে সব ভাল করে জেনেই ত রবি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল, এ্যাণ্ডারসনকে হত্যা করবার এ্যাকশনে সহপাঠী বন্ধুকে যেতে দেখে অনেকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগ দেবার জেদ দেখিয়েছিল।

সে জেদ দেখিয়েছিল বলেই যে তাকেই নিতে হবে, বিপ্লবী দলে এমন কোনো নিয়ম নেই। বরং অহেতুক অতি উৎসাহ দেখতে পেলেই মনোনয়নকারী বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। মেজর সত্য গুপ্ত ও তাঁর সহকর্মিদের সামরিক ধাঁচে সংগঠন এবং অনুশীলনের ফলে বি ভি দলে বেশ বড় রকম একটি সুইসাইড স্কোয়াড গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, এ্যাকশনের শেষে আত্মবলিদানে যে স্কোয়াডের ছেলেরা ছিল এক কথায় রাজী, কিন্তু তবু চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের পূর্বে আরও অনেক বেশী সাবধানতা অবলম্বনের অবকাশ ছিল না কি?

আমার মনে আছে, ১৯৩৪ সালে আমি যখন আমাদের গ্রামের বাড়ীতে অন্তরীণ ছিলাম, তখন তাজপুরগ্রামের ইন্দু সরকার আমায় বলেছিল, এমন দুটি ছেলে দিতে পারেন, যারা এ্যাকশনের শেষে আর ফিরে আসবে না বা ধরা দেবে না?

আমার সংগঠনে তখন বিভিন্ন গ্রামের অনেক ছেলে ছিল, যাদের মধ্যে সুইসাইড স্কোয়াডে যোগ দেবার মত সাহসী ছেলের অভাব ছিল না। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে এবং মনে মনে অনেক রকম যাচাই করে আমি ইন্দুকে বলেছিলাম, দুটি পারব না, একজনকে দিতে পারি।

তারপর অবশ্য ইন্দু আর একদিন জানিয়ে গেল, দরকার নেই, পাওয়া গেছে।

আমার ধারণা, রবির স্বীকৃতিমূলক বিবৃতির জন্য তার দুর্বলতা যতখানি দায়ী, ওকে যিনি নির্বাচন করেছিলেন, তাঁর নির্বাচনের ত্রুটিও ততখানি দায়ী। অবস্থার চাপে পড়ে রবি বাধ্য হয়ে বিবৃতি দিয়েছিল বলে প্রচার করে তার অন্যায় কাজকে হোয়াইট ওয়াশ করবার যেমন কোন কারণ নেই, তেমনি বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বি ভি-র একটানা জয়ের মধ্যে কোনও ত্রুটির ফলে যদি কখনও পরাজয় ঘটে থাকে, তাহলে সেই পরাজয়কেও যেন রেগুলার সৈনিকের

মতই নৈতিক সাহস দেখিয়ে মেনে নিতে পারি। সত্য গুপ্ত কি সেই শিক্ষাই দেননি ?

চল্লিশ ডিগ্রিতে কখনো সুশীলের সেলে, কখনো আমার সেলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে এই সব আলোচনা করতাম।

কিন্তু মাত্র পনেরো দিন, তারপরই এসে গেল জেল কর্তৃপক্ষের নয়া ফরমান, আমাকে ছয় ডিগ্রিতে স্থানান্তরিত করা হল।

আমরা দুজন কিন্তু উল্লসিত হয়ে উঠলাম, কারণ ওখানেই আছে রবি ব্যানার্জী। এবার মুখোমুখি রবির কৈফিয়ৎ শুনতে পাবার সুযোগ হল। জেলার সুধীর মুখার্জী একটা ভুল শোধরাতে গিয়ে আবারও যে কি ভুল করছে, মূর্খ তা বুঝতেও পারল না।

থালা বাটি কম্বল নিয়ে ছয় ডিগ্রিতে গিয়ে দেখলাম, এক নম্বর সেলে আছে রবি। ভাবলাম, তাড়াহুড়া কিসের, থাকতেই ত এসেছি, দু একদিন যাক, তারপর ওকে ধরা যাবে। দেখলাম, সত্যিই রাজপুত্রের মত চেহারা, খুব ফিটফাট থাকে, খাট বিছানা টেবিল চেয়ার চমৎকার করে সাজানো।

কিন্তু হায়, সুধীর মুখার্জী চালাক হয়ে গেছে, যে করেই হোক, জেনে ফেলেছে যে, আমি বি ভি দলের সদস্য, দলের কনফেসর, যার মারাত্মক বিবৃতির ফলে কয়েকটি ছেলে ও একটি মেয়ের সাজা হয়ে গেছে, তাকে হয়ত আমি ভাল চোখে দেখব না, ক্ষমা করব না, বাগে পেলে ছেড়ে দোব না।

তাই আমি পৌঁছবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল জেলারের পরবর্তী হুকুম। রবিকে স্থানান্তরিত করা হল চল্লিশ ডিগ্রিতে, আমার নাগালের বাইরে।

না, রবির সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

রবির স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হল, এবার সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বলি।

দুঃসাহসিক অভিযান বি ভি বিপ্লবী দলের পক্ষে তখন আর নতুন কিছু নয়। পুলিশের বড় কর্তা লোম্যানকে খতম করেছে তারা, শেষ করে দিয়েছে তারা জেলসমূহের বড় কর্তা সিম্পসনকে, যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে তিন বছরে মেদিনীপুরের তিন-তিনটে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে—পেডি, ডগলাস ও বার্জ, ঢাকার পুলিশ সুপার হডসনকে তারা পঙ্গু করে দিয়েছে চিরজন্মের মত, তাছাড়া অসংখ্য রাজনৈতিক ডাকাতি করে তারা সাংগঠনিক দক্ষতা, নির্ভুল পরিকল্পনা ও অতুলনীয় সাহসের স্বাক্ষর রেখেছে।

তাই ১৯৩৪ সালের ২২ এপ্রিল ঢাকা শহরে একটি গুপ্ত সভায় যখন প্রস্তাব উঠল যে, এবার খতম করতে হবে গভর্ণর এ্যান্ডারসনকে, সবাই এক বাক্যে তা সমর্থন করল। বিপ্লবী বীণা দাসের রিভলভারের গুলী আগেকার গভর্ণর জ্যাকসনের গায়ে লাগেনি বটে, কিন্তু ভয়ে আতঙ্কে সে বিলেতে চলে গেছে।

এ্যান্ডারসন হচ্ছেন জবরদস্ত প্রশাসক। এই জবরদস্ত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের এজেন্টটি যেন কোনক্রমেই ফসকে না যায়। তাই একজন নয়, যাবে দুজন, একই সঙ্গে চালাবে রিভলভার, ওকে শেষ করে রিভলভার নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিজেরাও শেষ হয়ে যাবে, পুলিশ যেন আর ঘটা করে মামলা সাজিয়ে বিচারের একটা প্রহসন করে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে বাহোবা না নিতে পারে।

এ্যান্ডারশন তখন সত্যিই জবরদস্ত গভর্ণর।

আয়ারল্যান্ডের গণচেতনা ও বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ দমন করবার জন্য একদা বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এ্যান্ডারসনকে পাঠিয়েছিল সেখানে, এ্যান্ডারসন চালিয়েছিল অমানুষিক অত্যাচার, কথায় কথায় ঘোড়সওয়ারের আক্রমণ, কথায় কথায় গুলীবর্ষণ ও বেয়নেট চার্জ, নারী ও শিশুনির্বিশেষে রেগুলেশন স্টীকচালনা, গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে বুটের লাথি, নির্জন হাজতে নিক্ষেপ করে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত রাখা, এ্যান্ডারসন আয়ারল্যান্ডে এমন অশ্রুতপূর্ব বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল—যার প্রবর্তিত পদ্ধতিকে বলা হত "ব্ল্যাক এ্যান্ড ট্যান নীতি"—যা কলঙ্কিত করে তুলেছিল বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আয়ারল্যান্ড শাসনের ইতিহাস।

ব্ল্যাক এ্যান্ড ট্যান নীতির প্রবর্তনকারী সেই ঐতিহাসিক জল্লাদকেই আবার পাঠানো হয়েছে ভারতবর্ষের বাছাই করা প্রদেশ বাংলায় এখানকার বৈপ্লবিক জাগরণ গুঁড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। বি ভি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল।

রিভলভার তুলে দেয়া হল ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জীর হাতে।

রবিকে নির্বাচনের বেলায় দ্বিধা ছিল। বড়লোকের ছেলে, বিলাসে ব্যসনে বড় হয়ে উঠেছে, তার হাতের অগ্নিনালিকা ঠিক সময়ে ঠিকভাবে অগ্নি উদ্গীরণ করবে কিনা, প্রাণ নিয়ে বিনা দ্বিধায় সে প্রাণ দেবার অটল সাহস শেষ পর্যন্ত দেখাতে পারবে কি না—কিন্তু রবির উৎসাহ প্রচণ্ড ভবানী তার প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠী, কোনো কাজেই একে অন্যকে ছাড়েনি, আজ প্রাণ দেবার আহ্বান আসতেই কি তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—মৈত্রী ভাবাবেগকে শেষ পর্যন্ত আর উপেক্ষা করা গেল না।

ওরা দুজন চলে এল কলকাতায়। নেতা জ্যোতিষ গুহের সঙ্গে গোপনে মিলিত হল। জ্যোতিষ গুহ প্ল্যান বললেন, কলকাতায় এ্যান্ডারসনকে বাগে পাওয়া যাবে না, যেতে হবে দার্জিলিং-এ, গ্রীষ্মের সময় ও যায় সেখানে, সেখানে ওর সিকিউরিটির ব্যবস্থায় খানিকটা শিথিলতা থাকতে পারে।

জ্যোতিষ গুহের প্ল্যান নিয়ে ভবানী ও রবি ফিরে এল জয়দেবপুরে।

সেখানে ২ মে আবার গুপ্ত বৈঠক বসল।

এ্যান্ডারসন তখন মারমুখী হয়ে উঠেছে। অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারী করে দলে দলে গ্রেপ্তার করে জেল ও বন্দীশিবির ভরে ফেলেছে, বড় লাটের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে তার সুপারিশক্রমে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জো-হুকুম মার্কা সদস্যদের সমর্থনে সংশোধিত করে নিয়েছে অস্ত্র আইন,

বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং আরও কয়েকটি সর্বভারতীয় আইন, যাতে খুশীমত যখন তখন বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করা যায়, বিনা বিচারে যতদিন খুশী আটক রাখা যায়, বাংলার রাজবন্দীদের প্রয়োজন বোধে গুজরাটে, পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে, এমন কি, সুদূর বর্মাতেও আটক রাখা যায় এবং কোন কোন আইন ভঙ্গের অপরাধে যাতে দীর্ঘতরো মেয়াদী দণ্ডে দণ্ডিত করা যায়।

কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত, এমন কি জীবন বিসর্জনেও যারা পশ্চাদপদ নয়, এ্যাণ্ডারসনের ব্ল্যাক ও ট্যান নীতিকে তারা কেন কেয়ার করবে ?

তাই জ্যোতিষ গুহের প্ল্যান জয়দেবপুরের বৈঠকে পুরোপুরি অনুমোদিত হল।

ভবানী ও রবি ট্রেনে দার্জিলিং রওনা হল।

পেঁছিল সেখানে ৪ মে।

উঠল তারা লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে।

দার্জিলিং-এ বেড়াতে কত লোকই ত আসে সারা বছর ধরে।

সুতরাং কে তাদের সন্দেহ করবে ?

প্ল্যানমত কলকাতা থেকে রওনা হল মনোরঞ্জন ব্যানার্জী আর উজ্জ্বলা মজুমদার।

ওরা গিয়ে উঠলা স্নো ভিউ হোটেলে।

ওদেরই বা কে সন্দেহ করবে ? উজ্জ্বল চেহারার কিশোর ও কিশোরী, এমনি জোড়ায় জোড়ায় হামেসাই আসে দার্জিলিং-এ প্লেজার ট্রিপে। ওদের সঙ্গে আবার একটা বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়াম। সুতরাং—

যে দেখল ওদের, সে-ই হয়ত অর্থবোধক মুচকি হাসল মাত্র।

কিন্তু উজ্জ্বলার ঐ নিরীহ বাদ্যযন্ত্রের খোলের মধ্যে যে একটি মারাত্মক যন্ত্র— একটি তাজা রিভলভার আত্মগোপন করে রয়েছে, তা কেউ জানতে পারল না।

লাট সাহেব শীতের দেশের মানুষ, বাংলা দেশের গরম সইতে পারেন না। তাই গ্রীষ্মের কটা মাস তিনি দার্জিলিং-এ থাকেন। ম্যালের কাছে পাহাড়ের ওপর বিরাট অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে, গভর্ণর হাউস। কিন্তু কলকাতা থেকে তিনি একা চলে এলে ত চলবে না, নিরীহ গোবেচারা বাংলার অধিবাসী ভারতীয় প্রজাদের শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখের ভার যাঁর স্কন্ধের ওপর ন্যস্ত, ব্ল্যাক এ্যাণ্ড ট্যান নীতির মুষল চালিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের মাথাগুলি দু ফাঁক করে ফেলবার পবিত্র দায়িত্ব পালনের শপথ নিয়ে যিনি সেই সাত সমুদ্রের ওপার থেকে বহুৎ মেহনত করে বাংলায় শুভাগমন করেছেন, তাঁর পক্ষে কি আর, গ্রীষ্মের মাত্র কটি মাস কেন, একটি দিনও একা একা দার্জিলিং-এ অবসর যাপন করা সম্ভব ? তাই এ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং-এ এসেছে তার সেক্রেটারীর দল, আমলা

কর্মচারীরা, পাইক বরকন্দাজ, বয় বাবুর্চি আর রাশি রাশি ফাইল। সঙ্গে, বলা বাহুল্য, পুলিশের বড় কর্তা থেকে শুরু করে মেজ, সেজ, ন, এমন কি, ছোট কর্তাও সদলবলে সশস্ত্র হাজির হয়েছেন দার্জিলিং শহরে।

গ্রীষ্মের কটি মাসের জন্য গোটা বাংলার প্রশাসন যেন দার্জিলিং-এ স্থানান্তরিত হয়েছে।

আবার রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য দেশের রাজা মহারাজা নবাব বাদশা রায় বাহাদুর রায় সাহেবরাও দার্জিলিং-এ এসে গভর্ণরের আশে পাশে ঘুর ঘুর করে ঘুরছেন হুজুরের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

অবশ্য সে যুগে, এ্যান্ডারসনের আর দোষ কি, গোটা ভারতবর্ষের রাজধানীই গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত শহর দিল্লী থেকে স্থানান্তরিত হত মনোরম শীতের শহর সিমলায়।

লাট সাহেব দার্জিলিং-এ এলেই সেখানে নানারকম ফাংশনের আয়োজন হত। ককটেল পার্টি, ডিনার ও বলড্যান্স, ফুলের প্রদর্শনী এবং ঘোড় দৌড়। দার্জিলিং-এর মত পার্বত্য শহরে শুধু লাট সাহেবদের আনন্দদানের জন্যই তৈরী হয়েছিল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রেস কোর্স লেবং-এর পাহাড় কেটে, খাদ ও গহ্বর ভরাট করে।

খবর পাওয়া গেল, একটি ফুলের প্রদর্শনীতে গভর্ণর আসবেন।

ভবানী ও রবি হাজির হল সেখানে ইয়োরোপীয়ান পোশাকে।

কিন্তু এত কড়াকড়ি যে, প্রদর্শনীর অভ্যন্তরে ঢুকতে পারল না তারা।

তারপর এল সেই স্মরণীয় দিবস, ১৯৩৪ সালের মে।

লেবং-এ আজ ঘোড়দৌড় হবে। গভর্ণরের কাপের প্রতিযোগিতা হবে। অবশ্যই এ্যান্ডারসন সেখানে যাবে। জনসাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।

সুতরাং এই হচ্ছে সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ।

সকাল হতেই মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে গেল। মনোরঞ্জন রিভলভার দুটো ভাল করে পরিষ্কার করল। উজ্জ্বলা হিটারের সামনে ধরে ধরে ও দুটো গরম করে তুলল। নাঃ, ঠিকই আছে পাশুপত অস্ত্র দুটি, বুলেটের ম্যাগাজিন ঠিকমতই রিভলভ করছে।

অপরাহ্ন হতেই ভবানী ও রবি পরল ইয়োরোপীয় পোশাক। ভবানী নিল পাঁচ ঘরা রিভলভার আর রবি সাতঘরা। প্রতিটি চেম্বারেই গুলী ভরা। সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত বুলেট। বলা যায় না, ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বিনয়, বাদল ও দীনেশের যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেছে, দার্জিলিং-এর লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে হয়ত তারই পুনরাবৃত্তি হবে, তাই অতিরিক্ত বুলেট। নইলে জল্লাদ এ্যান্ডারসনকে খতম করার জন্য দুই বন্ধুর দুটো বুলেটই যথেষ্ট।

একখানা ট্যাক্সিতে ওরা দুজন রওনা হল, ওদের অনুসরণ করল আরেকখানা। তাতে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা।

টিকিট কিনে ওরা দুজন মাঠে ঢোকবার সময় মনোরঞ্জন ইসারায় এ্যান্ডারসনকে চিনিয়ে দিল।

তারপর সহকর্মিদের সাফল্য কামনা করে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা ট্যাক্সি ঘুরিয়ে সোজা রওনা হল পঞ্চাশ মাইল দূরে শিলিগুড়ী অভিমুখে। সেখানে গিয়ে গুড বয় ও গুড গার্লের মত ওরা কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে নিরীহ যাত্রী ও যাত্রিণীর মত বসে রইল।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ঘোড় দৌড়ের মাঠ লেবং না দেখলে ঠিক বোঝানো যাবে না। দার্জিলিং শহর থেকে বেশ দূরে, শহরের অনেক নীচে, পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল কেটে তৈরী করা হয়েছে। গোলাকার বটে, কিন্তু দর্শকদের বসবার জন্য নেই তেমন কোন ভাল গ্যালারির ব্যবস্থা। দর্শকদের ভিড় ঠেকাবার জন্য অস্থায়ী-ভাবে কাঠের রেলিং খাড়া করা হয়েছে। শুধু একদিকে লম্বা শেড, তার নীচে উচ্চতর শ্রেণীর দর্শকেরা বসেন। রেস দেখবার জন্য কোনো বাইনোকুলারের প্রয়োজন হয় না।

সেই শেডের নীচেই গভর্ণরের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড। শান-বাঁধানো কয়েকটি ধাপের সিঁড়ি, ওপরে শান-বাঁধানো প্লাটফরম। সিঁড়ির দুধারে শান-বাঁধানো দেয়াল-রেলিং, প্ল্যাটফরমের তিনদিকে কোমর-সমান উঁচু দেয়াল। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডটি ঘিরেও তাই।

শহর থেকে দূরে হলে কি হবে, দর্শকের ভিড়। আজকের ভিড় আরও বেশী, কারণ গভর্ণরের কাপ খেলা হবে আর গভর্ণর স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিজেতার হাতে কাপটি তুলে দেবেন। রাজা, মহারাজা, শহরের গণ্যমান্য রেসবিলাসী জনগণ, সরকারী অফিসাররা সবাই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে গ্র্যান্ড স্টান্ড আলোকিত করে বসে আছেন বাংলার জবরদস্ত গভর্ণর স্যার জন এ্যান্ডারসন। পাশে যথারীতি এডিকং, স্ট্যান্ডের অদূরে পুলিশের কর্তারা ও সশস্ত্র পুলিশ, হয়ত দর্শকদের ভিড়ের মধ্যেও মিশে রয়েছে সাদা-পোশাক সশস্ত্র আই বি-র লোক।

রেস খেলা ও দেখার নেশায় মশগুল ওরা কেউ দেখেও দেখল না যে, গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে গভর্ণরের দুপাশে ইয়োরোপীয় পোশাকে দুটি কিশোর এসে দর্শকদের মধ্যে ভাল মানুষের মত আসন গ্রহণ করল।

রেস চলছে। রেস চলছে। রেস চলছে।

দর্শকদের হল্লাও চলছে।

কোন ঘোড়া জিতছে, কোন ঘোড়া হারছে।

জয়ী ঘোড়ার ওপর যারা বাজী রেখেছে, তারা উল্লাসে চীৎকার করে উঠছে। বাজীতে হারছে যারা, তাদের মুখ বেজার।

এমন সময় ঘোষিত হল, দিনের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ এবার গভর্ণরের কাপ খেলা হবে।

ঘোড়াগুলো সার বেঁধে দাঁড়াল স্টার্টার সংকেত করল, ঘোড়াগুলো বায়ু বেগে ছুটল। নেক টু নেক ছুটছে, কোনটা এগিয়ে যাচ্ছে দু ইঞ্চি, পেছনেরটা আবার মেক আপ করে ঠোঁট এগিয়ে দিচ্ছে, জকিরা ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে, প্রাণপণে চাবুক চালাচ্ছে, দর্শকদের উত্তেজনা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, হল্লা ও চীৎকারে পাহাড়-পর্বত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে, রেস চলছে, রেস চলছে।

রেস এবার শেষ হল।

স্মিতহাস্যে এ্যাণ্ডারসন উঠে দাঁড়াল।

এমন সময় অকস্মাৎ রিভালভারের শব্দ, দ্রাম!

ভবানী শান-বাঁধানো দেয়ালের ওপর ডান হাত রেখে মাত্র আট নয় ফুট দূর থেকে গুলী চালিয়েছে।

এ্যাণ্ডারসনের গায়ে গুলী লাগেনি।

আবার গুলী চালাল ভবানী।

এ্যাণ্ডারসনের এডিকং ততক্ষণে পাল্টা গুলী চালাল, পর পর চার বার।

আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভবানী। একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

রবি একবার উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের সামনে, সিঁড়ি বেয়ে উঠল দুটো ধাপ, তারপর গুলী করল মাত্র পাঁচ ফুট দূর থেকে। এ গুলীও লাগল না এ্যাণ্ডারসনের গায়ে, চকিতে সে সরে গেছে, গুলী লাগল তার স্টেনো মিস থর্টনের পায়ে।

আবার একটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল রবির ওপর। একজন সার্জেণ্টের গুলী এসে লাগল। রবিও ধরা পড়ে গেল।

কুখ্যাত গভর্ণর এ্যাণ্ডারসন বেঁচে গেল।

তার পরের কাহিনী সহজ সরল।

১৯৩৪ সালের ১৪ আগস্ট গঠিত হল স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল, প্রেসিডেণ্ট জে ইউনি, সদস্য আর এইচ পার্কার এবং এম. এইচ. এস, ফারুকি।

শুনানী তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। কারণ, ইংরেজের মতে, হিজ ম্যাজিস্টিজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আইনানুগ ভারতীয় প্রজাবর্গের জীবন, সম্পত্তি ও শান্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব যে স্বার্থত্যাগী রাজকর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত আছে, নৃশংসের মত তাদের হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত, সেই খুনীদের যত শীঘ্র সম্ভব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা দরকার।

তাই পর পর শুনানী চলতে লাগল দার্জিলিং-এ।

১২ সেপ্টেম্বর রায় দিলেন স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল ভবানী ভট্টাচার্য, রবি ব্যানার্জী ; অমিয়া ওরফে উজ্জ্বলা মজুমদারের প্রতি দুটি দণ্ড, যাবজ্জীবন দীপান্তর ও চোদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, তবে দুটি দণ্ড এক

সঙ্গে চলবে, সুকুমার ঘোষ ও মধুসূদন ব্যানার্জী দণ্ডিত হল চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে আর সুশীল চক্রবর্তীর বারো বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে।

যথারীতি আপীল দায়ের করা হল হাইকোর্টে।

মনোরঞ্জনের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর উজ্জ্বলার চৌদ্দ বৎসর। বাকী সবারই আপীল ডিসমিস হয়ে গেল।

ভবানী ও রবিকে সুস্থ করে তুলে খবর আদায়ের জন্য পুলিশ যখন হাজারো প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে কিছুই করতে না পেরে অবশেষে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল, রবি তখন সইতে না পেরে স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দিয়েছিল আর ভবানী বলেছিল নির্ভীক নিঃশঙ্ক কণ্ঠে, হ্যাঁ, আমি এ্যাণ্ডারসনকে হত্যা করতে এসেছিলাম, চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, গুলী তার গায়ে লাগেনি। আমি কোনো অন্যায় করিনি। এ্যাণ্ডারসনকে হত্যা করতে পারলে আমি অত্যন্ত খুশী হতাম।

১৯৩৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী রাজসাহী সেনট্রাল জেলে ভবানীর ফাঁসী হয়ে গেল।

বি ভি বিপ্লবী দলের শহীদ তালিকায় আর একটি নাম সংযোজিত হল।

ভবানী ভট্টাচার্য বাংলার গভর্ণর জন এ্যাণ্ডারসনকে লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে সেদিন হত্যা করতে পারেনি সত্য, কিন্তু শহীদের অবিস্মরণীয় অপরিম্লান স্মৃতি ব্ল্যাক এ্যাণ্ড ট্যান নীতি প্রবর্তকের কলঙ্কময় ইতিহাসকে ধ্বংস করেছে।

আলীপুরের 'এ্যাণ্ডারসন হাউস' নামীয় সেই বিশাল অট্টালিকাটি আজ রক্তাক্ত তিলক ধারণ করে ধন্য হয়েছে—'ভবানী ভবন।'

আক্রান্তের সমাধির ওপর আততায়ীর বিজয় বৈজয়ন্তী!

ফরাসী বিপ্লব মানুষের মনে এনে দিল এক অপরূপ আশার আলো—সে তার নিজের ওপরে বিশ্বাস।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর, প্যারিসের নোতারদাম গীর্জায় এক বিচিত্র উৎসবের আয়োজন হোল—মুক্তি ও যুক্তির উৎসব। যুক্তিবেদীরূপে সাজিয়ে বসানো হোক এক সুন্দরী মহিলাকে। সত্যের মন্দিরে চলল যুক্তির পুজা।

আদর্শবাদীর স্বপ্ন, মানুষের চিরকালের স্বাধীনতা পিপাসা ঐ একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠল আর তারপরেই নেমে এল অন্ধকার, এই আন্দোলনের নেতাদের হত্যা করা হোল গিলোটিনে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের একুশ বছর পরে

কুখ্যাত কালা কানুন রাওলাট এ্যাক্ট, ইংরেজ সরকার যার গালভরা গুরুগম্ভীর নাম দিয়েছে দি এ্যানারকিক্যাল এ্যান্ড রিভলিউশনারী ক্রাইমস এ্যাক্ট। ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাশ হয়ে গেল। রাজার জাত সাহেব হোম মেম্বারের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী, আমাদের ভারতীয় প্রজাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করবার যে পবিত্র দায়িত্ব আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে চলেছি, মাঝে মাঝে কতকগুলো মতিচ্ছন্ন লোক তাতে বাধার সৃষ্টি করছে আর তাদের সেই অপকার্যে উসকানি দিচ্ছে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি, সুতরাং গভর্ণমেণ্টের হাতে আরও ক্ষমতা দেবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে—এই বাণীই তো বাইবেলের ভার্স, মথিলিখিত সুসমাচার। তাই পরিষদে যে মুষ্টিমেয় যো-হুকুম ও মোসাহেব-মার্কা ভারতীয় সদস্য ছিল, তাদের হিজ মাস্টারস ভয়েস কণ্ঠে সমবেতভাবে উচ্চারিত হল, বটেই তো। বটেই তো। হয়তো দু একজন ছিলেন অসমসাহসিক, স্পেডকে স্পেড বলে থাকেন, হোম মেম্বারের কথা ভগবানের বাণী বলে মেনে নিতে রাজী নন, হয়তো সেই দু একজন প্রতিবাদের হাত তুলেছিলেন, কিন্তু বিপুল সমর্থনের বন্যায় সেই প্রতিবাদ তৃণের মতো ভেসে গেছে।

রাওলাট এ্যাক্টের নানা বিধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

গভর্ণমেণ্ট হুকুম জারি করে সংবাদপত্রে বা পত্র পুস্তিকায় কোন মামলার বিবরণ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিতে পারবেন,

আঘাত, ডাকাতি, অনধিকার প্রবেশ, অপরাধ করবার জন্য প্ররোচনার অপরাধে যে কোন আদালত যে কোন দণ্ড দান করতে পারবে এবং উচ্চতর আদালত কর্তৃক সেই দণ্ড কনফার্ম করবার প্রয়োজন হবে না,

যে দণ্ড দেয়া হবে, তার বিরুদ্ধে কোন আপীল, এমন কী হাইকোর্টেও আপীল করা চলবে না।

পাঞ্জাবের তিনটি জেলায় সামরিক আইনের শাসন অবশ্য আগে থেকেই জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করেছিল। এই নতুন আইনের কথা প্রকাশিত হবার পরই গান্ধীজী বোম্বে থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে, এই আইনের ধারাগুলি পড়লেই বোঝা যায় আইন-প্রণেতারাই সুস্থ নন।

২৪ মার্চ গান্ধীজী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য অনশন করলেন।

স্থির হল, ৩০ মার্চ সমগ্র দেশে শোক ও অবমাননা দিবসরূপে পালন করা হবে।

৯ এপ্রিল গান্ধীজী দিল্লী রওনা হলেন।

পরদিন কোশি কালান রেল স্টেশনে ট্রেনের কামরাতেই তাঁর ওপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, আপনি দিল্লী বা পাঞ্জাবে যেতে পারবেন না। তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে মথুরায় পাঠানো হল। গান্ধীজী সরকারী হুকুম অমান্য করে আবার পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে বোম্বে নিয়ে এসে নয়া হুকুম জারী করে, আপনার বোম্বের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ।

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার ফলে ক্ষেপে উঠল পাঞ্জাবের জনসাধারণ।

দিল্লীতে হল সাধারণ ধর্মঘট।

লাহোরে ও অমৃতসরে দাঙ্গা দেখা দিল।

পুলিশ তো এটাই চাইছিল। দাঙ্গা দমনের নামে দলে দলে রাস্তায় নামল সশস্ত্র পুলিশ, এলোপাথারি গুলী চালান, বহু সংখ্যক নরনারী রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। লাহোরে ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণে চারজন ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রাণ হারাল। ১১ এপ্রিল গান্ধীজী বোম্বে শহরে এক বিশাল জনসভায় জনগণ ও গভর্ণমেণ্ট দুপক্ষকেই শান্ত হবার জন্য আবেদন জানালেন। ১২ এপ্রিল কলকাতা শহরে ও সারা বাংলায় পাঞ্জাবে পুলিশের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অসংখ্য সভার অনুষ্ঠান হল। ধিক্কার দেয়া হল গভর্ণমেণ্টকে।

তারপর এল সেই চিরস্মরণীয় দিনটি। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল। জালিয়ানওয়ালাবাগে বৈশাখী মেলা। হাজার হাজার নরনারীর আনন্দ সমাবেশ।

যেন ছুরি শানাচ্ছিল দুটি জল্লাদ আগে থেকেই। পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও'ডায়ার আর সামরিক বাহিনীর জেনারেল ডায়ার। জালিয়ানওয়ালাবাগে সমাবেশ দেখে ওরা বুঝি হেসেছিল পৈশাচিক হাসি, এসেছে, সুযোগ এসেছে!

গভর্ণর ও'ডায়ার হুকুম দিলেন অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনারকে, ডেপুটি কমিশনার খবর পাঠালেন জেনারেল ডায়ারকে, ডায়ার এসে পৌঁছলেন সদলবলে ১১ এপ্রিল বিকেলে। এক জল্লাদ ও'ডায়ার ডেকে পাঠাল আর এক জল্লাদ ডায়ারকে। দুই জল্লাদের যোগসাজসে ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ উত্তাল হয়ে উঠল মানুষের রক্তস্রোত, আর্তচিৎকারে চৌচির হয়ে ফেটে গেল আকাশ, সেই নারকীয় গণহত্যা দর্শনে স্তম্ভিত অভিভূত পৃথিবী বুঝি ভুলে গেল তার আহ্নিক গতি।

কিন্তু বন্দুক দিয়ে ভয় দেখানো চলে, শাসন করা চলে না। ও'ডায়ার আর ডায়ার ভেবেছিল রাইফেল আর মেসিন গানের ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে যত গণবিক্ষোভের আবর্জনা, সন্ত্রাসের বিভীষিকা সৃষ্টি করে জানিয়ে দেবে বৃটিশ সিংহের থাবা কতখানি শক্তিশালী ও মারাত্মক! কিন্তু জানত না মূর্খদ্বয় যে, শত নির্যাতন সহস্র অত্যাচারেও প্রতিবাদের গণকণ্ঠ কখনও চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দেয়া যায় না।

তাই সমগ্র দেশব্যাপী শুরু হল প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল। কেউ ডেকে আনল না কাউকে, কোন সংগঠক নেই, ব্যবস্থাপক নেই, নেতা নেই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে ঘর ছেড়ে পথে নেমে এল মানুষ, সমুদ্রতরঙ্গের মতো প্লাবিত করল শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম।

অবশেষে বাধ্য হয়ে গভর্ণমেণ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করলেন, পাঞ্জাব ডিসঅর্ডারস এনকোয়ারী কমিটি ছোট করে যাকে বলা হয়, হাণ্টার কমিটি।

সেই হাণ্টার কমিটির সমক্ষে বিবৃতি প্রসঙ্গে নির্লজ্জের মতো বলল ডায়ার যে, জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলীচালনা খুব যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। সভা করার নিষেধাজ্ঞা মানল না যারা, গুলীবর্ষণ শুরু করবার আগে নিয়ম অনুযায়ী তাদের আর ওয়ার্নিং দেবার দরকার কি? সুতরাং সৈন্যদের ফায়ারিং পজিশনে দাঁড় করিয়ে অবিশ্রান্ত গুলী চালাতে আদেশ দেয়া হল।

যদিও তখনও সামরিক আইন ঘোষণা করা হয়নি এবং যদিও সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী গুলী চালনা শুরু করবার আগে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক, তথাপি জল্লাদ ডায়ার তাচ্ছিল্যভরে বলল, ওটার কোনো প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করিনি আমি।

কমিটির অন্যতম সদস্য বিচারপতি র‍্যাংকিন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা জেনারেল, আপনার কাজ কি বিভীষিকা সৃষ্টি করেনি?

না, মোটেই না, ডায়ার জবাব দিল, বরং আমি দয়া প্রদর্শন করেছি বলা যেতে পারে, কারণ আমি এমনভাবে এতক্ষণ গুলী চালিয়েছি, যাতে অপর কাউকে আর গুলী চালনার জন্য ডাকতে না হয়।

প্রশ্ন ঃ গুলীচালনা শেষ হলে আহতদের হাসপাতালে পাঠাবার জন্য আপনি কোন ব্যবস্থা করেছিলেন কি?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই না। সে দায়িত্ব আমার নয়। হাসপাতালগুলি খোলাই ছিল, আহতরা ইচ্ছে করলেই সেখানে যেতে পারত।

আপনার গুলী চালনার ফলে চার পাঁচশো লোক প্রাণ হারিয়েছে, আপনি কি মনে করেন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট আপনার কাজ অনুমোদন করবেন?

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, করবেন।

আপনি কি মনে করেন না যে, আপনি বৃটিশ জাতির আদর্শবিরোধী কাজ করেছেন?

না, মোটেই না। আমি ঠিক কাজই করেছি এবং সেজন্য আমার প্রাপ্য ধন্যবাদ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দুদিন পর গুজরান-ওয়ালা, লাহোর ও অমৃতসরে সামরিক আইন জারী করল দ্বিতীয় জল্লাদ ও'ডায়ার।

প্রকাশ্য রাজপথে উলঙ্গ করে হাত পা বেঁধে বেত মারা হল যাদের তাদের মধ্যে কজন ছিল স্কুলের ছাত্র। বাঘের খাঁচার মত লোহার খাঁচা তৈরী করে

শহরের প্রধান প্রধান স্থানে রাখা হল আর তার মধ্যে আটকে রাখা হল গণমান্য ব্যক্তিদের। হাতকড়া এঁটে মধ্যাহ্নের প্রখর তাপের মধ্যে খোলা ট্রাকের ওপর বন্দীদের গাদাগাদি করে ফেলে রাখা হল। বহু সম্পত্তি দখল করা হল, বহু বাসগৃহের বৈদ্যুতিক সংযোগ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা কেটে দেয়া হল। নির্দিষ্ট কতকগুলি রাস্তায় বাধ্যতামূলক হামাগুড়ি দিয়ে ও লাফিয়ে চলা প্রবর্তন করা হল। ভারতীয়দের বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে সেখানে ইউরোপীয়দের বসবাসের জায়গা করা হল। সামরিক আইন ভঙ্গের অপরাধে বহু লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল এবং কার্যকরী করা হল সেই চরম দণ্ড।

এই সব বর্বরোচিত ব্যবস্থার ও অমানুষিক অত্যাচার যাঁর পরোক্ষ সমর্থনে অবাধে চলছিল পাঞ্জাবে, তিনিই সেই স্বনামধন্য গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার।

কিন্তু মনে মনে ছিল তার সীমাহীন ভয়। জানত যে, ভারতীয় বিপ্লবীদের কালো খাতায় তার নাম উঠে গেছে; বলা যায় না কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে তাদের ফায়ারিং স্কোয়াড এগিয়ে আসবে! তাই জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার মাত্র দেড় মাস পর ২৬ মে মাইকেল ও'ডায়াব গভর্ণরের চার্জ অপরকে বুঝিয়ে দিয়ে সপরিবারে ভারতের উপকূল ত্যাগ করে ছুটল দেশের দিকে।

সেখানে কিন্তু আর ধিক্কার নয়, সাড়ম্বর সম্বর্ধনা! সমবেত অভিনন্দন।

হে ধীমান, তুমি যে অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত শাসন-মুষল ঘুরাইয়া ভারতের বিদ্রোহী কালা আদমীদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়াছ, তাহার তুলনা নাই।

হে শক্তিধর, জেনারেল ডায়ারকে নিয়োগ করিয়া জালিয়ানওয়ালাবাগে কয়েক হাজার আইন ভঙ্গকারী নরনারীকে—শিশু, বালক, বালিকা, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিহত ও আহত করিয়া তুমি যে কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছ, ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে উহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

হে দেশহিতৈষী, বিদেশে তুমি স্বদেশবাসীর মান বাঁচাইয়াছ, তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছ, তোমার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

ঘটা করে ডাকা সভায় ফুলের তোড়ার সঙ্গে মাইকেল ও'ডায়ারের হাতে স্বদেশবাসীদের কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ তুলে দেয়া হল বিশ হাজার পাউণ্ডের একটি তোড়া।

তারপর দিন গড়িয়ে যেতে লাগল।

দিন গড়িয়ে মাস।

মাস গড়িয়ে বছর।

বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল।

বার্ধক্যে উপনীত ও'ডায়ার ভুলে গেল পাঞ্জাবের কথা।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতবাসীর স্মরণ-মন্দিরে প্রদীপের মতো জ্বলতে লাগল।

একুশ বছর পর।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসের ৩ তারিখ।

পাঞ্জাবের অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার সপরিবারে বসবাস করে কেন্সিংটনে। রয়েল সেণ্ট্রাল এসিয়ান সোসাইটি এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের যুক্ত উদ্যোগে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে সেদিন অপরাহ্নে ক্যাক্সটন হলের টিউডর কক্ষে। সভাপতি লর্ড জেটল্যাণ্ড। বক্তৃতার বিষয়, আফগানিস্থান।

সময়মত সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ল ও'ডায়ার। ভৃত্যকে বলে গেল যে, সভা শেষ হতেই ফিরে আসবে সে পাঁচটার মধ্যেই, এসে চা খাবে।

অনেক দিন আগে, ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেই একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিল ও'ডায়ার, ইণ্ডিয়া এ্যাজ আই নিউ ইট। ভারত ও ভারতবাসীর কেচ্ছা এত সুন্দর করে তাতে বর্ণনা করা হয়েছিল যে ইংলণ্ডের পাঠকসমাজে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। কিন্তু ইংলণ্ড-প্রবাসী অথবা সাময়িকভাবে ইংলণ্ডে আগত ভারতীয়েরা সেই গ্রন্থখানি ও গ্রন্থকারকে সুনজরে দেখেনি। তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। সবাই ভুলে গেছে। ভারত সম্বন্ধে তার তীব্র সমালোচনা ও অবমাননাকর মন্তব্য দেশে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে, তাই ভারত বা তার আশেপাশের কোন দেশ সম্বন্ধে কোন আলোচনা-সভা হলেই তার আমন্ত্রণ আসে।

আমন্ত্রিতেরা সবাই এসে গেছেন। এসে গেছে শ্রোতৃবর্গও। টিউডর কক্ষ মানুষে মানুষে ভর্তি হয়ে গেছে। প্ল্যাটফরমের ওপর সভাপতি লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে স্যার মাইকেল ও'ডায়ার উপবিষ্ট।

সভা শুরু হবার কথা, সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত হবার ঠিক পূর্বক্ষণে, কেউ লক্ষ করল না এবং লক্ষ করবার মতো কোন কারণও ছিল না—একটি শিখ যুবক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে সম্মুখ থেকে চার পাঁচ সারি পেছনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন বক্তার ভাষণ শুনতে লাগল। সে তো আর একা দেয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়নি যে সবার চোখে পড়বে। তার আশেপাশে আরও শ্রোতা, বসবার স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সভা শেষ হল অপরাহ্ণ ঠিক সাড়ে চারটায়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালাও শেষ।

শ্রোতারা সভাকক্ষ ত্যাগ করতে লাগল। এমন সময়—

এমন সময় অকস্মাৎ শোনা গেল রিভলভারের গর্জন, পরপর পাঁচ ছয়বার।

শ্রোতারা বেরিয়ে যাবার মুখে অকস্মাৎ সেই শিখ যুবকটি ভিড়ের মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল প্ল্যাটফরমের দিকে, পকেট থেকে ঝটিতি বার করল রিভলভার, পর পর গুলী করল প্ল্যাটফরম লক্ষ করে।

হুড়োহুড়ি শুরু হল। হৈ চৈ শুরু হল। যে যেদিকে পারে, ছুটতে চেষ্টা

করল। যুবকটিও চীৎকার করে উঠল, সরুন, সরুন, রাস্তা দিন, যেতে দিন। দরজার দিকে ছুটল সে।

কিন্তু বাধা দিল জনতা। তারা চিনেছে এই যুবকই রিভলভার চালিয়েছে।

ধ্বস্তাধ্বস্তি করল সে। পারল না। একা কি করে পারবে এত লোকের সঙ্গে?

ধরা পড়ে গেল সে।

কে কে এই শিখ যুবক? কি তোমার নাম? কেন গুলী চলালে? কাকে হত্যা করলে?

জানা গেল যুবকের আসল নাম উধম সিং, লণ্ডনের বন্ধুরা জানে, রাম মহম্মদ সিং, দেশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আমি গুলী চালিয়েছি মাইকেল ও'ডায়ারকে খতম করবার জন্য, দৃঢ়স্বরে জবাব দিল সে।

প্রথম গুলীর আওয়াজেই বিদ্যুৎবেগে আসন ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল বৃদ্ধ ও'ড়ায়ার, কিন্তু পরক্ষণেই পরপর দুটি বুলেট তার পিঠ দিয়ে ঢুকে একেবারে ফুসফুস ফুটো করে দিয়েছে। প্রাণহীন ও'ডায়ারের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে প্ল্যাটফরমের ওপর।

তার পরের ঘটনাবলী সহজেই অনুমেয়।

পরদিনই আদালতে হাজির করা হল উধম সিংকে।

মামলা ২ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হল।

২ এপ্রিল শুরু হল মামলা।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলি আদালত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করে সবিস্তারে পেশ করলেন মামলার বিবরণ। যাকে বলে, ঠাণ্ডা মাথায় মার্ডার। কোন প্ররোচনা নেই, উত্তেজনার কোন কারণ নেই। নিহত মাইকেল ও'ডায়ার আজ থেকে একুশ বছর আগে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন, আইন ও শৃংখলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন সুযোগ্য অফিসাররূপে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। পাবলিক সার্ভিস করতে গিয়ে হয়তো কখনো কখনো তাঁকে আনপ্লেজেণ্ট কাজও করতে হয়েছে। কিন্তু একুশ বছর আগে কত বয়স ছিল আসামীর? সে শিশুর বেশী ছিল না। আদালতকে বিবেচনা করতে হবে আসামী কতখানি দুর্দান্ত প্রকৃতির যে বড় হয়ে লোকের মুখে শুনে অথবা হিংসামূলক প্রচারকার্যে বিশ্বাস স্থাপন করে সেই সুদূর ভারত থেকে এখানে এসেছে নরহত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি মনে করি, আসামী বিন্দুমাত্র লিনিয়েন্স পাবার যোগ্য নয় এবং নরহত্যার অপরাধে দণ্ডদান করলেই আইনের মর্যাদা রক্ষিত হবে।

আদালত উধম সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোন প্রশ্ন আছে?

উধম সিং জবাব দিল, কোন প্রশ্ন নেই।

সুতরাং নিম্ন আদালতের মামলা কৌঁসুলির ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল।

আদালত আসামীকে ওল্ড বেইলি ক্রিমিন্যাল কোর্টে সোপর্দ করলেন।

সেই কোর্টে মামলার শুনানীকালে অকুতোভয় উধম সিং বিবৃতি প্রসঙ্গে বলল, হ্যাঁ, আমি মাইকেল ও'ডায়ারকে হত্যা করেছি। বহু বৎসর আগে ভারতে সে যা করে এসেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে সে। আমার নিজের জন্য ভাবি না। মরতে ভয় পাই না আমি, কারণ আমি মরছি আমার দেশের জন্য।

ও'ডায়ার ব্যক্তিগতভাবে তো তোমার কিছু করেনি, তার ওপর এত আক্রোশ কেন তাহলে?

আক্রোশ আমার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল উধম সিং। ও'ডায়ার ছিল সেই সাম্রাজ্যবাদেরই একজন এজেণ্ট। অন্ততঃ একজন এজেণ্টকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলাম। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের ফলে আমার দেশের মানুষকে উপবাসে মরতে দেখেছি। সুতরাং আমার কর্তব্য ছিল যা, তাই করেছি।

জান, ওই অপরাধের কি শাস্তি হতে পারে?

উধম সিং জবাব দিল, আমি তা গ্রাহ্য করি না। জানি, আমার দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বছর জেল হতে পারে কিংবা হতে পারে ফাঁসী। ওতে পরোয়া করি না আমি।

চরম দণ্ডেই দণ্ডিত করা হল তাকে।

১৯৪০ সালের ১২ জুন লণ্ডন শহরের জেলে উধম সিং-এর ফাঁসী হয়ে গেল।

ভারতের অগণিত শহীদ ফাঁসীর রজ্জুতে আত্মবিসর্জন করে ভারতের বিভিন্ন জেলে যে অগণিত শহীদ-তীর্থ সৃষ্টি করে গেছেন, সেই তীর্থতালিকায় আরও একটি নাম সংযোজিত হল, লণ্ডনে উধম সিং-এর শহীদ-তীর্থ!

বিপ্লব-ঋষি

[কয়েকজন প্রবীণ বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ]

ভূমিকা

দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে ফেলবার মানসে যেসব বিপ্লব-ঋষি এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেছিলেন, বার্ধক্যের স্বাভাবিক কারণে তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ লোকান্তরিত। যে কজন এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, তাঁদের সবারই বয়স নব্বই-এর কাছাকাছি, কেউ কেউ নব্বই-ও বেশ পেছনে ফেলে গেছেন। লোলচর্ম, ক্ষীণদৃষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য অথবা রীতিমত অসুস্থ। তথাপি, এখনও স্মৃতির অতলস্পর্শতা থেকে ডুবুরীর মতো কিছু কিছু মণি-মাণিক্য তুলে আনতে পারেন!

আমি এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম ও প্রশ্ন করেছিলাম। ১৯৭৪-৭৫ সালে আমার সাক্ষাৎকারের বিবরণ গল্প-ভারতী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত করবার জন্য বিপ্লব-ঋষিরা যেসব লোমহর্ষক তথ্য ও ঘটনার কথা বলেছেন, তার প্রায় কোনটাই প্রবন্ধ বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। যাঁরা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও তিনজনকে আমরা হারিয়েছি।

স্বর্গতঃ সেই বিপ্লব-ঋষিদের উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্ধর্ষ প্রবীণ বিপ্লবী নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত

বাড়ীটা কোন রোড-এর ওপর নয়, রোড থেকে একটু ভেতরে। অথচ ঠিকানায় 'রোড' আছে।

তবে আপনাকে বাড়ীর নম্বর খুঁজতে হবে না। ও অঞ্চলে গিয়ে যে-কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই বাড়ীটা দেখিয়ে দেবে।

কারণ সবাই ওঁকে চেনে।

শুধু চেনে নয়, ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, আপনজন মনে করে।

কেন করবে না ? যে-কোন লোক যে-কোন ব্যাপারে ঠেকে গিয়ে ওঁর কাছে গেলেই সৎ পরামর্শ পাবে। শুধু পরামর্শ নয়, ওঁর সাধ্যায়ত্ত সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হবে না। হয়ত একখানা সার্টিফিকেট কিংবা একখানা চিঠি, আবেদন-পত্রের কোণে দু লাইন সুপারিশ কিংবা একটা ফোন। কোথাও যাবার প্রয়োজন বোধ করলে তাও যাবেন।

সমাজকল্যাণমূলক যে-কোন কাজে তাঁকে পাওয়া যায়। শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরেও। আমি তাঁকে বাসের ভিড় ঠেলে উঠতে দেখেছি, উঠতে দেখেছি চলন্ত ট্রামে। এ্যাকসিডেণ্টেও পড়েছেন, হাসপাতালে থাকতে হয়েছে।

তারপর আবার যে-কে সেই।

ইনিই হচ্ছেন মনোরঞ্জন গুপ্ত। দলমতনির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য তাঁর দ্বার অবারিত। উৎসাহ, উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার অফুরন্ত আধার। পেছনে ফেলে এসেছেন সুদীর্ঘ চুরাশীটি বৎসর, কিন্তু কর্মদ্যোতনায় আজও মনোরঞ্জনদা যেন চব্বিশ বৎসরের তরুণ।

আমার সঙ্গে মনোরঞ্জনদার প্রথম পরিচয় কবে? সেই ১৯২৮ সালে। আমাদের বিপ্লবী দলের অধিনায়ক সত্যভূষণ গুপ্ত একদিন আমায় বলেছিলেন, আমাকে কোন কাজের সময় যদি হাতের কাছে না পাও, তাহালে সব জানাবে বরিশাল শঙ্কর মঠ গ্রুপের মনোরঞ্জন গুপ্তকে। তাঁর নির্দেশমত কাজ করবে, তাঁকেও না পেলে ঐ দলের যাঁকে পাবে, তাঁর নির্দেশেই চলবে।

তারপর ডন নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, পৃথিবী তার অক্ষ ঘিরে অসংখ্য বার ঘুরপাক খেয়েছে, কক্ষপথ পরিক্রমা করেছে অনেক বার। কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডী পেরিয়ে আজ আমি বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত, কিন্তু আজও মনোরঞ্জনদার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা রয়ে গেছে পারিজাতের মতই অপরিম্লান!

মনোরঞ্জনদার দেশ বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অধীন আধুনা গ্রামে।

উনি বাটাজোড় গ্রামের হাইস্কুল থেকে ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, তারপর ঐ সালেই এসে বরিশাল শহরের ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। তখন ওঁর বয়স উনিশ বৎসর। স্কুলে থাকতেই অনন্তকুমার সেনের প্রভাবে ভগবদারাধনা ও অধ্যাত্মসাধনা করতেন। মনোরঞ্জনদা স্কুলে থাকতেই ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

সহপাঠী ও বন্ধু মাহিলাড়া গ্রামের হীরালাল দাশগুপ্ত যে স্কুলে থাকতেই একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠন করেছিলেন, তা উনি জানতেন। হীরালাল বন্ধুকে দলে টানবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ধর্মভাবাপন্ন মনোরঞ্জন বিপ্লবীদের হিংসামূলক কাজকর্ম ধর্মসঙ্গত নয় বলে যোগ দিতে রাজী হলেন না।

তারপর দুজনে একই কলেজে ভর্তি হলেন।

দুজনের মধ্যে হীরালালই প্রথম বরিশালের বিপ্লবী দলে যোগ দেন।

হঠাৎ একদিন হীরালাল কিছু না বলেই মনোরঞ্জনকে নিয়ে এল ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্রের কাছে। ইনি প্রথমে ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পরে হন ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্র এবং আরও পরে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী। ১৯১২ সালে জমি কিনে তিনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম রাখা হয় 'শংকর মঠ'।

ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্রের সঙ্গে মনোরঞ্জনদার কয়েক দিন ধরে আলোচনা চলল। বিপ্লবীদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, তাদের ক্রিয়াকাণ্ড ধর্মসঙ্গত নয়, মনোরঞ্জনদার এই অভিমতের জবাবে ব্রহ্মচারী যা বলেছেন, আজও মনোরঞ্জনদার তা স্পষ্ট মনে আছে।

বলেছিলেন—ধর্ম কি? ধর্ম কাকে বলে? গুরু গোবিন্দ সিং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেছেন,

হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

শিখদের ধর্মগুরু একথা বলেছেন, একথা কি ধর্মসঙ্গত নয়? গীতা হচ্ছে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে, কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে ধর্ম। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক কর্ম নিশ্চয়ই নিষ্কাম কর্ম।

তাঁর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেন মনোরঞ্জনদা। মনোরঞ্জনদার কথাতেই বলি— আমার কানে একটি সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি বললেন, আমার কানে তুমি ফের এই মন্ত্র উচ্চারণ কর। আমি তা করতে তিনি বললেন, মন্ত্র দিয়ে

ফিরিয়ে নিলাম। তোমাকে এই মন্ত্র জপ করতে হবে না, এ সম্বন্ধে যা করবার আমিই করব। আমার ওপরই রইল সব ভার। তুমি শুধু দেশোদ্ধারের জন্য রাজনীতি করবে, আজ থেকে তুমি দেশোদ্ধারের ব্রতে উৎসর্গীত প্রাণ।

মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন, এক কথায় বলা যায়, ১৯০৯ সালে আমি যখন ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্র (পরে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী) পরিচালিত বরিশাল বিপ্লবী দলে যোগদান করি, যুগান্তর নামে কোন বিপ্লবী দল তখন জন্মলাভ করেনি। বস্তুতঃ, যুগান্তর দল কতকগুলি বিপ্লবী গ্রুপের ফেডারেশনের মত ছিল। আমাদের দলের জনপ্রিয় নাম ছিল, বরিশালের শংকর মঠ গ্রুপ। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ-শত্রু জার্মানীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গুলিবারুদ আনিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে যে দল ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেছিল, সে দলের নেতা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। কলকাতায় তাঁর নিজের গ্রুপ ছাড়া যে কটি গ্রুপ তাঁর নেতৃত্বাধীনে সে সময় কাজ করেছিল, সেগুলো হচ্ছে, আমাদের শংকর মঠ গ্রুপ, ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ পরিচালিত ময়মনসিংহ গ্রুপ, ফরিদপুরের পূর্ণ দাসের গ্রুপ এবং উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় সংগঠিত যতীন রায়ের দল নামে পরিচিত উত্তরবঙ্গ গ্রুপ।

বিশ্বযুদ্ধের পরে এই পাঁচটি গ্রুপেরই যুক্ত নাম হয়েছিল, যুগান্তর দল।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পত্রিকা 'যুগান্তর' তখন অগ্নিক্ষরা ভাষায় বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এই অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা যুগান্তর থেকেই 'যুগান্তর দল' নামটা এসে যায়। বলতে গেলে এ নামটা পুলিশেরই দেয়া। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ চার্লস টেগার্ট এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্গদেশের বিপ্লবী দলগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক দল ঢাকার অনুশীলন সমিতি দলভুক্ত, যে সমিতির পরিচালক পুলিন দাস। এদের মুখপত্র "স্বাধীন ভারত" ইস্তাহার, যা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় দল ঢাকায় নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করে কলকাতায় নেতৃত্ব সংগঠনের জন্য লালায়িত। এদের মুখপত্র ভূপেন দত্ত সম্পাদিত "যুগান্তর" পত্রিকা। এদের যুগান্তর দল বলা যায়। বিপিন গাঙ্গুলীর সংগঠিত "আত্মোন্নতি সমিতি"-কেও যুগান্তর দলভুক্ত বলা যায়।

মনোরঞ্জনদা আরও বললেন, হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গ্রুপ, যারা "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স" নামে পরিচিত, সেই গ্রুপ পরে যুগান্তর দলে যোগদান করে।

আমার পরের প্রশ্নঃ আপনাদের দলের মানে, বরিশাল শংকর মঠ দলের আপনি তো আছেনই, তাছাড়া আরও ক'জন খ্যাতনামা জীবিত অথবা মৃত বিপ্লবীর নাম বলুন।

বললেন, অনেকেরই নাম মনে পড়ছে, যাঁরা সংগঠনকার্যে, কর্তব্যনিষ্ঠায় ও অসমসাহসিক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিজের নিজের স্বাক্ষর রেখে স্মরণীয় হয়ে

রয়েছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম বলছি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, নরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরী, অরুণচন্দ্র গুহ, অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী, সতীন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রকুমার গুহ, তারকেশ্বর সেনগুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীরকুমার আইচ, শচীন করগুপ্ত, কান্তিরঞ্জন চাটার্জী প্রভৃতি।

কথা বলছিলাম ওঁর বৈঠকখানা ঘরে বসে। আমাদের সামনে নীচু একটি বেতের টেবিল, ক্লথ দিয়ে ঢাকা। ওপারে বেতের সোফায় উনি, আর এপাশে ডবল সিটের সোফায় আমি। তখন সকাল সাতটা।

ঘরের বাইরে বারান্দা। এক পাশে একখানা চৌকি, মাদুর দিয়ে ঢাকা। সামনে ছোট্ট প্রাঙ্গণ, সীমান্তে লোহার গেট। গেটের বাইরে গলিপথ। সেই পথে লোকজন যাতায়াত করছে।

বেশ নীচু গলায় কথা বলেন মনোরঞ্জনদা। সহজ সরল ভাষা, তাপ উত্তাপ নেই। কিন্তু আছে তথ্য, আছে যুক্তি।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মনোরঞ্জনদা, আপনার কর্মকেন্দ্র কোথায় ছিল?

কর্মকেন্দ্র সারা বাংলা দেশই বলতে পার, উনি বললেন। তবে হ্যাঁ, প্রধানতঃ আমার নিজের জেলা বরিশাল এবং কলকাতা।

এইবার আমার একটি মারাত্মক প্রশ্ন মনোরঞ্জনদা, আমি বললাম। মারাত্মক বলছি এজন্য যে, এমনিভাবে এমনি ধরনের প্রশ্ন আই-বি পুলিশই করে থাকে, হয়তো অতীতে আপনাকেও বহুবার করেছে এবং কোনবারই জবাব পায়নি। পেলেও সে জবাবে কাজ কিছুই হয়নি ওদের, কারণ আপনি ঠিক-ঠিক জবাব দেননি। এ গেল বৃটিশ আমলের কথা। দেশ স্বাধীন হবার পর বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস লেখার একাধিক চেষ্টা আগেও চলেছে, এখনও চলছে। ইতিহাস উপন্যাস নয়, ইতিহাস তথ্যনির্ভর। যে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে যেভাবে ঘটেছে, ইতিহাসে থাকবে সেই সব তথ্যেরই সমাবেশ। বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের গোপন তথ্য আপনারা যদি না বলেন, যদি বলেন এসব মারাত্মক প্রশ্নের জবাব দেবেন না—তাহলে কি করে ইতিহাস লেখা সম্ভব? কি করে উত্তরসুরীরা জানতে পারবে তাদের পূর্বপুরুষ দেশের স্বাধীনতার জন্য কিভাবে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন?

কি তোমার প্রশ্ন, মনোরঞ্জনদা বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশ্ন করলাম, আপনি কি কোন রাজনৈতিক ডাকাতি বা হত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন? এমনি কোন ডাকাতি বা হত্যা সংগঠন করেছেন?

সেই নীচু তাপ-উত্তাপহীন কন্ঠ, কিন্তু স্পষ্ট জবাব, করেছি। ডাকাতি ও হত্যা, দুটোই করেছি। নরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরীর নেতৃত্বে তিনটি ডাকাতিতে আমি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছি। প্রথম ডাকাতি বরিশাল জেলার মোহনগঞ্জ বন্দরে ১৯১০ সালের ৪ মার্চ। তখন আমার বয়স কুড়ি বৎসর। আগের

বছরই আমি বিপ্লবী দলে যোগদান করেছি। দ্বিতীয় ডাকাতি ১৯১১ সালের ২২ এপ্রিল বরিশাল জেলার লক্ষণকাঠি গ্রামে এক বাড়ীতে। ১৯১৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর যে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করি, সেটা হয়েছিল উড়িষ্যার যাজপুর গ্রামে। এর পর ১৯১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামে যে ডাকাতি হয়, তাতে ঠিক এ্যাকশনে আমি অংশ গ্রহণ না করলেও ডাকাতির আগে ও পরে সংগঠনের অনেক কাজ করতে হয়েছে অনেকখানি ঝুঁকি নিয়ে।

মনোরঞ্জনদা আরও বলতে লাগলেন, নিজের নেতৃত্বে ও সংগঠনে করেছি দুটো ডাকাতি। প্রথমটা ১৯১২ সালের ১৫ জুলাই বরিশালের প্রতাপপুর গ্রামের জমিদার বাড়ীতে। আর দ্বিতীয়টি ১৯১৫ সালের ২ ডিসেম্বর এই কলকাতা শহরের কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে এক সোনার দোকানে।

আর হত্যা ? বলে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, আমার নেতৃত্বে রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে একটি। বলতে পারা যায় আমার রিভলবারের গুলিতেই প্রাণ হারিয়েছে একজন পুলিশ সাব-ইনসপেক্টার এই কলকাতাতেই।

অনুরোধ জানালাম, মনোরঞ্জনদা, এই কলকাতাতে যে দুটো এ্যাকশন আপনি করেছিলেন, একটি ডাকাতি ও একটি মার্ডার, এই দুটোর বিবরণ বলুন না।

মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন।—

তখন নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামে ডাকাতি সম্পর্কে ধরা পড়ে গেছেন অনেকে। ধরা পড়ে গেছেন ডাকাতির পরিচালক নরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরী। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়ে গেছে। মামলা শুরু করে দিয়েছেন পাবলিক প্রসিকিউটর বারোজন বিপ্লবী আসামীর বিরুদ্ধে।

কিন্তু আসামী পক্ষের উকিল কে ? তাদের সমর্থন করে কে দাঁড়াবে ট্রাইবিউনালের সমক্ষে ?

উদ্বিগ্ন মনোরঞ্জনদা গেলেন ব্যারিষ্টার নিশীথনাথ সেনের কাছে।

রাজী হলেন তিনি মামলা পরিচালনার ভার নিতে। তাঁরই পরামর্শমত ব্যারিষ্টার এস কে সেনকেও নিযুক্ত করা হল।

কিন্তু আইনজীবিদের শুধু নিযুক্ত করলেই হবে না, তাঁদের ফিজ দিতে হবে। সে টাকা কোথায় ?

টাকা পাই কোথায় ? কার কাছে ? এমন কোন সহকর্মী বা শুভানুধ্যায়ীর কথা মনে পড়ছে না, যে দুজন ব্যারিষ্টারের ফি জোগাতে পারে। মহা ভাবনায় পড়লেন মনোরঞ্জনদা।

টাকার জোগাড় করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে ?

অবশেষে স্থির করলেন, ডাকাতি করবেন কোন গহনার দোকানে। পাওয়া

যাবে প্রচুর সোনার গহনা, গলিয়ে সোনার তাল করে বিক্রি করে দিলেই হবে টাকা! কিংবা তৈরী করা গহনাই বিক্রি করা যাবে।

তিনটি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করার ফলে ডাকাতি সম্বন্ধে মনোরঞ্জনদার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে বটে, কিন্তু সে সবই গ্রামে। গ্রামে ডাকাতি আর শহরে ডাকাতি অনেক তফাৎ। শহরও আবার যে সে শহর নয়, কলকাতা যার নাম। রাস্তার ওপর গহনার দোকান। সে রাস্তায় চলে অগণিত পথচারী। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিশ। চলছে অসংখ্য যানবাহন। একটা হাঁক দিলেই লোকজন ছুটে আসবে।

সুতরাং এবারকার শহরের ডাকাতি আর পায়ে হেঁটে নয়, মোটরে করা হবে স্থির হল। কিন্তু মোটর কোথায় পাওয়া যাবে?

এক বন্ধুর মারফৎ মনোরঞ্জনদা পরিচিত হলেন ভবানীপুরে পাঞ্জাবী ভাড়াটে মোটর চালকদের আড্ডার নেতা সর্দার হরদয়াল সিং-এর সঙ্গে। সব শুনে সর্দারজী রাজী হল। বলল, দেবে মোটর, চালাবে চেৎ সিং।

কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে ফকিরচাঁদ দত্তের সোনার দোকান। ১৯১৫ সালের ২ ডিসেম্বর রাত প্রায় ন'টার সময় চেৎ সিং-এর মোটর এসে থামল সেই দোকানের সামনে।

হুড়মুড় করে দোকানে ঢুকে পড়ল চার জন যুবক আর তাদের নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত। সবার হাতেই রিভলভার।

দোকানে ছিল দু তিনজন লোক, রিভলবার উঁচিয়ে ধরে দৃঢ়স্বরে বললেন মনোরঞ্জনদা, নড়েছ কি গুলী করে সাবাড় করে দোব।

সহকর্মীরা গহনা-সাজানো বাক্সগুলি চটপট মোটরে তুলে ফেলল। সবাই মোটরে উঠলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে রাস্তায় লোক জমে গেছে। তারা চীৎকার করছে। হল্লা করছে। মোটর রওনা হতে তারাও হৈ হৈ করে পিছু ধাওয়া করল।

গাড়ী থেকে মুখ বার করে পেছনে জনতাকে লক্ষ্য করে পর পর গুলী চালাতে লাগলেন মনোরঞ্জনদা।

জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে গেল।

মোটর এসে পেঁছাল নিরাপদ স্থানে।

তারপর শুনলাম মনোরঞ্জনদার স্বহস্তে পুলিশ হত্যার কাহিনী।

এটাও শিবপুর ডাকাতির মামলার সঙ্গে জড়িত হলেও সংঘটিত হয়েছিল কর্পোরেশন ষ্ট্রীট ডাকাতির আগে ১৯১৫ সালের ২১ অকটোবর।

৯৯ নম্বর মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। জনৈক পুলিশ অফিসারের বাড়ী।

বিপ্লবীরা খবর পেয়ে গেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ওখানে আরও কজন

পুলিশ অফিসার আসে। আড্ডা হয়। শিবপুর ডাকাতি মামলা পরিচালনা সম্বন্ধে সলা-পরামর্শ চলে।

স্থির করা হল, ঐ বাড়ীতে হামলা করতে হবে, ভেঙ্গে দিতে হবে ওদের আড্ডা আর পরামর্শ বৈঠক, বুঝিয়ে দিতে হবে, শিবপুর মামলায় যাদের ধরেছে, তাদের বন্ধুরা তোমাদের রেহাই দেবে না।

আক্রমণ পরিচালনার ভার নিলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত। সঙ্গে থাকবেন ভূপতি মজুমদার আর ব্রজেন দত্ত। এ্যাকশন স্কোয়াডের ইনফরমাররূপে কাজ করবেন কয়েকজন, তাঁদের মধ্যে একজন অন্নদা মজুমদার।

১৯১৫ সালের ২১ অকটোবর।

সন্ধ্যার পর ঐ বাড়ীটার কাছাকাছি একটি পার্কে এসে জমায়েত হলেন মনোরঞ্জন, ভূপতি আর ব্রজেন।

ইনফরমাররা নজর রাখল পুলিশ অফিসারের বাড়ীটার ওপর।

সরু অন্ধ গলির মধ্যে বাড়ীটা।

স্থির হল, মনোরঞ্জনদা সোজা ঢুকে পড়বেন ঘরের মধ্যে, সঙ্গে থাকবেন ভূপতি আর ব্রজেন রিভলভার হাতে পাহারা থাকবেন গলিতে।

পার্কে ওঁরা একটা বেঞ্চিতে বসে আছেন ভাল মানুষের মত। সন্ধ্যা উতরে গেছে, পার্কে জমায়েত নরনারী যে যার বাড়ী চলে যাচ্ছে, এমন সময় অন্নদা এসে খবর দিলেন যে, পুলিশরা সবাই এসে গেছে, আলোচনা শুরু হয়েছে।

তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম আমরা তিনজন। মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন।

বাড়ীর সামনে রক। লাফিয়ে উঠলাম রকের ওপর। সঙ্গে ভূপতি!

ঘরে ঢুকেই চালালাম 'মজার' পিস্তল। শব্দের ঝাপটায় আলো নিভে গেল।

সামনেই দোতলার সিঁড়ি। প্রাণভয়ে ওরা অন্ধকারেই হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে পালাতে লাগল। আমিও পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে পশ্চাদ্ধাবন করে ওপরে উঠে গেলাম।

কাউকে দেখলাম না সেখানে। তবে কি ওরা কোন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে? এতগুলো গুলী ছুঁড়লাম, যদিও অন্ধকারের মধ্যে, তবু কি একটাও লাগেনি কারুর গায়ে?

কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে হল না।

আমরা চলে এলাম সাবধানে অথচ দ্রুত পায়ে।

পরদিন খবরের কাগজে দেখি, গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে পুলিশ সাব-ইনসপেক্টার গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আরেকজন সাব-ইনসপেক্টার গুরুতররূপে আহত হওয়ায় তাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

একটু পর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন মনোরঞ্জনদা। বললেন, বসো, আসছি। বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে অন্দরের দিকে গেলেন।

এত হঠাৎ এবং এত তরতর করে চলে গেলেন যে, কিছুই বলতে পারলাম না আমি। চুরাশী বৎসরের যেন স্মার্ট যুবক অন্তর্হিত হলেন।

কতই-বা উচ্চতা হবে? পুরো পাঁচ ফুট কিনা, তাও সন্দেহ। ওঁর আটত্রিশ বছর বয়সে দেখেছি, এমন কিছু ডনবীর বা কুস্তিগীরের স্বাস্থ্য দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আর চিরকালই দেখছি শান্ত ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ। এমনি ছোটখাটো 'ভাল মানুষ'টি রিভলভার নিয়ে হানা দিয়েছেন গহনার দোকানে? পিস্তল হাতে সোজা ঢুকে গেছেন পুলিশের আড্ডায়? বুঝতে পারলাম, মানুষটি ছোটখাটো হলে কি হবে, ওঁর অন্তরে অহর্নিশি জ্বলছে দেশপ্রেমের বিরাট এক বয়লার, দরজা বন্ধ থাকায় যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা সঞ্চারিত করছে হাজার সেণ্টিগ্রেডের প্রচণ্ড উত্তাপ। তাই কোমল স্নিগ্ধ দরদী মানুষটির মধ্য থেকে স্বাধীনতার প্রয়োজনে মুহূর্তে বেরিয়ে আসে এক ক্ষমাহীন কৃতান্ত, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের অটল প্রতিজ্ঞায় যে অনুপ্রাণিত!

ঘরখানার চারিদিকে চোখ বোলালাম। একদিকের দেয়ালজোড়া তিনটে বিশাল আলমারী, তাকে তাকে সাজানো অসংখ্য বই। এক কোণে একটি সেক্রেটারীয়েট টেবিল, তার ওপর থরে থরে সাজানো বই, খাতা, কাগজপত্র, পত্রপত্রিকা, খবরের কাগজ, পুস্তিকা এবং কি নয়? ঘরের দুটো তাকওয়ালা কুলুঙ্গি, তাতেও বই, তাতেও ঠাসা পত্রপত্রিকা। পেছনের জানালার তাকে বই, একটা বড় বেতের সোফার ওপর বই ও পত্রপত্রিকা, মেঝেতেও সাজানো বই। এমন কি, আমার সামনে যে নীচু বেতের টেবিলটি, তার ওপরেও খানকতক বই, খাতা, ডায়েরী, এনগেজমেণ্টের নোটবুক, ঠিকানা ও টেলিফোন লেখার খাতা, কাগজপত্র, পেন্সিল, লেটারহেড ও ফাউণ্টেন পেন।

এই বিশাল গ্রন্থজগতের মধ্যমণি মনোরঞ্জন গুপ্ত।

মনোরঞ্জনদা ফিরে এলেন। বসলেন। তারপরই এল একটি মেয়ে। চা ও খাবার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল। উনি বললেন, খাও।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মনোরঞ্জনদা, নিশ্চয়ই আপনার প্রথম গ্রেপ্তারের কথা মনে আছে?

হেসে বললেন, তা আছে।

বলুন না সেই কাহিনীটা, আমি অনুরোধ জানালাম।

মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন, ১৯১৪ সাল থেকেই আমি ফেরার ছিলাম। আমার নামে কোন 'হুলিয়া' তখন বেরিয়েছিল কিনা জানি না, তবে এ খবরটা ঠিকই পেয়েছিলাম, যে, আমায় পেলেই গ্রেপ্তার করবে। তাই গা ঢাকা দিয়ে

থাকতাম, নয় চলতাম, মানে দলের কাজ সবই করতাম, তবে যতটা সম্ভব, পুলিশের শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে।

১৯১৪ গেল, ১৯১৫ গেল, ১৯১৬ এসে গেল। আমার বয়স ২৬ বৎসর।

সে সময় বিভিন্ন গোপন সোর্স থেকে আমরা রিভলভার, পিস্তল ও বুলেট সংগ্রহ করতাম। বলা বাহুল্য, প্রচুর অর্থব্যয়ে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ এটা একটা লাভজনক ব্যবসা মনে করত। ওরা স্মাগল করে আনা রিভলভার প্রচুর টাকায় আমাদের কাছে বিক্রি করত।

ওয়েলেসলি পাড়ার একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের কাছে মাঝে মাঝে রিভলভার বিক্রি করে আসছিল। লোকটাকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ ঘটেনি।

একদিন সে যখন একজন নতুন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্মাগলারের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়, তখন মানিক আমার সঙ্গে ছিল। সেই সাহেবটা একটা রিভলভার বিক্রি করবে। ১১ জানুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পূব কোণে ওয়েলেসলির মোড়ে রিভলভারটা নিয়ে আসবে সন্ধ্যার পরে আর মানিক এসে টাকা দিয়ে সেটা নিয়ে যাবে, এই ব্যবস্থা হল। সাহেবটা মানিকের নাম জিজ্ঞেস করায় বললাম, ওর নাম হাওড়া—

হাওড়া! আমি বলে উঠলাম, সে কি মনোরঞ্জনদা, হাওড়া আবার মানুষের নাম হয় নাকি? সাহেবটা বুঝে ফেলল না যে, ফাঁকি দিলেন আপনি?

সাহেব বলেই বুঝতে পারল না, উনি হেসে বললেন, হাওড়া কথাটাই মনে পড়ল, তাই বলে দিলাম।

একটু থেমে বললেন, তারপর শোন।

মানিক কলেজে পড়ে, থাকে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের ওয়ান হোস্টেলে।

১১ জানুয়ারী, ১৯১৬ সাল। সন্ধ্যার পর আমি গেলাম মানিকের হোস্টেলে খোঁজ নিতে সে রিভলভারটা আনতে গেছে কিনা। গিয়ে দেখি, সে যায়নি। তার শরীরটা খারাপ হয়েছে, জ্বর-জ্বর লাগছে।

সুতরাং তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম আমি। ট্রামে উঠলাম। মেডিক্যাল কলেজের কাছে সহকর্মী হীরালাল দাশগুপ্তের বইয়ের দোকানের সামনে নামলাম। যদি সাহেবটা দাম আরও বেশী চায়, তাই হীরালালের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আবার ট্রামে চাপলাম।

ওয়েলেসলির মোড়ে গিয়ে দেখি, সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। আমায় বলল, জিনিসটা এখানে আনিনি, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের একটা বাড়ীতে আছে। চল।

অচেনা বাড়ীতে যেতে আপত্তি জানালাম।

সাহেব বলল, আপত্তি করছ কেন? এই ত কাছেই। এখনই দিয়ে দোব ওটা।

তবু, যেতে মন চাইছিল না। কথা ছিল ওয়েলেসলির মোড়ে ফুটপাথে

দাঁড়িয়েই লেন-দেন হবে। রাত করে পথচারীরা কেউ লক্ষ্য করবে না। এখন আবার অন্য কথা কেন? ওটা নিয়ে আসেনি কেন? কারুর বাড়ীতে কেন আমায় নিয়ে যেতে চায়? ও গিয়ে নিয়ে এলেই তো পারে।

আবার ভাবলাম, স্মাগলার ব্যাটা কথার মূল্য কি বুঝবে? আর যে জিনিসটা পাওয়া যাবে, তা যেমন অমূল্য, তেমনই দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, এ ব্যাটা যখন এত পীড়াপীড়ি করছে, তখন ঝুঁকি নিয়ে দেখা যাক।

রওনা হলাম ওর সঙ্গে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের ফুটপাথ দিয়ে যেই আমরা প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এসেছি, পেছন থেকে কে একজন আমার পিঠে হাত দিল।

ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই লোকটা পেছন থেকে আমার দুই বগলের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আমার দুখানা হাতই উঁচু করে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা লোক পেছন থেকে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে কোমর হাতড়াতে লাগল। দেখল, সঙ্গে পিস্তল-টিস্তল আছে কিনা। অবশ্য কিছুই ছিল না। ওদের একজন যুযুৎসুর প্যাঁচ মেরে আমার ডান হাতটা এমনি মুচড়ে ধরে রাখল যে, আমার আর নড়বার শক্তি ছিল না।

সেই স্মাগলার সাহেবটা দিল লম্বা দৌড়।

বুঝতে বাকি রইল না যে, আমি গ্রেপ্তার হয়েছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাহেব ব্যাটাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ঠিক, কিন্তু মনোরঞ্জনদা, আপনাকে জাপটে ধরল ও দুটো হিন্দুস্থানী, না বাঙ্গালী পুলিশ?

হিন্দুস্থানীও না, বাঙ্গালীও না, মনোরঞ্জনদা হেসে জবাব দিলেন। দুটোই সাহেব। আর ছোটখাটো পুলিশও নয়। স্বয়ং পুলিশ কমিশনার টেগার্ট আর ডেপুটি কমিশনার লোম্যান—

লোম্যান? বাধা দিয়ে বললাম, মানে ১৯৩০ সালের ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ? মানে, বি ভি-র বিনয় বোস যাকে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে খতম করে দেয়?

হ্যাঁ, সেই লোম্যান। মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন, সাহেবটার সঙ্গে ব্যবস্থা করে ওরা ফাঁদ পেতেছিল "হাওড়া"কে মানে, মানিককে ধরবার জন্য। সাহেবটা নিশ্চয়ই বলে দিয়েছিল যে, এটা হাওড়া নয়। তাই আমায় লালবাজার লকআপে নিয়ে যাবার পর লোম্যান বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, Who is Howrah?

প্রথমটা বার বার বলেছি, জানিনে, তবুও যখন ঘুরে-ফিরে ল্যোম্যান ঐ একই প্রশ্ন করতে লাগল, Tell me, who is Howrah? তখন হেসে হেসেই বলে দিলাম, Howrah is a town on the other side of the Hooghly River—

বলেই হেসে উঠলেন মনোরঞ্জনদা।

এগারোটা বেজে গেছে।

বললাম, মনোরঞ্জনদা, আজ এই পর্যন্ত রইল। প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার শেষ। যদি আপনার অসুবিধা না হয়, তাহলে কালই আবার আসতে পারি দ্বিতীয় দিন সাক্ষাৎকারের জন্য।

বললেন, এসো সকাল আটটায়।

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

অফিস টাইমের প্রচণ্ড ভিড় কমে গেছে বটে, তবুও বেশ ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে বাসে উঠতে গিয়ে চুরাশী বৎসরের যুবকটির কথা মনে পড়ল। সঙ্গে থাকলে আগে তুলে দিয়ে নিজে উঠতেন পরে, চলন্ত বাসে।

মনে লেশমাত্র বার্ধক্যের জড়তা আসেনি, বুঝি শরীরেও নয়।

পরদিন ঠিক সকাল আটটায় গিয়ে হাজির হলাম।

আমি যে সব সময় পাংচুয়েল, মনোরঞ্জনদা তা জানেন।

দেখলাম, তিনিও রেডি হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

দু-একটা একথা সেকথার পর আসল প্রসঙ্গে এসে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মনোরঞ্জনদা, আপনার নামে কখনো কোন মামলা হয়েছিল কি? কোনো মামলায় কনভিকশন?

হ্যাঁ, মামলাও হয়েছে, কনভিকশনও হয়েছে, মনোরঞ্জনদা বললেন। মামলা হয়েছে তিন বার, ১৯২১ সালে, ১৯৩১ সালে এবং ১৯৪০ সালে। ১৯২১ সালের মামলায় কনভিকশন হয়েছে, জেল খেটেছি। ১৯৩১ সালে আমায় ফেরারী অবস্থায় ধরে ফেলে, মামলা করবার জন্য বহুৎ মেহনত করেছিল, কিন্তু পারেনি। ১৯৪০ সালের মামলায় আমায় লোয়ার কোর্টে কনভিকশন হলেও আপীলে বেকসুর খালাস হয়ে যাই।

ওঁর মামলাগুলো কৌতুকপ্রদ।

১৯২১ সালে বরিশালে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজী-প্রবর্তিত আইন অমান্য এই আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেণ্টের আইনানুগ প্রজাদের শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় এবং শহরের আইন ও শৃঙ্খলা যাতে অটুট থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরিশালে ১৪৪ ধারা জারী করে শোভাযাত্রা ও সভা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা সেই আদেশ মানলে তো!

মনোরঞ্জন গুপ্ত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজাবাহাদুরের হাভেলীতে এক জনসভায় বক্তৃতা দিলেন।

ইংরেজ সরকারের প্রেস্টিজ পাংচার!

তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হল বক্তাকে।

একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

মনোরঞ্জনদা জেল খাটলেন। যাকে বলে 'নিরামিষ জেল'। কোনো খাটাখাটি নেই। খাও-দাও আর ঘুমোও।

তারপর ১৯৩১ সাল।

১৯৩০ সালের ২৫ আগস্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের ওপর ডালহাউসি স্কোয়ারে বোমা নিক্ষেপের ফলে তখন স্টেট ভার্সাস দীনেশ মজুমদার মামলা হয়ে গেছে, তারপর ২৭ নভেম্বর হয়ে গেছে ডালহাউসি বোমার মামলা। এই মামলায় প্রধান আসামীর নাম মনোরঞ্জন গুপ্ত। রাজসাক্ষী তাঁকে জড়িয়ে অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা বললেও প্রধান আসামী গরহাজির। কারণ তিনি ফেরারী।

ফেরারী মনোরঞ্জনদা ধরা পড়েন ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে।

আবার পুলিশ তোড়জোড় করতে থাকে তাঁর নামে মামলা করার। মুক্তিপ্রাপ্ত সেই রাজসাক্ষীকে তলব করা হয়, অনেক বোঝানো হয়।

কিন্তু কিছুতেই সে আবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মনোরঞ্জনদার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী হল না। সাহস হল না তার।

ফলে, হল না মামলা।

মনোরঞ্জনদাকে রাজবন্দী করা হল।

ওঁর ১৯৪০ সালের মামলা সম্বন্ধে কিছু বলার আগে প্রাসঙ্গিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন। আমি সে সম্বন্ধে মনোরঞ্জনদার কথাই হুবহু উদ্ধৃত করছি।—

১৯৩৮ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমরা (যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা) আলাপ-আলোচনা করে স্থির সিদ্ধান্ত করি যে, আমাদের কর্মপন্থার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। এতদিন আমরা মনে করতাম যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জনে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। কয়েক শো বিপ্লবী ও কিছু বোমা রিভলভার দিয়ে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে না। সুতরাং ইংরেজ যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত হবে, তখন তার শত্রুর সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর সাহায্যে আমরা সেই চেষ্টাই করেছিলাম।

কিন্তু সফলকাম হতে পারিনি। না-পারার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের যথেষ্ট প্রস্তুতিই ছিল না আমাদের।

১৯৩৮ সালে আলাপ আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন নেই। যারা সাহায্য করবে, ইংরেজ বিতাড়িত হবার পর তারাই আবার প্রভু হয়ে বসতে পারে। তাছাড়া, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি প্রকৃত জাতীয় প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসের পতাকাতলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতদিনের আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ অন্ততঃ

এটুকু ভাবতে শিখেছে যে, বিদেশী ইংরেজ শাসকের চাইতে স্বদেশের কংগ্রেস শাসন অনেক ভাল হবে। কংগ্রেস শাসন মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ। এখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে জনসাধারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর এবং এই পথই যে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও প্রকৃষ্ট পথ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে আমাদের যুগান্তর দলের নেতা হিসেবে যাদুগোপাল মুখার্জীর নামে খবরের কাগজে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব বিলোপ করে দেওয়া হয়েছিল।

তারপর মনোরঞ্জনদারা কংগ্রেসে যোগদান করেন।

১৯৪০ সালে আসন্ন কংগ্রেস আন্দোলনে যাতে বিপ্লবীরা সর্বান্তঃকরণে যোগ দেয়, বন্ধুবান্ধবকে সে কথা বুঝিয়ে বলবার জন্য দেশের নানাস্থানে যাতায়াত করছিলেন মনোরঞ্জনদা।

ফরিদপুরের ইদিলপুরেও গিয়েছিলেন। একদিন কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন, হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব। নিখিল গুহ রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং মনোরঞ্জনদাকে ধরে নিয়ে গেল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অজুহাত দেখিয়ে মামলাও শুরু হয়ে গেল। সাজাও হয়ে গেল সবার। কিন্তু আপীলে মনোরঞ্জনদারা বেকসুর খালাস হয়ে যান।

জিজ্ঞাসা করলাম, মোট কত বছর আপনি জেলে বা অন্যত্র আটক ছিলেন?

একটু ভেবে বললেন, তা প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর হবে।

তেইশ-চব্বিশ বছরই রাজবন্দী?

না, হেসে জবাব দিলেন, এক মাস বাদ। ঐ যে বললাম ১৯২১ সালে একমাস কয়েদী ছিলাম। অবশ্য বিনাশ্রমের কয়েদী। তাছাড়া সব সময় State Prisoner under Regulation III of 1818.

কোন্ কোন্ জেল বা বন্দী-শিবিরে ছিলেন?

এইবার সত্যিই মনোরঞ্জনদা হেসে ফেললেন, সে যে লম্বা তালিকা। মনে রাখতে পারবে না, লিখে নাও।

তারপর উনি বলতে লাগলেন, প্রথম গ্রেপ্তার ১৯১৬ সালের ১১ জানুয়ারী। সাত দিন লালবাজার লক-আপে অবস্থান, তারপর প্রেসিডেন্সী জেল। তখন নাম ছিল আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেল। সেখান থেকে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের হাজতখানায় দু-সপ্তাহ্ অন্তরীণ, তারপর আবার সেই প্রেসিডেন্সী জেল। তারপর লেখ, আলীপুর নিউ সেনট্রাল জেল। এখন অবশ্য 'নিউ' কথাটা তুলে দেয়া হয়েছে।

তারপর?

তারপর বর্ধমান জেল। হাজারীবাগ স্পেশাল জেল। রাজসাহী সেনট্রাল জেল। ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। ১৯২০ সালের আগস্টে সেখান থেকে মুক্তিলাভ। প্রথম পর্ব সমাপ্ত বলতে পার।

দ্বিতীয় পর্ব শুরু ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আবার আলীপুর সেনট্রাল জেল। তারপর মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল। তারপর লম্বা পাড়ি, একেবারে মাদ্রাজ সেনট্রাল জেল। তারপর ত্রিচিনোপলি জেল।

১৯২৭ সালের প্রথম দিকে আবার লম্বা পাড়ি। ত্রিচিনোপলি থেকে সোজা সন্দীপে প্রত্যাবর্তন, একটি গ্রামে অন্তরীণ। ঐ বছরই নভেম্বর মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান। তারপর মুক্তি। কিন্তু শর্ত এই, তুমি বরিশাল জেলা, চব্বিশ পরগণা জেলা আর কলকাতা শহরে ঢুকতে পারবে না। সুতরাং এসে উঠলাম হুগলী বিদ্যামন্দিরে। ১৯২৮ সালের জুন মাসে শর্ত প্রত্যাহার, পূর্ণ মুক্তিলাভ এবং দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত।

এমন সময় কালকের সেই মেয়েটি প্রবেশ করল। হাতে চা ও খাবার। টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল। বুঝলাম, আজ আগেই বলে রেখেছিলেন। উঠতে হল না। বললেন, খাও, আমি এখুনি আসছি।

পাশের ঘরে ফোন। বুঝতে পারলাম কোথায় ফোন করছেন।

ফিরে এসে মনোরঞ্জনদা নির্দিষ্ট আসনে বসলেন।

আমি সূত্র ধরিয়ে দিলাম, আপনার দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত বলা হয়েছে—

হ্যাঁ, এবার তৃতীয় পর্বের কথা, উনি বলতে লাগলেন। শুরু ১৯৩১ সালে। ফেরার অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছিলাম তো, তাই পুলিশ প্রথমটা আদা-নুন খেয়ে লেগে গেল মামলা করে জেল ঠুকে দিতে। পারল না। তাই আবার স্টেট প্রিজনার করে প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেল, তারপর পাঠাল বকসা দুর্গ বন্দী-শিবিরে। সেখান থেকে ভারতের আর এক প্রান্তে পাঞ্জাবের মিনওয়ালী জেলে। তারপর বোম্বাই জেলে। তারপর নাসিক জেলে। তারপর ফিরে এলাম হিজলি স্পেশ্যাল জেলে। ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ। ইতি তৃতীয় পর্ব।

চতুর্থ পর্ব শুরু হল ১৯৪০ সালে। ইদিলপুরে গ্রেপ্তার, ফরিদপুর জেলে আগমন, মামলা, কনভিকশন, আপীল, খালাস। তারপর আবার সেই রেগুলেশন থ্রু স্টেট প্রিজনার এবং দমদম সেনট্রাল জেলে অধিষ্ঠান। সেখান থেকে আবার হিজলি স্পেশ্যাল জেল। আবার বকসা দুর্গ বন্দীশিবির। আবার রাজসাহী। আবার বকসা। আবার রাজসাহী। আবার দমদম।

অবশেষে ১৯৪৬ সালে মুক্তিলাভ এবং ১৯৪৭ সালে ইংরেজ সরকারের মহাপ্রস্থান। মনোরঞ্জনদা হেসে উঠলেন।

আমি বললাম, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন মনোরঞ্জনদা, নাটকে দুই অঙ্কের মাঝখানে যেমন দশ মিনিটের বিরাম থাকে, ঠিক সেই কায়দায় ইংরেজ গভর্নমেন্ট প্রথম পর্ব আটক রাখার পর আপনাকে যেমন তিন বৎসর জেলের বাইরে থাকতে দিয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বের শেষেও তাই, সেই তিন বছর। শুধু তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের মাঝখানকার গ্যাপ তিন বছর নয়, দু বছর।

উনি বললেন, ঠিকই ধরেছ।

আমার পরের প্রশ্ন, আপনি কি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পেনসন পেয়েছেন ? তাম্রপত্র পেয়েছেন ?

পেনসন পাইনি, মনোরঞ্জনদা জবাব দিলেন। তাম্রপত্র পেয়েছি। পেনসনের জন্য যে দরখাস্ত করতে হয়, তা করিনি।

পরের প্রশ্ন—মনোরঞ্জনদা, যেসব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পড়ে আপনি বিপ্লবী দলে যোগদানের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, তার কয়েকখানির নাম বলবেন ?

উত্তরে উনি যা বললেন, তার মর্ম এই যে, আগে দেশাত্মবোধক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নের ফলে বিপ্লবী দলে যোগদানের অনুপ্রেরণা লাভ করে পরে দলে যোগদান—না, এমনিভাবে তিনি দলে আসেননি। যোগ দিয়েছিলেন গুপ্ত সমিতিতে, বিপ্লবের পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জনই যার একমাত্র লক্ষ্য। যোগদান করার পর বড়দের নির্দেশে যেসব বই ও পত্রপত্রিকা পাঠ করে আরও বেশী উৎসাহিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী, নবীনচন্দ্র সেনের সিরাজউদ্দৌলা, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী, হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের দেশাত্মবোধক কবিতাবলী এবং আরও অনেক বই।

মনোরঞ্জনদা যে ফেরার হয়েছিলেন সে কথা আগেই বলেছেন এবং বলেছেন দু-দুবার ফেরার হতে হয়েছিল। বললাম, আপনার ফেরারী জীবনের কাহিনী কিছুটা শুনতে চাই মনোরঞ্জনদা।

উনি বলতে লাগলেন, ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে আমার সহপাঠী ও বিপ্লবী বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ দত্তের কুমিল্লা শহরের বাড়ীতে যাই ভূপতি মজুমদার ও আমি। যতীনদা (যতীন মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন) তখন ফেরারী, পুলিশ হন্যে হয়ে ওঁকে খুঁজছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁর জন্য আশ্রয়স্থলের অনুসন্ধান।

কুমিল্লায় ছিলাম মাত্র একদিন। পরদিন যাই করিমগঞ্জে।

আমরা চলে যাবার পরই দেবেনদের বাড়ীতে পুলিশ এসে হাজির।

প্রশ্ন ঃ বাইরে থেকে কেউ এসেছিল কি ? গত সাত দিনের মধ্যে ?

দেবেনের দাদা হরেনবাবু শুধু আমার নাম বললেন। ভূপতিকে তিনি চিনতেন না।

কয়েক দিন পর কুমিল্লায় ফিরে এসে আমরা সে খবর পেলাম।

বুঝলাম পুলিশ আমায় খুঁজছে। দেরী না করে সোজা চলে গেলাম আমাদের দেশের বাড়ী আধুনা গ্রামে।

পরদিনই পুলিশ গিয়ে হাজির।

আমার ষ্টেটমেণ্ট লিখে নিয়ে এল।

কয়েক দিন পরেই আবার পুলিশ। 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক দুর্গামোহন সেন জানালেন যে, যতীন ঘোষ নামে ডি. এস. পি. আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

ঐ পত্রিকার অফিসে বসেই কথা বলে গেল।

বুঝলাম, ব্যাপার সুবিধের নয়। এমনিভাবে স্টেটমেন্ট নিতে নিতে একদিন আমাকেই নিয়ে যাবে।

অমনি আমি গা-ঢাকা দিলাম।

তারপর স্মাগল-করা রিভলবার কিনতে গিয়ে ধরা পড়লাম ১৯১৬ সালের ১১ জানুয়ারী।

আর দ্বিতীয় বার? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন, দ্বিতীয় বার ফেরার হই ১৯৩০ সালে। ডালহাউসি স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের ওপর বোমা নিক্ষেপের আয়োজন ও প্রস্তুতিপর্ব চলছে আমারই পরিকল্পনা অনুসারে। পুলিশের স্পাই তখন প্রকাশ্যে আমায় ফলো করছিল। এরই মধ্যে লোক মারফৎ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম খুব সতর্কভাবে। কিন্তু ওরা একটুখানি টের পেয়ে গেলেই টেগার্ট হত্যার সমস্ত আয়োজন বানচাল হয়ে যাবে। তাই অকস্মাৎ ওদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়লাম।

বিপ্লবী বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। তারপর স্কুলশিক্ষক কালিঘাটের দুর্গামোহন বসু মহাশয়কে অনুরোধ জানালাম একটা আস্তানা ঠিক করবার জন্য। বেহালা সখেরবাজারে এক গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ী ঠিক করলেন। গেলাম সেখানে। এখানে কালিপদ আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, তাকে দিয়েই কাজ করাতাম।

ইতিমধ্যে টেগার্টের ওপর আক্রমণ চালানো হল ২৫ আগস্ট। বোমা ওর গায়ে লাগল না। যে চারজন আক্রমণ চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে বোমার টুকরো লেগে অনুজা সেন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়, অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগী পথচারীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে পালিয়ে যায়, দীনেশ মজুমদার ওখানেই ধরা পড়ে। তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়।

তারপরেই পুলিশ আরও অনেককে গ্রেপ্তার করে ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলা শুরু করে।

আমি তখনও সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই আছি। ওঁর ছেলেমেয়েরা আমায় 'কাকাবাবু' বলে ডাকে। আমি কাকাবাবু হয়েই ওঁর সংসারে মিশে আছি।

একদিন সুরেশ দাস মহাশয় এসে গোপনে দেখা করে বলে গেলেন যে, জেল থেকে হরিদা অর্থাৎ হরিকুমার চক্রবর্তী খবর পাঠিয়েছেন—ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় মনোরঞ্জনকে প্রধান আসামী বলে দাঁড় করানো হয়েছে। সে যেন সাবধানে থাকে, মামলা চলাকালে যেন ধরা না পড়ে।

ইতিমধ্যে বোমার মামলা শেষ হয়ে গেল। অনেকের দীর্ঘ মেয়াদী সাজা হয়ে গেল। রাজসাক্ষী ছাড়া পেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর ?

মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন, অনেক দিন ওখানে আছি—ফেরারী হয়ে কোথাও বেশী দিন থাকা ঠিক নয়—ভাবলাম, এবার শেলটার বদলানো দরকার। দুর্গাবাবুকে বললাম এবং তাঁরই ব্যবস্থামত চব্বিশ পরগণার রামচন্দ্রপুর গ্রামে সুরেন সামন্ত নামে একজন সম্পন্ন চাষীর গৃহে আশ্রয় নিলাম। সুরেনবাবুর কর্তৃত্বাধীনে একটা মাইনর স্কুল ছিল, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সেই স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে গেলাম। আমার নাম নরেন সরকার, বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। আই. এ. পাশ। থাকি সুরেনবাবুর বাড়ীতে।

ভালই ছিলাম সেখানে, বুঝলে ? মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন। জনপ্রিয় হেডমাষ্টার বলতে পার, কারণ আমার উদযোগে ও প্রচেষ্টায় ঐ মাইনর স্কুলের কিছু কিছু উন্নতিও হয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ, ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি বলেই মনে পড়ছে, পুলিশ এসে হাজির। একজন দারোগা তো সোজা রিভলভার তাক করে হুকুম করল, Surrender or I will shoot.

ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু ওরা আর মামলা করতে পারল না। আবার হলাম ষ্টেট প্রিজনার।

হঠাৎ ঘরের আলো ও পাখা নিভে গেল, বন্ধ হয়ে গেল। লোড শেডিং। ওঁর ঘরে দিনের আলো যে কম তা নয়। তবে আমার বয়স ছেষট্টি আর ওঁর চুরাশী। জানালাগুলি পর্দায় ঢাকা। তাই আলো জ্বাললেই দুজনেরই সুবিধে দেখতে ও কথা কইতে। জিজ্ঞাসা করলেন, বারান্দায় বসবে ? বললাম, থাক না, এখানেই কথা বলি। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মনোরঞ্জনদার মুখে যেসব চাঞ্চল্যকর গুপ্ত কাহিনী শুনছি, যার ছিটেফোঁটাটুকুও সংগ্রহের জন্য ইংরেজ আমলের পুলিশ স্বর্গমর্ত আলোড়ন করেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, ঘরের মধ্যে আধো অন্ধকার নির্জনতায় একান্তে শুনতেই যেন তা ভাল লাগে। বারান্দা প্রকাশ্য মনে হয়। গুপ্ত কথা বলার যোগ্য স্থান নয়।

আমি বললাম, মনোরঞ্জনদা, একটা এ্যাকশন হলেই লোকে চমকে ওঠে। যারা এ্যাকশন করে, এক মুহূর্তেই তারা জনসাধারণের সমক্ষে এসে যায়। কিন্তু এই এ্যাকশনের নেপথ্যে যারা কাজ করেছে, কেউ এনেছে সংবাদ, কেউ করেছে পরিকল্পনা, কেউ নির্বাচন করেছে কারা এ্যাকশন করবে, কেউ সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা, নেপথ্যের সেই সংগঠক কর্মীরা অচেনাই রয়ে যায় প্রায় ক্ষেত্রেই। অথচ একটা এ্যাকশনের ব্যাপারে তাদের অবদানের মূল্য অনেক। এখন আমার প্রশ্ন ঃ এমনি কোন সংগঠন আপনার নেতৃত্বে হয়েছিল কিনা, যার ফলে চাঞ্চল্যকর কোন এ্যাকশন হয়েছিল ?

মনোরঞ্জনদা বললেন, সংক্ষেপে বলছি। ১৯৩০ সালের ২৫ আগস্ট টেগার্টের ওপর আক্রমণের ঘটনা থেকে শুরু করে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত যেসব এ্যাকশন হয়েছে, বলতে গেলে সে সবের পরিকল্পনা যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে আমাকেই করতে হয়েছিল। তার কারণ তখন অন্য নেতারা প্রায় সবাই ছিল জেলে। আমার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, রসিকচন্দ্র দাস ও আরও অনেকে। অবশ্য আমি শুধু সাধারণ পরিকল্পনা করেছিলাম, তারপর বিভিন্ন গ্রুপ তাদের নিজস্ব গ্রুপ নেতৃত্বের সংগঠনে বিভিন্ন এ্যাকশন করেছে। সেই এ্যাকশনগুলির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনরকম সম্পর্ক ছিল না। শুধু একটি ছাড়া, সেটা হচ্ছে টেগার্টের ওপর বোমা নিক্ষেপ। এই পরিকল্পনারও আদি রচয়িতা যতীন মুখোপাধ্যায়ের গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।

কিন্তু ভূপেনবাবু ১৯৩০ সালের জুন মাসে গ্রেপ্তার হয়ে যাবার ফলে টেগার্ট আক্রমণ সংগঠনের ভার পুরোপুরি আমার ওপরেই এসে পড়ে। আমার দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসারে স্থির হয় যে, কলকাতায় টেগার্টের ওপর বোমা নিক্ষেপই মফঃস্বলের এ্যাকশন শুরু করার পক্ষে সংকেত (সিগন্যাল) বলে মনে করতে হবে। তারপর আর কেন্দ্রীয় কোন নির্দেশ পাঠানো সম্ভব হবে না। তখন গ্রুপগুলি নিজেদের পরিকল্পনা সংগঠন অনুযায়ী কাজ করে যাবে। কাজ হচ্ছে, জেলায় জেলায় বোমা বিস্ফোরণ, তারপর ইংরেজ রাজকর্মচারীনিধন।

মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন, আমার এই পরিকল্পনার ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অনেকগুলি চাঞ্চল্যকর এ্যাকশন যুগান্তর দলের বিভিন্ন গ্রুপ করেছিল। তাদের মধ্যে হেমচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স গ্রুপের এ্যাকশনই ছিল সবার চাইতে বেশী।

এইবার আমার শেষ প্রশ্ন কিন্তু বোধ হয় সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। বললাম, মনোরঞ্জনদা, আপনার ব্যক্তিগত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা শুনলাম। এইবার বলুন আপনাদের দলের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে স্মরণীয় কোন একটি কাজের বিবরণ।

উনি বললেন, বলতে পারি। তবে আমার শংকর মঠ গ্রুপের একার কাজ নয়, কয়েকটি গ্রুপের মিলিত কাজ। আমাদের গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী হলেও এ্যাকশন লীডার ছিলেন নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী। তাঁরই পরিচালনায় নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামে ধনী মহাজন কৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ীতে ১৯১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর যে ডাকাতি করা হয়, যার ফলে বহু বিশিষ্ট কর্মী গ্রেপ্তার হন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই দীর্ঘমেয়াদী সাজা হয়ে যায় এবং দলের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়, আমার মতে দলের সেই কাজটাই সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়।

বললাম, বেশ, তাই বলুন।

তারপর মনোরঞ্জনদার মুখে শিবপুর ডাকাতির যে সুদীর্ঘ বিবরণ শুনলাম, সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি সে কাহিনী।—

স্থির হল তিনটি গ্রুপ এক সঙ্গে কাজ করবে, বরিশালের শঙ্কর মঠ গ্রুপ, হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর ময়মনসিংহ গ্রুপ এবং উত্তরবঙ্গের যতীন রায়ের গ্রুপ। লীডার শঙ্কর মঠ গ্রুপের নরেন ঘোষ চৌধুরী।

উত্তরবঙ্গ গ্রুপের যোগেন দে সরকার উত্তরবঙ্গের কোথাও ডাকাতি করবার প্রস্তাব করেন। ঐ গ্রুপের নরেন সরকার নরেন ঘোষ চৌধুরীকে নিয়ে গিয়ে শিবপুর গ্রাম দেখিয়ে আনলেন।

কৃষ্ণনগর শহর থেকে কুড়ি পঁচিশ মাইল উত্তরে জলঙ্গী নদীর তীরে শিবপুর গ্রাম। নৌকোয় যেতে হবে, নৌকোয় ফিরে আসতে হবে। কৃষ্ণনগর ও শিবপুরের মাঝামাঝি স্থানে একটি ঘন জঙ্গলে বেশ বড় গর্ত করে অপেক্ষা করবেন যোগেন্দ্রনাথ বসু ও ক্ষিতীশ চৌধুরী। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ঐ গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সবাই এসে উঠবেন নবদ্বীপ শহরে। সেখানে ত্রিবেণীচরণ সুর আগে থেকেই একটা বাড়ী ভাড়া করে সস্ত্রীক বাস করতে থাকবেন। সবাই এসে সেই বাড়ীতে উঠবেন। তারপর ধীরে ধীরে যে যার জায়গায় চলে যাবেন। পুলিশী উত্তেজনা কমে গেলে জঙ্গলের মধ্যে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা টাকা পয়সা, গহনা ইত্যাদি তুলে আনা হবে।

মনোরঞ্জন গুপ্তের শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না বলে লীডার নরেনের নির্দেশে তিনি ডাকাতির আগে ও পরে নানারূপ আনুষঙ্গিক কাজের ভার নিলেন, ডাকাতি করতে যাননি।

ডাকাতির তারিখ নির্দিষ্ট হল ১৯১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর।

সপ্তাহখানেক পূর্বে মনোরঞ্জন কৃষ্ণনগর চলে এলেন। লীডার নরেন একখানা নৌকো কিনেই ফেলেছিলেন আর ময়মনসিংহের একজন কর্মীকে মাঝি সাজিয়ে সেই নৌকোয় বসিয়ে রেখে এসেছিলেন।

২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর থেকে পর পর ট্রেনে কলকাতা থেকে তিন চারজন করে কর্মী আসতে লাগলেন আর মনোরঞ্জন ষ্টেশনে উপস্থিত থেকে ওঁদের কৃষ্ণনগর নদীর ঘাটে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন।

লীডার নরেন আসেন শেষ ব্যাচে ভোর রাত্রে। মনোরঞ্জন তখন তাঁর আস্তানায় চলে গেছেন। নৌকোয় তখন জনত্রিশেক কর্মী জমে গেছেন। দিনের বেলা ওঁদের ঘাটে দেখলে লোকের সন্দেহ হতে পারে, তাই লীডার নরেন নৌকো যাত্রা করিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছেন তিনি পরে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে উঠবেন।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য যখন তিনি তাঁর আস্তানায় এলেন,

মনোরঞ্জন আবার তখন লীডারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঘাটে গেছেন। গিয়ে দেখেন, নৌকো চলে গেছে।

ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসার পথে পূর্ণিয়ানিবাসী মানিক ও শ্রীহট্টনিবাসী উপেন চৌধুরীর সঙ্গে মনোরঞ্জনের দেখা হল। তাঁরা বললেন, নরেনবাবু বলে গেছেন আজ সন্ধ্যার পর কৃষ্ণনগর থেকে কিছু দূরে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে। আপনাকে সব ব্যবস্থা করতে বলে গেছেন।

উপেন এক পায়ে খোঁড়া, এসব কাজে নিয়োগ করায় বিপদ হতে পারে। তাই মনোরঞ্জন তাঁকে কলকাতা ফিরে যেতে বললেন। তারপর তিনিও কলকাতা থেকে তার কাটার যন্ত্রাদি কিনে সন্ধ্যার মধ্যেই কৃষ্ণনগর ফিরে এলেন এবং মানিককে সঙ্গে নিয়ে পরের ষ্টেশনের অনতিদূরে টেলিগ্রাফের তারগুলি কেটে ফেললেন। তারপর নদীর খেয়া পার হয়ে দুজনে চলে এলেন নবদ্বীপে ত্রিবেণী সুরের সেই ভাড়া করা বাড়ীতে।

পরদিন সকালবেলাই মনোরঞ্জন মানিককে কলকাতা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু দুপুরের পরে শহরে একটা গুজব শোনা যেতে লাগল যে, একদল ডাকাতের সঙ্গে পুলিশের বন্দুক লড়াই চলছে। সেদিন ১ অকটোবর। আগের দিনই ডাকাতি হয়ে যাবার কথা, সেদিন ওরা সবাই নবদ্বীপে ফিরে আসবে।

সারাটা দিন গেল, সারাটি রাতও গেল। কারুর দেখা নেই, কোনো সংবাদ নেই।

সকালবেলা খেয়া পার হয়ে যোগেন আর ক্ষিতীশ এসে হাজির। জঙ্গলের মধ্যে ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু ডাকাতির শেষে ওঁরা কেউ ফিরলেন না দেখে চলে এসেছেন। যোগেন বললেন যে, নৌকোয় যাবার সময় হঠাৎ অসাবধানতাবশতঃ রিভলভারের একটা গুলি ছুটে গিয়ে কৃষ্ণনগরের নরেন সরকারের হাতে লাগে। নরেন সরকারই এই ডাকাতির স্থান ও গৃহ নির্বাচন করে লীডার নরেন ঘোষ চৌধুরীকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল।

শিবপুর ডাকাতি মামলায় উত্তরবঙ্গ গ্রুপের এই নরেন সরকারই রাজসাক্ষী হয়। মনোরঞ্জন যোগেন ও ক্ষিতীশকে কলকাতা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ। তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। নিশ্চয়ই অনভিপ্রেত ও মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে।

পরদিন সকালেই গুজব শোনা গেল, পুলিশ দুজন ডাকাতকে ধরে থানায় নিয়ে এসেছে আর তৃতীয় ডাকাত খেয়া পার হতে গিয়েছিল, মাঝি তাকে থানার ঘাটে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে।

সবাই ডাকাতদের দেখতে থানায় যাচ্ছে, মনোরঞ্জনও তাদের সঙ্গে মিশে থানায় গেলেন। খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন থানাঘরের মধ্যে বসে রয়েছে সত্য বসু, ভূপেন ঘোষ এবং সানুকূল চাটার্জী।

সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত সহজ হয়ে গেল।

ওরা ধরা পড়েছে। সুতরাং আর কি হবে নবদ্বীপে থেকে?

মনোরঞ্জন নিজেই তখন ফেরারী। পুলিশ তাঁর নাম জানে, কিন্তু তখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হননি বলে ওরা চেনে না ওঁকে। তবু সাবধানতার মার নেই। তাই তিনি মাথাটা কামিয়ে ফেললেন, হাতে নিলেন ডি. গুপ্ত ওষুধের আধখানা খালি একটা বোতল, ওষুধ খাবার প্লাস দিয়ে মুখটা ঢাকা কিন্তু জামার নীচে কোমরে গোঁজা রিভলভার। চলে এলেন নির্বিঘ্নে কলকাতার গোপন আস্তানায়।

এরপর মনোরঞ্জনদা শিবপুর ডাকাতির ফলে বিপ্লবী সহকর্মী ও বন্ধুদের একে একে গ্রেপ্তার হবার কাহিনী বললেন। সংক্ষেপে তা বলছি—

নদীর উজান ঠেলে কুড়ি পঁচিশ মাইল নৌকো বেয়ে শিবপুর পেঁছিতে প্রায় ভোর হয়ে এল। তখন ডাকাতি শুরু করলে সকাল হয়ে যাবে, সবাই দেখতে পাবে এবং হয়তো তারা বাধা দিতে চেষ্টা করবে, থানায় দৌড়ুবে।

তাহলে কি করা যায়? নৌকোভর্তি লোক, রাত্রির অপেক্ষায় কোথায় তারা লুকিয়ে থাকবে? কোথায় খাবে সবাই; নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে যাবে, গ্রামের লোকেরা সন্দেহ করবে, প্রশ্ন করবে—

সুতরাং লীডার নরেন ঘোষ চৌধুরী হুকুম দিলেন, যা হয় হবে, চল, ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বিপ্লবীরা আক্রমণ করলেন কৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ী।

কাজ হয়ে গেল সুষ্ঠুভাবে বিনা রক্তপাতে। কিন্তু সময় তো একটু লাগবেই।

সকাল হয়ে গেল।

বিপ্লবীরা বাড়ীর বাইরে এসে দেখেন, অনেক লোক জমে গেছে।

গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে নৌকায় উঠলেন সবাই। নৌকো স্রোতের অনুকূলে যাত্রা করল।

কিন্তু দেখা গেল, গ্রামবাসীরা দমবার পাত্র নয়। গুলীর আওয়াজে তারা নিরস্ত হয়নি। এবং নদীর দুই পাড় দিয়ে তাড়া করল। অতি দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল তাদের সংখ্যা।

বিপ্লবীরা বুঝতে পারলেন, রক্তপাত এড়ানো যাবে না।

সুতরাং এবার তাক করে চালালেন মসার পিস্তল।

তিনজন গ্রামবাসী নিহত হল, রাজেন মুখোপাধ্যায়, কেদার সরকার ও চারুচন্দ্র দাস। আহত হল বেশ কয়েকজন। ওরা নিরস্ত হল।

কিন্তু এর পর আর নৌকোয় থাকা নিরাপদ নয় মনে করে বিপ্লবীরা জঙ্গীপুরের কাছে নৌকো ত্যাগ করে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে রওনা হলেন ভাগীরথী নদীর দিকে।

ইতিমধ্যে স্বভাবতঃই পুলিশ খবর পেয়ে গেছে।

সারাদিন হাঁটিবার পর বিকেলের দিকে অকস্মাৎ এক দল পুলিশের সম্মুখীন হলেন বিপ্লবীরা।

তৎক্ষণাৎ চলল মসার পিস্তল, যার পাল্লা পুলিশের বন্দুকের চাইতে বেশী।

পুলিশ আর সাহস করল না এগোতে।

বিপ্লবীরা ভাগীরথীর পাড়ে এসে পেঁছিলেন।

একখানা চলমান নৌকো থামিয়ে তারা ছোট ছোট দলে নদী পার হলেন। শেষ দলে পার হলেন লীডার নরেন ঘোষ চৌধুরী, সতীন সেন, সুধীর দাশগুপ্ত, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, বিজয়কুমার মিত্র এবং রাধিকা গাঙ্গুলী।

সবাই একটা পুকুরের পাড়ে শুয়ে রইলেন সারা রাত।

তারপর আবার ওঁরা নৌকোয় রওনা হলেন।

বারাসত এসে গেলেন।

সবারই পোশাকপরিচ্ছদ অত্যন্ত ময়লা, লোকের সন্দেহ হতে পারে।

তাই লীডার নরেন ও সুধীর কলকাতা গেলেন সবার জন্য ফর্সা পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আসতে।

নগেন গেলেন একটু বাজারের দিকে ঘুরে আসতে। যতীন, বিজয় ও রাধিকা লোকের কৌতুহলী দৃষ্টি এড়াবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রগুলি নিকটবর্তী একটা জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে এলেন।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নগেন দূর থেকেই দেখতে পেলেন, সতীন বিজয় ও রাধিকার চারিদিকে অনেক লোক জমে গেছে। বোঝা গেল, ওঁরা আর গ্রেপ্তার এড়াতে পারলেন না।

পায়ে পায়ে সরে পড়লেন নগেন।

একটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাড়া যাবে দমদম পর্যন্ত ?

একজন দফাদার কথাটা শুনে ফেলেছিল। বেরিয়ে এসে নানা প্রশ্ন করল নগেনকে। অবশেষে বলল, উঠুন গাড়ীতে, আপনাকে থানায় যেতে হবে।

নগেনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে দফাদার গিয়ে বসল কোচম্যানের পাশে। গাড়ী থানা অভিমুখে চলল।

নগেন কি এমনি শান্তশিষ্টের মত ধরা দেবেন ? তেমনি পাত্রই নন তিনি।

গাড়ীটা যেই একটা বাঁক ঘুরছে, কাছেই একটা ঘন জঙ্গল, নগেন টুক করে নেমে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন এবং মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নগেন তারপর নির্বিঘ্নে দমদম পেঁছে গেলেন।

ওদিকে সতীন সেন, বিজয় মিত্র ও রাধিকা গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন।

নরেন ঘোষ চৌধুরী কলকাতায় এসেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন বেনেটোলা লেনে হীরালাল দাশগুপ্তের বাড়ীতে। তারপর সার্পেন্টাইন লেনে একটা ভাড়াটে বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। মনোরঞ্জনদাও কদিন ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

একদিন নরেনবাবু বললেন যে, নদীয়ার একটি জঙ্গলে ডাকাতির কিছু টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা আছে। আর বারাসতে গ্রেপ্তারের সময় বন্ধুদের কাছে যখন আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়নি, তখন তারাও নিশ্চয়ই সেগুলো কাছেই কোন জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছে। সেগুলো উদ্ধার করে আনা দরকার।

মনোরঞ্জনদা একদিন নবদ্বীপ গেলেন, ত্রিবেণীবাবুকে সঙ্গে করে গেলেন সেই জঙ্গলে। কিন্তু দেখা গেল, মাঝে মাঝে মাটি খোঁড়া হয়েছিল, জিনিস কিছুই নেই। বারাসতের জঙ্গলে মনোরঞ্জনদা একাই গিয়েছিলেন, পাননি কিছুই।

সবই পড়েছিল পুলিশের হাতে। ঐ পিস্তলগুলি যে সতীন, বিজয় ও রাধিকার, পুলিশ তা প্রমাণ করতে না পারায় ওদের বিরুদ্ধে মামলা টেঁকেনি।

৩০ নভেম্বর অকস্মাৎ পুলিশ রাত থাকতেই সার্পেন্টাইন লেনের বাড়ীটা ঘেরাও করে ফেলে এবং নরেন ঘোষ চৌধুরী ও উপেনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

মনোরঞ্জনদা বলতে লাগলেন, 'ডিসেম্বরের তেরো তারিখ স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের সমক্ষে বারোজনের নামে মামলা শুরু হল। রাজসাক্ষী কৃষ্ণনগরের সেই নরেন সরকার। সে স্বভাবতঃই খালাস হয়ে গেল।

১৯১৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী রায় প্রদত্ত হল। তিনজন মুক্তি পেয়েছে, বাকি ন' জনের মধ্যে একজনের দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড। আর সবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তাদের মধ্যে একজন বরিশাল শঙ্কর মঠ গ্রুপের এ্যাকশন লীডার নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মনোরঞ্জনদা, শিবপুর ডাকাতিতে বিপর্যয়ের প্রধান কারণ কি ছিল বলে আপনার মনে হয়?

ডাকাতির টাইমিং, উনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। ডাকাতি করা উচিত ছিল রাত্রে। রাত্রের অন্ধকারে গ্রামের অত লোক জমতে পারত না আর বিপ্লবীরাও অনেক সহজে অন্ধকারে নিরাপদে সরে পড়তে পারত।

আমি বললাম, শিবপুর ডাকাতি যুগান্তর দলের একটি স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু একে পুরোপুরি বিপর্যয় বলতে পারি না। পূর্বসূরীদের কর্মকাণ্ড, তা সে সফলই হোক, বা বিফলই হোক, উত্তরসূরীদের গাইডের কাজ করে থাকে, জ্ঞান বৃদ্ধি করে, সঠিক পথের সন্ধান দেয়।

ঘড়ি দেখলাম। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

মনোরঞ্জন গুপ্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বিপ্লবী নেতা নলিনীকিশোর গুহ

পুরো ছিআশীটি বৎসর অতিক্রান্ত। নুব্জদেহ, লোলচর্ম, ক্ষীণদৃষ্টি। জড়ো-করা বালিশ হেলান দিয়ে খাটে অর্ধশায়িত। ভাল করে হাঁটতে পারেন না। ক্বচিৎ যান সভা-সমিতিতে।

কিন্তু বয়সের গুরু ভারে শরীর ভেঙ্গে পড়লে কি হবে, বিপ্লবী বাংলার সেই আদি যুগের প্রখ্যাত সম্পাদক নলিনীকিশোর গুহের লেখনী আজও অগ্নিক্ষরা। এক টুকরো কাগজ চোখের খুব সামনে ধরে খস খস করে লিখে ফেললেন, "ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ডাক এল, 'আয়, আজি আয়, মরিবি কে?' এই মরণের ডাকে বিপ্লবী বাংলা সাড়া দিল। মৃত্যু বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার অভূতপূর্ব সাধনা! কত সতীর্থ ও সহযাত্রী শহীদ হলেন। এদিকে, এক যাত্রার পৃথক ফল, মরতে প্রস্তুত হয়ে মরতে গিয়েও আমরা, দৈবাৎ বেঁচে রইলাম, সেই আমাদেরই তো আজ সংগ্রাম করার কথা। বিপ্লবীদের সংগ্রামের কখনো শেষ নেই। বিপ্লবী পথিকৃতের সত্য সিদ্ধান্ত, আমাদের জাতীয়তা ভগবৎ আদিষ্ট ধর্ম। ভারতের আছে একটি আত্মা, India is one and indivisible, ভারত এক এবং অবিভাজ্য। সেই অবিভাজ্য ভারতকেই আমরা বিভক্ত হতে দেখেছি। জাতির এই সর্বনাশা অকল্যাণ রোধ করবার জন্য মৃত্যু বরণের সংকল্প নিয়ে দাঁড়াইনি আমরা। আজ শহীদগণকে শ্রদ্ধা জানাতে যখন সমবেত হই তখন বিচার বিশ্লেষণ করি নিজেকে—শুধু মূর্তি বা প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে "ব্যর্থ নমস্কারে" তাঁদেরই বিদায় দোব, "আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে যারা?" তাঁদের জীবনের বাণী। তাঁদের আচরণ, তাঁদের শিক্ষা রাষ্ট্রে ও সমাজ-জীবনে রূপায়িত করবার দায়িত্ব যে আমাদের। আমরা কি সেই কর্তব্য পালন করছি? ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে।"

কাগজখানা দিলেন। পড়লাম। সামান্য কাটাকুটি আছে, দু একটা ভুল বানান, যতিগুলির কিছু কিছু পড়েনি। তবু দেখলাম, দেখে বিস্ময় বোধ করলাম—জটিল, প্রতিপাদ্য বিষয়ে সম্পাদকসুলভ দ্রুতগতিতে লিখবার সেই পুরোনো ক্ষমতা আজও অটুট রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা নলিনীবাবু, আপনি কতগুলি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন?

বললেন, প্রথম "শঙ্খ" আর "বাংলায় বিপ্লববাদ"। সাপ্তাহিক। ১৯২১

সালে বেরিয়ে, যত দূর মনে পড়ে, দু তিন বছর চলেছিল। তারপর "দৈনিক স্বরাজ।" সেও শুরু হয় ১৯২০-২১ সালে, চার পাঁচ বছর চলে।

তারপর ১৯২৪-২৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা দৈনিক "হিন্দুস্থান"। বছর চারেক চলেছিল মনে পড়ছে। তারপর যাই ঢাকায়, ১৯২৬ সালে বার করি সাপ্তাহিক "বাংলার বাণী"। ছয়-সাত বৎসর চলবার পর রাজদ্রোহমূলক সম্পাদকীয় প্রকাশের অপরাধে গভর্ণমেণ্ট জামানত দাবী করেন। প্রতিবাদে কাগজ বন্ধ করে দেয়া হয়। এর পর ১৯৩০-৩১ সালে ঢাকা থেকে বার করি সাপ্তাহিক "সোনার বাংলা"। চলেছিল একটানা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। তারপর, কি যেন একটু ভাবলেন নলিনীবাবু। তারপর বললেন, "স্বাধীন ভারত" নামে সে যুগে মাঝে একখানা প্রকাশক, সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নাম-ঠিকানাহীন বিপ্লবী ইস্তাহার বেরুত, মাঝে মাঝেই তা আমিই লিখতাম। সেই ইস্তাহার কোন দিন দেখেছেন কি ?

না, দেখিনি, তবে 'স্বাধীন ভারত' ইস্তাহারের নাম শুনেছি।

তারপরই বললাম, একটা কথা আপনাকে বলি। আপনি আমার চাইতে বিশ বছরের বড়। একদা আমি ছিলাম যুগান্তর দলে আর তার অনেক বছর আগে থেকেই আপনি কাজ করেছিলেন অনুশীলন সমিতিতে। আমায় 'আপনি' 'আপনি' করে বলবেন না।

আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হইবো। হেসে জবাব দিলেন উনি পূর্ববঙ্গীয় টানে।

ওঁর আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বজ্রযোগিনী গ্রামে। কথা যতই সতর্কতার সঙ্গে বলতে যান না কেন, ঢাকার টান পুরোপুরি এড়াতে পারেন না।

প্রশ্ন করলাম, যেসব গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা পাঠ করে আপনি বিপ্লবী দলে যোগদানের অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তার মধ্যে কয়েকখানির নাম বলুন।

উনি জবাব দিলেন, অনেক বইয়ের কথা মনে পড়ছে, তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, টডের রাজস্থান, রজনী গুপ্তের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বক্তৃতাবলী, ইত্যাদি।

এইবার বলুন, কোন্ সালে কত বৎসর বয়সে আপনি অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন, কে দলে নিয়ে আসেন, কার কাছে দীক্ষা নেন।

চোখ বুজে কি যেন ভাবলেন, পিঠের দিকের বালিশগুলো ঠিক করে নিয়ে ভাল করে হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর বলতে লাগলেন, সত্তর বৎসরেরও আগেকার কথা, স্বপ্নের মত মনে পড়ে সব—না, সব নয়, সব কথা আর মনে করতে পারি না। যা পারি, তাই বলছি। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে একটা পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল। সেখান থেকে বই নিয়ে পড়তাম। আমার বয়স তখন চোদ্দ পনের বৎসর হবে। আজও মনে পড়ে যে সব কবিতা—"কত কাল

পরে বল ভারত রে", "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়" এবং "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে।" দক্ষিণের ঘরে বসে যখন "হবে না, হবে না, খোল তরবার, এসব দৈত্য নহে তেমন—" সুর করে পড়তে পড়তে মুষ্টি উঁচু করে ধরতাম, আমার আজও মনে আছে, একমাত্র শ্রোতা আমার মা অদূরে বসে তাঁর এই অষ্টম গর্ভের সন্তানটির কাণ্ড দেখে শঙ্কিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন, তারপর যেন কতকটা আপন মনেই ধীরে ধীরে বলতেন, ঠিক কথাই তো বলছে। বিদেশী ওরা আর কজন? অথচ ওরাই আমাদের ওপর লাঠি ঘোরাচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" পড়ে আমরা পাঁচ ছয়জন সমবয়সী "সন্তানদল" গড়ে তুললাম। সাদা কাপড় গেরুয়া রং করে নিলাম, বিবেকানন্দের ছবি দেখে তেমনি করে পাগড়ী বাঁধলাম। গোপনে জঙ্গলে ঢুকে লোকচক্ষুর অন্তরালে আমরা সমবেতভাবে ধ্যান করতে লাগলাম। গ্রামের কর্মকারকে দিয়ে টিনের তলওয়ার তৈরী করিয়ে নিয়েছিলাম। ধ্যানান্তে আমরা কল্পিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতাম সেই তলওয়ার ঘুরিয়ে। মনে পড়ে একখানা ছবিও আঁকিয়েছিলাম বড় করে—এক বলিষ্ঠদেহ পুরুষ মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, বিস্তৃত বক্ষপট, চোখেমুখে দুর্জয় সংকল্প ও বেপরোয়া সাহসের অভিব্যক্তি, নীচে লেখা বিবেকানন্দের সেই অগ্নিক্ষরা বাণী, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

কিন্তু এ তো সবই ভাবপ্রবণ কিশোর মনের উচ্ছ্বাস। নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটা কিছু করতে হবে, এই ছিল সংকল্প। কিন্তু কি করে সেই সংকল্পসাধন করব? কোন পথে? কে দেবে পথের নিশানা? কোথায় সেই ভগীরথ? উত্তেজনায় কেঁপে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠ। কণ্ঠ বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমিও সহসা কিছু বলতে পারলাম না।

একটু পর শুধু বললাম, তারপর?

ঠিক এমনি সময় সুযোগের হল সূত্রপাত, নলিনী গুহ বলতে লাগলেন, ১৯০৫ সালে শুরু হল বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন। আরম্ভ হল "স্বদেশী যুগ।" কলকাতার টাউন হল-এ এক বিশাল সভায় দেশবরেণ্য নেতারা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আজ থেকে বিদেশী শাসকের কাছে আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হল। আমরা প্রতিরোধ করব।

সেই প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ, জনসেবা, বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন ও স্বদেশী প্রচার এবং স্বদেশী দ্রব্যাদি বিক্রয় কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট শুরু করল অমানুষিক অত্যাচার। সেই অত্যাচারের ফলেই প্রকাশ্য আন্দোলন গুপ্ত পথে ধাবিত হল। স্বদেশী যুগ বঙ্গ-বিপ্লব যুগের সূচনা করল। আগেই কলকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়ে

গিয়েছিল। ঢাকায় স্থাপিত হল ঢাকা অনুশীলন সমিতি। সমিতির নেতা পুলিন দাস।

এই ১৯০৫ সালেই, সতেরো বৎসর বয়সে, নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, যোগাযোগ ঘটল পুলিন দাসের সঙ্গে। তিনিই আমায় বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। আমি ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা নলিনীবাবু, অনুশীলন সমিতিতে সে-যুগে যোগদানের সময় কোন প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করতে হত ?

হ্যাঁ, পাঠ করতে হত, উনি জবাব দিলেন। তাতে অন্যান্য কথার পর লেখা ছিল, 'নেতার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিব।' আমি তা করেছি। প্রসঙ্গত বলি, অনুশীলন সমিতির দুটি রূপ ছিল—একটি প্রকাশ্য, আরেকটি গোপন। একটি বহিরঙ্গ আরেকটি অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গে সমিতি জনসেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান। সমিতির আখড়ায় কুস্তি, লাঠি ও ছোরাচালনা শিক্ষা দেয়া হত, শিক্ষা দেয়া হত যুযুৎসু। শরীর ও স্বাস্থ্যগঠনের জন্য চলত নানাবিধ ব্যায়াম। সঙ্গে সঙ্গে চলত সৎগ্রন্থ পাঠ, সদালাপ ও সদালোচনা। রোগীর সেবা, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ, পুষ্করিণীর পানা পরিষ্কার করা, জঙ্গল কেটে পথ সুগম করা, মাটি ফেলে রাস্তা তৈরী করা, শবদেহ সৎকার—এই সবই ছিল সমিতির বহিরঙ্গের তৎপরতা।

আর অন্তরঙ্গে সমিতি ছিল একটি গুপ্ত বিপ্লবী কর্মীদের সংঘ। বলপ্রয়োগের দ্বারা ইংরেজ বিতাড়ন করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল সেই সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বহিরঙ্গ থেকে বাছাই-করা ছেলেদের অন্তরঙ্গের গোপন মহলে নিয়ে এসে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেয়া হত।

দলনেতা পুলিনবাবু সমিতির শাখাবিস্তার-কার্যে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বস্তুতঃ, বিপ্লবমন্ত্র প্রচারকল্পে সেটাই তো প্রাথমিক কাজ। ওঁর সংগঠনের ফলে পূর্ববঙ্গে প্রায় পাঁচশো শাখা স্থাপিত হয়ে গেল।

নলিনীবাবু বললেন, আমারই উদ্যোগে আমাদের বজ্রযোগিনী গ্রামেও এসেছেন পুলিনবাবু। সেখানেও শাখা স্থাপিত হল।

কিছুদিন পরেই নেতার আহ্বানে ঢাকা যেতে হল।

উনি আমায় পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন।

বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে কাজকর্মের তদারকি করতে লাগলাম।

নলিনীকিশোর গুহের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না।

তবে আমি তাঁকে চিনতাম।

অনেক বার দেখেছি ওঁকে। হয়ত ঢাকায়, কলকাতায়, কিংবা অন্যত্র। ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে সেই চেহারা আজও মনে পড়ে। মজবুত শরীর,

তারুণ্যে উজ্জ্বল মুখশ্রী, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, একটি পা দুর্বল, যতদূর মনে পড়ে, একখানা লাঠিতে ভর করে হাঁটেন। তাও সব সময় নয়।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত "বাংলার বাণী" আমরাও নিয়মিত পড়েছি ছোট-বেলায়। প্রতিটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ছিল চিত্তআলোড়নকারী নির্ভীক মতবাদ, ইংরেজ সরকারের প্রতিটি অনাচার ও অত্যাচারের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

আজ সাক্ষাৎ করতে এসেছি ওঁর সমসাময়িক একজন প্রখ্যাত বিপ্লবীর পরিচয়পত্র নিয়ে। কিন্তু মুহূর্তে উনি আমায় কাছে টেনে নিয়েছেন। খাটের পাশেই বিছানো সোফা-সেট—না না, সেখানে নয়, একেবারে ওঁর খাটে,ওঁর পাশে।

মুহূর্তে আমি ওঁর অন্তরঙ্গ আত্মীয় হয়ে গেছি যেন!

হঠাৎ সচকিত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিয়ে বলে উঠলেন, কই লো, চা দিয়া গেলি না!

পরমুহূর্তেই একটি মেয়ে চা ও খাবার এনে সেণ্টার টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চলে গেল। নলিনীবাবু বললেন, খাও, এক কাপ চা খাও। কতদূরে থিকা আইছ। খাইতে খাইতে কথা হইবো'খনে।

আমাদের দেশ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ভাষা। অনেক দিন পর শুনলাম। কানে যেন মধু ঢেলে দিল।

সোফায় বসে কাপটা তুলে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা নলিনীবাবু, আপনি কত বৎসর বয়সে প্রথম গ্রেপ্তার হন? আপনার নামে কোন মামলা হয়েছিল কি কখনো?

নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, আমাদের গ্রামের বাড়ী প্রথম তল্লাসী হয় ১৯০৭ সালে। তখন আমার বয়স উনিশ বৎসর। কিছুই পেল না পুলিশ। গ্রেপ্তারও করল না আমায়। হেসে বললেন, খবর ওরা ঠিকই পেয়েছিল, কিন্তু থানার পুলিশ আসতে একদিন দেরী করে ফেলেছিল। একটা রিভলভার ছিল। আগের দিন সন্ধ্যার পর এল সহকর্মী গোপাল ঘোষ। বলল, আপনার কাছে এসব রাখা নিরাপদ হবে না, হঠাৎ পুলিশ আসতে পারে। ওটা দিয়ে দিলাম, সে চলে গেল আর ভোর হতে না-হতেই এল পুলিশ।

১৯০৮ সালে আবার তল্লাসী হল। এবারও পেল না কিছুই। তবে আমার রচিত "কেদার রায়" এবং "বিধবা পূজা" গ্রন্থদুখানির পাণ্ডুলিপি মারাত্মক রাজদ্রোহমূলক রচনা মনে করে নিয়ে গেল পুলিশ। এবারও রেহাই দিল আমায়।

১৯০৮ সালেই ঢাকা অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হল। ১৪ ডিসেম্বর সমিতির নেতা পুলিন দাসকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করা হল পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলে। বাড়ীঘর ছেড়ে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে যাঁরা কেন্দ্রেই থাকতেন, তাঁরা আশ্রয়হীন হয়ে পড়লেন, তাঁদের দুবেলা অন্ন জোটানোই কঠিন হয়ে পড়ল।

তাঁদের মধ্যে এক দল বাধ্য হয়ে কলকাতায় চলে এলেন। নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি আগেই কলকাতা এসে কলকাতা ন্যাশনেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছি। ওদের সঙ্গে যোগাযোগে ও সহযোগিতায় কাজ করছি।

একটু থেমে উনি আবার শুরু করলেন, এবার আমার প্রথম গ্রেপ্তার হবার কথা বলি। ফেব্রুয়ারী মাসেই মুক্তি পেয়ে ঢাকায় এসে গেছেন পুলিনবাবু। আমরা ভাবলাম, আবার জমিয়ে কাজ শুরু করা যাবে।

কিন্তু পুলিশের অভিসন্ধি বুঝতে এতটুকুও দেরী হল না। জুলাই থেকেই শুরু হয়ে গেল ধবপাকড়। ষাট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের মধ্যে আমিও একজন।

এবং অবশ্যই দলনেতা পুলিন দাস।

মামলার নাম দেয়া হল, "ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা"।

আমার বয়স তখন বাইশ বৎসর।

আজ থেকে কত বৎসর আগে, নলিনীবাবু? হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

উনিও হেসে ফেললেন, মাত্র চৌষট্টি বৎসর আগে।

দুজনেই হাসতে লাগলাম।

চা পান হয়ে গেছে, আবার ওঁর খাটে ওঁর কোলের কাছে এসে বসলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, গ্রেপ্তার করে আপনাকে কোথায় নিয়ে গেল?

ঢাকা সেনট্রাল জেলে, উনি বললেন, চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে। সেখানে পুলিনবাবু ও আরও সহকর্মীরা ছিলেন পৃথক পৃথক সেলে।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশ আমায় জেলে আটকে রাখতে পারল না, কারণ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রচেষ্টার অভিযোগ কোনটাই শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। দীর্ঘ পনেরো মাস পর মুক্তি পেলাম।

নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, পুলিনবাবু যখন বুঝলেন যে আমায় ছেড়ে না দিয়ে পারবে না, তখন আমায় কতকগুলো গোপন কথা ও নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, সেগুলো নরেন্দ্রনাথ সেনকে জানাতে হবে। পুলিনবাবুর অনুপস্থিতি কালে নরেনই ছিল ঢাকা সমিতির নেতা।

আমি মুক্তিলাভ করেই উকিল শশাঙ্ক বসুর বাড়ীতে যাই। নরেনবাবু সেখানে থাকতেন, আমি পুলিনবাবুর প্রেরিত কথাগুলি জানিয়ে দিই।

তারপর কলকাতা চলে আসি।

জিজ্ঞেস করলাম, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি হল, নলিনীবাবু?

বহু সহকর্মী ও বিপ্লবী নেতার দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়ে গেল, নলিনীবাবু উদগত দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বললেন। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল পুলিনবাবু এবং আরও দুজনের। মোট পঁয়ত্রিশ জনের সাজা হয়।

আমার পরের প্রশ্ন : আপনি কি কখনও ফেরার হয়েছিলেন ?

নলিনীবাবু জবাব দিলেন, না, তোমরা যাকে ফেরার বল, পুলিশ গ্রেপ্তার করবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, যাকে বলে 'হুলিয়া', সেই হুলিয়া বেরিয়ে গেছে, রেলষ্টেশনে ষ্টেশনে, পোস্টাফিসে আমার ছবি লাগানো বিজ্ঞাপন সেঁটে দেয়া হয়েছে, 'ধরাইয়া দিতে পারিলে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে'—না, এমনি অবস্থা আমার হয়নি। না হলেও সর্বদাই পুলিশের নজর এড়িয়ে চলতাম, সর্বদাই লক্ষ্য রাখতাম আমার পেছনে কেউ লেগেছে কিনা। অবশ্য সে-যুগে এমনিভাবে 'হাফ-ফেরারী' হয়ে অনেককেই কাজ করতে হয়েছে।

হাফ-ফেরারী !

হ্যাঁ, নলিনীবাবু হেসে উঠলেন, তা ছাড়া আর কি বলবে ?

তারপর বলতে লাগলেন, ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সমিতির কলকাতা শাখার বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমায় করতে হয়েছে। ডিক্লেয়ার্ড ফেরারী না হয়েও আমাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে। পুলিশ যাতে আমার আস্তানার খবর না পায়, সেজন্য সর্বদাই থাকতাম মেসে এবং কোনো মেসেই বেশী দিন নয়। কলকাতা শহরে অন্ততঃপক্ষে পঁচিশটি মেস বদলেছিলাম। ঢাকার সহকর্মী শশাঙ্ক হাজরা চকবাজারে একটি লোহার কর্মকারের দোকান করেছিল। সারাদিন কালিঝুলি মেখে আগুন জ্বালিয়ে দা কাস্তে বঁটি মেরামত করত, শান দিয়ে দিত, কিন্তু গোপনে আমাদের জন্য তৈরী করত ছোরা, কিরিচ, ভোজালি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র। সেও কলকাতা চলে আসার পর তার সঙ্গেও তিন চারটি আস্তানায় থেকেছি।

ত্রৈলোক্য মহারাজ ফেরারী অবস্থায় এসেছিলেন আমার ৮০ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের মেসে। ৮৮ নম্বর রাজাবাজার ষ্ট্রীটে একবার আমার মেস ছিল। পাশের বাড়ীতেই থাকতেন প্রখ্যাত বিপ্লবী রবীন্দ্রমোহন সেন। এই বাড়ীতেই আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় রাসবিহারী বসু, মতিলাল রায় ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে—

শ্রীশ ঘোষ, বাধা দিয়ে বললাম, ইনি কি সেই চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ ? পড়েছি, আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে যখন প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং খতম করার ভার নেন মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত, তখন বারীন্দ্র-কুমার ঘোষের গোপনে পাঠানো নির্দেশে চন্দননগরের বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশ ঘোষ আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় গায়ের চাদরের নীচে করে দুটো রিভলভার এনে ওদের কাছে পাস করে দিয়ে যান—ইনিই কি সেই শ্রীশ ঘোষ ?

নলিনীবাবু বললেন, ঠিক ধরেছ, ইনিই সেই শ্রীশ ঘোষ।

জিজ্ঞেস করলেন, আর কি প্রশ্ন আছে তোমার ?

বললাম, নলিনীবাবু, আলাপের সুবিধার জন্য কতকগুলি একই ধরনের

প্রশ্ন আপনাদের করছি। তার মানে এ নয় যে, এগুলো উকিলের জেরা এবং আপনাকে শুধু সহজ কথায় তার ঠিক ঠিক জবাব দিতে হবে, একটি কথাও বেশী বা কম বললে চলবে না। আলাপের সূত্র শুধু আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছি এক-একটি প্রশ্ন করে, আপনি তার জবাবে প্রাসঙ্গিক যে কোন কথা বলতে পারেন। এবং বলুন, এটাই আমার অনুরোধ। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের পুরোধাগণের স্মৃতিচারণের অন্ততঃ খানিকটা আমরা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

বেশ, উনি বললেন, বল, কি বলব!

একটু ভাবলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বাধীন ভারত" ইস্তাহার আপনাকেই বেশী লিখতে হত বলেছেন, গোপনে কোথায় ছাপানো হত সে ইস্তাহার?

নলিনীবাবু বললেন, আমাদের সহকর্মী উপেন রায় তখন ফেরারী। কালিপদ তখন তার ছদ্মনাম। সবাই, এমন কি আমরাও, তাকে কালিপদ নামেই ডাকি। আমার যে কোন আস্তানায় বসে আমি ইস্তাহার লিখে ফেলতাম, কালিপদ আমার লেখা কপিগুলি নিয়ে যেত গুলু ওস্তাগর লেনে একটি প্রেসে। প্রেসের মালিক ছিলেন সুরেশ বসু। আমাদের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী। সংসারী মানুষ হয়েও সমিতির কাজের জন্য প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করতেন না। কালিপদ কপিগুলো নিয়ে গিয়ে নিজেই কম্পোজ করত, নিজেই ছাপিয়ে ফেলে হরফগুলি ডিসট্রিবিউট করে ফেলত। তারপর ইস্তাহারের বাণ্ডিল নিয়ে চলে আসত। বিলি করা হত বিভিন্ন কর্মীকে দিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে।

উনি বলতে লাগলেন, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু একবার কলকাতায় এসে উঠলেন শশাঙ্ক হাজরার বাড়ীতে। বাড়ীর ঠিকানা ২৯৬।১ আপার সার্কুলার রোড, রাজাবাজারের কাছেই। বোধ হয় সেটা ১৯১২ সালের নভেম্বর মাস। রাসবিহারী আমার ওখানে খেলেন। খাওয়ার পর আমায় বললেন, আপনার "স্বাধীন ভারত" আমি মাঝে মাঝেই দেখি, খুব ভাল লাগে। তারপর কি যেন ভাবলেন, তারপরই ফুলহাতা সার্টের ওলটানো কাফ-এর মধ্যে থেকে তিন টুকরো টাইপ-করা পাতলা কাগজ বার করে বললেন, এই তিনটে নীচে নীচে সাজালে একটা পূর্ণ বয়ান হবে। যা লেখা আছে, তার আক্ষরিক অনুবাদ নয়, এর মর্ম নিয়ে "স্বাধীন ভারতে"র সংখ্যায় খুব কড়া করে লিখবেন।

জিজ্ঞেস করলাম, ওতে কি লেখা ছিল নলিনীবাবু?

হুবহু বলতে পারব না, উনি বললেন। মনে নেই, তবে বিষয়টি মনে আছে। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের আসন্ন দিল্লী দরবার ও সেই উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রার উল্লেখ করে ওতে যা বলা হয়েছিল, তার মর্ম এই যে, 'দিল্লী দরবার ও শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বিপ্লবী ভারত মনে করে এটা ভারতের জাতীয় মর্যাদার

প্রতি দাম্ভিক শাসকবর্গের অবমাননাকর আঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এর প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা উচিত।'

আমি সেই ভাবেই লিখলাম। স্বাধীন ভারত কোন প্রকাশ্য পত্রিকা নয়, ওখানা বৈপ্লবিক ইস্তাহার—সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকরের নাম নেই। সুতরাং খুশীমত গরম ভাষায় লিখলাম, আহ্বান জানালাম তরুণ ভারতকে এই অবমাননার যোগ্য প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রতিবার যেমন করা হয়, সেবারও প্রতি কেন্দ্রে স্বাধীন ভারত বিলি করা হল।

আশ্চর্য, তার কয়েক দিন পরেই ২৩ ডিসেম্বর হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলা হল।

বোমা ঠিক কে ফেলেছিলেন, রাসবিহারী না বসন্ত বিশ্বাস, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে আমি কিছু জানিনা বটে, জানবার কথাও নয়, কারণ বিপ্লবীদের ডান হাত যা করত বাঁ হাত তার হদিস পেত না। কিন্তু রাসবিহারীই যে ছিলেন এব উদ্যোক্তা ও সংগঠনের নায়ক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং সেই উদ্যোগ জোরদার করবার উদ্দেশ্যেই যে আমাকে দিয়ে স্বাধীন ভারতে লিখিয়েছিলেন, তাও সত্য। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি যে, আমার ওখানে আহার, বিশ্রাম ও নানা আলোচনার মধ্যে ঘুণাক্ষরেও এই বোমা নিক্ষেপের আয়োজন সম্বন্ধে আভাস দেননি। একেই বলে বৈপ্লবিক গোপনতা!

আমি অনুরোধ জানালাম, রাসবিহারী সম্বন্ধে আপনার আরও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলে বলুন না।

নলিনীবাবু বললেন, সেইবারই কাগজের টুকরোগুলি দেবার পর উনি বললেন, আপনার মারাঠা বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন বলেছিলেন, কবে দেবেন?

তার দুদিন পরই নিয়ে গেলাম তাঁকে কানাই ধর লেনে মারাঠা ছাত্রাবাসে, পরিচয় করিয়ে দিলাম বন্ধু হেডগাওয়ার এবং ভি ভি এ্যাথালের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে রাসবিহারী কি কথা বললেন জানিনা, কারণ গুপ্ত সমিতির নিয়ম-অনুযায়ী আলাপের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না।

এর পরবর্তী একটা ঘটনার কথা বলি, উনি বলতে লাগলেন, রাসবিহারীর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, তিনি ফেরারী। ফেরারী হলেও নানারূপ ছদ্মবেশে সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিপ্লবের কাজে। পুলিশ কিছুতেই তাঁকে ধরতে পারছে না।

একবার কলকাতায় এসে আশ্রয় নিলেন অনুশীলনের বাদুড়বাগান বাড়ীতে। সহকর্মী বীরেন চাটার্জী তখন ঢাকা থেকে এল, হাতে একটা থলি, থলির মধ্যে রিভলভার। ওর কোমরেও ছিল একটি গুলীভরা রিভলভার, বীরেন সেটাও থলিতে রেখে বলে গেল পরে এসে থলিটা নিয়ে যাবে।

রাসবিহারী এসব কিছুই জানতেন না। প্রতুল গাঙ্গুলী ও আমার সঙ্গে কথা

বলতে বলতে রাসবিহারী থলিটা যেমন নাড়াচাড়া করছেন, হঠাৎ রিভলভার থেকে গুলী ছুটে গিয়ে তাঁর হাতে লাগে। প্রতুল গাঙ্গুলী অল্পের জন্য বেঁচে যান।

বাদুড়বাগান থেকে রাজাবাজার আসবার সময় আমরা যখন বীরেনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা বলেছিলাম, উনি বাধা দিলেন, না না, দোষ বীরেনের নয়, দোষ আমার। বীরেন থলিতে কি রেখে গেল, না গেল, তা দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে ঠিক হয়নি। বিপ্লবীর বিন্দুমাত্র কৌতুহল থাকতে নেই, বিশেষ করে সহকর্মী ও তাদের কাজ সম্বন্ধে। ভেবে দেখ, কতখানি উদার আর দরদী ছিলেন রাসবিহারী!

আমি বললাম, এবার ছোট ছোট ক'টি প্রশ্ন করব আপনাকে। আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি কেন্দ্রীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন পেয়েছেন?

উনি বললেন, পেয়েছি।

তাম্রপত্র পেয়েছেন?

হ্যাঁ, তাও পেয়েছি।

আপনার দলের কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবীর নাম বলুন।

আশুতোষ দাশগুপ্ত, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, মাখনলাল সেন এবং আরও অনেকে। উনি বললেন, তুমি তো নিশ্চয়ই জান, আদিতে অনুশীলন সমিতি, কলকাতা সমিতি, তারপর ঢাকা সমিতি। তারপর হয় যুগান্তর দল, অনেকগুলি স্বয়ংশাসিত গ্রুপের ফেডারেশনের মতো বলতে পার।

আমার পরের প্রশ্ন, আপনি বিচারাধীন আসামী ছিলেন শুনলাম। কিন্তু আপনার কখনও কারাদণ্ড হয়েছিল কি?

হ্যাঁ, তাও হয়েছিল। ১৯১৩ সালের ২৬ মে মোট চুয়াল্লিশ জন বিপ্লবীকে আসামী করে শুরু হল বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। পলাতক থাকায় পাঁচজনকে তখন গ্রেপ্তার করতে পারেনি, তাদের একজন মদনমোহন ভৌমিক। ১৯১৪ সালে এই মামলায় বারোজনের দীর্ঘমেয়াদী সাজা হয়ে যায়। মদন তখনও ধরা পড়েনি।

তারপর অবশ্য এরা পাঁচজনই ধরা পড়ে যায় এবং বরিশাল দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলায় এদের সবারই দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়ে গেলেও আপিলে মুক্তি লাভ করে প্রতুল গাঙ্গুলী ও রমেশ চৌধুরী।

নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, ফেরারী মদন ভৌমিক কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তার চিকিৎসা দরকার। মেডিক্যাল কলেজের উলটো দিকে একজন মাদ্রাজী ডাক্তার থাকত, তার বাসারই ওপর তলাটা ভাড়া নেয়া হল। মদনের চিকিৎসা শুরু হল। তাকে নার্স করবার জন্য ওখানে রাখা হল লালমোহন দে এবং প্রফুল্ল ভট্টশালী নামে দুজন বিপ্লবী কর্মীকে। আমারই তত্ত্বাবধানে এসব ব্যবস্থা চলছিল। আমি তখন ছিলাম কলেজ স্কোয়ারে একটি

দোতলা বাড়ীতে। নীচের তলায় উইলকিন প্রেস আর ওপরে আমাদের মেস। সেখানে কয়েকজন ছাত্রও থাকত। তাদের বাড়ী বিক্রমপুরে, তাদের নাম মনে নেই। পরবর্তী কালে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বিপ্লবী নেতা মাখনলাল সেন ও অমূল্যচন্দ্র সেনও ঐ মেসে ছিলেন। ঐ উইলকিন প্রেসের বাড়ীতেই পরে গৌরাঙ্গ প্রেস স্থাপিত হয় এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ছাপানো শুরু হয়।

বললাম, তাহলে দেখা যাচ্ছে, মদনবাবু থাকতেন যে বাড়ীতে, আপনি সে বাড়ীতে থাকতেন না, বরং পাশাপাশিও নয়, একটু দূরেই থাকতেন, তাও আরও অনেকের সঙ্গে একটি মেসে; অথচ মদনবাবুকে হার্বার করার চার্জ আপনারই ঘাড়ে পড়েছিল।

সে-যুগে ইংরেজের আদালতে পুলিশ যে কোন অভিযোগ করলেই, নলিনীবাবু বললেন, সাজা হয়ে যেত। এমনিই ছিল নিরপেক্ষ বিচারপ্রহসন! একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, যে করেই হোক পুলিশ মদন ভৌমিকের খবর পেয়ে যায়। ১৯১৪ সালের মাঝামাঝি একদিন গভীর রাত্রে পুলিশ মদনের বাড়ীতে হানা দিয়ে মদন, লালমোহন ও প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করে। ঐ রাত্রেই পুলিশ হানা দেয় আমাদের মেসে। তাদের লীডার টেগার্ট, কলসন আর লোম্যান। লোম্যান আমাকে দেখিয়ে বলে উঠল, He is Nalini! মেসের সবাইকে নানারূপ প্রশ্ন করা হল, কিন্তু গ্রেপ্তার করা হল শুধু আমাকেই।

হ্যাঁ, আরও একটা বড় শিকার ওদের জুটে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে, নলিনীবাবু হেসে বললেন। আর এক ফেরারী, পুলিশ যাকে সাত বছর ধরে হন্যে হয়ে খুঁজে মরছিল। আমাদের মেসে যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তাঁর গৈরিক বসন, পুরোদস্তুর ঘরছাড়া সন্ন্যাসীর পোশাক। নাম শিশিরকুমার গুহরায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি ফেরারী হয়েছিলেন কেন নলিনীবাবু?

আবার মৃদু হাসলেন উনি। বললেন, তাহলে শোন। শিশির ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন, বাড়ীঘর ছেড়ে সমিতির অফিসেই থাকতেন। যেমন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তেমনি স্বাস্থ্যসমুন্নত দেহ, আর সবার ওপরে বেপরোয়া সাহস। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকার খয়ের খাঁ নবাবের প্ররোচনায় এক মুসলমান দাঙ্গাবাজ জনতা একটা বাজে ছুতো করে সমিতির নেতা পুলিন দাসের উয়ারীর বাড়ী আক্রমণ করে। সেখানেই তখন ছিল সমিতির অফিস, সুতরাং শিশিরও ওখানেই থাকতেন। আক্রমণকারীরা কাঠের গেট ভেঙে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে যখন বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে যায়, নেতার নির্দেশে সমিতির কর্মীরা তখন বাধা দিতে অগ্রসর হয়। সে সময় এই কালান্তকের মতো দাঙ্গাকারীদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের এমন মার দেন যে, ওরা পালাবার পথ পায় না। পুলিশ পুলিনবাবুর নামে মামলা করে। তাঁর

তিন সপ্তাহ কারাদণ্ড ও পনেরো টাকা জরিমানা হয়। শিশিরকে খোঁজ করে পুলিশ, কিন্তু শিশির তখন সরে পড়েছেন। সেই যে সরে পড়লেন, ব্যস, আর ফিরলেন না, সন্ন্যাসীর বেশে সারা ভারত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

তাহলে স্বদেশী ছেড়ে দিলেন? বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ছাড়লেন বলি কি করে? নলিনীবাবু জবাব দিলেন। অমনি ফেরারী থাকাকালেই ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে অর্থাৎ পরের মাসেই ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন সাহেব যখন দেশে যাবার পথে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে স্টীমার ছেড়ে ট্রেনে উঠছিল, এই শিশিরই তাকে গুলী করে। না মরলেও এ্যালেন গুরুতররূপে আহত হয়। তারপর ১৯০৮ সালের জুন মাসে ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাররা গ্রামের যামিনীমোহন সরকারের বাড়ীতে অনুশীলনের যে ত্রিশ বত্রিশ জন কর্মী ডাকাতি করে নগদ টাকা ও অলংকারে প্রায় তেইশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে, পলাতক শিশির তাদের একজন।

এরপর শিশিরের সঙ্গে আমাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। এতকাল পর বাংলায় ফিরে এসে আমাদের খুঁজে বার করেন এবং আমাদের মেসেই ছিলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তাঁর সাজা হয় ১১০ ধারায় আর মদনকে আশ্রয় দেবার চার্জে আমার সাজা হয় এক বছর।

প্রেসিডেন্সী জেলের বারো নম্বর ডিগ্রিতে ছিলাম, পর পর সেলে ছিলাম আমরা পাঁচ জন, প্রফুল্ল ভট্টশালী, লালমোহন দে, সাধু শিশিরকুমার, মদনমোহন ভৌমিক এবং আমি। দিন দশেক পর অবশ্য মদন ভৌমিককে বরিশাল নিয়ে যায় বরিশাল (অতিরিক্ত) ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করে এবং তার দশ বৎসর সাজা হয়ে যায়। আর পাঁচটি সেলে ছিলেন রডা বন্দুক চুরির মামলার বিচারাধীন আসামী অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গধর রায়, নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরিদাস দত্ত।

আমি বললাম, জেলের কোন একটা ঘটনার কথা বলুন না।

নলিনীবাবু একটু ভেবে বললেন, তোমরা যে জেল দেখেছ আমাদের কালে তা অন্যরকম ছিল। 'স্বদেশী' আসামী বলে কোনরূপ সুবিধা বা সুবিবেচনা পাওয়া যাওয়া তো দূরের কথা, বরং কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি সব সময় মারমুখী হয়ে থাকত। আর কর্তৃপক্ষ মানে শুধু সুপার জেলার, ডেপুটি জেলার, সুবাদার বা জমাদার নয়, সাধারণ ওয়ার্ডার, এমন কি 'কালাপাগড়ী' কয়েদি বা মেট, এরাও আমাদের ওপর হম্বিতম্বি করত, পদে পদে অপমান করত আর আমাদের গার্ড দিত হিন্দুস্থানী সিপাই নয়, গুর্খা সিপাই। আর ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডারের সঙ্গে আমরা সকালে ও বিকেলে সেলের বাইরের প্রাঙ্গণে এক ঘণ্টা করে বেড়াতে পারতাম।

বললেন, আচ্ছা, শোন একটা ঘটনা। বসন্ত চ্যাটার্জী ছিল আই. বি-র ডেপুটি পুলিশ সুপার। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, লোকটার অদ্ভুত বুদ্ধি

আর দারুণ সাহস ছিল। ইংরেজ সরকার স্বদেশীদের ব্যাপারে ওর ওপর খুব নির্ভর করত।

বিপ্লবীরা ওকে খতম করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১৪ সালেরই জুলাই মাসে ঢাকা শহরে বিপ্লবীরা ওর ওপর অতর্কিত গুলী চালায়। মারা যায় ওর একজন দেহরক্ষী। আরেকজন গুরুতরভাবে আহত হয়। বসন্তর কিছু হল না।

তারপর ঐ বছরই নভেম্বর মাসে কলকাতার মুসলমানপাড়া লেনের একটি বাড়ীতে সন্ধ্যার পর বসন্ত চ্যাটার্জী যখন আরও কজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল, স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র অনুশীলন সমিতির নগেন সেন ওকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। আবারও বেঁচে যায় বসন্ত চ্যাটার্জী। মারা যায় ওর একজন দেহরক্ষী।

আর একটা বোমা নিক্ষেপের আগেই ফেটে যায়। নগেন আহত অবস্থায় ধরা পড়ে। তাকে নিয়ে আসে আমাদের বারো নম্বর সেল ওয়ার্ডে।

পরদিন সকালে নিয়মমত ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডার আমাদের সবাইকে নিয়ে পায়চারী করতে লাগল, আমরা নগেনের সেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। দেখছি ওকে আহত অবস্থায় শায়িত, ওর সঙ্গে কথা বলা নিষেধ, তাই শুধু দেখছি ওকে—হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডারের পেছনে আমরা হাঁটছি দল বেঁধে, হঠাৎ আমি টুক করে সরে গিয়ে নগেনের সেলে ঢুকে পড়লাম, ফিস ফিস করে অতি দ্রুত বললাম, ভয় নেই, পাশেই আছি। যতই টর্চার করুক, কোন কথা বলোনা যেন। আর কাউকে ধরেছে কিনা, খবর নিতে চেষ্টা কর।

ব্যস, চট করে বেরিয়ে এসে দলের সঙ্গে মিশে আবার ভাল মানুষটির মতো হাঁটতে লাগলাম। কালীবাবু বললেন, বড্ড রিস্ক নিয়েছিলেন, ধরা পড়লে নির্ঘাৎ বেত চালাত।

আমার প্রশ্ন শেষ।

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিতে যাব, হঠাৎ বললেন নলিনীবাবু, এই যে খাটখানা, আমি বসে আছি, তুমিও এসে বসেছ, এই খাটে একদিন সুভাষচন্দ্র রাত্রি যাপন করেছিলেন—

সুভাষ! নামটি শুনেই আবার বসে পড়লাম। অনুরোধ জানালাম, ঘটনাটা বলবেন? আপনার শোবার খাটে সুভাষ রাত কাটিয়েছিলেন?

হাসলেন নলিনীবাবু, শোন তাহলে। তারপর আরম্ভ করলেন, ১৯৩৯ সালে সুভাষ কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। তারপর গঠন করেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। ঢাকা থেকে তখন বেরোয় সাপ্তাহিক "সোনার বাংলা"। আমি তার সম্পাদক।

সুভাষ ঢাকা শহরে এলেন ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠন করতে। আমার সঙ্গে

বিশেষ পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা আগেই ছিল, তাই আমার এখানেই তাঁর আহার ও থাকবার ব্যবস্থা করলাম। আমার অনুরোধ রাখলেন, এলেন রাত্রে। নানারকম ব্যঞ্জন সাজিয়ে আহারে বসিয়েই মনে পড়ে গেল। ঐ যা, একথাটা তো মনেই ছিল না যে, আমরা ঢাকার মানুষ, ঝাল বেশী খাই আর উনি কলকাতার। বললাম ওঁকে, আপনার নিশ্চয়ই সবই খুব ঝাল লাগছে, খেতে কষ্ট হচ্ছে।

না না, এমন কিছু না, বাধা দিয়ে বললেন। ঝাল একটু হলেও প্রতিটি জিনিসের স্বাদ হয়েছে চমৎকার। খেতে খুব ভাল লাগছে।

তারপর রাত্রে শোবার ব্যবস্থা করলাম এই খাটে। আমার ভোরে ওঠা অভ্যাস। রাত চারটেতে উঠে দেখি কি জান? মশারীর নীচে সুভাষ ধ্যানরত। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

নলিনীবাবু তন্ময় হয়ে কি ভাবতে লাগলেন, আমিও চুপ করে রইলাম।

একটু পর বললেন, ভগবানে এতখানি বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি ছিলেন অমিত শক্তিধর। তাই ভবিষ্যতে সমগ্র ভারত তাঁকে স্যালুট করে বলেছিল, আমাদের নেতাজী।

এত বড় স্বাধীনতাসংগ্রামী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

নলিনীবাবুর শয্যার পাশে প্রচুর বই, খাতা, কাগজ ও চিঠিপত্র। কিছুটা সাজানো, বেশীর ভাগই অগোছালো। ম্যাগনিফাইং কাঁচের মধ্য দিয়ে কাগজ পড়েন, চিঠি লেখেন অনেকটা আন্দাজে, ছিয়াশী বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু দেখলাম, দেখে মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম, বিপ্লব যুগের কথা বলতে গিয়ে আজও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ভাবাবেগে কণ্ঠ কাঁপতে থাকে, সাধু ভাষায় বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে অজানতেই পূর্ববঙ্গীয় কথা ও সুর এসে যায়, আমাকে কখনো 'তুমি', কখনো 'আপনি' বলছেন, যেন এত কথা এক মুখে বলতে পারছেন না, সহস্র মুখ থাকলে ভাল হত, কিংবা যদি আগেকার মতো সম্পাদকের কলম চালাবার চোখ থাকত। তাহলে আবার ওঁর মসী অসিরূপে ঝনৎকার তুলত।

কয়েক ঘণ্টা আমি যেন বাংলায় বিপ্লববাদের আদি কাণ্ডে ঘুরে এলাম।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির আদি যুগের বিপ্লবী নেতা নলিনীকিশোর গৃহের সান্নিধ্য অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

অবশ্য, আগেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে, আমি দেখা করতে যাচ্ছি।

তবু কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। হয়তো আমায় চিনতে পারবেন না, আমার কথা মনে পড়বে না। জিজ্ঞেস করবেন আর আমায় নতুন করে পরিচয় দিতে হবে যে, আমি বি. ভি-র কর্মী ছিলাম, হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য গুপ্ত—

আর আমিও, যদিও ওঁর চেহারা কিছু কিছু মনে করতে পারি, কিন্তু সে কবে দেখেছি ওঁকে? সেই উনিশ শো আঠাশ উনত্রিশ সালে। আর এটা উনিশ শো চুয়াত্তর। কত বৎসর হল? পুরো প'য়তাল্লিশটি বৎসর! প'য়তাল্লিশটি বৎসর আগে দেখা মানুষকে না চিনিয়ে দিলে পারব চিনতে?

সি'ড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছিলাম আর এই সংকোচ, এই প্রশ্ন মনের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছিল।

কিন্তু ভূপেনদার সামনে গিয়ে নাম বলতেই বলে উঠলেন, আসুন, আসুন। আপনার চিঠি পেয়েছি। বসুন, বসুন—

আসুন, বসুন নয় ভূপেনদা, তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললাম, এস, বস। আমার চুল পেকে গেছে, আমি বুড়ো হয়েছি তা যেমন সত্য, তেমনি আপনিও যে আমার চাইতে অনেক বড় সে কথা মিথ্যে নয়। বয়সের রেসে কোনদিনই আপনাকে ধরতে পারব না—

হেসে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, বস, বস।

টেবিলের কোণে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

চশমার মোটা কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকালেন। হেসে বললেন, তোমার চেহারা আমার মনে নেই বটে কিন্তু তোমার নাম আজও মনে আছে। তোমার চিঠি পেয়েই মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, তুমি আমাদের "স্বাধীনতা" পত্রিকায় গল্প লিখতে না? একটা গল্পের নাম ছিল, "রিভলভার", তাই না?

বললাম, ঠিকই ধরেছেন। রিভলভারের পর "ফাঁসীর আসামী", তারপর "ফেরারী"। তারপর একদিন স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে গেল। আর লেখা হল না। সেদিনের সেই আঠারো উনিশ বছরের কিশোর আজ ছেষট্টি বছরের বৃদ্ধ।

আর আমার চলেছে আশী। ভূপেনদা হাসলেন। চোখ খারাপ, কান খারাপ।

বলেই উঠে পড়লেন, দাঁড়াও, আগে এক কাপ চা—

বাধা দিলাম, না না, থাক না, চায়ের কি দরকার—

কিন্তু ততক্ষণে পেছনের কক্ষে উনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

ভাবছিলাম স্বাধীনতা পত্রিকার কথা। ১৯২৮ সালে আত্মপ্রকাশ। দুজন সম্পাদক, অরুণচন্দ্র গুহ এবং হরিকুমার চক্রবর্তী। ছাপানো হত শ্রীসরস্বতী প্রেসে। দু-এক মাস পর ওঁদের নাম তুলে দিয়ে অপরের নাম দেওয়া হল এবং সম্পাদনার ভার নিলেন এই ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।

সে-যুগে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি বাংলার বিপ্লবী মনের কথা অসমসাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করত, প্রচার করত। বর্বর ইংরেজ সরকারের নারকীয় স্বরূপ জনসমক্ষে উদ্ঘাটন করে দিয়ে যে সামান্য ক'খানা পত্রপত্রিকা বলিষ্ঠ প্রতিরোধের আহ্বান জানাত, স্বাধীনতা ছিল তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। আজও মনে পড়ে, প্রতি সপ্তাহে আমরা বিপ্লবী সহকর্মীদের সঙ্গে বসে স্বাধীনতার সম্পাদকীয় ও অন্যান্য রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতাম।

বাষট্টি দিন অনশনের পরদিন—১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে যতীন দাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গভর্ণমেণ্ট শহীদের মরদেহ ট্রেনযোগে কলকাতায় আনবার অনুমতি দিলেন।

শহীদের মরদেহ নিয়ে কলকাতার রাজপথে যে বিশাল শোকযাত্রা বেরিয়েছিল তা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট—যার নির্দেশে কথায় কথায় চলত রেগুলেশন স্টিক, বুট, ঘোড়সওয়ারের বেত, সার্জেণ্টের রিভলভার, সশস্ত্র পুলিশের রাইফেল। কিন্তু সেদিন সেই বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত জনসমুদ্র যে পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তুলে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল কেওড়াতলা শ্মশানতীর্থে, হতবুদ্ধি পুলিশবাহিনী সেই জনতরঙ্গের সম্মুখীন হবার দুঃসাহস দেখায় নি, নির্বাক বিস্ময়ে শুধু চিত্রার্পিতের মত পথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

সাপ্তাহিক স্বাধীনতার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই ঐতিহাসিক শোকযাত্রা নিয়ে যে অনলবর্ষী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তার ভাষা আজ আর হুবহু মনে করতে পারছি না বটে, কিন্তু ধরনটি ভুলিনি:

'দেখিলাম। দেখিলাম হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষামান অগণিত মানুষ। ভারতমাতার দামাল ছেলে যতীন দাস, ক্ষুদিরাম, কানাইলালের উত্তরসাধক যতীন দাস, অমৃতলোকের যাত্রী বাংলার দুলাল যতীন দাস, বাংলায় ফিরিয়া আসিতেছেন। দেখিলাম, অগণিত মানুষ প্রস্তরীভূত মূর্তির মত চাহিয়া রহিয়াছে আর দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে তপ্ত শোকাশ্রু।

দেখিলাম। দেখিলাম মদমত্ত ইংরেজের আত্মম্ভরী চ্যালেঞ্জ ধূলায় লুটাইয়া দিয়া যে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ বীরের বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন, দেখিলাম—লক্ষ মানুষ শোকাকুল হৃদয়ে অশ্রুপ্লাবিত নয়নে রাজপথ দিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

খুশী হইতাম, যদি দেখিতাম চৌরঙ্গী রোড দিয়া দক্ষিণে যাইবার সময় সেই

উদ্বেলিত জনসমুদ্র অকস্মাৎ হিংস্র অজগরের মত সহস্র কালফণা উদ্যত করিয়া ধাইয়া চলিল পশ্চিম দিকে, ময়দান প্লাবিত করিয়া দিয়া সেই পর্বতপ্রমাণ সমুদ্রতরঙ্গ অপ্রতিরোধ্য গতিতে যাইয়া আঘাত হানিল ইংরেজের বর্বর দম্ভের প্রতীক ঐ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গপ্রাকারে, সেখানকার বন্দুক, কামান, মেসিনগানের সর্বপ্রকার প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া উহার লৌহকপাটে বিজ্ঞাপন-ফলক লটকাইয়া দিল, 'টু লেট'—ভাড়া দেওয়া যাইবে!

এই স্বপ্ন যেদিন বাস্তবে রূপায়িত হইবে, সেদিন, শুধু—সেদিনই সার্থক হইবে মরণজয়ী শহীদ যতীন দাসের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও শোকাঞ্জলি নিবেদন!

খুব সম্ভবতঃ এই ভূপেন্দ্রকুমার দত্তই লিখেছিলেন সেদিনের সেই অবিস্মরণীয় সম্পাদকীয়।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীগণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ওখানকার শয়তান ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ যেভাবে টলটলায়মান করে তুলেছিলেন, সে সম্বন্ধে স্বাধীনতায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম ছিল, 'ধন্য চট্টগ্রাম।'

সেও হয়ত এই ভূপেনদারই লেখা।

ভূপেনদা ফিরে এলেন। এক হাতে চায়ের কাপ, অপর হাতের ডিসে সন্দেশ ও বিসকুট। বললেন, খাও।

তারপর বসলেন। বললেন, বল, এবার তোমার প্রশ্নগুলি বল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি যে পশ্চিমবঙ্গের, মানে এখনকার পশ্চিমবঙ্গের নন তা আমি জানি, কিন্তু আপনার দেশ কোথায় ছিল ভূপেনদা?

জেলা যশোহর, থানা মহম্মদপুর, গ্রাম ঠাকুরপুর, ভূপেনদা জবাব দিলেন। আর আমার জন্ম তারিখ যদি জিজ্ঞেস কর, তাও বলতে পারি—১৮৯৪ সালের ৯ অকটোবর।

যেসব পত্রপত্রিকা ও বই পড়ে আপনি বিপ্লবী দলে যোগদানের অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তার কয়েকখানার নাম বলুন।

সে যে অনেক এবং সবগুলোই মূল্যবান, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি?

তবুও যা বিশেষভাবে আপনাকে প্রভাবিত করেছিল।

বেশ। তাহলে শোন। উনি বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকদের বইগুলি এক সঙ্গে করে সে যুগে সুলভ সংস্করণ গ্রন্থাবলী বার করত বসুমতী সাহিত্য মন্দির। আমি তার মধ্যে থেকে পড়তাম বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, অনুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র, দেবী চৌধুরাণী। পড়তাম রমেশচন্দ্রের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা। আর পড়তাম

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী, হৃদয় উচ্ছ্বাস, চিন্তাতরঙ্গিনী। পত্রপত্রিকার মধ্যে উল্লেখ করতে পারি বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, নবশক্তি, যুগান্তর ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ভূপেনদা, আপনি কোন্ সালে কত বৎসর বয়সে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন? কে আপনাকে দলে নিয়ে আসেন? কার কাছে দীক্ষা নেন?

দীক্ষা আমি একজনের কাছে নিয়েছিলাম সত্য, ভূপেনদা বললেন। কিন্তু সাধারণতঃ যেভাবে একজনকে রিক্রুট করা হয় সেভাবে কেউ আমায় দলে টানেনি। ব্যাখ্যা করে বললেন, সেই যে একজনের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে তাকে ভাল ভাল বই পড়তে দেওয়া, দেশের পরাধীনতা ও ইংরেজের অত্যাচার সম্বন্ধে আলোচনা, অন্য দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস পর্যালোচনা, ক্রমে তাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানে উৎসাহিত করে দলনেতার কাছে নিয়ে যাওয়া—ঠিক এমনিভাবে কেউ আমায় বিপ্লবী দলে নিয়ে আসেনি।

একটু পর বললেন, আমাকে self-enthused বলতে পার। অর্থাৎ আমায় কেউ টেনে দলে নিয়ে যায়নি, আমি নিজেই দলকে খুঁজে বেড়িয়েছি।

ভূপেনদাকে বিশদভাবে বলতে অনুরোধ জানালাম।

উনি হেসে ফেললেন, সেসব কথা স্বপ্নের মত মনে পড়ে। যে বইগুলির কথা এইমাত্র বললাম, সেগুলো অধ্যয়ন করে, বিশেষ করে বিবেকানন্দের কর্মযোগ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পাঠ করে আমার মনে জাগে, আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ আমার মা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমার সেই মা পরের দাসী, তাঁর পায়ে দাসীত্বের শৃংখল। সেই শৃংখল ভেঙ্গে ফেলে তাঁর দাসীত্ব ঘোচাবার জন্য আমারও কিছু করা উচিত, আমিও কিছু করব। আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠা করে সন্তান সেনার মত আমিও গড়ে তুলব আত্মত্যাগী কর্মীদল।

সেটা ১৯০৭ সাল। ফরিদপুর শহরের জিলা স্কুলের ফোর্থ ক্লাস, মানে এখনকার ক্লাস সেভেন-এ পড়ি। থাকি এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে, তিনিই আমার স্থানীয় অভিভাবক। আমার বয়স তেরো বৎসর।

তেরো বৎসর বয়সী বালকের সংকল্প যতই আন্তরিক হোক, তা মনে মনে থাকে। বালকের সুযোগ কোথায়? কে সুযোগ করে দেবে? কে উপায় বলে দেবে? কে করবে সাহায্য ও সহযোগিতা?

মাঝে মাঝেই জঙ্গলে যেতাম, একা একা ঘুরে বেড়াতাম, আর ভাবতাম কি করে আমার সংকল্প সাধন করতে পারি।

এমনি করেই কেটে গেল দু বছর, ভূপেনদা বলতে লাগলেন, আমি সেকেন্ড ক্লাস, মানে ক্লাস নাইনএ উঠলাম। আমার বয়স পনোরো কি ষোল।

আমার স্থানীয় অভিভাবকের ছেলের নাম অমূল্যকৃষ্ণ দত্ত। আমার পছন্দ

হত না ওকে, কারণ আমার সমবয়সী হয়ে সে পান খেত, সিগারেট খেত আর সিদ্ধি খেয়ে নেশা করত। ওর সঙ্গ সর্বদাই এড়িয়ে চলতাম।

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম, অমূল্য যেন আর নেশাটেশা করছে না। না খায় পান সিগারেট, না খায় সিদ্ধি। ব্যাপার কি? ভাল করে নজর রাখতে লাগলাম। সত্যিই তো, ও নেশা ছেড়ে দিয়েছে! নেশাখোরের পক্ষে, কেউ কিছু না বলতেই অকস্মাৎ নিজে থেকেই একদিনে সব ছেড়ে দেওয়া তো সহজ কথা নয়!

আর, শুধু কি নেশা ছেড়ে দিয়েছে অমূল্য? দেখলাম, দেখে দারুণ আশ্চর্য হলাম যে অমূল্য এখন নিয়মিত ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে। শুধু ব্যায়ামই নয়, ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে সে এখন ভাল ভাল বই সংগ্রহ করে পড়ে, বেশ নিবিষ্ট মনে পড়ে। দেখলাম, কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর ভাব! হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে যায়, ঘুরে ফিরে আসে। সন্দেহ হল, কি একটা মতলবে আছে যেন।

অথচ কিছুই বলে না আমাকে।

তারপর বোধ হয় একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ভূপেনদা? আমি বললাম।

না, না, ওকে নয়, ভূপেনদা বললেন। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। অমূল্য শুধু আমার মনে দারুণ কৌতূহল ও বিস্ময় জাগিয়ে তুলল। জিজ্ঞেস করলাম, ওর বন্ধু পটলাকে। পটলার ভাল নাম সৌরেন ভাদুড়ী। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি রে পটলা? অমূল্য হঠাৎ নেশা টেশা ছেড়ে দিয়ে গুড বয় হয়ে গেল কেন রে? একসারসাইজ করে, কোথা থেকে ভাল ভাল বই এনে পড়ে—ব্যাপারটা কি বল না ভাই!

পটলা মুচকি হাসল, তারপর নীচু গলায় বলল, আমিও কদিন ধবে ভাবছি ব্যাপারটা তোকে বলব। শোন্, আমাদের একটা গুপ্ত সমিতি আছে, যে সমিতি দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে—

গুপ্ত সমিতি! দেশের স্বাধীনতা! মনটা হঠাৎ ছ্যাঁক করে উঠল। মনে পড়ে গেল দু বছর আগেকার সংকল্পের কথা। দেশমাতৃকার দাসীত্ব ঘোচাবার জন্য কিছু করব, সন্তান দল গড়ে তুলব! বললাম, পটলা, আমায় নিয়ে যাবি সেই সমিতিতে?

কি করবি গিয়ে?

বললাম, আমিও যোগ দেব তোদের গুপ্ত সমিতিতে, আমিও স্বাধীনতার জন্য কাজ করব! নিয়ে যাবি? বল না—

নিয়ে যাব, পটলা বলল, তোকে পরিচয় করিয়ে দেব একজনের সঙ্গে।

পটলা আমার আগ্রহ দেখে মোটেই দেরী করল না। পরদিনই নিয়ে গেল ওদের গুপ্ত সমিতির স্থানীয় নেতা সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের কাছে। সুরেশবাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হবে। পরে জেনেছিলাম, ওঁর

আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায়, চুরাইন গ্রামে। তোমাদের দেশও তো ছিল বিক্রমপুরে, আছে না চুরাইন গ্রাম ?

বললাম, আছে। চুরাইন গ্রাম আমাদের গ্রামের কাছে না হলেও প্রায় বছরই ফুটবল সিজন-এ আমি অন্য গ্রামের পক্ষে হায়ার্ড হয়ে চুরাইন সিলভার কাপ টুর্ণামেণ্টে ম্যাচ খেলতে যেতাম। বিক্রমপুরে ফুটবল ম্যাচ খেলার রেওয়াজটা খুব বেশী ছিল, ভুপেনদা। এই কলকাতার বড় বড় টিমের অনেক প্লেয়ারই ছিল ঢাকার, এখনও আছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাদের প্রায় সবাই প্রথম ফুটবল খেলা সুরু করেছিল বিক্রমপুরের গ্রামে।

ভুপেনদা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কলকাতায় খেল নি ?

বললাম, খেলেছি, সেই ১৯২৮ সালে। আই. এফ. এ-র শীল্ড আর লীগ বাদে ইলিয়ট শীল্ড থেকে সুরু করে প্রায় প্রতি টুর্ণামেণ্টেই খেলেছি আমাদের কলেজ টিমের হয়ে—

কোন কলেজে পড়তে ?

যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের তখন নাম ছিল বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তাম—

তুমি ইঞ্জিনিয়ার ?

না না, ভুপেনদা। হেসে বললাম, মাত্র দেড় বছর পড়তে পেরেছি। তারপর গ্রেপ্তার। আর জানেনই তো সে যুগে একবার 'স্বদেশী' করার অপরাধে গ্রেপ্তার হলেই বার বার গ্রেপ্তার হতে হত। দাগী আসামীর মত।

তারপরই বলে উঠলাম, যাক গে এসব। এসব তো আমার কথা। আমার কথা বলতে আসিনি, ভুপেনদা। না হয় আরেক দিন শুনবেন। আজ এসেছি শুধু আপনার কথা শুনতে।—বলুন, তারপর কি হল।

ভুপেনদা আবার শুরু করলেন, আমি সুরেশচন্দ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রথমটা কিছু না বলে তিনি শুধু আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ন সন্ধানী দৃষ্টিতে। যেন আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে চেষ্টা করলেন। তারপর সামান্য দুচারটে মামুলী প্রশ্ন করলেন। তারপর পটলাকে দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে কি বললেন জানি না। পটলা ফিরে এসে বলল, চল যাই।

পথে যেতে যেতে পটলা বলে উঠল, তোর কি ভাগ্য রে ভুপেন!

জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

পটলা বলল, দুচারটে কথা বলেই সুরেশদার তোকে এত ভাল লেগে গেছে যে, একবারেই তোকে আদ্য, মধ্য ও অন্ত তিনটে স্তরেই দীক্ষা দিতে বললেন। এটা খুব সহজ কথা নয় রে। সাধারণতঃ ছেলেদের প্রথম দীক্ষা দেওয়া হয় আদ্য স্তরে। তারপর তার চলাফেরা ও কাজের ওপর নজর রাখা হয়। যদি দেখা যায় কাজ সে ভালই করছে, তবেই তাকে দীক্ষা দেওয়া হয় মধ্য স্তরে।

আবার তার কাজকর্মের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়। এর পর দলনেতা যখন উপযুক্ত মনে করেন, শুধুমাত্র তখনই তাকে অন্ত স্তরে দীক্ষা দেওয়া হয়। শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবি ভূপেন যে, আমি নিজেই এখনও মধ্য থেকে অন্ত স্তরে পৌঁছতে পারিনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, স্তরগুলি একটুখানি ব্যাখ্যা করে বলুন না ভূপেনদা।

বলছি। ভূপেনদা বললেন, তিনটি স্তর মানে, হাতে লেখা তিন রকমের প্রতিজ্ঞা-পত্র। এক-একটি স্তরে দীক্ষা নেবার সময় এক-এক রকমের প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করতে হত। আদ্য স্তরের প্রতিজ্ঞা-পত্রে নির্দেশ ছিল ব্যায়ামচর্চা ও শরীর গঠন। লাঠি ও ছোরাচালনা শিক্ষা। দেশপ্রেমমূলক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা পাঠ। ধ্যান, প্রাণায়াম, কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন। সৎসঙ্গ, সদালাপ ও সদালোচনা।

মধ্য স্তরের প্রতিজ্ঞা-পত্রে নির্দেশ ছিল, গুপ্ত সমিতিতে সদস্যরূপে যোগদান। মন্ত্রগুপ্তি। স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে আত্মবলিদানের শপথ।

অন্ত স্তরের নির্দেশ ছিল, সংগঠন বিস্তারে আত্মনিয়োগ। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি ভাবে আপনাকে তিনটি স্তরে দীক্ষা দেওয়া হল ?

প্রশ্ন শুনেই যেন চুপ করে গেলেন। টেবিলের ওপাশে বইভর্তি আলমারী, সেদিকে চেয়ে রইলেন। মোটা কাঁচের আড়ালে দুই চক্ষু অপলক। মনে হল, দৃষ্টি এখানে নেই—মনও নেই। কালের উজান বেয়ে মন চলে গেছে পঁয়ষট্টি বৎসর পেছনে ১৯০৯ সালের ফরিদপুর শহরে। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এখন জিলা স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। পনেরো বছরের কিশোর। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর কিশোরের মনে দেশমাতৃকার দাসীত্ব ঘোচাবার স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সার্থক করে তোলার পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। আজ হবে তার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। ঐ অপলক চোখে বুঝি দেখতে পাচ্ছেন সেই দীক্ষা গ্রহণের দৃশ্য, বুঝি মনে পড়ছে প্রতিজ্ঞা-পত্রের সেই কঠিন নির্দেশগুলি।

কতকটা অভিভূতের মত বলতে লাগলেন, কত বছর—কত কাল আগের কথা, তবু আজও যেন চোখে ভাসছে। পটলা পরদিনই আমায় নিয়ে গেল আমাদের বাসার পেছন দিকে। পুকুরের পাড়ে আমবাগান। গাছের নীচে এখানে ওখানে ঝোপঝাপ। আমরা দুজনে একটা ঝোপের আড়ালে বসলাম। অপরাহ্ন তখন ম্লান হয়ে এসেছে। অন্ধকার হয়ে যেতে আর দেরী নেই। এমন সময় পটলা বার করল গীতা, একটি রিভলভার আর তিনখানি প্রতিজ্ঞা-পত্র। গীতা ধরে রাখল আমার মাথায়, ডান হাতে দিল রিভলভার, আর আমার বাঁ হাতে পর পর তুলে দিতে লাগল প্রতিজ্ঞাপত্র।

আমি শ্রদ্ধানত চিত্তে প্রতিজ্ঞা-পত্রগুলি পাঠ করলাম।

আমি বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত হলাম।

চাইলেন আমার দিকে। ভূপেনদার হাসি-হাসি মুখ। অনির্বাণ হাসি সারাক্ষণ মুখে লেগে আছে!

মনে পড়ল, বিপ্লবী হাসতে হাসতে যেমন করে প্রাণ নিতে পারে, তেমনি হাসতে হাসতেই এক মুঠো ধুলোর মত জীবন দিতে পারে। তাদের হাসি অবিনশ্বর!

এর পর কতকগুলি ছোট প্রশ্ন করলাম।

আপনার দলের পরিচয় কি ভূপেনদা?

১৯০৯ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত অনুশীলন সমিতি, তারপর যোগ দিই যুগান্তর দলে।

আপনার কর্মকেন্দ্র কোথায় ছিল?

প্রথম ছিল খুলনা জেলার দৌলতপুর, তারপর কলকাতা, চন্দননগর, তারপর চট্টগ্রাম। তারপর লাহোর, অমৃতসর। পরে বরিশাল ও ফরিদপুর। এছাড়াও বহু জায়গায় আমায় কাজের জন্য যেতে হয়েছিল।

আপনার দলের খ্যাতনামা বিপ্লবীদের কয়েকজনের নাম বলুন।

সে যে অনেক—

তবুও তাঁদের মধ্যে থেকেই কয়েকজনের নাম বলুন।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সূর্য সেন, সতীশ চক্রবর্তী, ভগৎ সিং প্রভৃতি।

তার পরের প্রশ্ন: বিচারাধীন আসামী, কারাদণ্ডিত কয়েদী এবং স্টেট প্রিজনার বা রাজবন্দীরূপে আপনি মোট কত বৎসর আটক ছিলেন?

ভূপেনদা জবাব দিলেন, মাস দেড়েক আণ্ডারট্রায়াল ছিলাম। আমায় যখন রাস্তায় গ্রেপ্তার করে, তখন আমার কাছে একটা রিভলভার ছিল। কিন্তু আমার নামে অস্ত্র আইনের মামলা করা হল না; আণ্ডারট্রায়াল থেকে Defence of India Act অনুযায়ী অর্ডার সার্ভ করল, দিন পঁচিশেক পর একেবারে State Prisoner করে দিল under Regulation III of 1818. তারপর থেকে যতবারই এ্যারেস্ট করেছে, প্রতিবারই এই রেগুলেশন থ্রি-তে।

মোট কত বৎসর আটক ছিলেন?

লেখ তাহলে, মুখে মুখে যোগ দেওয়া কঠিন। বলে একখানা রাইটিং প্যাড এগিয়ে দিলেন। উনি বলতে লাগলেন, আমি লিখতে লাগলাম—

১৯১৭ সালের মে থেকে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর=৩ বৎসর ৭ মাস।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৮ সালের জুলাই=৪ বৎসর ১০ মাস

১৯৩০ সালের জুন থেকে ১৯৩৮ সালের জুলাই=৮ বৎসর ১ মাস

১৯৪১ সালের মে থেকে ১৯৪৬ সালের মে=৫ বৎসর

বললাম, তাহলে মোট ২১ বৎসর ৬ মাস আপনি বন্দী ছিলেন।

ভূপেনদার মুখে সেই স্বাভাবিক অনির্বাণ হাসি, তা হবে।

পরের প্রশ্ন: আপনি স্বাধীনতা সংগ্রামীর কেন্দ্রীয় সরকারের পেনসন পেয়েছেন?

পেয়েছি।

তাম্রপত্র নিশ্চয়ই পেয়েছেন?

পেয়েছি।

হঠাৎ সচকিত হযে উঠলেন, কটা বেজেছে?

এত বেলা হয়ে গেছে? তুমি কি খেয়ে বেরিয়েছ?

না ভূপেনদা—

তাহলে তোমায় আর এক কাপ চা দিই?

এবার উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর হাত চেপে ধরলাম, না ভূপেনদা কিছুতেই না। আমি সকালে মাত্র এক কাপ খাই, আপনার এখানে এসে আরেক কাপ খেয়েছি। এখন এই দুপুরের রোদে কিছুতেই আর খাব না—

নিরস্ত হলেন, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হেসে বললেন, কিন্তু আমার যে কিছু খাবার সময় হয়েছে। তুমি বসো আমি আসছি। বলে আবার পিছনের কক্ষে চলে গেলেন।

এইবার আমিও পেছনে তাকালাম। প্রকাণ্ড দরজা। পুরোনো বাড়ী, তাই সে যুগের রেওয়াজমত জানালা দরজা সবই বিরাট আকারের। পেছনের ওটিকে মোটেই কক্ষ বলা যায় না, হল্ বলতে যা বোঝায় তার চাইতে একটু ছোট। দেখতে পেলাম সারি সারি সিঙ্গল চৌকি পাতা। মশারী টাঙ্গাবার ছত্রি। কয়েকটিতে বিছানা গোটানো, কোন কোনটা খালি খালি। অনেকটা মেস-কক্ষের চেহারা। বাড়িটি একটি বিখ্যাত প্রেসের। পুরো নীচের তলাটা অফিস, ওপরেও কয়েকখানা ঘরে টেবিল চেয়ার কাউণ্টার দেখেছি। বাদ শুধু পেছনের ঘরখানা আর যেটাতে বসেছি, সেটা। আরও বাদ আছে কিনা জানিনা। মনে হয়, কজন প্রধান বিপ্লবীকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। এ দুখানা ঘর তাঁদেরই জন্য নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত।

বিরাট টেবিলের সামনে বসে আছি। পুরোনা টেবিল। টেবিলভর্তি কাগজপত্র, খাতা, রাইটিং প্যাড, পত্রপত্রিকা। কিন্তু সবই গোছানো, পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা। ডান দিকের কোণে টেলিফোন। ভূপেনদা যে চেয়ারে বসে-ছিলেন, পুরোনো বটে, কিন্তু গদি আঁটা। টেবিলের মাঝখানে ফটো ষ্ট্যাণ্ডে এক-খানি ছবি, শ্রীঅরবিন্দের। বাংলায় বিপ্লবীবাদের ব্রহ্মা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বাংলায় বিপ্লবীবাদের আদিগুরু অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষের নয়, শ্রীঅরবিন্দের ছবি।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লাইন মনে পড়ল—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।

মনে পড়ল,

দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে ?

ভূপেনদা ফিরে এলেন, হাতে এক গ্লাস দুধ।

চেয়ারে বসে হাসি মুখে বললেন, বল তোমার পরের প্রশ্ন।

বললাম, আমি এবার দুটো প্রশ্ন এক সঙ্গে করব, কারণ দেখেছি, কারুর কারুর ক্ষেত্রে এদুটো প্রশ্নের জবাব এ্যালায়েড। আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি কি ফেরার হয়ে ছিলেন ? তার বিবরণ বলুন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি কবে প্রথম গ্রেপ্তার হন তার বিবরণ বলুন।

ঠিকই বলেছ, ভূপেনদা বলে উঠলেন, আমার ক্ষেত্রেও এই দুইটি প্রশ্নের জবাব এ্যালায়েড অর্থাৎ আমি ফেরার থাকাকালেই প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। শোন সে কাহিনী।—

১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলছি। তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অতুল ঘোষকে গ্রেপ্তার করবার জন্য মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পলাতক অবস্থায় তিনি আছেন চন্দননগরে। সতীশ চক্রবর্তী ঘোরাঘুরি করছেন বটে, তবু খুব সাবধানে।

আমি তখন পড়ি সংস্কৃত কলেজে, অনার্স ক্লাস করতে যাই প্রেসিডেন্সীতে।

সতীশদা মারফৎ অতুলদা বলে পাঠালেন, ওসব কলেজ-টলেজ বাদ দাও। পেলেই কিন্তু ধরবে তোমাকে। সরে পড়।

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের তালিকায় অবশ্য আমার নাম নেই। তাছাড়া পুলিশের 'হুলিয়া' যাকে বলে, কোন খবর পাইনি। তবু কেন সরে পড়তে বললেন অতুলদা ?

যাই হোক বলছেন যখন, কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে নিলাম।

সেই বছরই একটা মেস করেছিলাম। প্রায় আমাদের লোক দিয়েই ভরিয়ে ফেলেছিলাম। অন্যান্যের সঙ্গে আছেন শৈলেন ঘোষ, মেহেরপুরের রাজেন পাল, কুমিল্লার অশ্বিনী ভট্টাচার্য। মেস করেছি আমি, সুতরাং বোর্ডারদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায়, বাড়ীভাড়া মেটানো, ঠাকুর চাকরদের মাইনে-পত্র দেওয়া, এসবই ছিল আমার ঘাড়ে। শৈলেন ঘোষ আমেরিকা যাবার পাশপোর্ট

পেয়েছিলেন, গেল সেটা বাতিল হয়ে। শুধু তাই নয়, আই বি দারোগা নলিনী মজুমদার একদিন মেসে এসে হাজির। বোর্ডাররা জিজ্ঞেস করল, কি চান আপনি? মজুমদার বলে উঠল ভাল মানুষটির মত, না না, চাই না কিছুই। শৈলেন আমার আত্মীয় কিনা, তাই একটু এসেছি ওর কাছে।

হঠাৎ একদিন রাজেন পাল গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজেই।

দু একদিনের মধ্যেই আমার মেস থেকেই ধরে নিয়ে গেল অশ্বিনী ভট্টাচার্য‌কে।

ভাবলাম, খুব বেঁচে গেছি। অতুলদা ঠিক সময়মত খবরটি পাঠিয়েছিলেন। আগে তবু যেতাম টাকা পয়সা আদায় ইত্যাদি কাজে এরপর একেবারেই যাওয়া ছেড়ে দিলাম। মানে, পলাতক হলাম—তুমি যাকে বলছ ফেরারী।

বললাম, ফেরারী আর পলাতক একই কথা ভুপেনদা। তারপর কি হল?

ভুপেনদা আবার বলতে লাগলেন, পলাতক তখন আমরা কয়েকজনই—কুন্তল চক্রবর্তী, চারু ঘোষ, সুরেশ কুশারী, জীবনলাল চ্যাটার্জী, সুরেশ দাস ও আমি। আমাদের তখন প্রধান কাজ, যাঁদের মাথার ওপব ওয়ারেণ্টের খড়্গ ঝুলছে, তাঁদের মধ্যে প্রধানদের কয়েকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রাখা। এঁদের মধ্যে আছেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর, মন্মথ বিশ্বাস আর পাঁচুগোপাল ব্যানার্জী।

শহর কলকাতায় বার বার বাড়ী বদলেও নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না তাই আমরা ক'জন সরতে সরতে একেবারে গিয়ে জুটলাম তিলজলায় রেলওয়ে ক্যাবিনের দেবেন ঘোষের বাড়ীতে। আর ওঁদের সবাইকে বার বার বদলে রাখা হতে লাগল। কিন্তু মুশকিল হল অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীকে নিয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

আর বলো না, ভুপেনদা বললেন, অমরদার যা চেহারা—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা, টকটকে ফর্সা রং, তার মধ্যে এক মুখ লম্বা গোঁফদাড়ি। এই চেহারার মানুষকে রাস্তায় দেখলে কে না তাকিয়ে থাকতে পারে? তার মধ্যে তাঁকে লুকিয়ে রাখা যে কি কঠিন কাজ, তা সহজেই বুঝতে পারছ। এর মধ্যে আবার অতুলদা খবর পাঠালেন যে, অমরদা যেখানে আছেন, সেখানে আর একটি দিনও থাকা নিরাপদ নয়। সেদিনই ওঁকে না সরালে চলবে না।

সেই মুহূর্তে কোথায় পাই আশ্রয় যে সরাই?

শেষটায় যা থাকে বরাতে করে কুন্তল ওঁকে নিয়ে এসে হাজির করলেন একেবারে আমরা আছি যে আস্তানায়—সেইখানে, সেই দেবেন ঘোষের বাড়ীতে।

তারপরই কুন্তল আর আমি বেরিয়ে পড়লাম অমরদার জন্য সেল্টার খুঁজতে। শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, বারাকপুর এবং কলকাতাতেও অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, পাওয়া গেল না পছন্দমত।

অবশেষে স্থির করলাম, ওঁকে একেবারে বাইরেই পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

রামগোপাল দত্ত খিদিরপুর ডকে চাকরি করে। শৈলেন ঘোষের আত্মীয়। শৈলেনকে আমেরিকা পাঠাবার ব্যাপারে সে সাহায্য করেছিল। তাকে ধরলাম। রাজী হয়ে সে চেষ্টাও করল একটা জাহাজে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা হল না। বলল যে আবার চেষ্টা করবে সে। তবে অমরদাকে খিদিরপুর অঞ্চলে রাখতে পারলে ভাল হয়। তাহলে খবর পাঠিয়ে ওঁকে আনাবার হ্যাঙ্গাম করতে হয় না। জাহাজ ঠিক করবে আর টুক করে তুলে দেবে।

ভাল প্রস্তাব। অমরদা আর কুন্তলের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। স্থির হল, ঠিক আছে, অমরদা রামগোপালের ব্যবস্থা করা খিদিরপুরের কোন সেলটারেই থাকবেন, তারপর জাহাজে উঠে সাগর পাড়ি !—ব্যস।

ভূপেনদা হেসে উঠলেন।

তারপর বললেন, একটা কথা তোমায় আগেই বলে রাখি। পুলিশের নজর এড়িয়ে চলতাম বটে, হাফ-পলাতক বলতে পার, তবে আমার সংকল্প ছিল পুলিশ যদি দেখে ফেলে, ধরতে আসে, তাহলে গুড বয়ের মত কখখনো ধরা দেব না, ফাইট চালাবো। তাই সব সময় আমার কোমরে থাকত—একটু থেমে বললেন শান্ত কণ্ঠে একটি লোডেড রিভলভার আর পকেটে পটাসিয়াম সায়নাইডের প্যাকেট—

কেন ? ওটা আবার কেন ভূপেনদা ? আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

হেসেই জবাব দিলেন উনি, ওটা সংকট মোচনের ধন্বন্তরী দাওয়াই।

তাহলে বলুন, আমি বললাম, পুলিশের সঙ্গে শুধু ফাইট নয়, কোনক্রমেই যাতে জ্যান্ত ধরতে না পারে সে ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন ?

করেছিলাম, কিন্তু সে ব্যবস্থাও টিকল না।—বসো, আসছি।

খালি গ্লাসটা নিয়ে পেছনের ঘরে চলে গেলেন।

সেই পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার মজবুত স্বাস্থ্য নেই। আশী বছরে তা থাকতে পারে না, স্থূলতা এসে গেছে। চামড়াও কুঁচকে গেছে, কিন্তু দেখলাম, শরীরের সেই খাঁচাখানা অটল আছে, সেই মোটা হাড় দিয়ে তৈরি কাঠামোখানা। আর দেখে বিস্ময় বোধ করলাম, অটুট আছে সেই স্মার্টনেস !

ভূপেনদা ফিরে এলেন।

বললেন, হ্যাঁ, সেই চমৎকার ব্যবস্থাও কি করে অকেজো হয়ে গেল, তাই বলছি।

তারিখটা আজও মনে আছে, ১৯১৭ সালের ২৩ মে।

দুপুরের পর কুন্তলকে নিয়ে রামগোপালের ওখানে যাব অমরদাকে রাখার জন্য কোন বাসা পেয়েছে কিনা খোঁজ নিতে, দেখি কুন্তল অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওর টি, বি হয়েছিল, হাসপাতাল থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে। কাল সারাদিন বেশ খাটাখাটনি গেছে। বেচারা ঘুমুচ্ছে। ঘুমোক।

একাই বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে যথারীতি রিভলভার নিয়েছি, পটাসিয়াম সায়নাইড নিয়েছি আর বাঁ পকেটে রয়েছে বাটাভিয়া থেকে লেখা ডাচ কনসালের ছোট্ট একখানি দুলাইনের চিঠি, যার মর্ম এমনি ধরণের—To the Revolutionary Head quarters India—Whom you sent has been arrested. ছোট্ট হলেও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদবাহী চিঠি। ওখানা নিয়ে যেতে হবে যাদুদার কাছে। যাদুদা তখন ফেরারী হয়ে গৌহাটিতে লুকিয়ে আছেন। চিঠিটা সঙ্গেই থাকে। আর আমার ডান হাতে একটা জখম ছিল, ব্যান্ডেজ বাঁধা। তাই গলায় সিল্কের চাদর জড়িয়ে তার নীচে হাতখানা ঢাকা।

রামগোপালের ওখানে ঢুকতে যেতেই একটু থমকে গেলাম। তেতলার দরজায় যথারীতি দারোয়ান আছে বটে, কিন্তু ওর পাশে ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা কে? কেমন যেন ওর চাওনি! যেন কটমট করে তাকিয়ে দেখল আমায়। ঘরে ঢুকে দেখি, রামগোপালেরও কেমন শুকনো শুকনো চেহারা। মনে হল স্নান করেনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি, অসুখ-টসুখ করেছে নাকি?

বলল, না।

সেলটার-টেলটার পাওয়া গেছে?

না।

ভাল লাগল না ওর কথাবার্তা। আর ভাল লাগল না সেই দাড়িওয়ালা লোকটার চাওনি।

চলে এলাম। ট্রামের ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠলাম।

ওয়াটগঞ্জের মোড়ে চার পাঁচজন কনেষ্টবল সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল। ওরা তো সেকেণ্ড ক্লাসেই ওঠে। এতে আর ভাবার কি আছে?

এসপ্ল্যানেডে নামলাম।

চারু ঘোষ তখন হাসপাতালে। ওর টি. বি. হয়েছে সন্দেহ করা হচ্ছে। ওর জন্য কিছু ফল নিয়ে যাব ঠিক করে হগ মার্কেটের দিকে চলেছি হঠাৎ পেছনে অনেকগুলি বুটের আওয়াজ পেলাম। পেছন ফিরে তাকাতে না তাকাতেই পুলিশগুলো ছুটে এসে আমায় জাপটে ধরল।

প্রথমেই মনে পড়ল চিঠিটার কথা। বার করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারা গেল না। তখন ব্যাণ্ডেজ-করা ডান হাতখানাই ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যেই কোনরকমে চাদরের নীচে দিয়ে কোমরে ঢুকিয়ে দিলাম। ভাবলাম, কোনরকমে যদি রিভলভারটা থেকে একটা আওয়াজ করতে পারি, ব্যাটারা আঁৎকে উঠে ঢিলে দেবে আর সেই মুহূর্তেই আমি ওদের ঘুঁসি লাথি দিয়ে দোব লম্বা ছুট। হাত ঢুকিয়ে ধরলাম রিভলভারটা, সরিয়ে দিলাম সেফটি কাচে, টানলাম ট্রিগার, কিন্তু হায়, আওয়াজই হল না। মানে, বুলেট ছুটল না।

এসপ্ল্যানেডের মোড়। পুলিশ দেখে আরও পুলিশ ছুটে এল। এল দুটো সার্জেণ্ট। ঘিরে ধরল জনসাধারণ। ভিড় বাড়তে লাগল।

আমি কিন্তু তখনও সমানে ধ্বস্তাধ্বস্তি চালাচ্ছি। কিছুতেই ওরা বাগে আনতে পারছে না আমায়। আমায় মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা সার্জেণ্ট মাটিতে বসে পড়ল, তারপর পা দিয়ে গলাটা চেপে ধরে সেই সিল্কের চাদরটা ফাঁস দেবার মত করে ক্রমাগত পাকাতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর ?

বুঝতে পারলাম, অতগুলোর সঙ্গে পারব না, পালানো যাবে না। তাহলে আর জীবন্ত ধরা দিই কেন ? হাত বাড়ালাম, কোমর থেকে পটাসিয়াম সায়নাইডের প্যাকেটটা বার করব। কিন্তু পকেটটাই তখন ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কখন অজ্ঞান হয়ে গেছি। ব্যস, ওদের পক্ষে কাজ করা সহজ হয়ে গেল।

জ্ঞান হতে দেখি, আমার হাত পা বাঁধা, আমি ট্যাকসির সীটে পড়ে আছি। আমার ধুতি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। চাদরটারই এক অংশ কোমরে জড়ানো। সারা শরীরে অসম্ভব ব্যথা, অনেক জায়গা কেটে গেছে। রক্ত ঝরছে।

১৯১৭ সালে ২৩ অপরাহ্নে আমি এমনিভাবে প্রথম গ্রেপ্তার হলাম।

ভূপেনদা কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেন।

আমার প্রশ্ন ছিলঃ আপনি কি কোন রাজনৈতিক ডাকাতি বা হত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ?

হাসিমুখে বলে উঠলেন, ওরে বাবা! এ যে সাংঘাতিক প্রশ্ন। সে যুগে আই. বি. অফিসে নিয়ে গিয়ে খোসামোদ, তোষামোদ, ভীতিপ্রদর্শন, অবশেষে নানা ধরণের অকথ্য অত্যাচার করে পেটের কথা বার করবার চেষ্টা করলেও কখনও এমনি সরাসরি প্রশ্ন করতো না, নানা রকমের টুকরো টুকরো আলাপ-সালাপ করে আসল কথাটা জানতে চেষ্টা করত—ওদের নামই তো আই. বি. মানে, ইণ্টেলিজেণ্ট ব্র্যাঞ্চ—বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করত। না পারলে সুরু করত প্রহারেণ ধনঞ্জয়—

বাধা দিলাম, ভূপেনদা, এখন তো আর সে সব দিন নেই—

শোন, শোন, উনিও বাধা দিলেন।—আমি যদি বলি, হ্যাঁ, ডাকাতি করেছি, নিজের হাতে মার্ডার করেছি, তাহলেই তোমার প্রশ্নের খৈ ফুটতে থাকবে, কোন ডাকাতিটা ? পুরো বিবরণ দিন। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম বলুন, ঠিকানা বলুন। তারপর কাকে মার্ডার করেছিলেন ? কবে ? কোথায় ?

কিভাবে? সঙ্গে কেউ থাকলে তিনি এখনো বেঁচে আছেন কি? ইত্যাদি ইত্যাদি একপোটা জেরা করবে আর নোট করবে। আবার প্রশ্নের জবাবে যদি বলি, না না, আমি কোন ডাকাতিও করিনি, মার্ডারও করিনি, তাহলে তুমি গাল ফুলিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকবে, ভাববে, ভূপেনদা বোধ হয় সত্য কথাটা চেপে গেলেন, তাই না? সুতরাং, এইবার হেসে উঠলেন উনি, আমার পক্ষে তোমার এ প্রশ্নের কোন জবাব না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে নাকি।

আমিও আর জবাবের জন্য চেষ্টা করলাম না। বললাম, ওটা বাদ দিলাম।

বরং আমার পরের প্রশ্নটি রাখতে যত্নবান হলাম। বললাম, এইবার আমার শেষ প্রশ্ন ভূপেনদা এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বাংলাদেশের নাম যখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল, আপনি সেখানে এম. পি. হয়েছিলেন, এম. এল. এ. হয়েছিলেন, আমি খবর রাখি। সুতরাং প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েও মিষ্টি কথায় প্রশ্নকারীকে কিভাবে তুষ্ট করে দেওয়া যায়, এ বিদ্যা আপনার ভাল করেই আয়ত্ত আছে। কিন্তু আমার এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলে ছাড়ব না কিন্তু।

সেই অনির্বাণ হাসি, বল, কি তোমার সিরিয়াস প্রশ্ন।

আপনাদের বিপ্লবী দলের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় কাজ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?

হঠাৎ সেই অনির্বাণ হাসি নিভে গেল। মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। মোটা কাঁচের আড়ালে চোখদুটি অপলক হয়ে চেয়ে রইল সোজা দেয়ালের দিকে। আমি মনে করলাম, অশীতিপর বিপ্লবী সুদীর্ঘ কালের অগ্নি-স্মৃতির অতলস্পর্শতায় নেমে অনুসন্ধান করছেন বিপুল কর্মকাণ্ডের ঠিক কোন কাজটিকে বিশেষভাবে স্মরণীয় বলে চিহ্নিত করবেন।

কিন্তু সে অনুসন্ধান দশ সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হল না। বলে উঠলেন, To me, the most memorable deed of our party was the conversion of revolutionary movement into a mass organisation by joining Congress after we—my colleague kuntal Chakravorty and myself were satisfied at a detailed discussion we had with Gandhiji whom we met at the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920.

অনুরোধ জানালাম, একটুখানি ব্যাখ্যা করে বললে ভাল হয়, ভূপেনদা।

বলছি, ভূপেনদা সুরু করলেন, প্রথমবার জেলে যাই ১৯১৭ সালে। রিলিজ হই ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে রাজসাহী জেল থেকে। তার ক'দিন পরেই নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন। সেই অধিবেশনেই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে যুগান্তর দল কি

মনোভাব গ্রহণ করবে, সে সম্বন্ধে পাকা কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। হরিকুমার চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত এঁরা তিন জন আমার ওপর ভার দেন গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করে অসহযোগ আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা কতটা, তা বুঝে আসতে।

গিয়েছিলাম কুন্তলকে সঙ্গে করে।

আমি গান্ধীজীকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসি, আপনি বলেছেন এক বছরে স্বরাজ এনে দেবেন। তার অর্থ কি এই যে, দেশ আপনার কার্যধারা গ্রহণ করলে আপনি কংগ্রেসকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের পার্লামেণ্ট বলে ঘোষণা করবেন?

গান্ধীজী জবাব দিলেন, Yes, exactly that's my idea

আমরা মনে করি না, আমি বললাম, তাতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। তারপরও ইংরেজের সঙ্গে অস্ত্রের সংঘাত হবেই। তবে এই এক বৎসরের জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাদের নেতৃত্ব মেনে কংগ্রেসের কাজ করব। কিন্তু এই এক বৎসরে অস্ত্রের সংঘাত সৃষ্টির অবস্থা দেখা না দিলে আমরা কিন্তু আমাদের পুরোনো পন্থায় ফিরে যাব।

গান্ধীজী খুশী হলেন বটে, তবে বললেন, অহিংসাকে পলিসি হিসাবে না নিয়ে তোমরা যদি প্রিন্সিপল হিসাবে গ্রহণ করতে পারতে, তাহলে আরও খুশী হতাম।

সবিনয়ে জানালাম, তা আমরা পারি না।

কিছু বন্ধুরা সবটা শুনে বললেন, একবার শ্রীঅরবিন্দের মতামতটা জানলে ভাল হত।

গেলাম শ্রীঅরবিন্দের কাছে। ভূপেনদা বলতে লাগলেন, গান্ধীজীকে আমি যে কথা দিয়ে এসেছি, তা উনি সমর্থন করে আবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, গান্ধীজী একটা মস্ত শক্তি নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এই বন্যার জলে নিজেদের একেবারে ভাসিয়ে দিও না। জল সরে যাবার পর নানা স্থানে ছোট ছোট আশ্রমজাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মানুষ ধরে রাখতে চেষ্টা করো।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

ভূপেনদা বললেন, এরপর থেকে যুগান্তর দল বাংলার বহু স্থানে কংগ্রেসের ভেতর দিয়ে ও আশ্রম গড়ে বৈপ্লবিক সংস্থার পাকা বনিয়াদ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কংগ্রেসে যোগদান করে আমরা সারা প্রতিষ্ঠানটার মধ্য দিয়েই বৈপ্লবিক বিদ্যুৎ সঞ্চালনের চেষ্টা করেছিলাম এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছিল।

ভূপেনদা চুপ করে আমার দিকে চেয়ে নীরবে হাসলেন।

বেলা সাড়ে বারোটা পার হয়ে গেছে।

উঠলাম। বললাম, আমার প্রশ্নের তালিকা শেষ, কিন্তু যা বললেন আপনি

ভূপেনদা তা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে আমায় অনেক খাটতে হবে। এত তথ্য ও ঘটনাবহুল আপনার বিপ্লবীজীবন—আচ্ছা ভূপেনদা, এত লোকের নামধাম এবং এত ছোট ছোট ঘটনা আপনি কি জেলে বসে নোট করে রেখেছিলেন ?

হেসে উঠলেন, জেলে বসে লেখা কোন কিছু আই. বি. বাইরে আনতে দেয় কখনও ? তোমায় দিয়েছিল ?

না, আমায় দেয়নি। দেয়নি মানে, দেয়না জানতে পেরে আমি আর আনবার চেষ্টাই করিনি। জিজ্ঞেস করলাম, সব কথা ও সব সব নাম আপনার মনে ছিল ?

ভূপেনদার মুখে আবার সেই অনির্বাণ হাসি !

বললাম, আচ্ছা, চলি।

বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র সেন

১

ছিয়াশী বৎসর বয়স্কা আমার আত্মীয়া প্রফুল্লমুখী দেবীকে একবার চিঠি লিখেছিলাম অনুরোধ জানিয়ে যে, ক্ষুদিরামের গানটা যদি তাঁর মনে থাকে, তবে যেন লিখে পাঠিয়ে দেন। তাঁর লেখা সেই কাগজখানা এখনো আমার কাছে কাছে—

এবার বিদায় দে মা
ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসী,
দেখবে ভারতবাসী॥
কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়েছিলাম লাইনের ধারে (মাগো),
লাটসাহেবকে মারব বলে
মারলেম ভারতবাসী॥
শনিবার দিন দ্বিপ্রহরে
হাইকোর্টেতে লোক না ধরে (মাগো),
জজ ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করে
হুকুম হল ফাঁসী॥
আবার যদি আসি ঘুরে,
জন্ম নেব খুড়িমার ঘরে (মাগো),
তখন যদি চিনতে না পার,
দেখবে গলায় ফাঁসী॥
অভিরামের দ্বীপান্তর মা,
ক্ষুদিরামের ফাঁসী॥

আবার, একান্ন বৎসর পূর্বে এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ গভীর নিশীথে ঢাকা শহরের রমনা অঞ্চলে এক ভাঙ্গা মসজিদের ধ্বসে-পড়া দরদালানে বসে বি ভি নামীয় বিপ্লবী দলের নায়ক সত্যভূষণ গুপ্ত আমাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেবার সময় বলেছিলেন,······ক্ষুদিরাম, কানাইলাল নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে যে পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন, সেই রক্ত-রাঙ্গা পথেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা,: খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বে পরাধীনতার শৃঙ্খল······

আবার, পরবর্তীকালে আমরা যাদের বিপ্লবী দলে টেনে এনেছিলাম,

আমরাও তাদের বলেছিলাম,······আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ উপরোধের পথ আমাদের জন্য নয়। সর্ব অন্তর দিয়ে আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের স্বাধীনতা আসবে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, যে বিপ্লবের সূচনা করে গেছেন ক্ষুদিরাম···

বৃদ্ধা আত্মীয়ার প্রেরিত গানের সবটাই কিন্তু ভুল।

কলের বোমা তৈরী করেননি, ক্ষুদিরাম, রেল লাইনের ধারেও দাঁড়াননি বোমা নিয়ে, লাট সাহেবকে আক্রমণ করাও তার উদ্দেশ্য ছিল না।

অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে ফাঁসীর পর আবার ফিরে আসার আশা ব্যক্ত করতে গিয়ে নিজের মাকে ছেড়ে কেন তিনি খুড়ীমার ঘরে জন্ম নেবার কথা বলেছেন, গানে তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

এ জন্মে গলায় ফাঁসির দড়ির দাগ যদি পড়ে, পরজন্মেও সেই দাগ থাকে কি? বস্তুতঃ, কোনো গানই করেননি ক্ষুদিরাম।

দৃঢ় পদক্ষেপে উঠে গেছেন ফাঁসীর মঞ্চে।

তাহলে কে রচনা করেছে এই গান, কে এতে দিয়েছে সুর কি করে এই গান দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ জানে না।

এত ভুল কেন গানে, এত অসামঞ্জস্যতা, কেউ বলতে পারে না।

অথচ, আমার অতিবৃদ্ধা আত্মীয়াটি যেমন নির্দ্বিধায় যত্নের সঙ্গে ভুলে ভরা এই গানটি লিখে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আমার চার বছরের নাতি রাজা, বোধ হয় ওর মার মুখে ক্ষুদিরামের গল্প শুনে এসে, এই তো সেদিন আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে খুব ধরা গলায় জিজ্ঞেস করছিল, আচ্ছা দাদু, সাহেবরা ক্ষুদিরামকে কেন মারল? কি করেছিল ক্ষুদিরাম?

অর্থাৎ, ছিয়াশী বছরের বৃদ্ধা থেকে সুরু করে চার বছরের শিশুও শুনেছে একটি নাম—ক্ষুদিরাম। যতই ভুলে ভরা হোক না কেন, তবু এই গানটি শহরে, গঞ্জে, গ্রামে লোকের মুখে মুখে শোনা যেত, এখনও শোনা যায়, আগামী দিনেও শোনা যাবে শুধু একটি নামের জন্যে—ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম চির-ভাস্বর সূর্য, যার অস্ত নেই।

ক্ষুদিরাম অমর অক্ষয় শাশ্বত সত্য, যার মৃত্যু নেই।

এখন যদি প্রশ্ন করি, এই প্রাতঃস্মরণীয় শহীদকে বিপ্লবী দলে কে নিয়ে এসেছিল? রক্তরাঙ্গা পথে পদক্ষেপের অনুপ্রেরণা সর্বপ্রথম কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম?

এই প্রশ্নটাই করেছিলাম প্রবীণ বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র সেনকে।

পূর্ণবাবু হেসে বললেন, তুমি ভীষণ চালাক, মোক্ষম প্রশ্নটাই সবার আগে করে বসেছ। বেশ, তাহলে একটু আগে থেকে বলি।

১৯০২ সালে কলকাতা শহরে ব্যারিস্টার প্রথমনাথ মিত্রের নেতৃত্বে স্থাপিত হয়েছিল 'অনুশীলন সমিতি', ঠিক সংগঠনের সময় যার উদ্দেশ্য ছিল শরীরচর্চা,

লাঠি ও ছোরা চালনা শিক্ষা, ঠিক তেমনি মেদিনীপুর শহরে ঐ বছরেরই গোড়ার দিকে প্রথম বৈপ্লবিক কেন্দ্র সংগঠন করেন দুই ভাই। জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু। কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক আর সুরেন্দ্র ব্যানার্জী সম্পাদিত ইংরেজী 'বেঙ্গলী' দৈনিক পত্রিকার মেদিনীপুরের 'নিজস্ব সংবাদদাতা।' আর ছোট ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সরকারী চাকুরে। এ কোন্ সত্যেন জান? ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি কানাইলাল দত্তের সহযোগিতায় আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যে আলিপুর বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে খতম করে কানাইয়ের সঙ্গে ফাঁসীতে জীবন দিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট বঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর থেকেই সারা বাংলায় প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন সুরু হয়ে গিয়েছিল।

পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন, আমাদের আদি নিবাস মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে হলেও আমরা থাকতাম তমলুক শহরে। বাবা ছিলেন উকিল মেদিনীপুরে। তাই তমলুক ও মেদিনীপুর শহর, দু জায়গাতেই আমাদের বাসা ছিল। তমলুকে হ্যামিংটন স্কুলে পড়বার সময় আমার মেদিনীপুরে যাতায়াত ছিল। তখন পরিচয় হয় সত্যেনের সঙ্গে। ওদের বাড়ীতে যেতাম। ওরা ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো, অরবিন্দের বাবার মামাতো ভাই, অর্থাৎ সম্পর্কে ওরা অরবিন্দ-বারীনের কাকা।

জ্ঞানবাবুর মুখেই প্রথম শুনি বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে বিপ্লব বা সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার কথা।

১৯০৪ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করে আমি চলে এলাম মেদিনীপুর শহরে। বাবা চাইলেন, আমায় কোন টেকনিক্যাল লাইনে পড়াতে, এদিকে আমি জেনারেল লাইন ছাড়তে রাজী নই।

এই টানাপোড়েনে নষ্টই হয়ে গেল একটি বছর।

১৯০৫ সালে ভর্তি হলাম মেদিনীপুর কলেজের এফ. এ. ক্লাশে।

জ্ঞানবাবুদের বাড়ীতে যাতায়াত স্বভাবতঃই বেড়ে গেল, বেড়ে গেল বন্ধুর সংখ্যা। ইংরেজকে যে বোমা আর রিভলবার দিয়ে মেরে তাড়াতে হবে এবং সেই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা যে করতে হবে গোপনে, এ বিশ্বাস আমার তখন গড়ে উঠেছে। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ছিলেন বসু ভ্রাতাদের প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী কেন্দ্রের প্রথম ও প্রধান সভ্য। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল।

চারিদিকে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ চললেও আমরা বিশ্বাস করতাম যে, এতে কিছু হবে না, চাই হাতিয়ার। চাই হাতিহার চালাবার উপযুক্ত ছেলের দল।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? কি করে খুঁজে পেলেন ক্ষুদিরামকে?

পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন, ক্ষুদিরাম তখন আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তমলুকে হ্যামিলটন স্কুলে সেভেন্থ ক্লাশে পড়ে। যতদূর মনে পড়ে, ১৯০৫

সালে জুলাই কি আগষ্ট মাস হবে। বাড়ীতে গিয়েছি। ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে, তোদের খেলার মাঠ কোথায় ?

তৎক্ষণাৎ সে বলল, চল না, আমাদের হা-ডু-ডু খেলা দেখবে চল।

গেলাম কিছুক্ষণ পর। মাঠের ধারে দাঁড়ালাম। বারো থেকে পনেরো বছর বয়সের ছেলেরা খেলছে। আমি ওদের খেলা দেখছিলাম না, দেখছিলাম ছেলেগুলোকে।

হঠাৎ চোখে লাগল একটিকে। চেহারা রোগা পটকা হলে কি হয়, একে ধাক্কা মারছে, ওকে ল্যাং মারছে, লাফাচ্ছে, ঝাপাচ্ছে, একজনকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে অপরের গায়ে, আর কেউ ধরতে এলেই দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আবার তাড়া করলেই কাঠ বেড়ালীর মতো তর তর করে উঠে যাচ্ছে একটা গাছে, বন্ধুরা গাছে উঠতে চেষ্টা করলে হয়তো লাফিয়েই পড়ছে গাছ থেকে।

বেশ ডানপিটে আর চটপটে মনে হল ছেলেটিকে।

বেশ চালাক আর বেপরোয়া।

ওদের হা-ডু-ডু-র একজন ওস্তাদ খেলোয়াড় মনে হল।

দাঁড়িয়ে রইলাম খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

খেলার শেষে ডাকলাম আমার ছোট ভাইকে।

নাম কি রে ছেলেটার ?

ক্ষুদিরাম, ভাই বলল, ক্ষুদিরাম বসু। আরও জানতে পারলাম, আমাদের এক দূর আত্মীয় অমৃতলাল রায় ক্ষুদিরামের ভগ্নিপতি, অমৃতবাবু স্থানীয় সিভিল কোর্টের অস্থায়ী চাকুরে, ক্ষুদিরাম দিদির কাছে থেকে হ্যামিলটন স্কুলে পড়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, ক্ষুদিরামের তখন বয়স কত স্কুলে পূর্ণবাবু ?

আমার চাইতে বছর তিনেকের ছোট হবে। পূর্ণবাবু জবাব দিলেন, তা—পনেরোর বেশী হবে না।

বললাম, তারপর ক্ষুদিরামকে দলে টেনে নিলেন—

দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাধা দিয়ে বললেন, দল-টল কোথায় তখন ?

১৯০১ সালে অরবিন্দের বরোদা থেকে যতীন ব্যানার্জীকে পাঠিয়েছিলেন বাংলায় গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। পরের বছর পাঠালেন ছোট ভাই বারীন ঘোষকে। তখন কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে অনুশীলন সমিতি।

আমি বললাম, পরেরটুকু আমি বলি পূর্ণবাবু। বারীন ঘোষ প্রথমবার এসে বিশেষ কিছু করতে না পারায় ফিরে যান বরোদায়। দাদাকে বললেন, হল না, পারা গেল না দল গড়তে।

অরবিন্দ দমবার পাত্র নন। আবার পাঠালেন বারীনকে ১৯০৪ সালে। বলে দিলেন, তুমি যাও, সুরু কর, আমিও আসছি পরে।

এবার কলকাতা এসেই বারীন অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়ে গেলেন।

হয়েই সংগঠকদের কাছে প্রশ্ন তুললেন, কি হবে শুধু শরীর বানিয়ে? শুধু লাঠি আর ছোরা চালানো শিখে? লাঠি আর ছোরা দিয়ে ইংরেজ তাড়ানো যাবে কখনও? তারপর ফিস ফিস করে বললেন, ওদের তাড়াতে হলে চাই, বোমা, চাই রিভলবার, চাই গোপন সংগঠন, চাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্যে একটি পত্রিকা, সেই পত্রিকার নাম 'যুগান্তর' দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু রাজী হলেন না অনুশীলন সমিতির কর্তা ব্যক্তিরা। অতখানি ঝুঁকি তখনই নেওয়া ঠিক হবে না, তাঁরা বললেন।

তাই বারীন নিলেন অরবিন্দের পরামর্শ ও নির্দেশ, অনুশীলন সমিতির বাইরে গড়ে তুললেন একটি পৃথক বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি, সমিতির কেন্দ্র নির্বাচিত হল এই কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলের মুরারীপুকুর বাগান বাড়ী। তাই না পূর্ণবাবু?

পূর্ণবাবু হেসে উঠলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও একেবারে মরারীপুকুর পর্যন্ত চলে এস না, তার আগে আরও অনেক পথ বাকি আছে। শোন।

সেই যে ক্ষুদিরামকে দেখলাম, আগের প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলেন, ওকে ডেকে দু'চারটে কথা বললাম—ব্যস, সে সময় ঐ পর্যন্তই শেষ। বলতে পার প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়ল। আমি আবার মেদিনীপুর চলে এলাম।

তিন চার মাস পর অমৃতবাবু বদলি হয়ে এলেন মেদিনীপুর শহরে, সঙ্গে এল তার শ্যালক ক্ষুদিরাম। ভর্তি হল টাউন স্কুলে। আবার দেখা হতে লাগল। আমি তখন পুরোপুরি বোস ব্রাদার্সের দলে যোগদান করেছি। এই দলটাই পরে বারীনদার দলের সঙ্গে মিশে যায়।

ক্ষুদিরামকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যেতে লাগলাম জ্ঞানবাবুদের বাড়ীতে। সত্যেনের সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

দাঁড়াও। বলেই উঠে পড়লেন, চায়ের কথা বলে আসি। পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

কথা হচ্ছিল ওঁর ড্রয়িং রুমে বসে।

সাদামাটা ড্রয়িং রুম। পুরাকালের নক্সা কাটা সোফা সেট, দুটি সিঙ্গল, একটি ডবল কেন, ট্রিবল-এর চাইতেও বড় হবে, পাতলা গদিতে ঢাকা। একটি নীচু সেন্টার টেবিল। বন্ধ কাঁচের দেয়াল-আলমারীতে বই। কি বই, নাম দেখা যায় না, কাঁচে ধুলো জমেছে। তেমনি সোফার বার্নিসও অনেক দিনের।

পূর্ণচন্দ্র সেনের নাম শুনেছি, দেখেছিও কয়েকটি সভায়। কিন্তু পরিচয় হয়নি। পাতলা, লম্বা, টকটকে ফর্সা রং, ব্যাক ব্রাস-করা পাতলা চুল, পরনে খদ্দর। মনে হত ব্যক্তিত্বশালী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ভ্রূকুটির রেখা না দেখলেও মনে করেছিলাম, উনি সহজে হাসেন না।

আজ সাক্ষাৎকার করতে এসে আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। অনর্গল গল্প করছেন আপনজনের মতো, যখন-তখন হেসে উঠছেন।

সে কোন্ যুগের গল্প, কোন যুগের কাহিনী?

বলা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের!

বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের সেই প্যালিওলিথিক যুগে, বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে বিলেত থেকে বরোদায় এসেছিলেন যে ভাস্কর, প্রথমে দূত পাঠিয়ে তারপর নিজেই স্থায়ীভাবে বাংলায় এসে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঠুক ঠুক করে হাতুড়ি বাটালি চালিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের যে শক্তিময়ী প্রতিমা, তারপর নিওলিথিক যুগে যেসব সহযোগী ও অনুগামী বিপ্লবী মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার দুরূহ কার্যে সেই অবিস্মরণীয় ভাস্করকে করেছিলেন অকুণ্ঠ সাহায্য আমি সেই আদি পর্বের বিবরণ শুনছি!

ফিরে এলেন পূর্ণবাবু। দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে সহাস্যে ক্রশ করবার ভঙ্গীতে বুকের দুপাশে আঙ্গুল ছুঁয়ে বললেন, No breadth, but only length—

তৎক্ষণাৎ বললাম আমি, Yes, you are a straight line but it is always absolutely prependicular to the earth—

হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম, সত্যিই তাই, আপনি লাঠির মতোই সোজা খাড়া। এই বয়সেও —আচ্ছা, আপনার বয়স কত হল পূর্ণবাবু?

সোফায় বসতে বসতে হেসে জবাব দিলেন, বেশী নয়, ঊননব্বই চলছে—

ঊননব্বই! বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলাম।

বললেন, আমার জন্ম তারিখ ২৬ নভেম্বর, ১৮৮৬ সাল।

দেখে, কথা বলে কিন্তু তা মনে হয় না। পাতলা বটে, কিন্তু ঋজু শরীর। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার হাইট?

পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির চাইতে একটু বেশী।

তারপরই আবার সুরু করলেন তাঁর ক্ষুদিরামকে রিক্রুট করবার প্রসঙ্গ, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল তীব্র আন্দোলন। সুরু হল বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার এবং ক্রয়। আমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ফলে, মদমত্ত ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সমগ্র দেশের ওপর দিয়ে অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিল।

ঠিক সেই সময় মেদিনীপুর শহরে আমরা গুটিকয় কিশোর, বোস ব্রাদার্সের অনুপ্রেরণায় দেশের জন্য প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন দেবার সংকল্প গ্রহণ করি।

জিজ্ঞেস করলাম, সেই কিশোরদের নাম মনে আছে?

নিশ্চয়ই আছে, উনি বলে উঠলেন, তারা হচ্ছে বিজয়ানন্দ সেন, সুধীর সেন, প্রকাশ মাইতি, সুবোধ বসু, ধীরানন্দ সেন, জিতেন ব্যানার্জী, শচীন ঘোষ এবং অবশ্যই আমি পূর্ণচন্দ্র সেন আর—আর শ্রীক্ষুদিরাম বসু—

ক্ষুদিরাম !

হ্যাঁ, ক্ষুদিরাম। তারপর কতকটা অভিভূতের মতোই বলতে লাগলেন—যেন স্মৃতি-সমুদ্রের তলায় নেমে গেছেন ডুবুরির মতো, হাতড়ে হাতড়ে কুড়িয়ে পেয়েছেন অনেকগুলো মণিমুক্তো, সেগুলো আমার সামনে ঢেলে দিচ্ছেন—বলতে লাগলেন, সত্যেনদের বাড়ির কাছে খোলা হল কলকাতার ছাত্র ভাণ্ডারের শাখা। খোলা হল তাঁতশালা, ব্যায়ামাগার ও কুস্তির আখড়া স্থাপন করা হল, চলতে লাগল প্রকাশ্যভাবে কুস্তি, লাঠি ও ছোরাচালনা শিক্ষা। জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে মাঝে মাঝে মিলিত হতাম আমরা, চলত দেশ ও দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা। হেমদার বাড়ীতেও যেতাম। হেমদার মামা জমিদার। তাঁর ছিল বন্দুকের লাইসেন্স। সেই বন্দুকটা নিয়ে হেমদা আমাদের নিয়ে যেতেন তাঁর মামাবাড়ীর পেছনে গাছগাছালিভরা বিশাল বাগানে! বন্দুকের কলকব্জা চেনাতেন, বন্দুক ছোঁড়া শেখাতেন।

চুপ করলেন পূর্ণবাবু। চুপ করলেও বুঝলাম, তাঁর কথা শেষ হয়নি! আবেগের আতিশয্যে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে। জীবনের শেষ যামে এসে সেই সুদূর অতীতের প্রথম সূর্যোদয়ের কথা মনে পড়ছে!

একটু পর কতকটা আত্মসমাহিতের মতো বলতে লাগলেন, জ্ঞানবাবু ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, বিবেচক, চিন্তাশীল ও আবেগহীন। আমাদের অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন, অনেক প্রশ্ন করলেন, তারপর সম্মতি দিলেন। আমরা একদিন তাঁরই সম্মুখে হাত চিরে রক্ত দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে তিলক পরিয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে, অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেউ বিবাহ করব না, লোক-লজ্জা, নিন্দা, ভয় বা প্রশংসা ভ্রূক্ষেপ করব না, মন্ত্রগুপ্তি মেনে চলব, দেশের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করব এবং প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ হব না—

ঠোঁট কেঁপে উঠল পূর্ণবাবুর, কেঁপে উঠল কথা, ফর্সা রং আরক্ত হয়ে উঠল, দুই চোখ হয়ে এল নিমীলিত।

যেন সত্তর বছর অতীতে ফিরে গেছেন।

ফিরে গেছেন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে!

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সামনে বসে আবার রক্ততিলক পরে ও পরিয়ে শপথ গ্রহণ করছেন যেন!

একটু পর জিজ্ঞেস করলাম, আমরা, মানে কে কে পূর্ণবাবু?

সেই ন'জনের, যাদের নাম একটু আগে বলেছি।

মানে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আপনি আর ক্ষুদিরাম—

হ্যাঁ, শ্রীক্ষুদিরাম বসু, পূর্ণবাবু বলে উঠলেন, ক্ষুদিরামও হাত চিরে সবার কপালে রক্ততিলক পরিয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা পূর্ণবাবু, সবাই সবাইকে রক্ততিলক পরিয়ে দেবার সময়, আগে অথবা পরে, কোন লিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করেছিলেন?

হাসলেন উনি, বললেন বুঝেছি, তুমি অনুশীলনের দীক্ষা দেবার পদ্ধতির কথা ভাবছ। সেই আদ্য, মধ্য ও অন্ত স্তরের তিন রকমের তিনখানা প্রতিজ্ঞা-পত্র—গীতা মাথায় রেখে এবং হাতে রিভলবার নিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করা—তুমি ভাবছ আমরা বুঝি তাই করলাম।

—না, না, সে রকম অনুষ্ঠান কিছু নয়।

বললাম, বেশ, তারপর কি হল বলুন।

বলতে লাগলেন, ১৯০৬ সালে সরস্বতী পুজোর সময়ের কথা। গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে সে সময় মেদিনীপুর শহরে একটা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হচ্ছিল। সারাদিন এবং সন্ধ্যের পরেও বহু লোকের ভিড়। প্রথমতঃ, সরকারী উদ্যোগ, তারপর এত জনসমাগম, পাছে জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত হয়, তাই পুলিশও ঘোরাঘুরি করছে। সত্যেন সরকারী চাকরি করে, কিন্তু বাঘের ঘরে যে ঘোগ ঢুকে বসে আছে, গভর্ণমেণ্ট তার আঁচ পাবে কি করে? সত্যেন বলল, "সোনার বাংলা" নামে রাজবিদ্রোহমূলক এক তাড়া লিফলেট এসেছে কলকাতা থেকে, সেগুলো প্রদর্শনী-দর্শকদের মধ্যে এমনভাবে বিলি করতে হবে, যাতে পুলিশ না টের পায়।—ব্যস, তৎক্ষণাৎ আমরা কাজে নেমে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে বলা বাহুল্য ক্ষুদিরামও।

প্রথম দিন নিরাপদেই বিলি হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিন এক হেড কনেষ্টবল হাতে-নাতে ধরে ফেলল ক্ষুদিরামকে।

ওটা তো জাত সাপ। অমনি ঘুষি মেরে বসল কনেষ্টবলের নাকে।

তারপর ধস্তাধস্তি, হুটোপুটি, ঘুষোঘুষি।

অকস্মাৎ ঘটনাস্থলে সত্যেনের আবির্ভাব! চীৎকার করে উঠল, আরে, আরে, কেয়া করতা হ্যায়? এ তো ডিপুটি সাহেবকো লেড়কা হ্যায়। ছোড় দেও, ছোড় দেও।

সরকারী চাকুরে সত্যেনকে চেনে পুলিশ। তাই ছেড়ে দিল ক্ষুদিরামকে।

আর ছাড়া পেয়েই ক্ষুদিরাম ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন ক্ষুদিরামের বয়স?

ষোল সতেরোর বেশী নয়। পূর্ণবাবু জবাব দিলেন।

মজা হচ্ছে, পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন, পুলিশ বিভাগ বোধহয় অনেক সলাপরামর্শের পর প্রায় মাসখানেক যেতে-না-যেতেই গ্রেপ্তার করে চালান দিল ক্ষুদিরামকে। অপরাধ? রাজদ্রোহ।

সুরু হল রাজদ্রোহের মামলা।

আমাদের দিকে অর্থাৎ ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়ালেন কলকাতার ব্যারিস্টার কে. বি. দত্ত।

বহুারম্ভে লঘুক্রিয়া হল। প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সাক্ষীর অভাবে ক্ষুদিরাম ছাড়া পেয়ে গেল।

ব্যস, আর আমাদের পায় কে! হেরে গেছে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট।

ব্যারিস্টার দত্ত সাহেবের বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ীর ঘোড়া খুলে ফেললাম এবং মামলায় বিজয়ী ক্ষুদিরামকে ফুলের মালা পরিয়ে ল্যাণ্ডো গাড়ীতে বসিয়ে আমি এবং আমার বন্ধুরা গাড়ী টেনে সারা শহর প্রদক্ষিণ করলাম।

ক্ষুদিরাম became a hero! পূর্ণবাবু জোর গলায় বলে উঠলেন।

ওঁর সঙ্গে আলাপ সুরু করেছি বিকেল চারটেয়।

এখন সাড়ে ছ'টা পার হয়ে গেছে।

আড়াই ঘণ্টা একটানা আলোচনা করেছি।

আমার বয়স সাতষট্টি হলেও ওঁর উননব্বই-এর কাছে কিছুই নয়।

প্রাগৈতিহাসিক বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণে বৃদ্ধের উৎসাহ যতই অফুরন্ত হোক না কেন, এতে চাপ পড়ছে ওঁর স্নায়ুর ওপর। সে চাপ যাতে অসহনীয় না হয়ে পড়ে, সেদিকে আমার সজাগ থাকা কর্তব্য।

তাই স্থির করলাম, প্রথম দিন শুধু ক্ষুদিরামের কাহিনীই শোনা যাক।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা পূর্ণবাবু, ক্ষুদিরামকে সত্যেন বোসের সঙ্গে আপনি কবে, কোথায় ও কিভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন?

পূর্ণবাবু হেসে উঠলেন, শোন, তোমাদের সময়ে যে পদ্ধতিতে ছেলেদের বিপ্লবী দলে রিক্রুট করা হত, একজন তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করবে, তাকে চিনবে, জানবে, ভাল করে তাকে বাজিয়ে নেবে, তারপর তাকে নানা রকম বই পড়িয়ে ও নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে, তারপর সময়মত তাকে এক অন্ধকার রাত্রে কোন দিগন্ত ছোঁয়া মাঠে অথবা কোন ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষমান দাদার সঙ্গে অন্ধকারে এমনিভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে, যাতে দাদার চেহারা না দেখা যায়— না, না, আমাদের সময়ে এমনি পদ্ধতি তখনো আসেনি। একেবারে প্রাথমিক যুগের কথা তো।

বলে উঠলাম, প্রাগৈতিহাসিক!

পূর্ণবাবু হাসলেন, যা বলেছ। একটু পর বললেন, ক্ষুদিরাম আমার বন্ধু হয়ে গেল, তাই আমার সঙ্গে সত্যেনদের ওখানে যেত এবং স্বভাবতঃই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। আগে থেকে খবর পাঠিয়ে আমি ক্ষুদিরামকে সত্যেনের কাছে নিয়ে যাইনি।

কিন্তু বারীন ঘোষের সঙ্গে কে পরিচয় করিয়ে দিল ?

সেটাও আপনা থেকেই হয়ে গেছে কিংবা হয়তো সত্যেন করিয়ে দিয়েছিল ঠিক বলতে পারব না। উনি বললেন, তবে হ্যাঁ, অরবিন্দের সামনে ক্ষুদিরামকে আমিই প্রথম নিয়ে আসি।

তৎক্ষণাৎ চেপে ধরলাম, বিস্তারিতভাবে বলুন।

পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন, মেদিনীপুরের বোস ব্রাদার্সের সঙ্গে কলকাতার ঘোষ ব্রাদার্সের যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, সে তো আগেই বলেছি তোমায়। সুতরাং বারীনদা যখন বিপ্লবী দল গড়ে তুললেন, তখন মাঝে মাঝে গোপনে কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে আসতেন জ্ঞানবাবুদের বাড়ীতে। জ্ঞানবাবুরা অরবিন্দের বাবা কে. ডি. ঘোষের মামাতো ভাই। অর্থাৎ বোসরা ঘোষদের কাকা। তাই বারীনদার কাকাদের বাড়িতে আসা খুবই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক হলেও তখন ছেলেদের মধ্যে কতকটা জানাজানি হয়ে গেছে যে, বারীনদা বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলেছেন। তাই মেদিনীপুরে আসতেন তিনি গোপনে। আমি তাঁকে ১৯০৫-০৬ সালে মধ্যে মধ্যে সত্যেনদের বাড়িতে আসতে দেখেছি।

তখনো পরিচয় হয়নি তাঁর সঙ্গে।

১৯০৬ সালে বরোদার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অরবিন্দ স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এলেন।

৩ মার্চ থেকে আত্মপ্রকাশ করল সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'যুগান্তর।' সে সময় পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু রাজদ্রোহের মামলা হলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আদালতে বললেন, আমিই এর সম্পাদক। যে প্রবন্ধটি আপত্তিকর বলা হয়েছে, তা প্রকাশের দায়িত্ব একক আমার।

যুগান্তরের পর ঐ বছরই প্রকাশিত হতে লাগল, ইংরেজী 'বন্দেমাতরম্'।

প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, তারপর অরবিন্দ ঘোষ।

পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন, মনে আছে, ১৯০৭ সালের শেষ দিকে অরবিন্দ এলেন মেদিনীপুরে। না, কাকাদের বাড়িতে উঠলেন না, উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী মোক্তারের বাড়িতে। দারুণ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, আলাপ-সালাপও অত্যন্ত তাপ উত্তাপহীন। কেউ তাঁর কাছে এ প্রশ্ন তুলতেই পারল না যে, তাঁর ভাই যখন আত্মীয় জ্ঞানবাবুদের বাড়িতে ওঠেন, তখন তিনি সেখানে উঠলেন না কেন ?

যাই হোক তিনি যে স্রেফ বেড়াতে আসেন নি, মতলব কিছু একটা আছে তা বুঝতে পারলাম তখন, যখন দেখলাম সত্যেন, মানে সত্যেন বোসের সঙ্গে তাঁর নিভৃত আলাপ চলছে মাঝে মাঝেই।

আপনি দেখা করেন নি ? আমি প্রশ্ন করলাম।

না। দেখেছি, কিন্তু দেখা করিনি। পূর্ণবাবু বললেন, সত্যেন পরিচয় করিয়ে না দিলে আমি তাঁর কাছে যেতে পারি না, এই ডিসিপ্লিন সে যুগেও আমরা মেনে চলতাম।

সত্যেন আপনার সমবয়সী ছিলেন ?

না, আমার চাইতে সাত বছরের বড়, আর জ্ঞানবাবু দশ বছরের।

উনি বলতে লাগলেন, সত্যেন আমায় বলল, ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে ওঁর আগ্রহ দেখছি বেশ। ওর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতে বললাম সব—ওর এ্যারেষ্ট, ওর মামলা, মামলা থেকে খালাস হয়ে যাওয়া, তারপর কে. বি. দত্তের ল্যাণ্ডো গাড়ীতে বসিয়ে গাড়ী টেনে সারা শহর ঘোরা—সব বলেছি। শুনে উনি ক্ষুদিরামকে দেখতে চাইছেন। পূর্ণ, তুমি ওকে নিয়ে এস। মনে রেখো, আনবে গভীর রাত্রে, যাতে পুলিশ বা অন্য কারুর নজরে না পড়ে যাও।

গেলাম ক্ষুদিরামের বাড়িতে।

দেখি, ওর জ্বর। শয্যাশায়ী।

তবু বললাম সব।

অরবিন্দের নাম শুনেই উৎসাহিত হল, যাব, যাব ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

গভীর রাত্রে অসুস্থ ক্ষুদিরামকে নিয়ে এলাম সত্যেন মুখার্জীর বাড়িতে অরবিন্দের কাছে। সত্যেন বোসের হাওলা করে দিলাম।

কি কথা হল ওর অরবিন্দের সঙ্গে ? আমি প্রশ্ন করলাম।

তা আমি শুনিনি, উনি বললেন, তবে সত্যেনের কাছে শুনেছি, সাধারণ কথা। পরেই কিন্তু মজঃফরপুরে সেই বোমা বিস্ফোরণ, ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকি কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ভুল করে মেরে বসল মিসেস ও মিস কেনেডিকে। আমি যদি পূর্ণবাবু, এই দুটি ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র টানি, যদি বলি অরবিন্দই ক্ষুদিরামকে মনোনয়ন বা অনুমোদন করেছিলেন বলেই বারীন প্রফুল্লের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন ক্ষুদিরামকে, তাহলে কি ভুল হবে ?

তা জানি না ভাই, পূর্ণবাবু বলে উঠলেন, শুধু এইটুকু তোমায় বলতে পারি যে, ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুরে পাঠানোর ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। ১৯০৮ এর ৩০ এপ্রিল মজঃফরপুরে ঘটনা ঘটল আর আমরা মোট চোদ্দজন যুবক ২ মে মানে তার দুদিন পরেই মুরারীপুকুর বাগান থেকে গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। প্রবেশ করলাম আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেলে।

বলেই হেসে উঠলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা পূর্ণবাবু, আপনি বিচারাধীন আসামী, কারাদণ্ডিত কয়েদি এবং রাজবন্দীরূপে মোট কত বৎসর আটক ছিলেন ?

এবার হেসে উঠলেন হো হো করে, তর্জনী তুলে বললেন; মাত্র একটি বৎসর, তাও আণ্ডারট্রায়েল প্রিজনাররূপে। জেলও হয়নি কোনো কেসে, রাজবন্দীও থাকিনি কখনও। ঐ একবারই মাত্র গ্রেপ্তার, আলীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী, তারপর বেকসুর খালাস, অরবিন্দসহ মোট সতেরো জন।—ব্যস।

একটু পর বললেন, আমার এই জবাবে বোধহয় খুশী হতে পারলে না, তাই না?

কেন?

ক্ষুদিরামকে যে স্কুলে নিয়ে এসেছিল, হাসিমুখে বলতে লাগলেন, সেই ক্ষুদিরামের হয়ে গেল ফাঁসী আর যে এনেছিল, তার হল মোটে এক বছর জেল হাজতে বাস! একদম বে-মানান, বে-মিল। কি বল?

আমিও হাসিমুখে বলে উঠলাম, কে বলল, বে-মিল? ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা টেকেনি, আপনার বিরুদ্ধেও টেকেনি ষড়যন্ত্রের মামলা। তারপরই গম্ভীর হয়ে বললাম, একটা অমিল আছে বটে। বেকসুর খালাস ক্ষুদিরামকে আপনারা মালা পরিয়ে সারা শহর ঘুরিয়েছিলেন, কিন্তু তার গুরু পূর্ণচন্দ্র সেনকে আমরা কজন চিনি?

আচ্ছা। আজ উঠি। আবার আসব। নমস্কার জানালাম।

বাইরে বেরিয়ে এলাম।

হেসে বললেন, ফোন করে এসো ভায়া। শরীরের কথা বলা যায় না।

আচ্ছা, ফোন করব। বললাম, আজ শুনলাম ক্ষুদিরাম, সেদিন শুনব আপনার কথা।

এগিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ল, পূর্ণচন্দ্র সেনের বয়স ঊননব্বই বৎসর!

(২)

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মৃত্যুরূপা তারই কাছে আসে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদায় ক্ষণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মন্ত্রশিষ্য বীরেশ্বর বিবেকানন্দের মুখনিসৃত অগ্নিবাণী।

তিনিই প্রথম মহামানব, যিনি সমগ্র বাংলায়, তথা ভারতবর্ষে এমন একদল স্বাস্থ্যবান ও চরিত্রবান যুবককে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, যারা স্বেচ্ছায়

আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে নির্যাতিত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট বরণে পরাঙ্মুখ হবে না, উন্নততরো সভ্যতার পথে যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তাই আহ্বান জানালেন কর্মবীর, সর্বাগ্রে তোমরা সবল হও। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে তোমরা ভগবানের বেশী নিকটে যেতে পারবে। গীতা বীরের ধর্মগ্রন্থ, স্বার্থপর কাপুরুষের গীতা স্পর্শেরও অধিকার নেই।

কম্বুকণ্ঠে বললেন, হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ভুলিও না তোমার উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর ; ভুলিও না তোমার ধন, তোমার জীবন ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয় ; ভুলিও না জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।

ঘুমিয়ে-পড়া জাতির কানে দিলেন জাগরণের অনুপ্রেরণা, হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। তুমি সদর্পে বল, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ !

স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে অচিরেই নানা স্থানে স্থাপিত হয়েছিল শরীরচর্চার কেন্দ্র, কুস্তির আখড়া—যেখানে তরবারি, ছোরা ও লাঠি-চালনাও শেখানো হত, সঙ্গে সঙ্গে চলত নানাবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কাজ।

১৯০২ সালে এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়েই কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল অনুশীলন সমিতি।

তারপর আত্মোন্নতি সমিতি। সংগঠক ও পরিচালক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।

ঠিক সেই সময় অরবিন্দের নির্দেশে ও বারীন্দ্র ঘোষের পরিচালনায় কলকাতার মুরারীপুকুর বাগানে গড়ে উঠেছিল বোমা রিভলভারে বিশ্বাসী যে বিপ্লবী সংগঠনটি, তাকে বলা যেতে পারে, বারীন ঘোষের দল।

এরপর স্থাপিত হয় ঢাকা অনুশীলন সমিতি। সর্বাধিনায়ক পুলিনবিহারী দাস। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই সমিতির অসংখ্য শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয়েছিল।

গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠলেও তখনই তা আগ্রাসী কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি, শুধু সদস্য বৃদ্ধি, প্রচার ও শাখা-প্রশাখা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু ১৯০৫ সালে ভারত গভর্ণমেন্টের বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা জাগ্রত জনগণের ধূমায়িত রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল।

৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হল-এ অবিস্মরণীয় সেই জনসভা।

উদ্যোক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশনায়কগণ।

সক্রিয় অংশ যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আনন্দচন্দ্র রায়, যাত্রামোহন সেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী।

আরও নাম, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ এবং মতিলাল ঘোষ।

সেই অবিস্মরণীয় সভায় বঙ্গবিভাগ প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ করা হল।

সেদিন থেকে বাঙ্গালীর মন্ত্র হল, "বন্দে মাতরম্।"

তারপর ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসে বরিশালের সেই স্মরণীয় কনফারেন্স। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার দত্ত। সম্পাদক রজনীকান্ত দাস। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র। সভাপতি আবদুল রসুল।

যোগদান করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং আরও অনেক দেশনায়ক।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করে হুকুম জারী করল।

জনগণ ও নেতৃবর্গ মানলেন না সে হুকুম।

ফলে, চলল লাঠি ও চাবুক।

দেশপ্রেমিকের রক্তে বরিশালের মাটি লাল হয়ে গেল।

আজও পূর্ণবাবুর ড্রয়িংরুমে বসেই সেই সব কথা হচ্ছিল। ঊননব্বুই বৎসরের বৃদ্ধ দীর্ঘ জীবনের পথে অনেক পেছনে ফেলে-আসা ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছিলেন। আমি শুনছিলাম।

আর লক্ষ্য করছিলাম, ফর্সা মুখখানা উত্তেজনায় ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে উঠছে। মোটা কাঁচের চশমার ভিতর থেকে বলিরেখা-বেষ্টিত দুই চোখে উদ্বেলিত আবেগ বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠছে।

বিপ্লবের পথে ভারত স্বাধীন করবার সর্বাত্মক সংগ্রামের সূচনাপর্বের ইতিহাস শুনছি এমন এক বিপ্লবীর মুখে, যিনি সেই পর্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন, যিনি তখনকার অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

১৯০২ সালে ওঁর বয়স ছিল ষোল বৎসর। সুতরাং যা দেখেছেন, তা বুঝেছেন এবং যা করেছেন, পরিণাম বুঝেই করেছেন।

বুঝলে, পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, স্বামী

বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান আমার কিশোর মন ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তাছাড়া আরও অনেক গ্রন্থ ও দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা থেকে বিপ্লবী দলে যোগদানের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলাম।

কয়েকখানার নাম বলুন না।—আমি অনুরোধ জানালাম।

প্রথমেই নাম করব, উনি বললেন,—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, তারপর রমেশ দত্তের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, বঙ্গবিজেতা এবং রাজপুত জীবনসন্ধ্যা। টড সাহেবের এ্যানালস অব রাজস্থান। হেমচন্দ্রের সেই কবিতা,—বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে, ভারত আবার স্বাধীন হবে।··· তারপর দল বেঁধে সুর করে পড়তাম নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ। সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করতাম রঙ্গলালের সেই আগুন-ঝরানো কবিতা,—স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ? দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় রে, কে পরিবে পায় ?—সেসব দিনের কথা মনে করলে এখনও শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটে ওঠে !

উনি আবেগের আতিশয্যে আর কিছু বলতে পারলেন না। আমিও চুপ করে রইলাম।

একটুক্ষণ পর বললাম, আচ্ছা পূর্ণবাবু, সেদিন আপনার কাছে শুনেছিলাম যে, ১৯০২ সালে আপনি প্রথম মেদিনীপুর শহরে বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতিতে যাতায়াত সুরু করেন, যে সমিতির গোড়া পত্তন করেন দুই ভাই, জ্ঞানেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ১৯০৪ সালে পাকাপাকি ভাবে তাতে যোগদান করেন। আপনার কাছে আরও শুনেছি, এই বিপ্লবী দল অনুশীলন নয়, যুগান্তরও নয়। ইতিমধ্যে বারীন ঘোষ কলকাতায় যে গুপ্ত দল সংগঠন করেন, আপনাদের মেদিনীপুরের দল বারীন ঘোষের সেই দলের সঙ্গে মিলে যায়। তাহলে বারীন এবং অরবিন্দের সঙ্গে নিশ্চয় আপনার পরিচয় হয়েছিল। সে কবে, কোথায়, কিভাবে, কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ; কি কি কথা হয়েছিল প্রথম দিন, সে সম্বন্ধে বলুন।

পূর্ণবাবু হাসলেন, বললেন,—তোমার এই প্রশ্নের জবাবে যে কাহিনী বলব, তা তোমাদের কাছে বেশ নাটকীয় মনে হবে। শোন।

১৯০৫-০৬ সালে বারীনদাকে মাঝে মাঝে গোপনে মেদিনীপুরে সত্যেনদার বাড়িতে আসতে দেখতাম। কিন্তু পরিচয় হয় নি, কারণ সত্যেন পরিচয় করিয়ে দেয়নি। তখনকার দিনেও আমরা তোমাদের যুগের মতো কৌতুহল দমন করে চলবার অলিখিত নিয়ম মেনে চলতাম।

১৯০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলছি। মেদিনীপুর শহরে ও গ্রামাঞ্চলে আমাদের গুপ্ত-সমিতির কাজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কলকাতায় বারীনদার দলের সঙ্গে আছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সেখান থেকে আসছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত ইংরেজী 'বন্দে

মাতরম্’, আসছে মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার ‘নবশক্তি’ আর আসছে বারীনদার ‘রণনীতি’, ‘মুক্তি কোন্ পথে’, অরবিন্দের ‘ভবানী-মন্দির’ আর আমরা গুপ্ত-সমিতির কর্মীরা মহা উৎসাহে ঐসব পত্র-পত্রিকা বিতরণ করছি, বিক্রয় করছি। পুরোদমে চলছে তখন আমাদের ব্যায়ামাগার, চলছে সত্যেনদের বাড়ির কাছে আমাদের স্থাপিত তাঁতশালা, চলছে নতুন নতুন ছেলে রিক্রুটমেণ্ট, চলেছে আমাদের নানা পরিকল্পনা। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অধীর হয়ে উঠেছে, একটা কিছু করতে হবে, একটা কিছু করতে চাই, কাজ চাই, কাজ, কাজ করবার প্রচণ্ড উন্মাদনায় আমরা তখন অধীর হয়ে উঠেছি, আর দেরী সইছে না—এমন সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত পাটনা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী ‘মাদারল্যাণ্ড’ পত্রিকার এক সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠ করে আমরা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারলাম না। সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির অনুকরণে “ভবানী মন্দির” সংগঠনের উদ্দেশ্যে সম্পাদক যুবকদের সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসবার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে সাড়া দিয়ে আমি গৃহত্যাগের সংকল্প করলাম।

তখন ১৯০৭ সাল। পড়াশুনার অবহেলা করে শুধু স্বদেশী করে বেড়াবার ফলে এফ. এ. ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল করেছি। বাবাও রাজনীতি করতেন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী। আমার অবস্থা উপলব্ধি করে বললেন, আবার কলেজে ভর্তি হও।

বুঝলে, ভর্তি হবার টাকা হাতে নিয়ে কলেজে যাবার পথে আমি থমকে দাঁড়ালাম, পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন—ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, কোন পথে যাব, কোন দিকে আমার পথ। কলেজের পথে গেলে একদা ডিগ্রি অর্জন করে বাবা মার সুসন্তানের মতো-পরিবার ও সংসারের স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারি, অপরদিকে ভবানীমন্দির গড়ে তোলার পথে পা বাড়াতে হলে ছাড়তে হবে সংসার, ছাড়তে হবে স্নেহ, মায়ামমতার নীড়, আমার বাড়ি, সর্বপ্রকার বন্ধন কেটে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে এক বিপদসংকুল পথে, যে পথের শেষে কে জানে, হয়তো দোল খাচ্ছে ফাঁসীর দড়ি অজগরের উদ্যত ফণার মত !

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক ভাবলাম।

এক দিকে কলেজ, আরেক দিকে ভবানী মন্দির !

এক দিকে বাড়ীঘর, বাবা মা, আত্মীয় পরিজন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অপর দিকে অনির্দেশ পদযাত্রা, দুঃসহ দুঃখকষ্ট, জীবনের ঝুঁকি।

কোন দিকে বেশী টানছে ?

অবশেষে, পূর্ণবাবু বলে উঠলেন, ভবানীমন্দিরই জয়ী হল। কলেজে আর ভর্তি হলাম না। সোজা গিয়ে সত্যেনের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, আমার সংকল্পের কথা। বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম আমাদের তাঁতশালায়। সত্যেন আমায় সমর্থন করলে। স্থির হল, পাটনা থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র যে “ভবানীমন্দির” সংগঠনের আহ্বান জানিয়েছেন, গণেশ দাস ও আমি যাব

সেখানে। যাবার পথে স্থানে স্থানে দু-একদিন থেকে সেখানকার যুবকদেরও উদ্বুদ্ধ করে তুলব; অবশেষে পাটনা শহরে ঘরছাড়া যুবকদের জমায়েৎ করে তৈরী হবে "ভবানী মন্দির" বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের অনুকরণে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মবলিদানে কৃতসংকল্প, ঘরছাড়া সেই যুবকের দল থাকবে সেই মন্দিরে, তারপর সুযোগ বুঝে তারা সুরু করবে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই।

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা পূর্ণবাবু, আপনারা যে সন্তান সেনার ধাঁচে সৈন্যবাহিনী গঠন করে ইংরেজের সম্মুখীন হবার আয়োজন করেছিলেন, কোথা থেকে পেতেন আগ্নেয়াস্ত্র, রাইফেল, মেসিন গান, কামান, কোথায় পেতেন গোলাবারুদ, কে করত আপনাদের পরিচালনা, এসব কথা কিছু ভেবেছিলেন কি?

কিচ্ছু না, পূর্ণবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। দেশের জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ দেবার মানসিকতাই ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল। কি দিয়ে আমরা যুদ্ধ করব, কোন সেনাপতি করবেন আমাদের পরিচালনা, যদি জয়লাভ করি, তাহলে কি রকম হবে শাসন-যন্ত্রের কাঠামো, কে কিভাবে হবে স্বাধীন দেশের কর্ণধার— না, না, এসব কিচ্ছু ভাবিনি আমরা, শুধু একটাই ছিল ভাবনা ইংরেজকে তাড়াতে হবে। কেন ভাই—ওঁর মুখে এবার হাসি দেখা গেল—পরবর্তী যুগেও জার্মানীর সাহায্য নিয়ে যখন দেশ স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা হয়েছিল, তখনও কি আগে থেকে করা হয়েছিল এ সবের সুষ্ঠু পরিকল্পনা? জার্মানীর সাহায্য নিয়ে ইংরেজকে তাড়ালে শেষটায় যদি জার্মানীই দেশের ঘাড়ে চেপে বসে, এ কথাটা কি জেগেছিল রাসবিহারী, যতীন মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্যের মনে?

হেসে উঠলেন। পূর্ণবাবু বললেন, আসল কথা, আমরা ইংরেজকে আমাদের দেশ থেকে মেরে তাড়াতে চেয়েছিলাম। তাড়াবার পর কি হবে, তা ভাবিনি। তোমরাও কি ভেবেছিলে কখনও? তোমাদের বিনয় বাদল দীনেশ রাইটার্সে হানা দিয়েছিল, তোমরা কি মনে করেছিলে কিছু ইংরেজ হত্যা করলেই বাকিরা বাপ-বাপ করে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে?

যাকগে। যা বলছিলাম, শোন। বলে তিনি আগেকার প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলেন, একদিন সত্যেনের সঙ্গে পরামর্শ করে পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম গণেশ দাস ও আমি। পরনে ধুতি বটে কিন্তু আমাদের মাথায় গৈরিক পাগড়ী আর হাতে লম্বা লাঠি। কাঁধে একটি ঝোলা, তার মধ্যে কখানা কাপড়-চোপড়ের নীচে একটি অকেজো রিভলভার।

রিভলভার! আমি বলে উঠলাম, এবং তাও আবার অকেজো?

পূর্ণবাবু হেসে উঠলেন, হ্যাঁ তাই। সত্যেন ওটা দিয়ে বলল, পথে যেতে যেতে যেখানে হল্ট করে ছেলেদের রিক্রুট করবে, সেখানে ওটা কাজে লাগবে, ওদের ওটা দেখিয়ে বলবে, এই রিভলভারই আমাদের ধ্যানজ্ঞান, আমাদের ইষ্টমন্ত্র।

হঠাৎ ভেতর দিকের দরজায় একটি ফ্রক-পরা বড় মেয়েকে দেখা গেল। মনে হল, বাড়িতে কাজ করে। পূর্ণবাবুকে বলল, ভেতরে ডাকছেন।

একটু বস ভাই। বলে উনি বাড়ির ভেতর গেলেন।

•

আজ দ্বিতীয় দিন ওঁর সঙ্গে আলোচনা করছি। প্রথম দিন ওঁর মুখে শুনেছিলাম প্রাতঃস্মরণীয় শহীদ ক্ষুদিরামকে কি ভাবে ধীরে ধীরে উনি রিক্রুট করেছিলেন। সে কি সহজে বলেছেন? কিছুতেই নিজের কথা বলতে চান না। এই ত, আমার সামনে সোফার ওপর পড়ে আছে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ওঁর কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, একখানি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ওঁর নিজের রচনা, 'যতদূর মনে পড়ে।' সে যুগের ঘটনা অনেক বলেছেন এতে, ক্ষুদিরামের অনেক কাহিনী। দেখা যাচ্ছে এই বয়সে সেই অতীত যুগের প্রায় সব কথাই ওঁর মনে পড়েছে, পড়েনি শুধু নিজের কথা। লেখা পড়লে মনে হয়, যেন নির্লিপ্ত নিরাসক্ত উদাসীন একটি দর্শকের সামনে ঘটনাগুলি ঘটেছিল আর উনি সে সব কাহিনী মনের পৃষ্ঠায় নোট করে রেখেছিলেন।

এঁদের নিজের কথা টেনে বার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

দরজায় পূর্ণবাবুকে দেখা গেল।

সহাস্যে বললেন, খুব লজ্জায় পড়ে আমায় ডেকেছে। চা করতে গিয়ে দেখে দুধটা খারাপ হয়ে গেছে, এখন অতিথিকে কি করে—

কোন অসুবিধা নেই, বাধা দিয়ে বললাম, পাতি লেবু আছে কি?

পূর্ণবাবু খবর নিয়ে জানালেন, আছে।

ব্যস, তাহলেই হবে, বলে উঠলাম, লিকারের দুধের বদলে লেবুর রস দিলেই ওটা লিমন-টি হয়ে যাবে, ফার্ষ্ট ক্লাশ পানীয়, আধুনিক সভ্যতা ও ভদ্রতার একটা নিদর্শন।

পূর্ণবাবু সশব্দে হেসে উঠলেন।

আবার এসে নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসলেন, হাসিমুখেই বললেন,—কিন্তু আমাদের সেই "ভবানীমন্দির" গড়ে তোলায় উদ্দেশ্যে পাটনা যাত্রা প্রায় সূচনাতেই পরিত্যক্ত হল বলা যায়।

আপনারা কি পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছিলেন?

না ভাই, ট্রেনে। বাঁকুড়ায় গিয়ে আমরা এক সরকারী অফিসারের বাড়িতে উঠলাম। সেখানে রাম মুখার্জী নামে একজন কুস্তিগীর থাকত, ঠিক দলের লোক না হলেও আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, আমরা তারই অতিথি হয়ে রইলাম। উদ্দেশ্য, ওখানকার ছেলেদের মধ্যে বিপ্লবমন্ত্র ছড়ানো।

দিন দশেক পর, পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন,—অকস্মাৎ একদিন স্ট্রং ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হল আমার সহযাত্রী গণেশ। আমার তো কলেরাই মনে হল। ডাক্তার

ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা হল গোপনে। ভাল হয়ে উঠল বটে কয়েক দিন পর, কিন্তু গণেশকে যা দুর্বল দেখলাম, বুঝলাম, ওকে নিয়ে পাটনা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে না, ফিরেই যেতে হবে। রামও সেই পরামর্শ দিল।

সুতরাং দুজনেই আবার ফিরে এলাম মেদিনীপুরে।

আসামাত্রই সত্যেন দিল এক লোমহর্ষক সংবাদ।

২৪ জুলাই 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেছে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত দুটি নিবন্ধের জন্য, 'ভয় ভাঙ্গা' এবং 'লাঠ্যৌষধি।' সত্যেন বলল, এবার সম্পাদক হিসেবে ডিক্লেয়ারেশন নিতে হবে তোমায়। গভর্ণমেণ্ট যখন একবার এতে হাত দিয়েছে, তখন বার বার এর পেছনে লাগবে। তাই প্রবন্ধগুলো যে-ই লিখুক, দায়িত্ব সম্পাদকের, তাকেই জেলে যেতে হবে। পূর্ণ, তুমি কলকাতায় যাবার জন্য রেডি হও।

সেটা ১৯০৭ সাল। তখন পর্যন্ত কোন পত্রিকায় সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকরের ও প্রেসের নাম প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু ভূপেনবাবুকে জেলে পাঠিয়ে গভর্ণমেণ্ট হুকুমনামা ঘোষণা করল যে, অতঃপর আদালতে নাম-জারী করতে হবে এবং আদালতের অনুমোদন নিতে হবে।

তারপর কি করলেন পূর্ণবাবু?

সত্যেন বারীনদার নামে একখানা চিঠি লিখে দিল, পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন, আমি চিঠি নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। বারীনদা তখন থাকতেন দু নম্বর ভবানী দত্ত লেনের মেসে। তখন ওখানে থাকতেন অবিনাশ ভট্টাচার্য আর নরেন ভট্টাচার্য, মানে, পরবর্তী কালের এম. এন. রায়।

সেই আমার বারীনদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

জিজ্ঞেস করলাম, প্রথম পরিচয়ে কি কথা হল?

বিশেষ কিছুই না! মনে হল যেন আমি ওঁর অনেক দিনের চেনা ও জানা, যেন আগে অনেকবার দেখা হয়েছে, অনেক কথা হয়েছে, এখন এসেছি একটা বিশেষ কাজ নিয়ে, পাঠিয়েছে সত্যেন—

কি সে বিশেষ কাজ পূর্ণবাবু?

পরদিনই বারীনদা আমায় নিয়ে গেলেন, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের পর "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে পূর্ণচন্দ্র সেনের নামজারীর আবেদনপত্র পেশ করা হল।

সি. পি. এম. এক ঝলক চাইল আমার দিকে, তারপরই আবেদনপত্রের ওপর খচ খচ করে লিখে দিল, **Callow youth. Declaration rejected.**

জিজ্ঞেস করলাম, সি. পি. এম. তখন নিশ্চয়ই কোন সাহেব ছিল, তাই না?

সাহেব বলে সাহেব! পূর্ণবাবু হেসে উঠলেন, তিনিই সেই স্বনামধন্য কিংসফোর্ড।

কিংসফোর্ড! হঠাৎ আমার মনের পর্দায় পর পর যেন অনেকগুলি ছবি ফুটে উঠল।

পনেরো বৎসর বয়স্ক সুশীল সেনকে কিংসফোর্ড পনেরো ঘা বেত মারবার হুকুম দিচ্ছে।

কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে সুশীল সেন ওর গার্ডেন রীচের বাড়ির চাপরাশির হাত দিয়ে ওকে একখানা বই উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিচ্ছে, যার মধ্যে লুকোনো রয়েছে একটি মারাত্মক বোমা।

বিপ্লবীদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুর জেলার জেলা ও দায়রা জজের পদে নিয়োগ করেছে আর সে প্রাণভয়ে চলে যাচ্ছে বাংলা ছেড়ে।

ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকি কিংসফোর্ডকে ঠিক চিনতে না পেরে বোমা নিক্ষেপ করেছে, যার ফলে মারা গেছে মিসেস কেনেডি ও তার মেয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, সেই কিংসফোর্ড ?

হ্যাঁ, সেই কুখ্যাত কিংসফোর্ড, পূর্ণবাবু জবাব দিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাটা বোধ হয় একটু হাসল। ভাবল, একুশ বছরের লিকলিকে ছোকরা, সে হবে কাগজের সম্পাদক, সে প্রবন্ধ লিখবে ?

এমন সময় দু কাপ লিমন-টি নিয়ে প্রবেশ করল সেই মেয়েটি, সঙ্গে এক ডিস বিস্কুট।

আমরা কাপ তুলে নিলাম।

একটু পর জিজ্ঞেস করলাম, অরবিন্দের সঙ্গে কে এবং কোথায় আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিল পূর্ণবাবু ?

ঐ তো, ঐ সময়ই,—উনি জবাব দিলেন, অরবিন্দ তখন ছিলেন শিয়ালদহের কাছে ছকু খানসামা লেনে একখানা ছোট বাড়িতে। বারীনদা আমায় কোর্ট থেকে সোজা সেখানে নিয়ে গেলেন এবং অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কি জিজ্ঞেস করলেন অরবিন্দ ? কি কথা হল তাঁর সঙ্গে ?

পূর্ণবাবু বললেন, মামুলি কথা, তাও দুচারটে। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, প্রায় সময়ই চুপ করে বসে থাকতেন, কি ভাবতেন কে জানে। আমি বাড়ীঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি এবং কাউকে কিছু না বলে—শুনে আমায় বললেন বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলে আসতে।

তাই করবার জন্য ফিরে গেলাম তমলুকে আমাদের বাড়িতে। রইলাম পাঁচ সাত দিন। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না বাবাকে বা অপর কাউকে। আবার নিঃশব্দে ফিরে এলাম কলকাতায় বারীনদার কাছে। অরবিন্দ তখন ৪৮নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে গেছেন। পুলিশ গুপ্তচরের তৎপরতাও তখন

বেড়ে গেছে মনে হল। বারীনদা, আরও ক'জন ও আমায় নিয়ে তাই এসে উঠলেন ২৪নং গোয়াবাগান লেনের একটি ছোট একতলা বাড়িতে। এই বাড়িতেই আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে।

সেই বোমারু উল্লাসকর? আমি বলে উঠলাম।

হ্যাঁ, সেই উল্লাসকর, পূর্ণবাবু সহাস্যে বললেন, আর ২৪নং গোয়াবাগান লেনেই ছিল তার প্রথম বোমা তৈরীর কারখানা।

আমার পরের প্রশ্ন, আপনার কর্মকেন্দ্র কোথায় ছিল?

উনি বললেন, প্রথমে তমলুক, তারপর মেদিনীপুর শহর ও গ্রামাঞ্চল, তারপর বাড়ীঘর ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন কলকাতা।

কলকাতায় কি বরাবর গোয়াবাগান লেনেই ছিলেন?

না না, পূর্ণবাবু বলে উঠলেন,—বারীনদা আমায় ওখান থেকে পাঠিয়ে দিলেন মুরারীপুকুর বাগানের আড্ডায়, যেখানে আরও কিছু ছেলে থাকত। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার হলাম আলীপুর বোমার মামলায়। বারীনদা আমি এবং আরও বারোজন।

আপনি কি কখনও ফেরার হয়েছিলেন?

না।

কোন রাজনৈতিক ডাকাতি বা হত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

না। তবে একটু বিস্তারিতভাবে বলি, পূর্ণবাবু বললেন, উল্লাসকরের বোমা নিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের প্রথম বৈপ্লবিক হত্যা প্রচেষ্টা হয়েছিল ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে। মানকুণ্ডু ও চন্দননগর স্টেশনের মধ্যে রেল লাইনের ওপর বোমা পেতে রাখা হয়েছিল। বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর এ্যানড্রু ফ্রেজার-এর স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বোমা ফাটল না।

দমল না তাতে বিপ্লবীরা এবং বোমারু উল্লাসকর। উন্নত ধরণের বোমা তৈরী করা হল এবং পরের মাসেই আবার বোমা পাতবার জন্য রওনা হলাম বারীনদা, বিভূতি সরকার, উল্লাসকর এবং আমি। স্থির ছিল, এবার বোমা পাতা হবে মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রেল স্টেশনের কাছে। তারিখটা আমার আজও মনে আছে, ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর, ফ্রেজারের স্পেশ্যাল ট্রেন ঐ লাইনে আসবে। খড়্গপুর পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে গেলাম। ওখান থেকে বারীনদা আমায় পাঠালেন মেদিনীপুরে। বলে দিলেন জনসাধারণের মধ্যে ফ্রেজার হত্যার প্রতিক্রিয়া কি রকম হয়, তা লক্ষ্য করতে।

কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? পূর্ণবাবু বলতে লাগলেন, ফ্রেজারের স্পেশ্যাল ট্রেন এল, বোমাও ফাটল, কিন্তু ভুল করে বোমা উলটো করে বসাবার ফলে ইঞ্জিনের টুকিটাকি ক্ষতি হল মাত্র আর লাইনটা সামান্য নড়ল। ট্রেন ঝম্ ঝম্ করে এসে ঝম্ ঝম্ করে বেরিয়ে গেল, ফ্রেজার বোধহয় টেরই পেল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনিয়ে বিপ্লবীরা যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দল ও গ্রুপ একাত্ম হয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীনকে বাংলা দলের নেতারূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, পূর্ণবাবু তখন ছিলেন মেদিনীপুর দলের অধিনায়ক। সে প্রয়াস ফলপ্রসূ না হওয়ায় উনি প্রধানতঃ ফেরারীদের জন্য কাজ করতে থাকেন। যারা ফরাসী চন্দননগরে আশ্রয় নেন, অনেক সময় পূর্ণবাবু মারফৎ তাঁরা কলকাতার ফেরারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। ওঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাও ওঁর কাজ ছিল। কয়েকজন ফেরারীর নাম করলেন উনি,—অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, চারু ঘোষ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কুন্তল চক্রবর্তী।

মণ্টেগু-চেলমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন জাতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা সুরু করেন, তখন অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জীর ব্যবস্থাপনায় উত্তর-বঙ্গ গ্রুপের সত্যব্রত দাসগুপ্ত ওরফে বাদলকে নিয়ে পূর্ণবাবু কাশিমবাজারের মহারাজার বাসভবনে গান্ধীজী এবং কলাকার স্ট্রীটের একটি বাড়িতে বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফেরারী বিপ্লবীদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। গান্ধীজী বলেন, হিংসার পথ পরিত্যাগ করে ওঁরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসুন। আর তিলক অপেক্ষা করতে বলেন।

১৯২০-২১ সালে এই সব সংস্কার প্রবর্তনের প্রাক্কালে আন্দামানে নির্বাসিত বিপ্লবীদের দেশে ফিরিয়ে এনে মুক্তি দেয়া হয়, ছেড়ে দেয়া হয় রাজবন্দী ও অন্তরীণদের, তখনও যাঁরা ফেরারী ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

ইতিমধ্যে পূর্ণবাবু স্টেনোগ্রাফী পাশ করে ইসটার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের কনষ্ট্রাকশন বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে চাকরি করছিলেন, গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯১৮-১৯ সালে জাতীয় আন্দোলন জোরদার করে তোলার উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে সভাপতি করে "জনসভা" নামে যে নিখিল বঙ্গ সংস্থা গড়ে তোলেন, পূর্ণবাবু ছিলেন তার জন-সংযোগ বিভাগের অধিকর্তা।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের প্রাক্কালে দেশবন্ধু পূর্ববঙ্গ সফরে গেলে পূর্ণবাবু তাঁর সঙ্গে যান প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে।

ঊননব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের স্মৃতিচারণ শুনছিলাম।

কতক ওঁর মনে আছে, কতক চেষ্টা করে মনে করছেন, কতক আর মনেই করতে পারছেন না।

স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক।

আর কিছু দিন পর যা মনে আছে, যা মনে করতে পারছেন, হয়তো তাও ভুলে যাবেন।

তারপর একদিন এই বৃদ্ধ চির বিদায় নেবেন পৃথিবী থেকে।

কিন্তু বাংলার বিপ্লবী দলের আদি ইতিহাস, তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের আদি পর্ব যে অলিখিত থেকে অবশেষে অবলুপ্ত হয়ে যাবে, সে জন্য কে দায়ী হবে?

উত্তর কালের তথ্যসন্ধানী মানুষের কাছে কী জবাব দেব আমরা?

ওঁর কথা শুনতে শুনতে সেই কথাই ভাবছিলাম।

মেয়েটি এসে খালি কাপ ডিস নিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, পূর্ণবাবু, আপনি ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা-সংগ্রামীর পেনসন পেয়েছেন?

না, ভাই, দরখাস্ত করিনি। উনি জবাব দিলেন।

তাম্রপত্র?

না, তাও নয়।

হঠাৎ বলে উঠলেন, এবার আমিই তোমায় চমকে দেবো। ষ্টেনোগ্রাফী পাস করেছি শুনেছ, এবার শোন আমার সাংবাদিক জীবনের ইতিহাস। ১৯২০ সালে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর "সার্ভেণ্ট" পত্রিকা এবং মতিলাল ঘোষের "অমৃতবাজার পত্রিকা"-র আমি ছিলাম বিশেষ প্রতিনিধি। তারপর ১৯২৩ সালে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির মুখপত্র "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় যোগদান করি চীফ রিপোর্টার হিসেবে। অবশেষে ১৯২৬ সালে "স্টেটসম্যান" পত্রিকার রিপোর্টারের চাকরিতে যোগদান করি।

বাধা দিয়ে বললাম, ১৯২৬ সালে, মানে বৃটিশের যুগে? চাকরিতে নিল ওরা? বোধ হয় আপনার অতীত কার্যাবলীর খবর রাখত না—

পুরোপুরি রাখত। পূর্ণবাবু জবাব দিলেন, প্রথমটা আমিও তাই ভেবেছিলাম। শেষটায় জানতে পারলে চাকরিটি খোয়াব, তাই আগেই আমি একটুখানি বলতে চেষ্টা করতেই ওরা সাফ বলল, সব জানে এবং জেনে শুনেই আমায় নিতে চায়। তাই যোগ দিলাম স্টেটসম্যান-এ এবং দীর্ঘ সাতাশ বৎসর পর রিটায়ার করেছি ১৯৫৩ সালে। ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবের আমিই প্রতিষ্ঠাতা ১৯৪৫ সালে। ওর প্রেসিডেণ্ট ছিলাম ১৯৪৫, ১৯৪৬ ও ১৯৫১ সালে।

স্টেটসম্যানের রিপোর্টার হিসেবে আমি গোপীনাথ সাহার কেস, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা 'কভার' করেছি। কিছুটা তোমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না?

জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম?

সহাস্যে বললেন উনি, বৃটিশের যুগে দীর্ঘকাল আটক ছিলে তুমি কথনো

জেলে, কখনো বন্দীশিবিরে, কখনো অন্তরীণে। আবার দেশ স্বাধীন হবার পর জেল-বার্ড তুমিই চাকরি পেলে জেল সুপারিনটেনডেণ্ট এবং সুপারের চেয়ারে সেই জেলেই বসলে, যেখানে একদা তুমি ছিলে বন্দী। ঠিক তেমনি গোপীনাথের স্থানে হয়তো আমাকেই যেতে হতে পারত টেগার্টকে হত্যার জন্য। তা না হয়ে আমারই সম-ধর্মী একজন হল আসামী আর আমি কাগজের রিপোর্টার। অদ্ভুত না ?

খেয়ালই করিনি এতক্ষণ। ঘড়ি দেখলাম। রাত সাতটা বেজে গেছে।

ক'ঘণ্টা কথা বললাম আজ ?

পুরো চার ঘণ্টা।

উঠে দাঁড়ালাম।

পূর্ণবাবুও উঠলেন। নমস্কার জানাতেই হাতখানা দুহাতের মুঠোয় ধরে বললেন, এদিকে এলে এসো আবার।

কথা দিলাম।

হঠাৎ বললেন, তোমার লেখাটা প্রেসে দেবার আগে একবারটি দেখিয়ে নেবে না ?

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, নিশ্চয়ই না। স্টেটসম্যান-এ রিপোর্টার হিসেবে অসংখ্য প্রেস কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন, তখন কি আপনার রিপোর্ট প্রেসে দেবার আগে, যিনি কনফারেন্স করতেন, তাঁকে দেখিয়ে নিতেন? আপনি দেখাতেন না, আমিও দেখাব না।

হেসে উঠলেন পূর্ণবাবু, বললেন—জেল-বার্ড জেল সুপার যদি আবার স্টাফ রিপোর্টার হয়, তাহলে তার সঙ্গে এঁটে উঠবে কে ?

হাসতে লাগলেন।

দরজার বাইরে ছোট বারান্দা। বারান্দার নীচে রাস্তা।

রাস্তায় নামলাম। আবার নমস্কার জানালাম।

তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম বড় রাস্তার দিকে।

বিপ্লবী নেতা নলিনীকান্ত কর

(১)

১৯১৫ সাল। ৯ সেপ্টেম্বর।

পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেন হাওড়া থেকে রাত্রে ছাড়ে।

আরও যাত্রীর সঙ্গে সেই ট্রেনের ইণ্টার ক্লাশ কামরায় উঠে বসল একটি যুবক। সঙ্গে বালেশ্বরের পরের স্টেশন খোন্তাপাড়ার টিকেট। সঙ্গে ধোলাই-করা জামা কাপড়ের একটি বড় বাণ্ডিল আর জামার নীচে কোমরে গোঁজা আছে একটি মাউজার পিস্তল, যার এগারোটা চেম্বারের ন'টাতে গুলি ভর্তি।

যুবকটির মনে এতটুকু শান্তি নেই। বরং নানা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় মন তার ভারাক্রান্ত। শুধু ভারাক্রান্ত নয়, বিপর্যস্ত!

চোখে তার এক ফোঁটা ঘুম নেই। অন্য যাত্রীরা কেউ বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ বসে বসে ঝিমুতে লাগল, কেউ কেউ সহযাত্রীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। আর নির্বাক যুবকটি পাথরের মতো বসে রয়েছে জানালার পাশে।

পর পর স্টেশনে প্যাসেঞ্জার ট্রেন থামছে, যাত্রীর ওঠা-নামা চলছে, ফেরি-ওয়ালার হাঁক শোনা যাচ্ছে, আবার বাঁশী বাজিয়ে ছুটছে ট্রেন অন্ধকার বিদীর্ণ করে।

যুবকটির বাহ্যিক কোনো চাঞ্চল্য নেই। পলকহীন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে? বাইরের জমাট অন্ধকার? সহযাত্রীদের চলাফেরা?

না না, কিছুই দেখছে না সে। দেখতে পাচ্ছে না। পাথরের চোখে শূন্য দৃষ্টি।

সারা অন্তর তার মথিত করে বার বার একটি প্রশ্ন জেগে উঠছে, পারব তো সময়মত পৌঁছুতে? পারব তো উদ্দেশ্য সফল করতে? খোন্তাপাড়া থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল পথ যেতে হবে, পারব তো পুলিশের আগে পৌঁছতে?

বালেশ্বর স্টেশনে ট্রেন থামল সকালবেলায়। ১০ সেপ্টেম্বর।

সারারাত কিছুই পেটে পড়েনি। একখানা পাঁউরুটি কেনা যাক।

যুবকটি ট্রেন থেকে নেমে চলল দোকানের দিকে পাঁউরুটি কিনবে বলে।

হঠাৎ প্লাটফরমে দেখতে পেল পরিচিত একজন পুলিশ সাব-ইনসপেক্টার। যুবকটিকে চেনে সে। বালেশ্বরের ইউনিভারসাল এম্পোরিয়াম দোকানে এসে আড্ডা মারতো। যুবকটিকে চেনে গোপাল রায় নামে। সেই এম্পোরিয়াম ৫ সেপ্টেম্বর সার্চ হয়ে গেছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে শৈলেশ্বর বসু ও নিমাই

চক্রবর্তীকে। পুলিশ ও বালেশ্বর শহরের অনেকে জানে, গোপাল রায় এম্পোরিয়ামের অন্যতম অংশীদার।

সুতরাং—

সুতরাং আর রুটি কেনা হল না। দ্রুত অথচ সতর্ক দৃষ্টি রেখে সে আবার ট্রেনে উঠে এক কোণে নিরীহ গোবেচারার মতো বসে রইল।

একটু পর ঘণ্টা বাজল, ইঞ্জিনের হুইসেল শোনা গেল। ট্রেন চলতে সুরু করতেই ধুতি পাঞ্জাবী-পরা একজন ভদ্রলোক চট করে উঠলেন সেই বগিতে, সঙ্গে দুজন পুলিশ।

যুবক সচকিত হল।

বগির বেশ কয়েকজন যাত্রী চেঁচিয়ে উঠল, এই যে ইন্‌সপেক্টারবাবু। আচ্ছা ইন্‌সপেক্টারবাবু, কাল ডাকাতদের সঙ্গে যে পুলিশের লড়াই হয়েছিল, তার ফলাফল কি হয়েছে দয়া করে বলবেন ?

যুবক কান খাড়া করল। ইনস্‌পেক্টার গর্বিত হাসিতে চোখমুখ দীপ্ত করে বললেন, পাঁচ জনের সঙ্গে লড়াই হয়েছে। একজন মারা গেছে, দু'জন আহত আর বাকি দুজন ধরা পড়েছে। আরও একটা ডাকাত ছিল, সেটা আগেই সরে পড়েছে।

ধ্বক করে উঠল যুবকটির বুক! নিশ্বাসে ঝড়! চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! শিরায় শিরায় তপ্ত রক্তের মাতামাতি!

উঃ, পারলাম না, পারলাম না যাদুদার নির্দেশমত ঐ পঞ্চবীরকে কাপ্তিপদা থেকে কলকাতায় নিয়ে যেতে।—উঃ, একটি দিন আগে যদি আসতাম! এখন সব শেষ হয়ে গেছে। সব শেষ!

কিন্তু বিপ্লবীর জীবনে শেষ বলে কোন শব্দ নেই। দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃংখল খান খান করে ভেঙ্গে না ফেলা পর্যন্ত তাদের অবিরাম অবিশ্রাম সংগ্রাম। সুরু করেছেন ১৮৯৮ সালের ১৮ এপ্রিল দামোদর হরি চাপেকর ফাঁসীর মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করে। তারপর সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বাসুদেব ১৮৯৯ সালের ৯ মে, রাণাদে ১০ মে, বালকৃষ্ণ ১২ মে। তারপর থেকে চলছে "আগে কে-বা প্রাণ করিবেক দান, তারই লাগি তাড়াতাড়ি।" ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু, চারুচন্দ্র বসু, বীরেন দত্তগুপ্ত সবাই এই অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের সামিল হয়েছেন। তাঁদেরই প্রদর্শিত পথে আগুয়ান হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতীশচন্দ্র পাল।

গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল যুবক। কর্তব্য স্থির করে ফেলল।

খোন্তাপাড়ায় আর নামল না।

সোজা চলে গেল পুরী।

সেখানে একদিন থেকেই ফিরে এল—না না, সরাসরি কলকাতায় নয়।

সাঁতরাগাছিতে নেমে ভাগীরথী খেয়া নৌকায় পার হয়ে গিয়ে খিদিরপুরের মেসে উঠল। সংবাদ পেয়ে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এলেন, এলেন অতুলকৃষ্ণ ঘোষ।

স্থির হল, আর বাড়ী ফেরা নয়। পেলেই ধরবে পুলিশ।

সুতরাং অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন ওঁরা তিনজন ১৯১৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর—যাদুগোপাল, অতুল ঘোষ এবং নলিনীকান্ত কর।

মুক্ত নাগরিক হয়ে বেরিয়ে এলেন দীর্ঘ ছয় বৎসর পর ১৯২১ সালে।

১৯১৫ সালের সেই সাতাশ বৎসরের যুবক এই ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে সাতাশী অতিক্রম করে গেছেন। নাম নলিনীকান্ত কর।

মুখোমুখি বসে বিপ্লবযুগের স্মৃতিচারণ করছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনিই সেই ছয় নম্বর ডাকাত?

উনি মৃদু হাসলেন।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনিই তাহলে বালেশ্বরের ইউনিভারসাল এম্পোরিয়াম অঞ্চলে গোপাল রায় নামে পরিচিত ছিলেন?

ছিলাম। উনি জবাব দিলেন। তারপর বললেন, ১৯১০ সালে আমি একা একবার আত্মগোপন করেছিলাম ঐ কাপ্তিপদা রাজ্যের মহুলডিহা মৌজায়। ছয় মাস ফেরারী ছিলাম, তার মধ্যে মাস চারেক ঐ মহুলডিহাতে। কাপ্তিপদার ম্যানেজারের ছেলে মনীন্দ্র চক্রবর্তী বিপ্লবীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে ৮।১০ দিন থাকবার পর তিনি অন্য একটা বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। উনিই আমার ছদ্মনাম দিয়েছিলেন, গোপাল রায়। গোপাল রায়ের নামে এক বিঘে ধানী জমি লিখে দিয়েছিলেন। নিজেই লাঙ্গল চালিয়ে চাষ করতাম।

একটু থেমে বললেন, ১৯১৫ সালে দাদারা পাঁচ জন ও আমি মণীন্দ্রদার বাড়ী থেকে দুই ফার্লং দূরে জঙ্গলের মধ্যে যে স্থানটিতে ঘর তৈরী করে ছিলাম, আবার সেই স্থানটির নাম দেয়া হল সেই পুরোনো—গোপালডিহা এবং উদালা রেজিস্ট্রেশন অফিসে গোপালডিহা মৌজা গোপাল রায়ের নামে রীতিমত দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল।

এইবার আমি বললাম—শুনুন নলিনীবাবু, বাংলায় বিপ্লব-আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু কিছু গ্রন্থ ও কাহিনী আমি পড়েছি। এর আগে আপনার সঙ্গে আমার আদৌ পরিচয় ছিল না বটে, কিন্তু সেই সব গ্রন্থে আমি আপনার নাম পেয়েছি। কিন্তু সে কতটুকু? একখানাতে পেয়েছি যে, নরেন ভট্টাচার্য ও নলিনী কর—বাঘা যতীন ও চিত্তপ্রিয়কে কাপ্তিপদায় রেখে এলেন। লক্ষ্য করুন, "রেখে এলেন।" তার অর্থ হচ্ছে যে, আপনি যেন কাপ্তিপদায় থাকতেন না, শুধু ওঁদের পৌঁছে দিয়ে এলেন। আর একখানাতে শুধু উল্লেখ করা আছে, নলিনী করের ব্যবস্থাপনায় কাপ্তিপদায় ওঁদের থাকবার ঘর তৈরী হল।—ব্যস ঐ পর্যন্ত।

কিন্তু আপনিই যে সেই ব্যক্তি, যিনি ১৯১০ সালে ঐ কাপ্তিপদা রাজ্যেই মণীন্দ্র চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায় মাসকয়েক আত্মগোপন করে গোপাল রায় নামে ছিলেন এবং ১৯১৫ সালে আপনিই আবার বাঘা যতীন ও অন্যান্যকে নিয়ে গেলেন সেই কাপ্তিপদা রাজ্যে—কই, এ তথ্য তো পাইনি কোথাও।

নলিনীবাবু আমায় থামাতে চাইলেন। আমি বললাম, না না, আমায় বলতে দিন। ১৯১০ সালে যে গোপাল রায়কে মণীন্দ্রবাবু এক বিঘে ধানী জমি লিখে দিয়েছিলেন, ১৯১৫ সালে সেই গোপাল রায়কে একখণ্ড জমি রেজিষ্ট্রি করে লিখে দিলেন এবং সেই গোপালডিহা নামের জমিতেই আত্মগোপন করে ছিলেন পঞ্চবীর এবং আপনি—না, এ তথ্য কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। এমন কি, গোপাল রায়ই যে নলিনীকান্ত কর এবং বিপ্লবী দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে নলিনীকান্ত করও যে বাঘা যতীনদের সঙ্গে থাকতেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে হঠাৎ কলকাতায় না এলে এবং ফিরে যেতে একদিন দেরী না হলে পঞ্চবীরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনাকেও যে ট্রেঞ্চ ফাইটে যোগদান করতে হত, এ তথ্য কোথাও লেখা আছে কি ?

উনি চুপ করে রইলেন।

আমি বললাম, যাকগে। যা লেখা নেই বা লেখা থাকলেও যা আমার চোখে পড়েনি অথবা কারুর মুখেও শুনিনি, তা নিয়ে আর অভিযোগ জানাতে চাই না। কারণ, আজ আপনাকেই পেয়ে গিয়েছি। একটু পর বললাম, ঘটনাটি আরও স্পষ্ট করবার জন্য আমি আপনাকে ক'টা প্রশ্ন করছি, দয়া করে জবাব দিন।

বেশ। প্রশ্ন করুন।

কে আপনাকে বাঘা যতীনদের কাপ্তিপদায় নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন ?

নির্দেশ নয়, নলিনীবাবু জবাব দিলেন। পরামর্শ দেয় আমার আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। ১৯১০ সালে যে আমি ওখানেই লুকিয়ে ছিলাম, তা সে জানত।

বাঘা যতীন তখন ফেরারী হয়েছিলেন কেন ?

নলিনীবাবু বললেন, তাহলে একটু আগে থেকে বলি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে সমগ্র ভারতে ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তোলার যে পরিকল্পনা ও সংগঠন করেছিলেন রাসবিহারী বসু, কৃপাল সিং পূর্বাহ্নেই বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিশকে তা জানিয়ে দেবার ফলে সমস্ত প্রয়াস ভেস্তে যায়। পুলিশ প্রচণ্ডভাবে ধড় পাকড় সুরু করে দেয়। রাসবিহারীসহ অনেকেই গা ঢাকা দেন। দাদা অর্থাৎ আপনারা যাঁকে বলেন যতীন মুখোপাধ্যায় অথবা বাঘা যতীন—তাঁর আসল নাম কিন্তু যতীন নয়, জ্যোতীন—তিনিও বার বার তাঁর কলকাতার আস্তানা বদলাতে থাকেন। ৭৩নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়। দাদা, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ও আরও ক'জন সেখানে আশ্রয় নেন।

২৪ ফেব্রুয়ারী দাদা, নরেন ভট্টাচার্য (মানে, উত্তরকালের এম. এন. রায়) এবং আরও ক'জন যখন ওখানে বসে কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় পুলিশের গুপ্তচর নীরদ হালদার কি করে যেন বাড়ীটার খবর পেয়ে সোজা দোতলায় এসে হাজির! দাদাকে সে আগেই চিনত, কিন্তু হয়তো ওখানে পেয়ে যাবে আশা করেনি। তাই বলে উঠল, যতীনবাবু, আপনি এখানে?

সঙ্গে সঙ্গে চিত্তপ্রিয় তাকে গুলি করল।

সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল নীরদ হালদার।

মরে গেছে মনে করে সবাই তৎক্ষণাৎ সরে পড়লেন।

পুলিশ এল। মৃতপ্রায় নীরদ হালদারকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল।

মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সে বলে গেল যে, যতীন মুখার্জী তাকে গুলি করেছে।

তৎক্ষণাৎ দাদার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়ে গেল গ্রেপ্তারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করে।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তখন কোথায় ছিলেন নলিনীবাবু?

মৃদু হাসলেন নলিনীবাবু। বললেন, আমি ঠিকাদারের ব্যবসা করি তখন। জানেন নিশ্চয়ই, দাদারও ঠিকাদারী ব্যবসা ছিল এবং ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ উনি আত্মগোপন না করা পর্যন্ত আমি ওঁরই সঙ্গে কাজ করতাম। ঠিক সেই সময় কাজ হচ্ছিল মাগুরায়। কয়লা দরকার, আমি এসেছিলাম খুলনা লাইনের সিঙ্গে স্টেশনে। কয়লা কিনে নৌকো করে পাঠিয়ে দিয়ে ট্রেনে মাগুরা ফিরে যাব। ট্রেনের জন্য প্লাটফরমে অপেক্ষা করছি, দু'খানা নৌকায় কয়লা বোঝাই হয়ে গেছে, এখুনি রওনা হব, এমন সময় স্টেশনে এল একখানা টেলিগ্রাম, স্টেশন মাস্টার জোরে জোরে পড়তে লাগলেন, Jyotin Mukherji shot. Nirod Halder dead—Have a sharp look out.

আমি আর মাগুরোয় গেলাম না। নৌকো দু'খানা রওনা করিয়ে দিয়ে পরের ট্রেনেই সোজা চলে এলাম কলকাতায়। তারিখটা মনে আছে, ১ মার্চ, ১৯১৫ সাল।

কলকাতায় এসেই সোজা গেলাম ২নং ছিদাম মুদি লেনে অতুল ঘোষের বাড়ীতে।

আমায় দেখে অতুল বলে উঠল, তুই এসে গেছিস? খুব ভাল হয়েছে। তোকেই এখন বিশেষ দরকার। তুই ক্ষিতীশদার মেসে যা, আমি একটু পরেই আসছি।

গেলাম সেখানে।

একটু পরেই অতুল এল। বলল, নীরদ হালদারের পর কাল ইনস্পেক্টার সুরেশ মুখুজ্জেকে খতম করেছে চিত্তপ্রিয়। খতম করার লিস্টে আরও নাম

আছে। দাদাকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। দাদাও জিদ ধরেছেন, চিত্তপ্রিয়দের রাখবার স্থান না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তিনি কলকাতার বাইরে যাবেন না। আমরা বলেছি, সে ব্যবস্থাও হবে। ১৯১০ সালে তুই যেখানে লুকিয়ে ছিলি, সেখানে নিয়ে গেলে কেমন হয় ?

বললাম, তোমরা কেউ আমার সঙ্গে চল, জায়গাটা তোমাদেরও দেখা দরকার।

নরেন ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে যাবেন স্থির হল।

দাদা, বিপিন গাঙ্গুলী, চিত্তপ্রিয় এবং আরো দু'একজন তখন অজ্ঞাতবাস করছেন হাওড়া জেলার বাগনানের হাইস্কুলের হেড মাষ্টার অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়ীতে। নরেনদা আমায় নিয়ে গেলেন। দাদা আমায় বললেন, নরেনদা আমায় বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই কি আর করব, আত্মগোপন করতেই হবে। যা, তোরা জায়গাটা দেখে আয়।

নরেনদা ও আমি মহুলডিহায় গিয়ে মণীন্দ্রদার বাড়ীতে উঠলাম।

মণীন্দ্রদা সব শুনে বললেন, আমার মৌজার মধ্যে যেখানে খুশী স্থান নির্বাচন করুন, আমি জায়গাটা গোপাল রায়ের নামে রেজিস্ট্রী করে দেব। নরেনদা কলকাতা চলে এলেন। আমি মণীন্দ্রদার সাহায্যে ঘর তৈরী করে ফেললাম। গাছের খুঁটি আর ডাল দিয়ে চালের ফ্রেম, বিচালির ছাউনি, জংলী লতা গাছ দিয়ে তৈরী দড়ির বাঁধ। রান্না করে খাওয়া সুরু করলাম।

সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই নরেনদা এসে গেলেন—দাদা, চিত্তপ্রিয় ও শৈলেশ্বর বসুকে নিয়ে। বালেশ্বর শহরে ইউনিভারসাল এম্পোরিয়াম খোলা হয়ে গেছে। নরেনদার সহকর্মী শৈলেশ্বর হবেন ঐ এম্পোরিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক। দাদার থাকবার স্থানটি ওঁকে চিনিয়ে দেয়া হল। আর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। আমাকে প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই কলকাতা যেতে হবে। তখন দাদার কাছে কাউকে নিয়ে যেতে হলে ইউনিভারসাল এম্পোরিয়াম থেকে শৈলেশ্বর তাকে নিয়ে আসবেন। কলকাতার খবরগুলিও সব আসবে এম্পোরিয়ামে শৈলেশ্বরের কাছে। আমি মাঝে মাঝে ওখানে যাব, খবর নিয়ে আসব। আমি না থাকলে শৈলেশ্বর আসবেন।

দিন দশ পনেরো পর, নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, শৈলেশ্বর, নীরেন ও মনোরঞ্জনকে ওখানে পেঁছে দিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর এল জ্যোতীশ পাল।

নরেনদা যখন সি. মার্টিন নাম নিয়ে অস্ত্রের সন্ধানে বাটাভিয়া যাত্রার প্রাক্কালে দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর আশীর্বাদ নিতে যান, আমি তখন ওখানে। যাদুদা দাদার কাছে আসবেন পরামর্শের জন্য। শৈলেশ্বর আর আমি তাঁকে বালেশ্বর থেকে নিয়ে এসেছিলাম।

মণীন্দ্রদার নামে আমরা একখানা সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকা রাখতাম।

হঠাৎ তাতে সংবাদ পড়লাম, ৭ আগষ্ট কলকাতার হ্যারি এ্যান্ড সন্স-এর

অফিস তল্লাসী করে পুলিশ হরিদা অর্থাৎ হরিকুমার চক্রবর্তী, তার ভাই মাখন চক্রবর্তী এবং শৈলেশ্বরের ছোট ভাই শ্যামেশ্বরকে গ্রেপ্তার করেছে।

দাদা বললেন, শৈলেশ্বরের ভাইকে যখন এ্যারেস্ট করেছে, তখন ইউনিভারসাল এম্পোরিয়াম পর্যন্ত পুলিশের এসে পড়া বিচিত্র নয়। আর কানের কাছে বালেশ্বরে এসে গেলে এখানকার খবরও পেয়ে যেতে পারে। অতএব রেডি হও, দিনরাত্রি ওয়াচ রাখ। আমরা ধরা দোব না, ওদের মোকাবেলা করব।

সুতরাং আমরা ছয়জন পালা করে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা গুলীভরা মাউজার পিস্তল নিয়ে আমাদের আস্তানার চারিদিকে পাহারা দিতে লাগলাম।

সারা আগস্ট মাসটাই পাহারা দিলাম, না, শত্রুপক্ষের দেখা নেই।

আমাদের তখন টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেছে। দাদার নির্দেশে ১ সেপ্টেম্বর আমি কলকাতা চলে এলাম। ভাবলাম, টাকা নিয়ে যাব আর আমাদের সবার জন্য কিছু কাপড় জামা।

অর্থাৎ, আমি বাধা দিয়ে বললাম, নরেন ভট্টাচার্য ও আপনি দাদাদের কাপ্তিপদায় নিয়ে গিয়েছিলেন, বৈপ্লবিক কাজের জন্য নরেন চলে এলেও আপনি দাদাদের সঙ্গেই ছিলেন এবং বরাবর তাঁদের সঙ্গেই থাকবেন। কখনই ধরা দেয়া নয়, পুলিশ যদি আসে, তাহলে আপনিও দাদাদের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে যোগ দিয়ে প্রাণ নেবেন এবং প্রয়োজনে প্রাণ দেবেন, এটাই ছিল সিদ্ধান্ত। তাই না নলিনীবাবু ? আর একটি দিন আগে যদি আপনি কলকাতা থেকে বেরোতে পারতেন, তাহলে হয়ত আপনি ওঁদের সরিয়েই ফেলতে পারতেন নিরাপদ আশ্রয়ে কিংবা ঐ পঞ্চবীরের নামের সঙ্গে আরও একটি নাম সংযোজিত হত—

সেটাই আমার জীবনে সব চাইতে বড় দুঃখ, গভীর স্বরে উনি বললেন, ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থেকে ঠিক চরম মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে উনি জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন।

পাশে টিপয়ের ওপর পরিচারক এক সময় এসে চা রেখে গিয়েছিল, আমি কাপ তুলে নিলাম।

লোহার গেটওয়ালা দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি বড় বাড়ীর বসবার ঘরে বসে আমরা কথা বলছিলাম। ঘরখানা অর্ধ বৃত্তাকার, সারি সারি কাঁচের জানালা। ওঁর একটি নিকট আত্মীয়ের বাড়ী। আত্মীয়টি ব্যারিস্টার। মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্য পৃথক সাজানো ঘর আছে। এঘরে আমরা দুজন।

চা খেতে খেতে ভাবছিলাম। সাতাশ বৎসর বয়েসে বুড়ীবালাম নদীর তীরে সম্মুখ যুদ্ধে ওঁর মন্ত্রগুরু বিপ্লবী নায়ক বাঘা যতীনের পাশাপাশি থেকে আত্মদান করতে পারেননি বলে ওঁর মনে গভীর দুঃখ। জীবন দিতে না পারার দুঃখ। আজ এই সাতাশী বৎসর বয়সেও সে দুঃখ কাঁটার মতো বিঁধছে।

আমি বললাম, আপনি বেঁচে থাকুন, সেটা বোধ হয় ভগবানেরই ইচ্ছা ছিল। বেঁচে গিয়েছিলেন এবং বেঁচে আছেন বলেই, যে দেশের স্বাধীনতার জন্য ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে, সেই দেশকে দেখতে পেলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এও কি কম ভাগ্যের কথা?

উনি ধীরে ধীরে বললেন, সেই কথা ভেবেই সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা নলিনীবাবু, আপনি টাকা আর জামাকাপড় নিতে ১ সেপ্টেম্বর রওনা হয়ে ২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এলেন, যাদুদার কাছ থেকে টাকাও পেয়ে গেলেন, জামাকাপড়ও জোগাড় করা হয়ে গেল, তাহলে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেরী করলেন কেন? কেন ৩/৪ তারিখেই রওনা হলেন না?

এবার হেসে ফেললেন নলিনীবাবু, শুনুন তাহলে। আমার ছিল হাইড্রোসিল। যাদুদাকে বলেছিলাম অপারেশনের ব্যবস্থা করে দিতে। আমি কলকাতা যেতেই উনি একশো টাকা দিলেন আর বললেন, টাকাটা মণীদার নামে ইনসিওর করে পাঠিয়ে দাও, তুমি যাও চন্দননগরে। তোমার হাইড্রোসিল অপারেশনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ওটা হয়ে যাবার পর কাপ্তিপদায় ফিরে যেও।

গেলাম চন্দননগরে, উঠলাম মতিলাল রায়ের বাড়ীতে। ফেরারী অমরেন্দ্র চাটার্জির সঙ্গে দেখা হল।

দু'তিন দিন পর ওখানেই কাগজে পড়লাম যে ৫ সেপ্টেম্বর ইউনিভারসাল এম্পোরিয়াম সার্চ করে পুলিশ শৈলেশ্বর ও নিতাইকে গ্রেপ্তার করেছে।—ব্যস, এই খবর দেখার পর আর কি দেরী করা যায়? ৯ তারিখ ট্রেনে চাপবার আগে যাদুদা ব্যস্ত হয়ে এসে আমায় বললেন, দাদাদের ওখানে রাখা ঠিক নয়, তুমি আজই চলে যাও, ওঁদের কলকাতা নিয়ে এস। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

উনি আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

একটু পর বললাম, আচ্ছা নলিনীবাবু, এবার আমি আপনাকে ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন করি, আপনি ছোট কথায় জবাব দিন। তবে ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ী তো, ভাববেন না যে, জেরা করছি।

উনি হাসলেন, না না, জেরা মনে করবো কেন? জিজ্ঞেস করুন।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা নলিনীবাবু, আপনার বয়স সাতাশী বৎসর বলছেন, জন্ম সন তারিখ মনে আছে কি?

জবাব দিলেন, বাংলা তারিখ মনে আছে। ১০ চৈত্র, ১২৯৫ সাল। ইংরেজী ১৮৮৮ সালের মার্চের কোন দিন হবে—

হেসে বললাম, আমারও জন্ম চৈত্রের ৪ তারিখ, মানে মার্চের আঠারো। চার যদি আঠারো হয়, তাহলে দশ হবে চব্বিশ, তাই না?

তা হবে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোন্ সালে জন্ম?

হেসে ফেললাম, সে কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। আমার একগাছি চুলও

কালো না থাকলে কি হবে, আমি আপনার চাইতে বিশ বছরের ছোট। কিন্তু আপনি তো সাতাশী প্রায় সাত মাস আগে পার হয়ে এসেছেন। অষ্টাশী চলছে বলুন।

উনি কিছু বললেন না।

আমি বললাম, আমার পরের প্রশ্ন, আপনার আদি নিবাস?

গ্রাম এতলামপুর, থানা কুমারখালি, মহকুমা কুষ্টিয়া, জেলা নদীয়া।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর মামাবাড়ী কয়া গ্রামে থাকতেন, কয়া গ্রাম কি আপনার এতলামপুরের কাছে?

বললেন, গড়াই নদীর একদিকে আমাদের গ্রাম, ওপারে কয়া। নদী পার হয়ে পাঁচ ছয় মাইল।

আপনার কর্মকেন্দ্র প্রধানতঃ কোথায় ছিল নলিনীবাবু?

কলকাতা ও কাপ্তিপদা।

আপনি কি স্বাধীনতা-সংগ্রামীর সরকারী পেনসন পেয়েছেন?

দরখাস্ত করিনি।

তাম্রপত্র পেয়েছেন?

না।

আপনি কোন রাজনৈতিক ডাকাতি বা হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

হাসলেন, একবার ডাকাতি করবার জন্য আমরা ক'জন ওৎ পেতে বসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত হল না সেটা। তাই অনুল্লেখ্য।

আমার পরের প্রশ্ন, আপনি কোন্ দলে কাজ করেছিলেন, অনুশীলন অথবা যুগান্তর?

নলিনীবাবু বললেন, প্রথম অনুশীলন, তারপর অনুশীলন ছেড়ে চলে এলাম। না না, যুগান্তর নয়, দাদা যতীন্দ্রনাথের দলে। দাদা কোন দল-টলে ছিলেন না। নিজেই তিনি যেন একটি দল, একটি মহা শক্তিশালী চুম্বক, চুম্বকের টানে বিপ্লবীরা তাঁর কাছে আসত, তাঁকে ঘিরে থাকত, তাঁর নির্দেশে কাজ করবার জন্য এগিয়ে যেত, সেই চুম্বকের টানে একবার এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করত না। যুগান্তর নাম তখনও সৃষ্টি হয়নি। যেমন ছিল বারীন ঘোষের দল। অনুশীলন নয়, এই পর্যন্ত।

বেশ। তাহলে আপনাদের সেই দলের কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবীর নাম বলুন।

উনি বললেন, আমাদের দাদার নাম বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপর নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন দত্ত প্রভৃতি।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা নলিনীবাবু, কাপ্তিপদায় আপনার একার একবার এবং পরে দাদাদের নিয়ে আত্মগোপন করবার ব্যাপারে মণীন্দ্র চক্রবর্তীর নাম

বার বার পাওয়া যাচ্ছে। এই মণিবাবু কি আপনাদের দলের কর্মী? তিনি গোপাল রায়ের নামে জমি লিখে রেজিস্ট্রী করিয়ে দিলেন, মহুলডিহা তাঁরই মৌজা—কিন্তু সেই ভদ্রলোকের পরিচয় কি?

শুনুন তাহলে। নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, ক্ষুদ্র কাপ্তিপদা দেশীয় রাজ্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত ও শাসনাধীন। মণিদার বাবা রাধানাথ চক্রবর্তী ছিলেন ময়ূরভঞ্জে অন্যতম পুলিশ ইনস্‌পেক্টার। কাপ্তিপদার রাজার অযোগ্য শাসনের ফলে ওখানে নানা আর্থিক সংকট দেখা দেয়। ময়ূরভঞ্জের রাজা তখন রাধানাথ চক্রবর্তীকে ওখানকার ম্যানেজার করে পাঠান। তাঁর চমৎকার শাসনে কাপ্তিপদার আর্থিক সংকট ও অরাজকতা দূরীভূত হয়ে যায়। রাজা তখন খুশী হয়ে ওঁকে ঐ মহুলডিহা মৌজাটি দিয়ে দেন।

মণিদা বাবার একমাত্র সন্তান। পড়তেন দাদপুর হাইস্কুলে বিপ্লবী দেবীপ্রসাদ রায়ের দাদার সঙ্গে। বাবার মৃত্যুর পর বাধ্য হয়েই মণিদাকে মহুলডিহার বাড়ীতে গিয়ে বসবাস করতে হল এবং জায়গাজমি দেখাশোনার সম্পূর্ণ ভার নিতে হল।

পরে দেবীপ্রসাদ যখন ইনসিওরেন্স এজেন্টের কাজ করে, তখন সে মাঝে মাঝে মহুলডিহায় মণিদার ওখানে যেত ও থাকত ইনসিওরেন্সের কাজে। সে-ই মণিদাকে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করে তোলে। খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি, অনেক রকমে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন, কিন্তু পুলিশ এতটুকু টের পায়নি।

বললাম, তাহলে তো বোধ হয় বুড়ী বালামের যুদ্ধের পরও পুলিশ জানতেই পারেনি আপনারা কি করে ওখানে ঐ জঙ্গলের মধ্যে আস্তানা তৈরী করেছিলেন।

না, পুলিশ পরে সন্দেহ করেছিল—নলিনীবাবু বললেন, ওঁকে গ্রেপ্তার করে প্রায় তিন বছর আটকে রেখেছিল। কিন্তু কোনো মামলা করতে পারেনি। তখন বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেয়।

বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

বুড়ো মানুষ, এখন ওঁর নিয়মমত স্নানাহার ও পরে বিশ্রামের সময়।

উঠলাম, বললাম, আজ এই পর্যন্ত। আবার আসব।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, উনি বললেন, এসব পুরোনো কথা খুব কম লোকই জানতে আসে। আপনি সেই কম লোকদের মধ্যেই একজন উৎসাহী শ্রোতা—

—আচ্ছা চলি, নমস্কার।

কাঁচের দরজা উনিই খুলে দিলেন।

(২)

ফোনে তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করা ছিল। সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে পেঁছব বলেও বলেছিলাম, চেষ্টা করব আটটাতেই যেতে।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটাতে অর্ধ বৃত্তাকার বসবার ঘরের কাঁচের দরজার কাছে যেতেই ভেতর থেকে ছিটকিনি খুলে দিলেন নলিনীকান্ত কর। ধুতি পাঞ্জাবি পরণে, হাতে লাঠি।

বলে উঠলাম, এ কি, বেরিয়ে যাচ্ছেন নাকি ?

না না, বেড়িয়ে এলাম ঃ বললেন উনি—রোজ সকালে লেকের ধারে মাইলখানেক ঘুরে আসি। এই ফিরলাম।

বসবার ঘরে আরও দু'একজন ভদ্রলোককে দেখলাম।

নলিনীবাবু বললেন, চলুন, আমরা ভেতরে যাই।

ওঁকে অনুসরণ করলাম।

কয়েকখানা ঘর পার হয়ে পেছন দিকে যে ঘরে এসে বসলাম, মনে হল ওটাই ওঁর শয়নকক্ষ। আমি বসলাম টেবিলের সামনে চেয়ারে, উনি খাটে।

এবার প্রশ্ন।

জিজ্ঞেস করলাম, যেসব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করে আপনি বিপ্লবীদলে যোগদানের অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তার মধ্যে কয়েকখানার নাম মনে আছে কি ?

মনে থাকা না-থাকার প্রশ্নই আসে না কারণ উনি স্পষ্ট জবাব দিলেন—কোন বই বা পত্রিকা পড়ে আমি অনুপ্রেরণা পাইনি, একখানাও পড়িনি। বাইরের বই তো দূরের কথা, পাঠ্য বইয়েরই ধারপাশ দিয়েও খুব কমই যেতাম। ছোট বেলাতেই মেতে উঠেছিলাম লাঠি খেলায়, কুস্তিতে। ভবিষ্যতে স্বদেশী করবার মতলবে নয় ; কিন্তু, স্রেফ ঔৎসুক্য বশতঃ আর স্বাস্থ্য ভাল করাও উদ্দেশ্য ছিল। এসব ব্যাপারে আমার বাল্যকালের সাথী ছিল আমার নিকট আত্মীয় অতুলকৃষ্ণ ঘোষ।

ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বলুন দয়া করে—আমি বললাম।

উনি বলতে লাগলেন, সে যুগে প্রধানত মুসলমানরাই লাঠি খেলত। বিশেষ করে মহরমের সময় ওরা জমিদার বাড়ীতে যে ঘটা করে লাঠি খেলা দেখাত, খুব ভাল লাগত আমার। দেখতাম মুসলমানদের সঙ্গে একজন হিন্দুও লাঠি খেলত। নাম আজও মনে আছে, মথুরদাস বৈরাগী। হিন্দু হয়ে মুসলমানের কাছে লাঠিচালনা শিক্ষা করা সে যুগে গ্রামে চল ছিল না।

অতুলকে বললাম, মথুরদাসকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয় ?

মথুরদাস অতুলের কথায় রাজী হয়ে গেল।

আমরা লাঠিচালনা শিখতে লাগলাম।

আরও বন্ধু ও সহপাঠী আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

আরও খবর পেলাম, মাইলখানেক দূরে আগরাকুণ্ডু গ্রামে ইয়াকুব শেখ নামে একটা লোক চমৎকার কুস্তি করে, কাউকে কাউকে শেখায়ও।

ব্যস, সেখানে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমি পড়ি কুমারখালি স্কুলে সে যুগের ফোর্থ ক্লাশে আর অতুল পড়ে মাইনর স্কুলের ফার্স্ট ক্লাশে। বাড়ী থেকে ছয় মাইল যাতায়াত করে স্কুলে যাই। কিন্তু লাঠি খেলা ও কুস্তি সম্বন্ধে উৎসাহের প্রাবল্যে পড়াশুনায় ভাটা পড়তে লাগল। সেটা ১৯০৫ সাল। আমার বয়স সতেরো। অতুলের পনেরো। বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আমাদের গ্রামাঞ্চলেও সভাসমিতি হতে লাগল। সেই সব সভার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহ না থাকলেও কোন নেতার জন্য সভার ব্যবস্থা করা ও ভলণ্টিয়ারী করায় আমার প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। বই-টইয়ের ধারে পাশে কমই ঘেঁসতাম।

তবুও প্রমোশন পেলাম। থার্ড ক্লাশে উঠলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা নলিনীবাবু, যাঁর সঙ্গে আপনি ছায়ার মতো লেগে ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি দিন দেরীর জন্য যাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ-ফাইটে যোগদানের সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি, সেই অবিস্মরণীয় শহীদ যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হয়েছিল কবে, কোথায় এবং কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল?

হঠাৎ যেন চুপ করে গেলেন নলিনীবাবু। আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বটে, কিন্তু বুঝতে পারছি সে দৃষ্টি শূন্য। স্মৃতির গভীরে মন তলিয়ে গেছে। দাদার কথা বলতে গেলেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যান, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, মাঝে মাঝেই কথার খেই হারিয়ে যায়।

একটু পর বলতে লাগলেন, ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাস হবে। আমার বয়স উনিশ। আমাদের গ্রামের হাটে সন্ধ্যার পর ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম; এর ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় আমার অন্যতম সহপাঠী হেমেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এসে বলল—শোন্ নলিনী, আমাদের বাড়ীতে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসেছেন, তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন—

আমার সঙ্গে! বিস্মিত হলাম। আমি কি এমন একটা ছেলে—স্কুল পালিয়ে লাঠি খেলতে যাই, কুস্তি লড়তে যাই—আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের কি দরকার?

যাই হোক, অনিচ্ছার সঙ্গেই হেমেনের সঙ্গে গেলাম তাদের বাড়ীতে। গিয়ে দেখি, ধুতি পাঞ্জাবি পরা দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক, বয়স ত্রিশের নীচে তো নিশ্চয়ই, হাতে একখানা বেড়াবার লাঠি। বেশ বেমানান মনে হল।

হেমেন পরিচয় দিল, এরই নাম নলিনী কর।

কিন্তু উনি যে কে, তা কিছু বলল না।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, চল্, খেয়াঘাট পর্যন্ত যাই।

যেতে যেতে আমায় প্রশ্ন করে জেনে নিলেন যে আমি লাঠি খেলি, কুস্তি লড়ি, ঝোপজঙ্গল পরিষ্কারের কাজে ভলান্টিয়ারী করি, বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের সভায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করি। তারপর বললেন—উঃ, সে কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। বললেন—আমার কাঁধে হাত রেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে, দেশের যুবকদের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, তবে সেই সঙ্গে মানসিক শক্তির অনুশীলনও অত্যাবশ্যক।

ঘাটে এসে গেলাম। ঢালু পাড় বেয়ে নীচে নামবার আগে বললেন, গীতাখানা পড়িস।—আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবে।

পাড় বেয়ে নামতে লাগলেন লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে।

নৌকোয় উঠলেন। নৌকো ছেড়ে দিল।

আমার এক বন্ধু পরে আমায় বলল, উনিই হচ্ছেন জ্যোতীন মুখার্জী। কয়ায় বাড়ী। কিছুদিন আগে ভোজালি দিয়ে একটা বাঘ মেরেছেন। বাঘটা হাঁটুতে থাবা মেরেছিল। ঘা এখনও সারেনি, তাই খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

হেমেন কি স্বদেশী করত? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না, না—নলিনীবাবু বললেন, দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েই সে চলে যায়।

এমন সময় পরিচারক ট্রেতে চা ও জলখাবারের প্লেট এনে টেবিলে রেখে গেল।

বললাম, তাহলে সেই দিন থেকে আপনি দাদার দলে যোগদান করলেন?

না, না—উনি বলে উঠলেন, বলেছি তো আগে অনুশীলন, তারপর দাদার দল।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন।

আসছি। বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আমি চায়ের কাপ তুলে নিলাম।

আজ দ্বিতীয় দিন ওঁর কাছে এসেছি।

বিপ্লবীদের জীবনের কত না অজানা ঘটনা, অজানা কথা শুনেছি। দুদিন কেন, মনে হয় মাসখানেক শুনলেও সব শোনা হবে না। আত্মজীবনীর মতো উনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যা লিখে রেখেছেন, সেই মোটা খাতাগুলি আমি পড়েছি। তাতে কত না ঘটনা, কত না বিবরণ, উপন্যাসের মতোই থ্রিলিং। মন টেনে রাখে, পড়া সুরু করলে শেষ না করে ছাড়া কঠিন। যদি সুবিধা থাকত, পুরো পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতাম কোন পত্রিকায়।

নলিনীবাবু ফিরে এলেন।

প্রশ্ন করলাম, অনুশীলনে কে আপনাকে নিয়ে গেল নলিনীবাবু ?

কেউ না। আমি নিজেই গিয়ে হাজির হলাম।

বলেন কি! বিস্মিত হয়ে বললাম, বলুন তো সেই হাজির হবার কাহিনী।

নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, ১৯০৮ সালের ২ মে মাণিকতলা বাগানে পুলিশ একদল ছেলেকে গ্রেপ্তার করল। ওরা নাকি বোমা রিভলভার দিয়ে ইংরেজদের হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছিল, ওদের নেতার নাম বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। সংবাদপত্রে এদের দৈনন্দিন খবরাখবর বেরুতে লাগল আর আমি অনুপ্রাণিত হতে লাগলাম। কেবলই মনে হতে লাগল আমিও তাই করব, বোমা রিভলভার দিয়ে ইংরেজ হত্যা করে আমার দেশকে স্বাধীন করব। কিন্তু কোথায় পাব এই রকম দলের সন্ধান ?

অতুল তখন কলকাতায় হিন্দু স্কুলে পড়ে।

লিখলাম তাকে সব খুলে। জানালাম মনের কথা।

অতুল লিখল, তুই কলকাতায় চলে আয়, পরে দেখা যাবে।

কলকাতায় থাকব কোথায় ? অতুলদের বাড়ীতে হবে না। ওর বড়দা কিরণচন্দ্র ঘোষ তখন আমাদের কুমারখালি হাই স্কুলের থার্ড মাস্টার। কলকাতার বাসায় অবশ্য ওর মেজদা ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ থাকেন। তবুও বড়দার কাছ থেকে মেজদা কি আমার লেখাপড়ায় অনীহা, লাঠি ও কুস্তির প্রতি তীব্র আসক্তি, ভলাণ্টিয়ারী করা আর ফুটবল খেলাই প্রধান কর্ম—এই সব গুণগরিমার কথা শোনেননি ?

তাহলে কোথায় যাব ?

ওদিকে স্বদেশী দলে যোগদানের ইচ্ছা তখন প্রবল।

অবশেষে বিনা টিকিটেই কলকাতার ট্রেনে উঠে বসলাম। সঙ্গে জামা কাপড়ের পুঁটলি, তার মধ্যে আবার একটি ছোট অকেজো রিভলভার—

রিভলভার! বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, তাও আবার অকেজো ? স্বদেশী দলে যোগ দেবার আগেই রিভলভার কোথা থেকে পেলেন ?

নলিনীবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, কুমারখালির মোক্তার অমরনাথ মৈত্রের কাছে এই লাইসেন্সবিহীন রিভলভারটি ছিল। তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন জানি না! ধরপাকড় সুরু হয়ে গেলে উনি ওটা মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন; তাতেই মরচে ধরে ওটা বিকল হয়ে যায়। পরে উনি ওটা ওঁর ভাইপো প্রবোধকে দিয়েছিলেন নদীতে ফেলে দেবার জন্য। সেও ওটা মাটির নীচে পুঁতে রাখে। একদিন আমার কাছে গল্প করায় আমি ওটা চেয়ে নিই।

অকেজো রিভলভারে কি কাজ হবে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

শুধু অকেজো ? উনি হেসে উঠলেন—একটিও বুলেট নেই। তবুও স্বদেশীওয়ালাদের বোমা রিভলভারের খবর কাগজে পড়েছিলাম, তাই মনে হত

রিভলভার—তা সে আস্তই হোক আর ভাঙ্গাই হোক, ওটা কাছে থাকলেই মনের জোর বাড়বে।

তারপর ?

তারপর—নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমাদের গ্রামের সোমনাথ ও গোপাল চক্রবর্তীদের বাসা পেয়ে সেখানে উঠলাম।

পরদিনই হিন্দু স্কুলে গিয়ে দেখা করলাম অতুলের সঙ্গে।

সে আমায় ৭ নম্বর ডাফ স্ট্রীটে অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে নিয়ে গেল। উনি হিন্দু স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। অতুল আমার পরিচয় দিল—গরীবের ছেলে, পয়সার অভাবে পড়া হচ্ছে না, থাকবারও জায়গা নেই।

উনি ভরসা দিলেন। কিন্তু ওঁকে তখনই দেশের বাড়ীতে যেতে হল শারীরিক কারণে। মাসখানেক পর ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করে দেবেন বলে গেলেন।

আবার পথে এসে পড়লাম। কোথায় যাই ?

যামিনীকান্ত মজুমদারকে দেখেছিলাম অরবিন্দবাবুর ওখানে আর শশীভূষণ রায়চৌধুরীকে। অরবিন্দবাবুই আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

হঠাৎ যামিনীবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। উনি আমার দুর্দশার কথা শুনে 'শ্রীপতি-আশ্রম'-নামীয় বোর্ডিং-এ আমার খাবার ও থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপরই বুঝি অনুশীলন সমিতির অফিস খুঁজে বার করলেন ?

উনি হাসলেন—বললেন, হ্যাঁ, তাই করলাম। ওঁদের অফিস তখন ছিল ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ীটার দোতলায়। সোজা দোতলায় গিয়ে সংগঠক ও নেতা সতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমি সমিতির সভ্য হতে চাই। তখনকার নিয়ম ছিল কোন সভ্যের সুপারিশ ছাড়া কাউকে সভ্য করা হয় না। সতীশবাবু পাশের ঘরে যাঁর কাছে পাঠালেন, পরে তাঁর নাম জেনেছিলাম লাডলিমোহন মিত্র। তিনি আমায় ঐ নিয়মের কথা বললেন। মহা মুশকিলে পড়লাম। এমন সময় আর একটা ঘরে যেন শশীদার কণ্ঠ শুনতে পেলাম। লাডলিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, ওঘরে শশীদা কথা বলছেন না ?

লাডলি বললেন, হ্যাঁ, উনিই তো। তুমি ওঁকে চেন নাকি ?

খুব চিনি।

ব্যস, আর অসুবিধা রইল না। শশীদার সুপারিশে অনুশীলন সমিতির রেজিস্টারে আমার নাম উঠল। পরদিন থেকে সমিতির ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম সুরু করলাম। লাঠি খেলা, কুস্তি, ছোরাখেলা—

কিন্তু নলিনীবাবু, আমি বাধা দিয়ে বললাম—আমি তো জানি, অনুশীলনের

সভ্য হতে হলে গীতা মাথায় করে ও রিভলভার হাতে নিয়ে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র—

না, না—উনিও বাধা দিলেন, সেসব নিয়ম হয়েছিল পরে।

সেই পিস্তলটা কি করলেন?

যামিনী নিয়ে নিলেন।

সেটা কোন্ সাল?

১৯০৮ সালের মাঝামাঝি হবে। সমিতির সেক্রেটারী পুলিন মুখার্জী ব্যবস্থা করে দিলেন বাগবাজারে এক এ্যাটর্নীর বাড়ীতে খাব আর থাকব সমিতির অফিসে। আমি হোলটাইম ওয়ার্কার হয়ে গেলাম। সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত তাজউদ্দীন আমাদের কুস্তি শেখাত।

আমার চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, এবার খাবারের প্লেট তুলে নিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বন্ধু অতুল ঘোষ কি তখন অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছেন?

ওর দাদা অনুশীলনের সভ্য ছিলেন, ও দাদার সঙ্গেই থাকত; তাই অতুলও সমিতির সভ্য হয়েছিল নিশ্চয়ই।

অনুশীলনের তো সভ্য হলেন বুঝলাম, আমি বললাম—কিন্তু সেই সমিতি যাতে নিজে থেকে যোগ দিয়েছিলেন এবং যার সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন, সেই অনুশীলন সমিতি কেন ছাড়লেন—এবার তাই বলুন।

উনি হাসলেন—না, না, অনুশীলনের কারুর সঙ্গে আমার কোনদিন কোন মতান্তর হয়নি, আমি নেতাদের আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতাম এবং তাঁদের নির্দেশ মেনে চলতাম। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, যতীনদাদা ডাকলেন; সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলাম না।

অনুরোধ জানালাম, একটু বিশদভাবে বলুন।

নলিনীবাবু বলতে লাগলেন, ১৯০৯ সালে এনট্রান্স পাশ করে অতুল গেছে বাড়ীতে। আমায় লিখল ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনীগ্রন্থ দুখানা নিয়ে যেতে। যাব যাব করছি, এমন সময় আর্টিস্ট ও দাদার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীল অমরেশ কাঞ্জিলাল এসে আমায় বললেন—দাদা শনিবার বাড়ী যাচ্ছেন, রবিবার তোমায় কয়াতে ওঁর বাড়ীতে দেখা করতে বলেছেন।

আমি সেদিনই বাড়ী গেলাম এবং রবিবার সকালে মাইল ছয়েক দূরে কয়া গ্রামে দাদার বাড়ীতে গেলাম অতুলকে সঙ্গে নিয়ে। দাদার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম। দাদা দুপুরে খেয়ে যেতে বললেন। আমরা গেলাম গড়াই নদীতে স্নান করতে। অতুল বলল, আমি জানি দাদারও একটা দল আছে।

কলকাতায় এসে দাদা থাকতেন তাঁর মামা ডাঃ হেমন্ত চাটার্জির চিৎপুর রোডের বাড়ীতে। সেখানে দাদার কাছে ঘনঘন যাতায়াত সুরু করলাম।

তারপরই হঠাৎ হেসে উঠলেন নলিনীবাবু।

জিজ্ঞেস করলাম, হাসলেন যে ?

বললেন, জেনেছেন আমি লাঠিয়াল ছিলাম, কুস্তিগীর ছিলাম, বোমার দলে কাজ করব বলে নিজেই বাড়ীঘর ছেড়ে এসে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার লেখাপড়া ? সে যে সেই কুমারখালি স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত এসেই ধামা চাপা পড়েছিল—

বললাম, তাতে আর কি হয়েছে ?

না, না, হয়নি কিছুই। উনি আবার হাসলেন—কিন্তু সেই ধামাটা কি করে সরে গেল, তাই শুনুন। কলকাতায় আমি কুচবিহার মহারাজার ফুটবল দলের বি টিমে খেলতাম। একদিন এ টিমের হাফ ব্যাক না আসায় কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছাসত্ত্বে আমাকেই নামায়। আমার খেলা এত ভাল হয় যে, রাজা তাই শুনে আমার লেখাপড়ার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হন। ফলে, সেই ধামাটা সরে যায়। আমি ম্যাট্রিক পাশ করলাম, আই. এস.সি পাশ করলাম, বি. এস.সি-তে ভর্তি হলাম।

১৯০৯ সালেই অনুশীলন সমিতি গভর্ণমেণ্ট নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। ওর অফিস তল্লাসী করে কাগজপত্র, রেজিস্টার যা পাওয়া গেল পুলিশ নিয়ে গেল।

একজন পরিচারিকাকে দরজার কাছে আসতে দেখেই নলিনীবাবু বলে উঠলেন, ও—আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এখখুনি আসছি। তারপর হেসে বললেন—নাতনী স্কুলে যাবে, তার ভাতটা আমি মেখে না দিলে খাবে না সে।

হাসতে হাসতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নলিনীবাবু অকৃতদার, অথচ তাঁর নাতনী আছে। হয়তো ভাইয়ের নাতনী কিংবা হয়তো ভাগ্নীর মেয়ে। আমাদের ভারতীয় পরিবারের এটাই ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য। আমি বিবাহ না করলে কি হয়, আমার একান্ত ব্যক্তিগতভাবে সৃষ্টি-করা কোন পরিবার না থাকলে কি হয়, আমার নিকট ও দূর আত্মীয়-স্বজন, আমার প্রতিবেশী সবাই যেন আমার পরিববারের অন্তর্ভুক্ত। দুই বাহু বিস্তার করে এদের সবাইকে আমার বুকে টেনে আনতে চাই। চিরকুমার হলেও আমি একক নই, একক থাকতে চাই না। সবার সুখদুঃখের সঙ্গে আমার হাসিকান্না অটুট বন্ধনে আবদ্ধ।

ঘড়ি দেখলাম। দশটা বেজে গেছে। পুরো দু ঘণ্টা ধরে অনর্গল বলে যাচ্ছেন সাতাশী বৎসরের বৃদ্ধ। লেক থেকে প্রাতর্ভ্রমণ করে এসে পোশাকটা পর্যন্ত বদলান নি। সেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই বসে আছেন। সে যুগের কথা বলতে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, কেশে উঠছেন। মাঝে মাঝেই উত্তেজনাবশে প্রসঙ্গ ভুলে যাচ্ছেন, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

ঘরের দেয়ালে কখানা বড় বড় ফটো—কাদের জানি না। ওপরে একখানা

যতীন্দ্রনাথের। চেহারায় তাঁর অসাধারণত্ব উল্লেখযোগ্য এমন কিছু নেই। নরেন ভট্টাচার্যের মতো তাঁর উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি নয়, আবার এই নলিনীবাবুর মতো পাঁচ ফুট আড়াই ইঞ্চিও নয়। শরীরের মাংসপেশীগুলো চামড়া ফুটে বেরিয়ে নেই, বুকের পরিধিও এমন আটচল্লিশ ইঞ্চি নয়। যাঁরাই তাঁকে দেখেছেন তাঁরাই বলেছেন, সাধারণ দোহারা চেহারা। ফর্সা তো নয়ই, বরং শ্যামবর্ণ বলা যায়। বাকপটু দূরের কথা বরং বলা যায় স্বল্পভাষী। কিন্তু—

কিন্তু অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ তাঁর সাহস এবং অসাধারণ তাঁর মিষ্ট ও দরদী আচরণ।

যুদ্ধ করতে হলে প্রথমেই কি প্রয়োজন হয় কব্জির জোর? আমার কিন্তু মনে হয়, তারও আগে প্রয়োজন সাহস। যে বাঘটিকে একখানা সাধারণ ছোরা দিয়ে তিনি খতম করেছিলেন, সেই বাঘটির চাইতে ওঁর কি বেশী গায়ের জোর? আমার মনে হয়, ওঁর সাহস বেশী। হ্যাঁ, হিংস্র শার্দুলের চাইতেও বেশী। বাঘ ভাবতেই পারেনি দুনিয়ায় এমন একটি মানুষ আছে, যে তার চাইতেও অনেক, অনেক বেশী সাহসী!

তাই দেশের মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসার দেওয়া নাম—বাঘা যতীন।

যেমন—পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং।

যেমন—রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক।

যেমন—দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, দেশগৌরব!

নলিনীবাবু ফিরে এসে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি যেন বলছিলাম?

আপনার অনুশীলন সমিতি ছেড়ে দাদার দলে চলে আসার—

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, উনি শুরু করলেন—দাদা একদিন বললেন, জনতাকে জাগাতে না পারলে শুধু কিছু শিক্ষিত ছেলে দিয়ে বিপ্লব সম্ভব নয়। গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাতে হবে। আত্মোন্নতি সমিতির বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে আমরা মেস করেছি শোভারাম বসাক লেনে। স্কুল কলেজ ছেড়ে দিয়ে যারা হোমিওপ্যাথি পড়বে, তারা থাকবে। তারা পরে গ্রামে যাবে। কিন্তু যাবে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতে। ডাক্তারী যারা পড়বে, তাদের মধ্যে তোর নামও আছে। তুই পারবি অনুশীলন ছেড়ে আসতে?

ব্যস, চলে এলাম শোভারাম বসাক লেন-এর মেসে। অতুলও ছেড়ে দিল অনুশীলন।

৫।৬ মাস পর দাদার নির্দেশে আত্মোন্নতির সঙ্গে আর মেস রইল না। গৌরমোহন মুখার্জী লেনে আমাদের একার মেস খোলা হল। তখন দাদার বলতে গেলে দক্ষিণ হাত—সতীশচন্দ্র সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল, ফণিভূষণ রায় আর আমি ওখানে ছিলাম। অতুল আগেরই মতো তার দাদার সঙ্গে থাকত।

মাঝে মাঝে আসতেন দেবীপ্রসাদ রায়, যতীন রায়, জ্যোতিষ মজুমদার আর সতীশদার বন্ধুরা।

আচ্ছা নলিনীবাবু, আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কখনও ফেরারী হয়েছিলেন?

উনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, দু'বার—

দু'বার?

হ্যাঁ দু'বার। নলিনীবাবু বললেন, বুড়ীবালামের তীরের ঘটনার পরই অনেককেই গা ঢাকা দিতে হয়। আমরা তিনজন—অতুল, যাদুদা (যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়) ও আমি একসঙ্গে ১৯১৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতা ছেড়ে প্রথমে গিয়ে উঠলাম চন্দননগরে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আস্তানায়। তিনিও তখন ফেরারী।

ওখান থেকেই অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলাম যাদুদা ও আমি।

ছয় বৎসর পর ১৯২১ সালে গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করার পর যাদুদা আর আমি ফ্রি সিটিজেন হিসেবে বেরিয়ে এলাম।

এই ছয় বৎসর সর্বদাই আপনি ও যাদুদা একসঙ্গে ছিলেন?

হ্যাঁ।

বেশ, সেই দীর্ঘ কাহিনী আর একদিন শুনব। আমি অনুরোধ জানালাম, আজ বলুন আপনার একক আত্মগোপনের কাহিনী।

উনি সুরু করলেন, ১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারী বিপ্লবী বীরেন দত্তগুপ্ত সামসুল আলমকে হত্যা করল। ২৯ জানুয়ারী পুলিশ দাদাকে গ্রেপ্তার করল তাঁদের চিৎপুর রোডের বাড়ী থেকে। সতীশদা বীরেনকে সামসুল হুদাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গা ঢাকা দিলেন। আরও, দেবীপ্রসাদ রায়কে (ওরফে খুড়োকে) দিয়ে আমায় খবর পাঠালেন সরে পড়তে। আমার তখন বাইশ বৎসর বয়স।

খুড়ো আমায় ৩০ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেসের ওপরতলার মেসে নিয়ে গেল। সেখানে খুড়োর সঙ্গে তার বন্ধু গুণেন ঘোষও থাকতেন।

দিন সাতেক পর হঠাৎ ঐ মেসে একজন নতুন বোর্ডার এলেন, তাঁর চালচলন সন্দেহজনক মনে হল। সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়লাম। পরদিন খুড়ো ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে পাঠিয়ে দিল নদীয়া জেলার দাদপুর গ্রামে। বেথুয়াডহরী স্টেশন থেকে দাদপুর ৪।৫ মাইল দূরে। প্রায় এক মাস ছিলাম।

একদিন ঐ গ্রামে একটা নাটক হচ্ছে, আমিও দর্শকদের মধ্যে বসে আছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, শ্যামেশ নামে একটি গ্রাম্য ছেলের আমার সম্বন্ধে দারুণ ঔৎসুক্য ও কৌতুহল—আমি কোথা থেকে এসেছি, কি নাম, কি করি ইত্যাদি।

পরদিনই আমি কলকাতায় চলে এলাম।

সেদিন রাত্রেই গুণেন ঘোষ আমায় নিয়ে গেলেন উড়িষ্যার মহুলডিহায়। বালেশ্বর স্টেশন থেকে গরুর গাড়ীতে নীলগিরি, সেখান থেকে পনেরো মাইল হেঁটে। মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে আমায় পৌঁছে দিয়েই গুণেন ঘোষ চলে এলেন।

কয়েকদিন পর মণিদা অন্য একটা বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রান্না করে খেতাম। অর্জুন ভুঞা নামে এক শিকারীকে দিলেন, আর দিলেন একটি গাদা বন্দুক। জঙ্গলে জঙ্গলে হরিণ আর শুকর মারতাম আমরা।

মণিদাই আমার নতুন নামকরণ করলেন, গোপাল রায়। উনিই কাপ্তিপদায় গোপাল রায়ের নামে এক বিঘা চাষের জমি বন্দোবস্ত করে দিলেন। অর্জুন আমার সাথী। তাকে নিয়ে স্বহস্তে লাঙ্গল চালিয়ে ধান ফলালাম।

এখানে বহু লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সবাই জানত আমি গোপাল রায়।

মাস চারেক পর হঠাৎ সতীশ সরকার এসে হাজির। তিনিও থাকলেন।

মার অসুখের খবর পেয়ে এই পলাতক অবস্থাতেই দেশে গিয়ে তাঁকে দেখে এলাম।

সপ্তম এডওয়ার্ড মারা গেলে পঞ্চম জর্জের করোনেশন উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট স্বদেশীদের বিরুদ্ধে সব গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে আমি আত্মপ্রকাশ করলাম প্রকাশ্যে।

জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন লুকিয়ে ছিলেন?

মাস পাঁচেক হবে। উনি জবাব দিলেন।

বললাম, তারপর ১৯১৫ সালে যাদুদার সঙ্গে ছিলেন ছয় বৎসর। মোট সময় হল ছয় বৎসর পাঁচ মাস।—আচ্ছা নলিনীবাবু, আমার শেষ প্রশ্ন করছি। বিচারাধীন আসামী, কারাদণ্ডিত কয়েদী এবং রাজবন্দীরূপে আপনি মোট কত বৎসর আটক ছিলেন?

একটি দিনও নয়, তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন।

মানে? আমি বলে উঠলাম, তার মানে আপনি এ্যারেস্টই হননি কোন দিন?

উনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, পরেও যখন এ্যারেস্ট হতে পারতাম, তখন আমি খাঁটি ব্যবসায়ী, যাকে বলে ঠিকাদার; রেলওয়ে রোড এ্যাণ্ড বিল্ডিং কনট্রাক্টর—১৯২৮ সাল থেকে একটানা স্বাধীনতারও অনেক পরে একেবারে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত।

একটু পর আমি হেসে উঠলাম, আপনার কর্মজীবন থ্রিলিং, অত্যন্ত থ্রিলিং। আপনি লাঠিয়াল, আপনি কুস্তিগীর, আপনি ফুটবলার, আপনি ভাল রাঁধুনি, আপনি শিকারী, আপনি চাষীর মতো নিজের হাতে লাঙ্গল চালিয়েছিলেন, আপনি কনট্রাক্টর, আপনি যেচে গিয়ে স্বদেশী দলের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন, তারপর মাত্র একটি দিনের দেরীতে আপনি বালেশ্বরের সংগ্রাম

থেকে রেহাই পেয়েছেন; পেয়েছেন বলেই কিন্তু আজ দেশকে স্বাধীন দেখতে পেলেন। সব চাইতে থ্রিলিং, এত কাণ্ড করেছেন আপনি, অথচ কখনও এ্যারেস্ট হননি। কারণ ঠিক সময়মত সরে পড়েছেন এবং দু'বারই বেরিয়ে এসেছেন তখন, যখন গ্রেপ্তার পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়ালাম। বেলা সাড়ে এগারোটা পার হয়ে গেছে। বললাম, যদুদা ও আপনার ছয় বৎসর আত্মগোপনের কাহিনী আর একদিন এসে শুনব।

উনি আগে চললেন, আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম।

কাঁচের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললাম, নমস্কার।

উনি বললেন, নমস্কার।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মনে হল, আমি যেন সময়ের উজান বেয়ে চলে গিয়েছিলাম সেই উনিশশো পাঁচ সালের বাংলায়, তারপর ভাটিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে উনিশশো পনেরো পর্যন্ত আসতে আসতে দেখতে পাচ্ছি, সময়-নদীর ঘাটে ঘাটে কত না হীরা, চুনি, পান্না অবহেলিত হয়ে ধুলোয় পড়ে রয়েছে।

কোথায় সে প্রত্নতত্ত্ববিদ সংগ্রাহক—অবজ্ঞাত এই সব অমূল্য রত্ন তুলে এনে জাতীয় যাদুঘরে সযত্নে সাজিয়ে রাখবে?

শুদ্ধিপত্র

(১) ১২ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারা ২৪ লাইন থেকে ২৯ লাইন পর্যন্ত বাদ যাবে।

(২) ১৩ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইন "প্রথমেই আদিগুরু অরবিন্দ" বাদ যাবে।

(৩) ১৫ পৃষ্ঠায় ১৬ লাইনে 'ফ্যাড' শব্দের পর 'লাইটের' হবে।

(৪) ২৬ পৃষ্ঠায় ৩০ লাইনে 'মাসিক' শব্দের স্থানে 'নাসিক' হবে।

(৫) ৩০ পৃষ্ঠায় ১৫ লাইনে 'করছে' শব্দের স্থানে 'করেছে' হবে।

(৬) ৪৬ পৃষ্ঠায় ৭ লাইনে 'রিভলভারে' শব্দের স্থানে 'রিভলভার হবে।

(৭) ৪৮ পৃষ্ঠায় ২১ লাইনে 'সংগঠনের' শব্দের স্থানে 'সংগঠনে' হবে।

(৮) ৫১ পৃষ্ঠায় ৩১ লাইনে 'ইউনিভরিস্যাল' শব্দের স্থানে 'ইউনিভারস্যাল' হবে।

(৯) ৫২ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনে 'সাভেরিক' শব্দের স্থানে 'মাভেরিক' হবে।

(১০) ৫৩ পৃষ্ঠায় ৩, ৫, ৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২৩, ২৭ ও ২৯ লাইনে 'সাভেরিক' শব্দের স্থানে 'মাভেরিক' হবে।

(১১) ৫৮ পৃষ্ঠায় ১৪ লাইনে 'নেত্রী' শব্দের স্থানে 'নেত্রা' হবে।

(১২) ৬৪ পৃষ্ঠায় ১২ লাইনে '১৯৩২'-এর স্থানে '১৯৩৩' হবে।

(১৩) ৬৬ পৃষ্ঠায় ১৩ লাইনে 'তালিকার' শব্দের স্থানে 'তালিকায়' হবে। এবং 'পর' শব্দটি বাদ যাবে।

(১৪) ৬৯ পৃষ্ঠায় ১৬ লাইনে 'আসছে' শব্দের পর দাড়ি বাদ যাবে।

(১৫) ৭১ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে 'মিষ্টার ই. তে' শব্দের স্থানে 'মিষ্টার ই. ডে' হবে।

(১৬) ৭২ পৃষ্ঠায় ৯ লাইনে 'গাড়' শব্দের স্থানে 'গড়ে' হবে।

(১৭) ২২৪ পৃষ্ঠায় ৮ লাইনে 'দীপঙ্করবাবু' শব্দের স্থানে 'দ্বিজেনবাবু হবে।

(১৮) ২৩৫ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারা ২২ লাইন থেকে ২৯ লাইন পর্যন্ত বাদ যাবে।

(১৯) ২৭৫ পৃষ্ঠায় পঞ্চম অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে "স্বাধীন ভারতে"র পরে "আগামী" শব্দ বসবে।

(২০) ২৭৮ পৃষ্ঠায় শেষ লাইনের উপরের লাইনের প্রথমেই "শিশিরবাবু" কথাটি বসাতে হবে।

(২১) ২৮৪ পৃষ্ঠায় শেষ লাইনের প্রথম শব্দটি "রমেশচন্দ্র" দিয়ে শুরু করতে হবে।

(২২) ২৯৫ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনে "১৯১৭ সালে ২৩" শব্দের পরে "মে" শব্দটি বসবে।

(২৩) ঐ পৃষ্ঠারই ২৭ লাইনের "ইণ্টেলিজেণ্ট" ব্রাঞ্চ স্থলে "ইণ্টেলিজেন্স" ব্রাঞ্চ পড়তে হবে।

(২৪) ৩০২ পৃষ্ঠায় শেষ থেকে নবম লাইনে "অরবিন্দের" স্থানে "অরবিন্দ" হবে।